প্রথম প্রকাশ :
স্বাধীনতাদিবস, ১৯৭৪

প্রকাশক :
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ
চট্টগ্রাম পরিষদ
পি-৭, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড
কলিকাতা-৩২

মুদ্রক :
শ্রীপরেশনাথ গোস্বামী
শ্রী আর্ট প্রেস
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

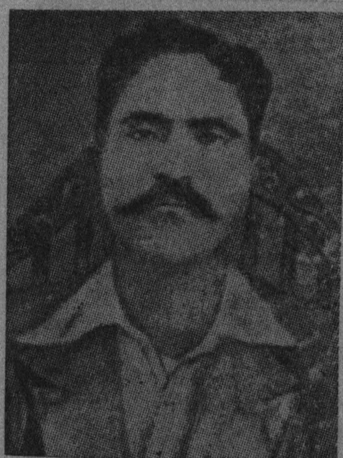
প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীগোপাল পাণ্ডা



অম্বিকা চক্রবর্ত্তী



নির্মল সেন



গিরিজাশংকর চৌধুরী



লোকনাথ বল

চট্টগ্রাম ঃ বিপ্লবের বহ্নিশিখা



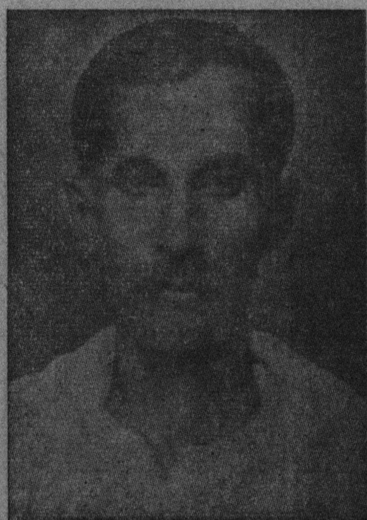
তারকেশ্বর দস্তিদার



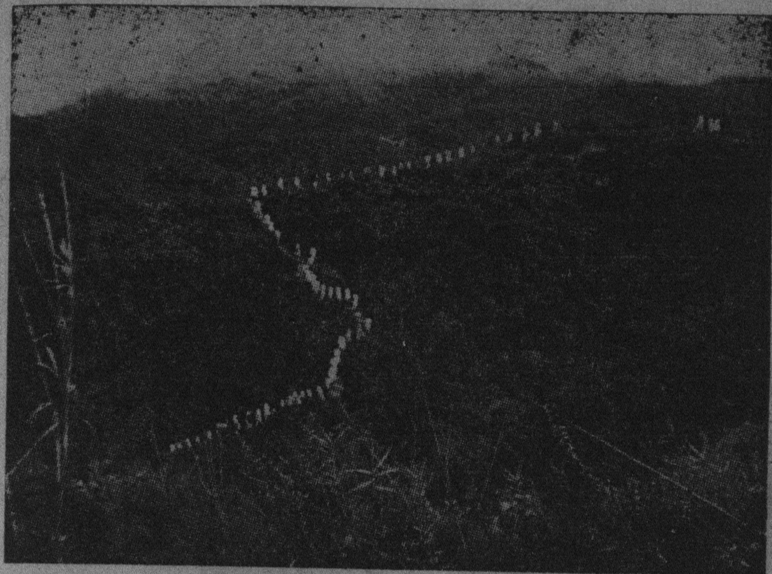
রামকৃষ্ণ বিশ্বাস



প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার



মহেন্দ্র বিশ্বাস



শহীদতীর্থ জালালাবাদ

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য শহীদতীর্থে আরোহণরত ভারত ও
বাংলাদেশের অনুরাগিবৃন্দ [২২শে এপ্রিল, ১৯৭২]



অর্ধেন্দু দস্তিদার

[জালালাবাদ যুদ্ধের শহীদ]

॥ সূচীপত্র ॥

জালালাবাদ যুদ্ধের শহীদ



প্রভাস বল　　শশাঙ্ক দত্ত　　নির্মল লাল

নরেশ রায়　　ত্রিপুরা সেন　　বিধু ভট্টাচার্য

জিতেন দাশগুপ্ত　　মধুসূদন দত্ত　　পুলিন ঘোষ



জালালাবাদ যুদ্ধের শহীদ



হরিগোপাল বল [টেগ্‌রা] মতি কানুনগো

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

[১]

চট্টগ্রাম পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য সর্বশ্রী অমরেশ ভট্টাচার্য, অরবিন্দ নাগ ও রাখাল চক্রবর্তী। সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ। চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বশ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্র দস্তিদার [শংকু], নবেন্দ্র দত্ত [নূপুর], ফকির সেন, বিনোদবিহারী দত্ত, মতিলাল চক্রবর্তী, শশধর চক্রবর্তী, সরোজ গুহ, সুধীর কানুনগো, সুধীর চক্রবর্তী, হরলাল চৌধুরী, হরিপদ কানুনগো, হরিনারায়ণ দাশ ও হৃদয়রঞ্জন চৌধুরী। অনুশীলন সমিতির সর্বশ্রী মোক্ষদা চক্রবর্তী ও শ্রীপতি নন্দী। কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহনের কন্যা সুষমাময়ী দাশগুপ্তা। চট্টলগৌরব মহিমচন্দ্র দাসের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসত্যব্রত দাস। 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কলিকাতা মেট্রোপলিটান স্কুল [মেইন]-এর শিক্ষক ও সম্পাদকের সহকর্মী সর্বশ্রী ধর্মদাস সামন্ত, রঞ্জিতরঞ্জন সিংহ ও সরোজ বিশ্বাস। সম্পাদকের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মী সর্বশ্রী বিধান ভট্টাচার্য ও শ্যামল পাণ্ডা। টিটাগর কৃষ্ণনাথ মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশম্ভু মল্লিক। চট্টগ্রামের অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার শ্রীসুশীল দত্ত। বিপ্লবীনেতা যতীন্দ্রমোহন রক্ষিতের কন্যা শ্রীমতী মুক্তি সিংহ। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। সর্বশ্রী অলোক ভট্টাচার্য, উৎফুল্ল রায়, উপালী গুহ, নির্মল সরকার, প্রদ্যোৎরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [চন্দননগর], মনোজিৎ গুহ, শুভ্রা গুপ্তা ও স্বদেশরঞ্জন গুহ।

[২]

আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, সাপ্তাহিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, যুগান্তর বিপ্লবী দলের মুখপত্র 'স্বাধীনতা' [সাপ্তাহিক], দৈনিক ইত্তেফাক [ঢাকা], দৈনিক বাংলা [ঢাকা], দৈনিক আজাদী [চট্টগ্রাম], ও **Calcutta Municipal Gazettee.**

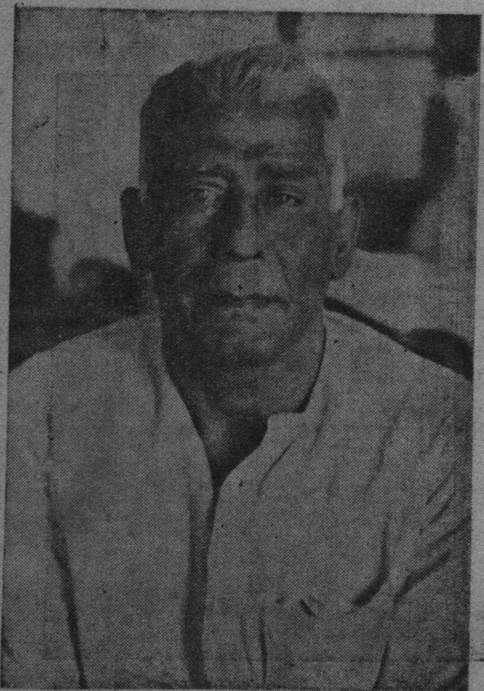
[৩]

The Roll of Honour—Kalicharan Ghosh. অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম—অনন্ত সিংহ। চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ—অনন্ত সিংহ। স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রাম—পূর্ণেন্দু দস্তিদার। সূর্য সেন স্মৃতি—বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থা।

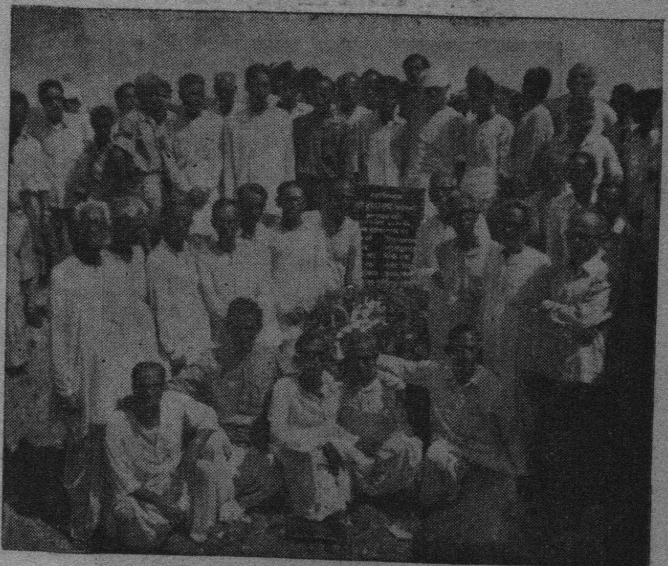
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ

চট্টগ্রাম পরিষদ

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী— সভাপতি, শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ—সম্পাদক, সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী অমলেন্দু দত্তগুপ্ত, দিলীপ কানুনগো, নীহারেন্দু চৌধুরী, বাদল চৌধুরী, মনতোষ চৌধুরী ও শশাঙ্কমোহন দাশ [সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম পরিষদ]— পদাধিকার বলে।

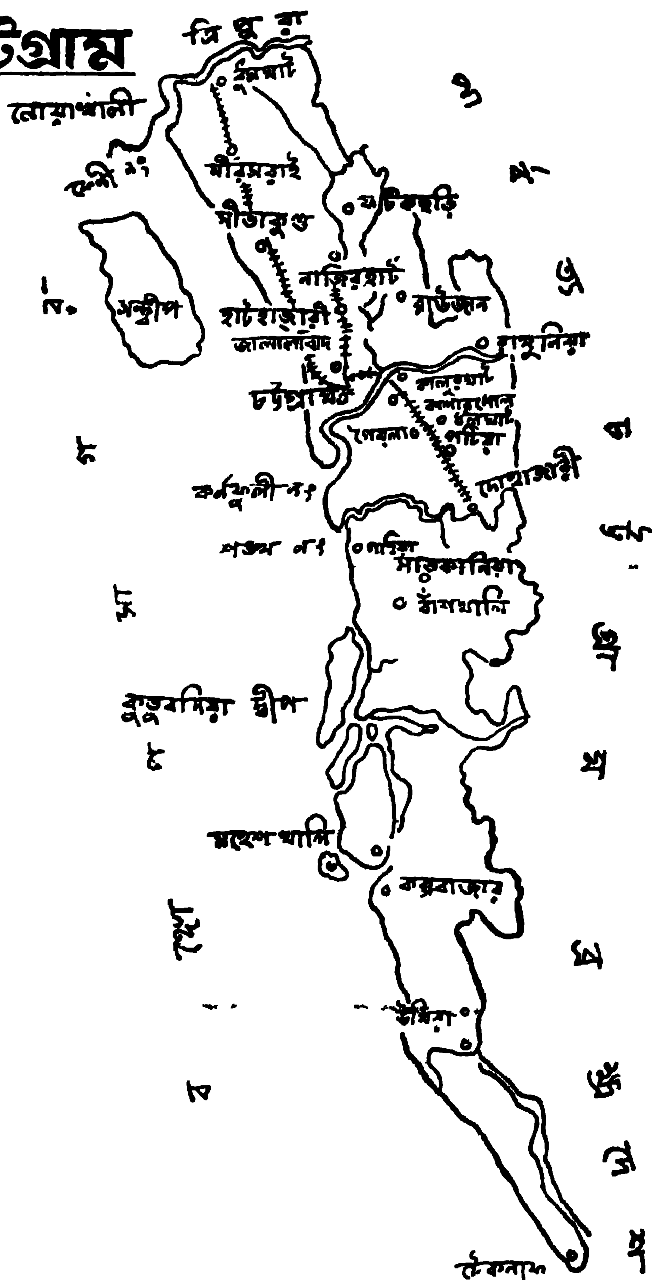


অগ্নিযুগের বিপ্লবী নায়ক চারুবিকাশ দত্ত

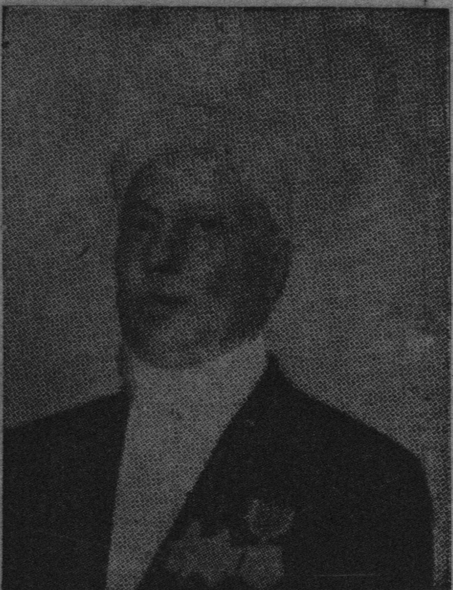


জালালাবাদ শহীদতীর্থে গৃহীত আলোকচিত্র

[২২শে এপ্রিল, ১৯৭২]



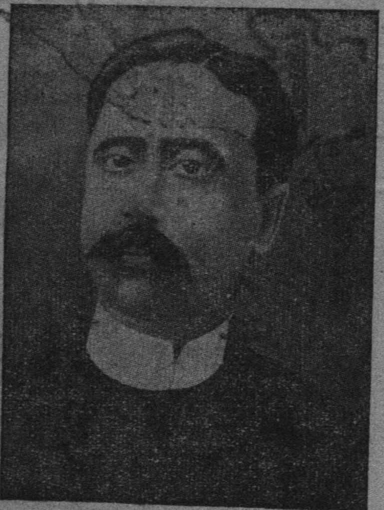
চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা
নোয়াখালী
মীরসরাই
সীতাকুণ্ড
ফটিকছড়ি
নাজিরহাট
রাউজান
হাটহাজারী
জালালাবাদ
সন্দ্বীপ
রাঙ্গুনিয়া
চট্টগ্রাম
কালুরঘাট
পটিয়া
দোহাজারী
সাতকানিয়া
বাঁশখালি
কুতুবদিয়া দ্বীপ
মহেশখালি
কক্সবাজার
টেকনাফ



জনাব আবদুল হক দোভাষী



শেখ রফিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী



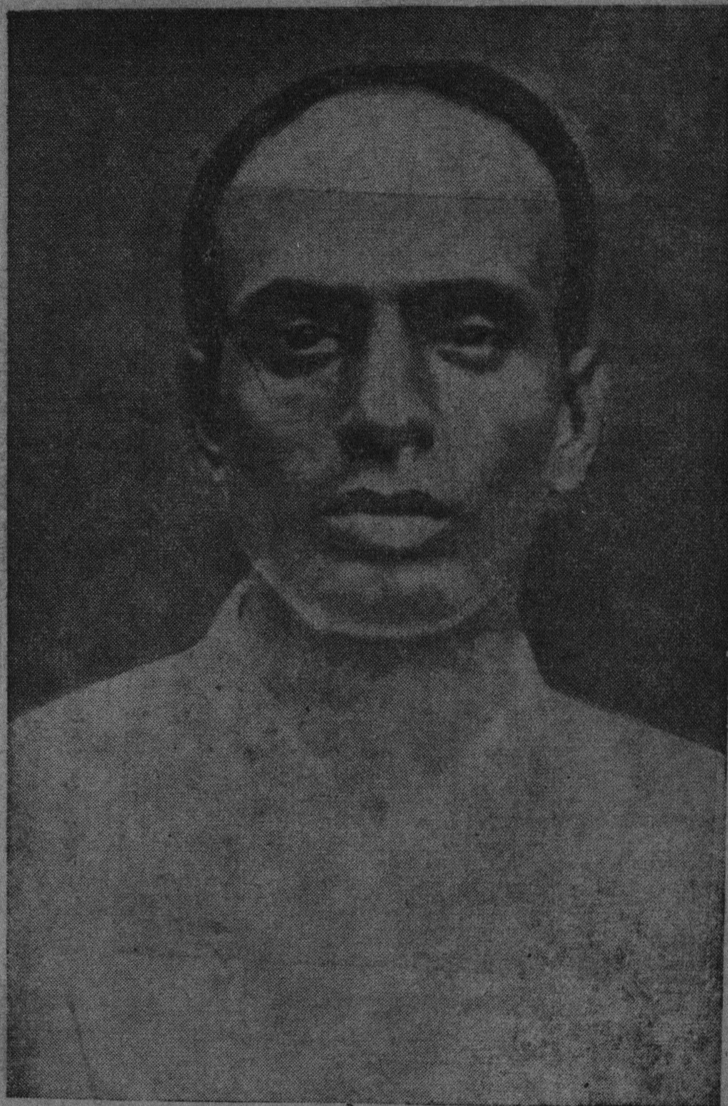
মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন



কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেন



স্ত্রী ও পুত্রের সাথে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান



বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন



ধলঘাট গ্রামে প্রতিষ্ঠিত নির্মল সেন ও
অপূর্ব সেনের স্মৃতিস্তম্ভ



ধলঘাট গ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের
স্মৃতিস্তম্ভ



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সূর্য সেনের আলেখ্য উপহার

বঙ্গবন্ধুর বামদিকে প্রথমে চট্টগ্রাম পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীদিলীপ কানুনগো।
ও পরে সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

ভূমিকা

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পন্থার পরিচয় পাওয়া যায়—একটি অহিংস ও অপরটি সহিংস। রাজা রামমোহন রায়ের আমল হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সর্বশেষে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অহিংস আন্দোলন নানাভাবে প্রথমে শাসনকার্যে ভারতীয়দের অধিকার-বৃদ্ধি ও পরে বিংশ শতাব্দী হইতে স্বাধীনতার দাবী উপস্থাপিত করা হইয়াছে। হিংসাত্মক পন্থাও স্থানীয় অভাব-অভিযোগের প্রতীকার অথবা ব্যাপকভাবে ব্রিটিশের প্রতি অসন্তোষজনিত বিভিন্ন কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহে উত্তর ও মধ্যভারতে বিশিষ্টরূপ ধারণ করে। এই বিদ্রোহ দমনের পরেও ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে মহারাষ্ট্রে হিংসাত্মক পন্থার অস্তিত্ব ছিল। বিংশ শতাব্দীতেই সর্বপ্রথম ইহা ভারতীয় বিপ্লববাদে পরিণত হয় এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ইহার শেষ পরিণতি দেখা যায় ১৯৪২ সনে ভারতবর্ষের বিপ্লবে, ১৯৪৪ সনে আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণে এবং ১৯৪৬ সনে ভারতীয় নৌবহরের বিদ্রোহে।

এই সহিংস বিপ্লববাদে যে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ, সে কথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। বাংলার

বিপ্লববাদের ইতিহাসে চট্টগ্রামের সক্রিয়তা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় অধ্যায়, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের ঘটনাপঞ্জী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও আলোচ্য এই গ্রন্থের যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা এই গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন।

বিভিন্ন ব্যক্তি এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির প্রথম অধ্যায়ে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লববাদের পূর্বকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক শ্রীশচীন দত্ত এই সম্বন্ধে এমন দুইটি উক্তি করিয়াছেন যাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, তিনি বলেন যে আলিপুর বোমার মামলার আসামীরাই চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম বিপ্লবের বীজ বপন করেন এবং প্রথম যে বিপ্লবী সংগঠনী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সদস্য ছিলেন যামিনী সেন, মণীন্দ্র সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও সম্ভবতঃ সূর্য সেন [আট পৃঃ]। দ্বিতীয়তঃ, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের চট্টগ্রাম ভ্রমণের সময় তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা। তারপর বিপ্লবের ধারা বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও অনুসৃত হয়—ডাকাতি করিয়া অর্থলুণ্ঠন ও সরকারী কর্মচারী হত্যা প্রভৃতি। অসহযোগ আন্দোলনেও চট্টগ্রাম বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে।

পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে জালালাবাদের মুক্তিযুদ্ধ ও ইহার নেতা সূর্য সেনের কাহিনী, মহান্ উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও কার্যাবলী বিভিন্ন লেখক কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এই জালালাবাদ সংগ্রাম ও তাহার সংশ্লিষ্ট পরবর্তী ঘটনা—ফেণী সংঘর্ষ, কালারপোল যুদ্ধ, চন্দননগর সংঘর্ষ, ধলঘাট যুদ্ধ—বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে [সাতচল্লিশ—উনপঞ্চাশ পৃঃ, ৪-২৯ পৃঃ, ৩১১-১৯ পৃঃ]। বহুগ্রন্থে

ও প্রবন্ধে ইহার আলোচনা আছে, কিন্তু এই সংগ্রামের কয়েকজন নায়ক —অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বল এবং সূর্য সেনের জ্যেষ্ঠতাত অগ্রজ ভ্রাতা চন্দ্রকুমার সেনের বিবরণ ঐতিহাসিক উপকরণ হিসাবে খুবই মূল্যবান। "মহানায়ক সূর্য সেনের মর্মবাণী" শীর্ষক অধ্যায়ে সংগৃহীত তাঁহার প্রবন্ধ, বিদায়বাণী ও উক্তি [২৮৯-৩০৫ পৃঃ] বিশেষ মূল্যবান।

অনেকদিন পূর্বে আমি লিখিয়াছিলাম যে, চট্টগ্রামেই বিপ্লববাদের একটি নূতন সার্থক প্রচেষ্টা দেখা যায়—সম্মুখ সমরে, স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত ও দেশের সম্মুখে এই আদর্শ স্থাপনে। অল্পকাল স্থায়ী হইলেও প্রেরণা ও দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহার মূল্য খুব বেশী। আলিপুর বোমার মামলার ফলে সমগ্র ভারতে যেমন সহিংস বিপ্লববাদের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়, চট্টগ্রামে তিন দিন ব্যাপী স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠায় ভারতে অনুরূপ প্রেরণা জোগাইয়াছিল। এই গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফে লোকনাথ বল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা একটি গুরুতর ঐতিহাসিক তথ্য এবং বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। ইহা আমার পূর্বোক্ত মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে।

এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়েকজন শহীদ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিবরণ এবং কয়েকজন বিপ্লবীর নিজের লেখা জীবনস্মৃতি। ভারতের সহিংস মুক্তিসংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যদি কোন দিন লিখিত হয়, তাহা হইলে এই কয়টি অধ্যায় অমূল্য ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কারণ ইহাতে বিপ্লবীদের মনোবৃত্তি, আদর্শ ও লক্ষ্য, শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতি এবং সর্বোপরি তাঁহাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া

যায় তাহার অনন্যসাধারণতা আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে—হত্যা, সংগ্রাম, লুণ্ঠন প্রভৃতি অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর সম্মুখে এক মাধুর্যমণ্ডিত পটভূমিকার আবরণ বা অন্তরাল সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে এই যুগের বাঙ্গালী যুবকের মহত্ত্ব উপলব্ধি করায়। বিশেষতঃ বর্তমান যুগের অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির তুলনায় তাঁহাদের চিত্র উজ্জ্বল হইয়া একাধারে বর্তমানে নিরাশা ও ভবিষ্যতের আশা জাগায়। এই হিসাবে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবনস্মৃতি ও বিদায়বাণী [২৬২-২৮৮ পৃঃ] এবং প্রমীলা দাসের [৯২-১০০পৃঃ] ও অণিমা বিশ্বাসের স্মৃতিকথা [২৩২-৩৩৯ পৃঃ) —এই গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ। এই কাহিনীগুলি উপন্যাসের চেয়েও আমাদের মনে অপূর্ব অনুভূতির বেশী উপাদান যোগায়। বিপ্লবীদলের পশ্চাতে বঙ্গনারীর শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস ও আত্মনির্ভরতার এরূপ অপূর্ব চিত্র আর কোথাও পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লেখার সময় আমি চট্টগ্রামের বিপ্লবের বিবরণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে এই মামলায় সংসৃষ্ট একজন সরকারী উকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কথাপ্রসঙ্গে প্রীতিলতার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন ঃ

> পুলিশ আফিসে রক্ষিত সূর্য সেনের নিকট প্রীতিলতার লিখিত কয়েকখানি চিঠিতে পুনঃ পুনঃ তাহার একটি কথার উল্লেখ দেখিতে পাই—'আপনি আমার জন্য ভাবনা বা ভয় করিবেন না। আমার বুকের মধ্যে যিনি আছেন তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন।' বারবার 'বুকের মধ্যে'

—এই কথাটি চিন্তা করিয়া আমার মনে কৌতূহল জাগে। প্রীতিলতার আত্মহত্যার সময় তাহার গায়ের জামা পুলিশের হেফাজতে ছিল—আমি তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গেলাম। দেখিলাম, জামার অভ্যন্তরে সেলাইকরা কৃষ্ণের ছোট একখানি ছবি। তখন বুঝিলাম, আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঠিক—ভগবানের প্রতি বিশ্বাসই পূর্বোল্লিখিত উক্তিটির অর্থ।

এই গ্রন্থ হইতে আরও যে বহু নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার মধ্যে চারিটি উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, সূর্য সেনের মৃতদেহ যে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করা হয় তাহার প্রমাণ ও বিবরণ [৬১-৬৭পৃঃ]। দ্বিতীয়তঃ, বর্মায় চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রভাব [২১৬-৩১ পৃঃ]। তৃতীয়তঃ, চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস [তেত্রিশ-একচল্লিশ, ১৭৭-২০০ পৃঃ]। ইহার সদস্যরা কেহ কেহ নাকি আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে দুইজন নেতাজীর দেহরক্ষক ছিলেন [১৮৯, ১৯৯ পৃঃ]। ইহার কোন প্রমাণ বা উল্লেখ অন্যত্র পাই নাই। চতুর্থতঃ, মুসলমানসম্প্রদায়ের কয়েকজন এবং হিন্দুসমাজে যাহাদিগকে আমরা নীচজাতি বলি তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বিপ্লবীদের সাহায্য করিয়াছেন ও পলাতকদের আশ্রয় দিয়াছেন [১৮৬, ২৪০, ২৪৫পৃঃ]। এই প্রসঙ্গে আমজাদ আলী যেভাবে জালালাবাদ সংগ্রামের পর আহত অম্বিকা চক্রবর্তীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য [৩৩৫-৬পৃঃ]।

উপসংহারে, ১৯৭১ সনে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলা-দেশের মুক্তিসংগ্রামে চট্টগ্রাম যে প্রথম সাড়া দেয় এবং চট্টগ্রামের

বীর বাঙ্গালী এক সৈনিকের আহ্বানে প্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার বর্ণনা আছে।

চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জী [৩২০-২৩পৃঃ], শহীদদের নাম ও কি উপলক্ষে কোন্ তারিখে কাহার মৃত্যু হয় তাহার বিবরণ [৩২৪-২৬পৃঃ] এবং ফেরারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতাদের নাম ও ঘটনা ইত্যাদির তালিকা [৩২৭-৩৩৬ পৃঃ] প্রভৃতি এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বৃদ্ধি করিবে।

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই গ্রন্থখানি এই বিষয়ের আকরগ্রন্থগুলিব মধ্যে একটি উচ্চ আসন অধিকার করিবে, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

৩১ শে জুলাই, ১৯৭৪

সম্পাদকের বক্তব্য

শচীন্দ্রনাথ গুহ

চট্টগ্রামের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। সমুদ্রমেখলা, সরিৎমালিনী ও 'বনরাজিনীলা' চট্টগ্রাম আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক আলোড়নের লীলাক্ষেত্র। প্রকৃতির বিচিত্র পরিবেশ এই অঞ্চলের অধিবাসিগণকে একদিকে করেছে সৌন্দর্যপিপাসু, আবার অপরদিকে সৌন্দর্যের অন্তরায়সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে তাদের করেছে সংগ্রামী। তাই, সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গরাজি এবং কর্ণফুলী ও শঙ্খ নদীর তীব্র স্রোতোধারা যখন জনপদে তাণ্ডব সৃষ্টি করে, তখন তার সঙ্গে সংগ্রামের বলিষ্ঠ মানসিকতা আমরা চট্টগ্রামবাসীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। রাজশক্তি যখনই আগ্রাসী সংকল্প নিয়ে চট্টগ্রাম অধিকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখনই সেই শক্তি প্রত্যক্ষ করেছে চট্টগ্রামবাসীর বিক্ষুব্ধ অন্তরের বহিস্ফুরণ। সংক্ষেপে বলা যায়—সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে চিরকাল উন্নতশির চট্টগ্রামবাসী। পক্ষান্তরে, তাদের জীবনধারার অনুকূল স্রোতকে তারা স্বাগত জানিয়েছে গভীর আন্তরিকতায়। চট্টগ্রামের এই বিচিত্র ইতিহাস গৌরবের, এই ইতিহাস গর্বের।

আমাদের এই গ্রন্থে সংগ্রামী চট্টগ্রামের বিভিন্নমুখী ধারার পরিচিতি-প্রদান সম্ভব নয়। মুখ্যতঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামের অবদানের পরিচিতি-প্রদান এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের আত্মত্যাগের গৌরবময় ঐতিহ্যকে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দেবার জন্যই এই ইতিহাস। বর্তমান যুগের জনসাধারণ যেন আত্মদানের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, বিগত যুগের মুক্তিপাগলদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে, তার জন্যই এই ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আমরাও বিশ্বাস করি :

> 'যে জাতির পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য-রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেশী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্‌হিম্ ও ওয়াটার্লু—ইতালী অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে।'

চট্টগ্রামের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, নিরপেক্ষ নয়। এই সংগ্রামের ধারা দ্বিমুখী—সহিংস ও অহিংস।

ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামে চট্টগ্রামের সহিংস কর্মধারা সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু অহিংস কর্মধারার কোন সুসংবদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তাই, এই গ্রন্থে প্রধানতঃ সহিংস ও অহিংস কর্মধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের প্রবন্ধ সংকলন করেছি। বহু প্রবন্ধ লেখকদের স্মৃতিচারণ। তাতে উচ্ছ্বাস আছে, সন্দেহ নেই ; কিন্তু ইতিহাসের উপকরণও আছে প্রচুর। সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর প্রদত্ত বিবরণই এই ইতিহাসের উপকরণ।

এই গ্রন্থকে সংগ্রামী চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে আমরা দাবী করছি না। এই গ্রন্থ ঐ ইতিহাসের একটি কাঠামো মাত্র। এই কাঠামোকে পূর্ণাবয়ব দানের দায়িত্ব অনাগত যুগের অধিকতর শক্তিমান্ ও সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের। চট্টগ্রামের বিচিত্র রোমাঞ্চকর কাহিনী যেন বিস্মৃতির অতলে বিলীন হয়ে না যায়, এই বোধ গ্রন্থ-সম্পাদনে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ-সংকলন বলে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

অহিংস আন্দোলনের ইতিহাসের উপকরণ বিভিন্ন গ্রন্থ, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র ও বিভিন্ন দেশভক্তের স্মৃতিভাণ্ডারে বিধৃত আছে। তাই, এই আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করা হয়তো তেমন দুরূহ ব্যাপার নয়। কিন্তু সশস্ত্র বা সহিংস আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে এই অভিমত প্রযোজ্য নয় ; কারণ সহিংস আন্দোলনের ইতিহাস মন্ত্রগুপ্তির ইতিহাস, গোপনীয়তার ইতিহাস। এই ইতিহাসের স্রোতোধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে ফল্গুধারার ন্যায় প্রবহমান। অহিংস আন্দোলনের ইতিহাস রচনা কোন একজন যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। সহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। মন্ত্রগুপ্তির সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ বিপ্লবীদলবহির্ভূত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। আবার এক অঞ্চলের বিশদ কর্মধারা অপর অঞ্চলের সাধারণ কর্মীদের কাছে অজ্ঞাত থাকত। কোন বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার পরিকল্পনা সাধারণত নেতাদের মতবিনিময়ে স্থিরীকৃত হত। এই সব স্বাভাবিক কারণে সশস্ত্র বিপ্লবীদলের কর্মধারার যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-প্রণয়ন বহু জনের সমবেত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতা-অর্জনে জাতীয় প্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনার জন্য উভয় আন্দোলনের সঠিক গতিধারার অবগতি একান্ত প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের প্রায় সুরু থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে অসন্তোষের

বহ্নি ধূমায়িত হতে থাকলেও ১৮৫৭ সালে তা প্রচণ্ড শক্তিতে সর্ববিধ্বংসী হুতাশনে আত্মপ্রকাশ করে। দেশবাসীর পরাধীনতাজনিত অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ এই সিপাহী বিদ্রোহ। তারপর ঘটনার পর ঘটনা—রক্তঝরা, অশ্রুঝরা ঘটনার ইতিহাস। চট্টগ্রামেও রচিত হয়েছে সেই ইতিহাস—চট্টগ্রামও সেই বহ্নির তাণ্ডবলীলার অন্যতম বিশিষ্ট ক্ষেত্র।

বর্তমান গ্রন্থ সেই অবিস্মরণীয় অভ্যুত্থানের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রামের অবদানের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিঅর্জনে অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী কংগ্রেস, সহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী সূর্য সেন-পরিচালিত বিপ্লবী দল [ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী—চট্টগ্রাম শাখা], অনুশীলন সমিতি এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের ভূমিকার মোটামুটি পরিচিতি-দান এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু। বিদেশীর শাসন ও শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য এই দেশভক্ত সন্তানসম্প্রদায়ের ত্যাগ ও তপস্যাব্রতের সমুজ্জ্বল দীপ্তি ও গৌরব বর্তমান ও ভাবীকালের মানুষকে সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজগঠনে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় জাতি মস্তক অবনত করে। প্রাণদানের সুযোগ যাঁদের হয় নি, অথচ অত্যাচার নির্যাতনের ঝড় যাঁদের সহ্য করতে হয়েছে দিনের পর দিন, সংগ্রামের সুষ্ঠু পরিচালনা ও অগ্রগতি এবং সংগ্রামীদের প্রাণরক্ষার জন্য যাঁদের নিরলস ও নির্ভীক প্রচেষ্টা চলেছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাঁদের অবদান প্রাণোৎসর্গ-কারীদের চাইতে মোটেই কম নয়। চট্টগ্রাম জেলার মত ক্ষুদ্র একটা অঞ্চলে বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন ও তাঁর সহবিপ্লবীরা আত্মগোপন করে গেরিলাপদ্ধতিতে শত্রুপক্ষকে আঘাতের পর আঘাত করেছেন। তা সম্ভব হয়েছে এই বিপ্লবীদরদী আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীদের আন্তরিক ও শঙ্কাহীন সহযোগিতায়। যখন এঁদের কারো পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে, তখন জনসাধারণ তাঁদের প্রতি জ্ঞাপন করেছে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা। কিন্তু কয়জনের নাম জনসাধারণ জানে? অজানা অচেনা বহু আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রী আছেন, আছেন সংগ্রামীদের অসংখ্য সহায়ক দরদী ব্যক্তি—যাঁরা এখনো unhonoured ও unsung. রক্তরেখার গোপন প্রলেপে যাঁরা সৃষ্টি করেছেন ইতিহাস, তাঁরা হারিয়ে যাবেন মানুষের স্মৃতি থেকে! স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত,

অথচ ইতিহাসে তাঁরা অজ্ঞাত, উপেক্ষিত থাকবেন—তা হলে তো সেই ইতিহাস যথার্থ নয়, নিরপেক্ষ নয়। আমরা চাই, প্রাণদানকারীদের সঙ্গে সংগ্রামীদের প্রাণরক্ষাকারী আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীদের নামও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হোক। এই উদ্দেশ্যে আমাদের কয়েকজন হৃদয়বান্ বন্ধুর অকুণ্ঠ সহায়তায় কয়েকজন আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীর নামধাম সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে মুদ্রিত করেছি। বলা বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়।

সম্প্রতি আত্মপ্রচারের প্রবণতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগ্যের আত্মপ্রচার কিছুটা ক্ষমার্হ হতে পারে; কিন্তু অযোগ্যের আত্মপ্রচার পুরোপুরি নিন্দনীয়। তা ইতিহাসকে বিকৃত করে, সঠিক তথ্যকে গোপন করে। সম্প্রতি-প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

পূর্বেই বলা হয়েছে, গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস-রচনায় সেই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিবেশিত তথ্যের উপরই নির্ভরশীল হতে হবে। তা না হলে ঐ ইতিহাস সঠিক হবে না—হতে পারে না। অপরের অবদানকে ছোট করে দেখা বা দেখানো, সেই অবদানকে গোপন করা অথবা একজনের বিপ্লবকর্ম অন্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত বলে প্রচার করা প্রচারকের মনোবৃত্তির সততার পরিচায়ক নয়। এই হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যে বিপ্লবী নয়, তা বলাই বাহুল্য। পুলিশের নিপীড়ন, নির্যাতন বা প্রলোভনে সে দ্বিতীয় নরেন গোস্বামীতে পরিণত হতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত কয়েকটি প্রবন্ধে পরস্পরবিরোধী তথ্য আছে। বিভিন্ন লেখক একই ঘটনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি; কিন্তু তাঁরা তাঁদের পরিবেশিত তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে অবিচল। কাজেই নিরুপায় হয়ে আমরা তাঁদের প্রবন্ধ হুবহু প্রকাশ করেছি। সত্যাসত্য নিরূপণের দায়িত্ব অনাগত যুগের ঐতিহাসিকদের উপর অর্পণ করলাম।

সঠিক তথ্য অবগত না হয়ে কিছু লেখা লেখকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। ইতিহাস জাতীয় সম্পত্তি। ভুল বা বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে ইতিহাস রচনার অধিকার কারো নেই। দুঃখের বিষয়, কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের মধ্যেও ইতিহাস বিকৃত করার প্রবণতা দেখা গেছে।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় "একটি দুর্ধর্ষ বিপ্লবীর কাহিনী" [গল্পভারতী, ফাল্গুন ১৩৬৩] নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

'মাষ্টারদা বাহিনীর পক্ষ হইতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর আসানউল্লাকে অপসারণের আদেশ দিলেন। পঞ্চদশ বর্ষীয় তরুণ সৈনিক হরিপদ ভট্টাচার্য ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম সহরে খেলার মাঠে রিভলভারের গুলীতে বিদেশী সরকারের ওই অনুগত ভৃত্যকে নিধন করে। বিপ্লবীদের উপর নৃশংস নির্যাতনের জন্য তিনি কুখ্যাত হইয়াছিলেন। **হরিপদ যৌবনের প্রারম্ভে ফাঁসির মঞ্চে গাহিয়া গেল জীবনের জয়গান।'**

আমাদের আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে, আমাদের বিশিষ্ট সহকর্মী হরিপদ কিশোর বয়সে এই অসম সাহসিকতাপূর্ণ ঘটনার হোতা ছিলেন এবং এখনো জীবিত আছেন।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল 'বনস্পতির বৈঠকে' [দেশ, ৭ই জুলাই ১৩৮০] লিখেছেন ঃ

'হাজরা রোডের বাড়ীতে একদিন ভরা দুপুরে জনৈক সুশ্রী, বলবান ও পেশীবহুল স্বাস্থ্য নিয়ে একটি আমার বয়সী যুবক সোজা উপরে উঠে এসে শ্রীমতী শোভার ঘরে ঢুকল।......বললুম, ও ভদ্রলোক কে এসেছিলেন ?..... অধীর আগ্রহে শ্রীমতী শোভা বললেন, ও আমার ছোট ভাই নির্মল সেন, ও আর ফিরবে না কোন দিন !......ওই সামান্য ঘটনার বোধ হয় দিন দশেকের মধ্যে চট্টগ্রাম রেলওয়ে ইনষ্টিট্যুটের হলের ভিতরে সাংঘাতিকভাবে বোমা নিক্ষেপ করে একটি যুবক ও একটি তরুণী—ওটা ওদের নিবিড় বন্ধুত্বের শেষ কৃত্য ! কিন্তু সেই রাত্রির অন্ধকারে ওরা পালায় নি, ওরা অন্ধকারে কেবল পটাসিয়ম সাইনাইড মুখে পুরবার অবসর খুঁজে ছিল। ওদের দুটি মৃতদেহ কুড়িয়ে পাবার পর পুলিশ জানল **একজনের নাম নির্মল সেন, অন্যজন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।'**

শ্রীমতী শোভার সঙ্গে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না, থাকলেও চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর বিপ্লবী নেতা নির্মল সেনের সঙ্গে কলকাতায় তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনা সঠিক নয় ; কেন না ঐ সময়ে নির্মল সেন কলকাতা আসেন নি। নির্মল সেন ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন সামরিক বাহিনীর সহিত সংঘর্ষের সময় ক্যাপটেন ক্যামেরণকে নিহত করে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে

'৮ জন বিপ্লবী চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করে বহু ইংরেজ নরনারীকে নিহত ও আহত করেন। বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ আক্রমণের কিছুক্ষণ পরে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, নির্মল সেন ও প্রীতিলতার একসাথে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ও বিষপানে আত্মহত্যার তথ্যটিও নিছক কল্পনাপ্রসূত।

কলকাতার স্বাক্ষরতা প্রকাশন-প্রকাশিত "এই আমাদের বাংলা" গ্রন্থের 'ধন্য চট্টগ্রাম' অধ্যায়ে দেখা যায় :

> '১৯৩০-এর ৬ই মে **গণেশ ঘোষের** নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের চেষ্টা করেন। ...লড়াই করতে করতে ফৌজী বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হ'ন গণেশ ঘোষ। ... **অপূর্বর** গুলিতে প্রাণ হারাল ক্যামেরণ.........গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করে শহীদত্ব বরণ করেন **প্রীতিলতা**।......

১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার অধিকারের পর গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল অগ্নিদগ্ধ বিপ্লবী হিমাংশু সেনকে চিকিৎসার জন্য সহরের নিরাপদ আশ্রয়স্থানে রাখবার উদ্দেশ্যে গাড়ীতে করে নিয়ে আসেন। পরে মূল বিদ্রোহীবাহিনীর সঙ্গে এঁদের মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটে নি। কয়েকদিন সহরে আত্মগোপন করে থাকার পর তাঁরা ২২শে এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রাম সহর থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তাঁরা ২৬শে তারিখ কলকাতা পৌঁছেন। গণেশ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা ৬ই মে চন্দননগরে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন। তাই গণেশ ঘোষ-সম্পর্কিত উপরিউক্ত ঘটনাটি সঠিক নয়।

ক্যাপটেন ক্যামেরণ নির্মল সেনের গুলিতে নিহত হন, অপূর্বর গুলিতে নয় [এই গ্রন্থের ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। প্রীতিলতা গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করেন নি, মেয়েদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই তাঁর আত্মহত্যা [এই গ্রন্থের ২৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থান অদূর অতীতের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেই অভ্যুত্থানের নায়ক ও কর্মীদের মধ্যে অনেকেই জীবিত আছেন। কাজেই এই ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত ইতিহাস, উপন্যাস বা স্মৃতিচারণ মিথ্যাশ্রয়ী হওয়া সমীচীন নয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাও চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁরা ঐ বিদ্রোহের নবমূল্যায়ন করেছেন। মুক্তিবাহিনীর একটি অংশের নাম ছিল সূর্য সেন ব্রিগেড। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহম্মদ আলী জিন্না হলের নতুন নামকরণ হয়েছে মাষ্টারদা সূর্য সেন হল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ভাষণে সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে থাকেন। ১৯৭২ সালের ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম বিদ্রোহে নিবেদিতপ্রাণ বীর শহীদদের স্মৃতিসভা উপলক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জালালাবাদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক শ্রীবিনোদ চৌধুরীর কাছে প্রেরিত নিম্নমুদ্রিত বাণীতে বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন :

> মুক্ত বাংলায় জালালাবাদ দিবস পালিত হচ্ছে শুনে আনন্দিত হয়েছি। আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে মৃত্যুভয়হীন বাঙালী বীরবিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিল। বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ রক্তঝরা সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেই স্বাধীন বাংলাকে জয়যুক্ত করেছে, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার সার্থক রূপায়ণের মাঝে মাষ্টারদার অতৃপ্ত আত্মা আজ খুঁজে পাবে শান্তি। মাষ্টারদা অমর হয়ে রইলেন বাংলার মানুষের হৃদয়ে—বাংলার ঘরে ঘরে। যুগে যুগে ঐতিহাসিক এই দিনটি প্রতিটি বাঙালীর কাছে অনন্ত প্রেরণার হয়ে থাকুক—এ কামনা করি।
>
> গণভবন
৩রা বৈশাখ, ১৩৭৯
১৪. ৪. ৭২
>
> আন্তরিক শুভেচ্ছাসহকারে
স্বাক্ষর—শেখ মুজিবুর রহমান

পরমশ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি নিবেদন করছি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তাছাড়া গ্রন্থ-সম্পাদনে আমি স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত বহু লেখক, দেশভক্ত এবং পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করেছি। এই গ্রন্থের অন্যত্র তাঁদের নাম মুদ্রিত হয়েছে। সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

৯ই আগষ্ট, ১৯৭৪

OLD CHITTAGONG

As you ask me to sing some original thing,
I suppose I can hardly be wrong,
If I try to rehearse in appropriate verse
The stories of Old Chittagong.
Then, gentlemen, join in the song
With a chorus to help it along.
'Tis the right of the host to lead
off with a toast,
And I give you—our Old Chittagong.

We have hills, we have plains and
such sweet winding lanes,
As to Devon and Dorset belong,
But the fern and the palm lend a
tropical charm
To the landscape of Old Chittagong.
Then, gentlemen, join in the song etc.*

*   *   *   *   *

[Adapted from Bignold's LEVIORA, 1888
Ref: Assam Review and Tea News—January, 1947]

---

* প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীশচীন দত্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত "Assam Review and Tea News" পত্রিকার 'Chittagong Notes etc.' বিভাগে ১৯৩২-৪৭ পর্যন্ত নিয়মিত সংবাদ পরিবেশন করতেন। উপরিউক্ত কবিতাংশটি তাঁর পুরনো সংগ্রহ থেকে সংকলিত।

—সম্পাদক

মুক্তিপিয়াসী চট্টলা

শ্রীদিলীপ কানুনগো

বীর-প্রসবিনী চিরবিদ্রোহী মুক্তিপিয়াসী চট্টলা !
তনু-মন-প্রাণ চির উদ্দাম মানসী কপাল-কুণ্ডলা !
বাংলা মায়ের অগ্নিকন্যা বহ্নি-পরশ কুন্তলে,
আলোড়ন আনে গিরি-কন্দরে কর্ণফুলীর জলে।
'সাম্পান' নায়ে বয়ে নিয়ে যায় অসীম সিন্ধু-পানে,
মৃত্যুর মাঝে মুক্তি-বারতা জীবনের সন্ধানে।
রুদ্রাণীবেশে ভৈরবী গায় কমনীয়া কন্যা,
চট্টলা তুমি কঠিনে কোমলে রূপসী অনন্যা।
বজ্রকঠিন আঘাতে তোমার ব্রিটিশ মেসিনগান
স্তব্ধ করেছে প্রাণ-বিনিময়ে অমৃতের সন্তান।
পাহাড়তলীতে নাগরখানায় গহিরায় পল্টনে,
দামাল জওয়ান পাঞ্জা লড়েছে কৃতান্তদূত সনে।
ধলঘাট আর কালারপোলেতে কবির ধাত্রী বাজালো বীণ,
অনলবর্ষী অগ্নিঅস্ত্রে ঝঙ্কার সুকঠিন।
রক্তপঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটেছে তরুণদল,
বুকের পাঁজরে তীর্থ গড়েছে বঙ্কিম চট্টল।
জালালাবাদের শৈলশিখরে নিভৃত পল্লীগ্রামে,
চট্টলা রচে নব ইতিহাস দুর্জয় সংগ্রামে।
যুব-বিদ্রোহে গাঁথা হ'ল এক মহাজীবনের মালা,
অমিত-বীর্য সূর্য-প্রভায় অনুপমা চট্টলা।*

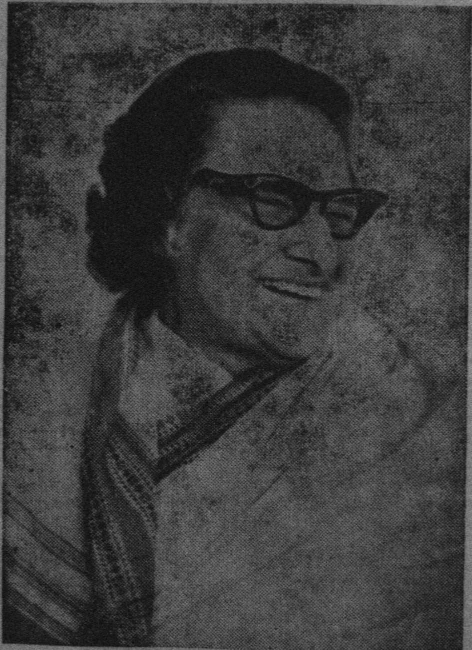
---

* নিবেদিতপ্রাণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও শহীদদের স্মরণে রচিত [২২শে এপ্রিল, ১৯৭২]

চট্টগ্রাম : ১৯৪৩

সুকান্ত ভট্টাচার্য

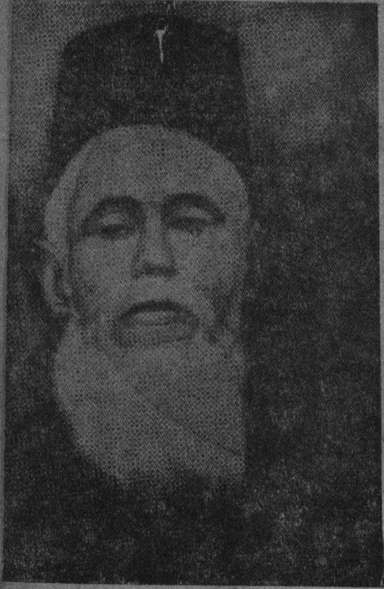
ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম—
চট্টগ্রাম: বীর চট্টগ্রাম!
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎপ্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন!
চট্টগ্রাম: বীর চট্টগ্রাম!
এখনো নিস্তব্ধ তুমি
তাই আজো পাশবিকতার
দুঃসহ মহড়া চলে,
তাই আজো শত্রুরা সাহসী।
জানি আমি তোমার হৃদয়ে
অজস্র ঔদার্য আছে; জানি আছে সুস্থ শালীনতা
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে
এখনও, স্তিমিত নও, জানি তুমি এখনো উদ্দাম—
হে চট্টগ্রাম!
তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দূলের ঘুম
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
তোমার উদ্যত থাবা, সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
এখনো হয় নি নিরাপদ।
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।
তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম!
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম॥



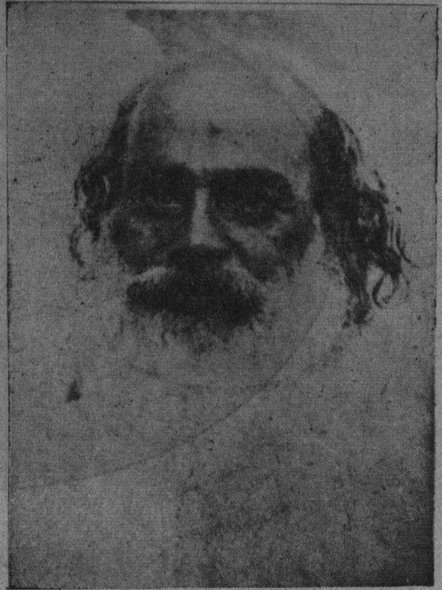
মহীয়সী নেলী সেনগুপ্তা



দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত



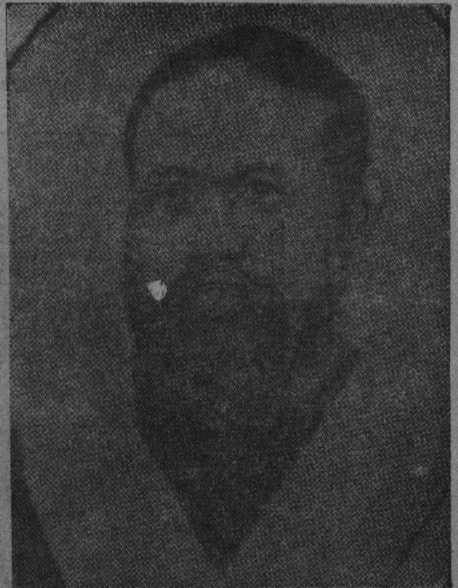
এ চাটগাম কাজেম আলী মিঞা



চট্টলগৌরব মহিমচন্দ্র দাস



ৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী



ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী



পদ্মবিভূষণ ও তাম্রপত্র প্রাপ্তির পর নেলী সেনগুপ্তা



১৯৭২ সালের ২২শে জুলাই বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী [বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী] ডঃ কামাল হোসেন চট্টগ্রাম জে. এম. সেন হল প্রাঙ্গণে দেশপ্রিয়ের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করে মাল্যদান করছেন। পাশে জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক শ্রীবিনোদ চৌধুরী—

বিপ্লব-ঐতিহ্যে চট্টগ্রাম

শচীন দত্ত

"চট্টগ্রাম বাংলার শক্তিপীঠ"—এই ঐতিহ্যাশ্রিত সত্যবাক্য লিখেছিলেন বঙ্গ-ভারতের অন্যতম বিপ্লবী পথিকৃৎ, মন্ত্রগুরু, উত্তরকালের যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দের একান্ত সহচর এবং পণ্ডিচেরী আশ্রমসচিব, প্রখ্যাত মনীষী শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। চট্টগ্রাম বিপ্লব আন্দোলনের [১৯৩০-৩৫ ইং] কথঞ্চিৎ ভূমিকা দিয়ে প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে গুপ্তমহাশয়ের নিকট বর্তমান লেখকের এক পত্রের জবাবে চট্টল ভূখণ্ডের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

প্রবীণ বিপ্লবী নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও তাঁর এক রচনায় লিখেছিলেন, ১৯৩০ সালে অস্ত্রাগার অধিকারের পরেই ব্রিটিশশক্তির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিজয়-উল্লাসে **চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহী দল সারা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার ত্রিরঙ্গ পতাকা উত্তোলনের গৌরব অর্জন করেছিলেন।**

চট্টলের বীর সন্তানগণের বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা, সংগঠন-শক্তি ও আদর্শবাদের মূল উৎস ভারতের এই পূর্বপ্রত্যন্ত দেশের ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক পরম্পরা এবং অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চট্টলবাসীর অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও কঠোর কর্মনিষ্ঠা। চট্টলবাসীর স্বভাবজাত অন্তর্জ্ঞান, ক্ষিপ্রবুদ্ধি, চিন্তার গভীরতা, অশেষ ভাবাবেগ, অপূর্ব দেশাত্মবোধ এবং বীরোচিত কার্যনির্ঘণ্ট ও এগিয়ে চলার দুঃসাহস যুগে যুগে তার জননী জন্মভূমিকে করেছে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

সিপাহী বিদ্রোহে চট্টগ্রাম

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় দশক, বিশেষতঃ মধ্যভাগ থেকেই ব্রিটিশরাজের অবিচার ও জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নি বিভিন্নদিকে ধূমায়মান হতে সুরু হয়। একাধিক ইংরাজবিরোধী ক্ষুদ্রাকারের অভ্যুত্থান, যেমন উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ [১৭৭১], পশ্চিমবঙ্গপ্রান্তে চুয়াড়

লেখক শ্রীশচীন দত্ত বহু বৎসরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও প্রখ্যাত সাংবাদিক। ১৯৩০ সাল থেকে চট্টগ্রামে বিপ্লব আন্দোলন তথা সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের যাবতীয় ঘটনাবলী, বিশেষ করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার এবং তৎপরবর্তী ও সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক মামলাদির তিনিই ছিলেন ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ও সংবাদসংস্থানসমূহের

বা নায়ক বিদ্রোহ (১৮০৬), ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৩১), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) প্রভৃতি বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গের আকারে সংঘটিত হলেও দেশব্যাপী দাবানল হয়ে যে প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম গর্জে উঠেছিল, তা বিদেশীর নামকরণে 'সিপাহী বিদ্রোহ' কথিত হলেও, হয়ে উঠেছিল হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত অভিযান। ভারতব্যাপী সিপাহীযুদ্ধের প্রধান ঘটনাস্থল হয়েছিল লক্ষ্মৌ, কাণপুর ও দিল্লী। কিন্তু বিদ্রোহের সূচনা হয় অবিভক্ত বাংলাদেশের ব্যারাকপুর সেনানিবাসে। এই সূচনাপর্বের প্রথম বলি হয়েছিলেন ৩৪নং পদাতিক বাহিনীর তরুণ সেনানী মঙ্গল পাঁড়ে ও ঈশ্বরী পাঁড়ে। এঁদের আত্মদানের অব্যবহিত পরেই সারা ভারতে বিদ্রোহবহ্নি ছড়িয়ে পড়ে। তখন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ।

পাঁড়ে শহীদদ্বয়ের ফাঁসীর দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সবপ্রথম পূর্ব-সীমান্তে চট্টগ্রামে। ৩৪নং রেজিমেন্টের সিপাহীগণ ইংরাজ অফিসারদের হুকুম গ্রাহ্য না করেই এগিয়ে গেল। প্যারেড ময়দানে সিপাহীদের সমবেত হওয়ার আজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। সিপাহীরা ঐ আদেশ ভ্রুক্ষেপই করল না, বরং মারমুখী হয়ে উঠে। অগত্যা ইংরাজ কর্মচারিগণ চট্টগ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়। অতঃপর ২৩শে নভেম্বর হাবিলদার রজব আলী খাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীরা সরকারী কোষাগার ('তেরজুরী') থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা লুট করে, জেলখানার ফটক খুলে দিয়ে কয়েদীদের মুক্তি দেয় এবং সেনানিবাসের অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। চট্টগ্রামে তখন ব্রিটিশশাসন প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিদ্রোহী সিপাহীগণ তাদের অভ্যুত্থানে প্রতিবেশী স্বাধীন ত্রিপুরা মহারাজার সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করেছিল। কিন্তু তিনি ব্রিটিশরাজের নেহাৎ অনুগত হয়ে রইলেন। বিদ্রোহীরা লুণ্ঠিত মালপত্রাদি, অর্থ ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অন্যত্র সরে যাওয়ার চেষ্টায়

একমাত্র সংবাদ-পরিবেশক। তিনি যে-সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ-সংস্থার বিশেষ সংবাদদাতা ছিলেন, তন্মধ্যে কলিকাতার ষ্টেট্সম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, লিবার্টি, আনন্দবাজার পত্রিকা, লক্ষ্মৌর পাইওনীয়ার, পাটনার ইণ্ডিয়ান নেশন, রেঙ্গুনের রেঙ্গুন গেজেট ও ডেইলী নিউজ প্রভৃতি পত্রিকা এবং তখনকার এসোসিয়েটেড প্রেস ও ইউনাইটেড প্রেস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে উড়িষ্যা গমন করেন এবং ২৪ বৎসরকাল অক্লান্ত শ্রমে সাংবাদিকতায় কার্যরত ছিলেন। কটকে অবস্থান-কালে তথাকার সমাজ, প্রজাতন্ত্র ও ইষ্টার্ণ টাইম্‌স প্রভৃতি ওরিয়া ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকার সহিতও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ সালে অবসর গ্রহণান্তর কলিকাতায় অবস্থান করছেন এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও দেশনায়িকা নেলী সেনগুপ্তার জীবনীসম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।—সম্পাদক।

মণিপুর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সিলেট পর্যন্ত গমন করে পুনরায় এক ইংরাজ মেজরের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল। চট্টগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহ এভাবে প্রশমিত হয়ে পড়ে। অবশ্য ১৮৫৮ সালেও বিদ্রোহাত্মক কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিছু সেনানিবাসে অগ্নিসংযোগ, কতক লোকের ছুটোছুটি, চাঞ্চল্য ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

ব্রিটিশ-অবিচারের প্রতিরোধ

সিপাহী বিপ্লবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগে স্বদেশের স্বার্থবিরোধী বহু কার্যকলাপের প্রতিবাদে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব সৃষ্ট হয়েছে নানা ভাবে নানাদিকে, কিন্তু সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠতে সময় লেগেছে। চট্টগ্রাম জেলায় জরীপকার্যে বাধাসৃষ্টির অপরাধে গুয়াতলীনিবাসী প্যারীমোহন চৌধুরী ১৮৩৭ সালে এবং আনোয়ারানিবাসী ডাঃ রামকিনু দত্ত ১৮৪৭ সালে কারাবরণ করেছিলেন। ১৮৬২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ধলঘাটনিবাসী স্বাধীনচেতা উকিল দুর্গাদাস দস্তিদার নব-প্রবর্তিত ইনকাম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষে প্রতিবাদ-লিপি লেখন অপরাধে এক মাসের জন্য কারাবরণ করেন। এই সকল ছিল কমবেশী ব্যক্তিগত প্রতিরোধের (individual resistance) কাল।

ভারতে জাতীয় মহাসমিতি অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় দশবৎসর পূর্বে, সমাজহিতৈষী, দেশপ্রেমিক স্বর্গত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীরের পরামর্শে চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় উকিল কমলাকান্ত সেন এবং দুর্গাদাস দস্তিদারকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করে "চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮৭৫)। এই এসোসিয়েশন উদার অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকল শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যাবতীয় অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া, প্রতিবাদ, সঙ্গে সঙ্গে আবেদন-নিবেদন ইত্যাদির মুখপাত্র ছিল। এর পরে ১৮৮০ সালে চন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদকতায় সাপ্তাহিক "পূর্ব প্রতিধ্বনি', ১৮৮২ সালে প্রসন্নকুমার করের "ভারতবর্ষ" নামক পত্রিকা এবং ১৮৯৬ সালে কালীশঙ্কর চক্রবর্তীর "জ্যোতিঃ" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি দেশের ও দশের অভাব-অভিযোগ, জন-

সাধারণের উন্নয়ন-দাবী, ঝড-ঝটিকা ও বন্যার প্রতিকার ইত্যাদি ব্যাপারে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করে জাতীয় অনুপ্রেরণা সৃষ্টি-কার্যে সহায়ক হয়ে উঠে।

চট্টগ্রামে আত্মস্বাতন্ত্র্যের ও স্বাজাত্যবোধের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সহিত যুক্ত করার প্রস্তাবে। সরকার-প্রণোদিত এক মানপত্রে এই প্রস্তাবের পক্ষে চট্টগ্রামকে "ঘুঁটে-কুড়ানী কন্যা" থেকে আসামের রাজরাণীর আসনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা হয়: "The Cinderilla of Bengal may yet be the Queen of Assam"। চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন প্রবল জনমতের প্রতিধ্বনি তুলে উক্ত প্রচেষ্টার গতিরোধ করে। "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় জোর প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—"Shoulderache of Bengal Satrap" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী চট্টগ্রামবাসীর পরম সহায়ক হয়। চট্টগ্রাম-নোয়াখালী ও ত্রিপুরার সম্মিলিত জনমত অচিরেই জয়যুক্ত হয় এবং উক্ত সরকারী ভেদবুদ্ধিসূচক প্রস্তাব তখনকার মত পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের পিতা স্বনামধন্য জননায়ক যাত্রামোহন সেন, কুমিল্লার কৈলাসচন্দ্র দত্ত এবং নোয়াখালীর রাধাকান্ত আইচ।

স্বদেশী আন্দোলনের আবর্তে

১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে নব জাতীয় জাগরণের অবিস্মরণীয় ঘটনা। চট্টগ্রামেও এর ঢেউ এসে পৌঁছাতে বিলম্ব হয় নি। নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন হিন্দু-মুসলমান শ্রেষ্ঠ নাগরিকবৃন্দ। দেশের ডাকে মহিমচন্দ্র দাস ছেড়ে এলেন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকতা, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ছাড়লেন মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষকতা, শেখ্-এ-চাটগাও কাজেম আলী মিঞা ত্যাগ করলেন কাজেম আলী স্কুলের শিক্ষকতা আর বিপিনচন্দ্র চৌধুরী ছাডলেন খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ। তাঁদের দেশাত্মবোধক বাগ্মিতায় দিনের পর দিন দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। চট্টগ্রামে কালীশঙ্কর চক্রবর্তীর সম্পাদকতায় "সাপ্তাহিক জ্যোতিঃ," মহিমচন্দ্র দাসের সম্পাদকতায় "সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য" এবং নলিনীকান্ত সেনের সাময়িকী "আলো"—তিনখানিই স্বদেশী আন্দোলনের ভাব ও কর্মধারা প্রচারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদস্বরূপ চট্টগ্রামেও স্বদেশী আন্দোলন

বিলাতী পণ্যবর্জন, স্বদেশীগ্রহণ, রাখীবন্ধন ইত্যাদি উপলক্ষ্য করে ব্যাপক উৎসাহ ও কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি হয়।

যাত্রামোহন সেনের জামালখাঁ-স্থিত বাসাবাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে জাফর নগরের কর্মীশ্রেষ্ঠ পুলিনবিহারী দাসের সংগঠনে এক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন উকিল দুর্গাকুমার ভট্টাচার্য। যাত্রামোহনবাবু প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের নানা কর্মপ্রচেষ্টায় নেতৃত্বে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—উকিল যাত্রামোহন সেন, মহিমচন্দ্র দাস, রমেশচরণ রক্ষিত, কামিনীকুমার রক্ষিত, শরৎচন্দ্র শর্মা, রঞ্জনলাল সেন, মোক্ষদারঞ্জন বিশ্বাস, প্রসন্নকুমার সেন, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, নলিনীকান্ত সেন, পুলিন দাস, মৌলভী কাজেম আলী, হরনাথ কর্মকার, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রমুখ। শিক্ষক নলিনী চৌধুরী, হরিরঞ্জন মজুমদার, জগবন্ধু চৌধুরী, বীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, অমিয়কুমার চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, গোপেন্দ্র চৌধুরী, যামিনীকান্ত সেন প্রমুখও আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। ৬ই ও ৭ই আগষ্ট তারিখে আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে।

এই আন্দোলনকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বাংলার ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সারা রাজ্যে কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেন। সে বৎসর ১৬ই ডিসেম্বর লাটসাহেব চট্টগ্রাম পরিদর্শনে এলে ব্যাপক জনবিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে দেশমাতৃকার বন্দনার জনপ্রিয় জয়ধ্বনি "বন্দেমাতরম্" উচ্চারণকারী জনতার শোভাযাত্রার উপর নির্মমভাবে পুলিশের লাঠিচালনা হয়। নেতৃবৃন্দের আহ্বানে সমগ্র সহরে ব্যাপক ধর্মঘট বা হরতাল পালিত হয়। তার ফলে লাটসাহেব ও তাঁর পারিষদবর্গকে যথাযোগ্য পরিবহন অভাবে অশ্বপৃষ্ঠে সরকারী পরিদর্শন-কার্য সমাধা করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ-বিদ্বেষ চট্টগ্রামে এতই গভীর হয়েছিল যে এক যুবদল লালদিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ক্ষুদ্র পার্কে স্থিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্মর-মূর্তি আক্রমণ করতঃ বিকৃত করে দেয় [২০শে এপ্রিল, ১৯০৬]। কিছুদিনের জন্য "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সহ শোভাযাত্রা বন্ধ করে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলার শীর্ষস্থানীয় জননায়ক দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ চট্টগ্রাম আগমন করেন এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী

আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। তাছাড়া, তরুণ নায়ক নলিনীকান্ত সেন স্বদেশী যুগের অন্যতম উদ্‌গাতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৯০৭ সালের ১৭ই জুন চট্টগ্রামে আনয়ন করেন। রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সদরঘাটে কমলাকান্তবাবুর থিয়েটার হলে [যা পরে বিশ্বম্ভর হল নামে পরিচিত]। কবিগুরু বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও দেশবাসীর কর্তব্য বিষয়ে এক বিশেষ উদ্দীপনাময়ী ভাষণ প্রদান করেন। সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এবং যুবক ও ছাত্রদল বহুসংখ্যায় কবির উদাত্ত কণ্ঠে দেশের নব জাগরণবাণী শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসেছিলেন।

১৯০৫-৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের কালে চট্টগ্রামে বিলাতী বর্জন এবং বিলাতী বস্ত্রাদির দাহকার্য সাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহপূর্বক উদ্‌যাপিত হয়।

এই বিদেশী বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দরের উপকূল-বাণিজ্যবাহী বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর সহিত সংশ্রব ত্যাগের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় আব্দুল বারি চৌধুরী, যাত্রামোহন সেন, দুর্গাদাস দস্তিদার প্রমুখের চেষ্টায় বেঙ্গল ষ্টীম নেভিগেশন কোং নামক এক স্বদেশীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

১৯০৭ সালেও আন্দোলন সমভাবেই অব্যাহত রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের গঠনমূলক কার্যাদি, দেশীয় তাঁতে তৈরী বস্ত্রাদি ও নিত্যব্যবহৃত দ্রব্যাদির এক প্রদর্শনী এবং তদুপলক্ষে চট্টগ্রাম সম্মেলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন চট্টগ্রাম হিতসাধিনী সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পরমোৎসাহী তরুণ নেতা নলিনীকান্ত সেনের জন্মস্থান কোয়েপাড়া গ্রামে, কর্ণফুলী নদীর খেলার ঘাট নামক স্থানে ও গৌরাঙ্গ রুদ্রের বাজারের সন্নিহিত মাঠে। সপ্তাহ-ব্যাপী মেলা, শিল্পপ্রদর্শনী, খেলাধূলা এবং সম্মেলনে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি ও ভাষণ জেলার বিভিন্নস্থান থেকে বহুলোককে আকৃষ্ট করেছিল। এই জনসমাগম ও উৎসাহ-উদ্দীপনা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করে তোলে। সম্মেলন ও মেলার স্থায়িত্বকালেই ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয় এবং একাধিকবার নিরস্ত্র ও নিরীহ জনতার উপর লাঠি চালনা হয়েছিল। সম্মেলনে যোগদানার্থ চট্টগ্রামের নেতারা ব্যতিরেকে কলকাতা থেকে প্রখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ও কুমিল্লার জনপ্রিয় নেতা অখিলচন্দ্র দত্ত আগমন করেছিলেন। উক্ত ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সম্পর্কে নেতাদের বৈঠকে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু কয়েক দিনের মধ্যেই বরিশালে

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে বঙ্গবিভাগজনিত জরুরী পরিস্থিতির আলোচনা হবে এবং প্রয়োজনবোধে আইন অমান্যের গুরু দায়িত্বও বহন করতে হতে পারে, সেই কারণে সম্প্রতি চট্টগ্রাম ধৈর্য ধারণ করে থাকাই বিধেয় বলে বিবেচিত হয়। সেদিন জনসাধারণ অতি ক্ষুণ্নমনে নেতাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল, কিন্তু বিক্ষোভের অন্তর্দাহ নিশ্চয় প্রশমিত হয় নি।

এর কিছুকাল পরেই বরিশালে আহুত প্রাদেশিক সম্মেলন [১৯০৭] বে-আইনী ঘোষিত হয়। সরকারী চণ্ডনীতির চরম পরিণতিস্বরূপ স্বদেশীয় নেতৃ ও কর্মিবর্গের উপর নির্মম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। বরিশালের দক্ষযজ্ঞ জাতীয় অভ্যুত্থানের ঐতিহ্যময় অধ্যায়। এই সম্মেলনে যোগদানার্থ চট্টগ্রাম থেকে মহিমচন্দ্র দাস, নলিনীকান্ত সেন, মণীন্দ্রকুমার সেন এবং শশাঙ্কমোহন সেন [কলিভাস্কর] প্রমুখ প্রায় ২৫ জন প্রতিনিধি গমন করেছিলেন।

বিপ্লবের পদধ্বনি : কার্জন হত্যার চেষ্টা

স্বাধীনচেতা মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বহুল অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, শাসনের দর্প পরিবর্তন আর অবাধ শোষণ বন্ধ না হলে এদেশে সশস্ত্র বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

এ বিপ্লবের ঘনঘটা স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক কালেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ এবং চণ্ডনীতি শাপে বর হয়ে বঙ্গ-ভারতের ভাগ্যাকাশে নবজীবনের দ্যোতনা জাগিয়ে দিয়েছিল।

বাংলায় বিপ্লববাদের ভেরীধ্বনি বেজে উঠেছে ১৯০৩-৪-৫-৬ সাল থেকে। চট্টগ্রামের ঘরে, মন্থরে বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

বঙ্গভঙ্গের কিছুকাল পূর্বে [১৯০৫-ফেব্রুয়ারী] লর্ড কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণপ্রসঙ্গে প্রাচ্যের লোক, বিশেষত ভারতবাসী এবং বাঙ্গালীজাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ প্রকাশ ও নিন্দাবাদ করেছিলেন। এতে সারা দেশে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনাকে উপলক্ষ্য করে বাঙালীকে সজোরে জাগাবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি [বা 'বাঘা যতীন']।

লর্ড কার্জন তাঁর সরকারের পরিকল্পিত বাংলাদেশ-দ্বিখণ্ডনের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহের গোপন অভিযানে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করছিলেন। চট্টগ্রামে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বড়লাট আসছেন ১৯০৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। এই বার্তা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [বাঘা যতীন] প্রমুখ বিপ্লবীদের কেন্দ্রে

পৌঁছামাত্রই তাঁদের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্র সংগৃহীত হয়েছিল এবং বড়লাটের চট্টগ্রাম আগমনের রেল ও ষ্টীমার পথের নিশানা যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে সংগ্রহ করে "দুইটি রিভলবার দিয়া দুই দুঃসাহসী সহকর্মীকে পাঠাইয়াছিলেন কার্জনকে হত্যা করিতে।"[১] কার্জনের পরমায়ু ছিল। হত্যা-ষড়যন্ত্র বিফল হয়ে গেল!

যতদূর জানা যায়, সম্ভবতঃ চট্টগ্রামে বিপ্লবী প্রচেষ্টার এটাই সূচনা।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী সংগঠন

১৯০৭ খৃঃ অব্দে ঐতিহাসিক সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও গরমপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের সংঘর্ষে বামপন্থী সমর্থনকারীদের দলে চট্টগ্রামের প্রতিনিধিদের মধ্যে কর্মব্যস্ত ছিলেন মহিমচন্দ্র দাস ও পুলিনবিহারী দাস। সুরাট কংগ্রেস থেকে চট্টগ্রাম ফেরার পথে চট্টগ্রামের বিপ্লব-বিশ্বাসী সদস্য কয়েকজন কলকাতায় যুগান্তর দলের নেতাদের সহিত গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। তখন এ-রকম বিবেচিত হয়, "যেহেতু তখনও চট্টগ্রাম বিভাগ রাজনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা, সেহেতু চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সন্দ্বীপ ইত্যাদি জায়গা পলাতক বিপ্লবীদের জন্য আশ্রয়স্থল এবং বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র রাখার গোপন ঘাঁটির যোগ্য স্থান......এই দলের লোকেরা প্রকাশ্যে বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকবেন।"[২] আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় "পলাতক কিছু আসামী গোপনে চট্টগ্রামে আসেন।"[৩] চট্টগ্রামের হিন্দুমুসলিম বুদ্ধিজীবিমহলের এক অংশ এঁদের আগ্রহের সহিত লুকিয়ে রাখেন। আলীপুর মামলার এই পলাতক আসামীরাই চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম বিপ্লবের বীজ বপন করেন। চট্টগ্রামের তরুণেরা তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জেলায় প্রথম একটি বিপ্লবী সংগঠনী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রথম সদস্য ছিলেন চার জন, তার মধ্যে তিনজনের নাম জানা যায়— যামিনী সেন, মণীন্দ্র সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী। চতুর্থ ব্যক্তি সূর্য সেন কিনা সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নি। তবে অম্বিকা চক্রবর্তী ও সূর্য সেন একই রাউজান থানার পাশাপাশি গ্রামের হওয়াতে তখন থেকে দুজনের মধ্যে বিশেষ পরিচয় ছিল।"[৪]

১। প্রবীণ বিপ্লবীনায়ক শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখিত "বাবা যতীন স্মৃতি-দিবস" শীর্ষক রচনা—'মন্দিরা' আশ্বিন ১৩৫৫।

২, ৩, ৪—পূর্ণেন্দু দস্তিদার প্রণীত 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রাম' গ্রন্থ।

এই সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, ১৯০৭ সালে কংগ্রেসে বামপন্থীদের আবির্ভাবের পরে ময়মনসিংহের ডাঃ আব্দুল গফুর ও সুহৃদ সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মী ব্রজেন গাঙ্গুলী চারণকবির ন্যায় চট্টগ্রাম সহর ও গ্রামাঞ্চলে বক্তৃতা ও সঙ্গীত পরিবেশন দ্বারা স্থানীয় যুবকগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে যান। এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে ১৯১৬-১৭ সালে বরিশালের দেশাত্মবোধ ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বিপ্লবী ভাবধারার প্রচারক, বিখ্যাত চারণগায়ক স্বনামধন্য মুকুন্দ দাসও তাঁর যাত্রাগান এবং অভিনয় মাধ্যমেও চট্টগ্রামের সহর ও পল্লীকেন্দ্রাদিতে আগামী যুগের ভাববন্যায় মাতন সৃষ্টি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে "কলকাতার অনুশীলন সমিতির [পরে যা যুগান্তর নামে অভিহিত] অনুকরণে চট্টগ্রামে লাঠিখেলা, ব্যায়াম অনুশীলনের আখড়া গড়িয়া উঠে। বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ-স্থাপিত স্বদেশবান্ধব সমিতির সহিত চট্টগ্রামের চন্দ্রশেখর দে, দ্বিজেন কুণ্ডু, মণীন্দ্র সেন, অম্বিকা চৌধুরী প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট থাকিয়া চন্দ্রশেখর দের নেতৃত্বে লাঠিখেলা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং ১৯০৮ সালে যুগান্তর দলের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট নোয়াখালীর নরেশ ঘোষ চৌধুরী, কুমিল্লার বসন্ত মজুমদার ও চট্টগ্রামের হেম দাসগুপ্ত, নগেন্দ্র দাসগুপ্ত, মহিমচন্দ্র দাস প্রভৃতি নগেনবাবুর দুর্গাপুরের বাড়ীতে বিপ্লবীদের গোপন সভায় মিলিত হন। বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত চট্টগ্রাম [পাহাড়তলী ?] রেলওয়ে ওয়ার্কসফ হইতে বোমার খোল তৈয়ারীর সম্ভাবনা অনুসন্ধানের জন্য চট্টগ্রাম আসেন। হেমেন দাসগুপ্তের চেষ্টায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য চট্টগ্রামে দুইটি দোকান রাখা হয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার জন্য নিকটবর্তী পাহাড়ের মধ্যে গোপন স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।"[১] নলিনী চৌধুরী কলকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনেল কাউন্সিল অব এডুকেশন্ [বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ] হতে বি. এ. পাশ করে সাপ্তাহিক "জ্যোতিঃ"-র সহকারী সম্পাদক ও পরে ন্যাশনেল স্কুলে শিক্ষকতার চাকরীতে যোগ দেন। তাঁর সহিত কলকাতার অমর ঘোষ ও অতুল ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। নলিনী চৌধুরী তাঁদেরই সাহায্যে চট্টগ্রামে 'ছাত্র ভাণ্ডার' নামক এক দোকান খুলে জাতীয়তাবোধক ও বিপ্লবাত্মক পুস্তকাদি সরবরাহের দ্বারা স্থানীয় ছাত্র ও যুবসমাজকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করতেন।

১। যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত লিখিত "স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রামের দান" শীর্ষক প্রবন্ধ: 'যুগধর্ম', স্বাধীনতা বিশেষ সংখ্যা, ১৯৫৫ ইং।

১৯১২ সালে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পরবর্তী বৎসর চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পুনঃসংযুক্ত বাংলার প্রতিনিধিগণ এবং বাংলার তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ সম্মেলন উপলক্ষে চট্টগ্রাম আসেন। ৬ই ও ৭ই এপ্রিল এই মহামিলনোৎসব ও জাতীয় যজ্ঞে বাঙালীর সংহত শক্তির ঐতিহাসিক সাফল্য অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন চট্টলজননায়ক যাত্রামোহন সেন, সম্পাদক কৃতী সন্তান যামিনীরঞ্জন সেন এবং বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক যুবকর্মী চন্দ্রশেখর দে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন তরুণ ব্যারিষ্টার। পূর্ব বৎসর ফরিদপুর অধিবেশনে তিনি চট্টগ্রামের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং চট্টগ্রামের পক্ষে পরবর্তী বৎসরের সম্মেলন তাঁর জন্মস্থানেই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন ত্রিপুরার প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার ও স্বদেশী যুগের জননেতা আব্দুল রসুল। সম্মেলনে যোগদানকারী বাংলার যশস্বী নেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল এবং আরও অনেকে। এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে অখণ্ড বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের নির্মম চণ্ডনীতিতে দেশব্যাপী যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তার সোচ্চার নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর ব্যাপক সমর্থন প্রকাশ পেয়েছিল। নেতৃগণের ওজস্বিনী ভাষণ সহস্রাধিক শ্রোতাকে ভবিষ্যতের স্বদেশ-স্বাতন্ত্র্য সাধনে গভীরভাবে প্রবুদ্ধ করেছিল। অপর দিকে বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংহতিও জোরদার হয়ে উঠছিল।

এই পরিস্থিতিকালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির অন্যতম সদস্য এবং বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার ফেরার আসামী হেমেন্দ্রলাল মুখোটি চট্টগ্রাম আসেন। যথেষ্ট চতুরতার সহিত তিনি প্রথমে দুর্গাপুর হাই স্কুলে শিক্ষক এবং পরে নয়াপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেন। অল্পকালের মধ্যেই 'মাষ্টার-দা' সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ যুবকগণ তাঁর বিপ্লবমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হন।[১] দুর্গাপুর কেন্দ্রেও যে বিপ্লবী ভাবধারা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তা পরবর্তী কয়েকটি ঘটনায় প্রতীয়মান হয়। দুর্গাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ

১। যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত লিখিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধ অনুসারে।

দাশগুপ্তের জীবন ও কর্ম তথাকার এবং আংশিকভাবে চট্টগ্রামে নব-জাতীয়তা-বাদের সহায়ক হয়েছিল। তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত অন্যতম বিপ্লবীভাবাপন্ন সমাজকর্মী হয়ে উঠেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতে স্বাধীনতা-অভিযানের গোপনীয় প্রকল্পের সহায়তার জন্য তিনি ও সহকর্মী অনেকেই কিছুকালের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে 'পঞ্চম বাহিনী' ভুক্ত সন্দেহে ব্রিটিশের কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন। এই স্থানেই চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অন্যতম আত্মগোপনকারী বিপ্লবী শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত উক্ত অভ্যুত্থানের দীর্ঘ বারো বৎসর পরে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে অভিযুক্ত হন এবং সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমূহ বিপদের সুযোগে ইউরোপে ও আমেরিকায় কয়েকজন দুঃসাহসী, স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী যুবক বৈদেশিক শক্তির অস্ত্র ও অর্থসাহায্যে, বিশেষতঃ জার্মেনীর কাইজারের সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে বিশেষ উৎসাহী হয়েছিলেন। ইহা ইণ্ডো-জার্মেন সভযন্ত্র নামে ব্রিটিশকর্তৃক অভিহিত হয়েছিল। এই চক্রান্ত-জাল বৈদেশিক কেন্দ্রগুলির সহিত ভারতের পেশোয়ার থেকে পূর্ব সীমান্তে চট্টগ্রাম এবং প্রাচ্যকেন্দ্রে হংকং পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়েছিল। এই প্রকল্প অনুসারে বিদেশী জাহাজে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলার সমুদ্রতীরে পূর্ব দিকে চট্টগ্রামের অনতিদূরে সন্দ্বীপে, মধ্যস্থলে সুন্দরবনের একস্থলে এবং ওড়িশার বালেশ্বরস্থ সমুদ্রকূলে ঐ জাহাজগুলিতে আনীত অস্ত্রসম্ভার ডেলিভারী দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু জনৈক বিশ্বাসঘাতকের অপকর্মহেতু সমুদ্রপথে আগুয়ান অস্ত্রবোঝাই জাহাজ ব্রিটিশের সহায়ক শক্তির হাতে ধৃত হয়ে সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বালেশ্বরের জঙ্গলে সংগোপনে অপেক্ষমান বাঘা যতীন প্রমুখ পঞ্চবিপ্লবীর সহিত ব্রিটিশবাহিনীর সম্মুখ সমর হয়। অপরদিকে, সন্দ্বীপে উক্ত জাহাজ থেকে বিদেশী অস্ত্রাদি গোপনে গ্রহণ করা ও বিলি-ব্যবস্থার দায়িত্ব যে কয়েকজন চট্টগ্রামের বিপ্লবীর উপর অর্পিত হয়েছিল, তঁদের মধ্যে ছিলেন সাতকানিয়ার উকিল নগেন দাস ও জমিদার নগেন চৌধুরী। এঁদেরই অপর একজন কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় অবশিষ্ট সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। এই ঘটনা সম্পর্কে

সদরঘাটের নালাপাড়ানিবাসী সুধাংশু নামক জনৈক যুবককে সন্দেহক্রমে ধরে বিপ্লবীরা চরমশাস্তি দেন। চট্টগ্রামের বিপ্লব ইতিহাসে ইহা প্রথম পর্বের অন্যতম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

এই সমসাময়িক কালে চট্টগ্রামে রামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্র দাস চৌধুরী, শ্রীপুরের নীরব কর্মী ও সাধকোপম রমণীরঞ্জন গুপ্ত ও সমাজসেবী রোহিণী সেনপ্রমুখ রামকৃষ্ণদেবের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান-মাধ্যমে আবেগের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের মর্মবাণী প্রচার ও সমাজসেবা করতেন। গোপনে যতদূর সম্ভব তাঁরা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথাও ভাবতেন এবং কয়েকজন ছাত্র ও যুবকসহ বিপ্লবাত্মক পুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। এ-রকম সমাজহিতৈষী কাজকর্ম এবং বিপ্লববাদী চিন্তাধারার বাহক ছিলেন কয়েকজন দেশপ্রেমিক শিক্ষক, যাঁদের জীবনাদর্শ নবযুগের জাগ্রত যুবজনকে সম্মোহিত করে রেখেছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিউনিসিপাল হাই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক বীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, সারোয়াতলী ও মহামুনি হাই স্কুলের শিক্ষক প্রফুল্ল সেন ও সরোজ সেন [ফরিদপুর], ধীরেন্দ্র দাসগুপ্ত [ঢাকা], ননীগোপাল চক্রবর্তী [যশোহর] এবং আরও কয়েকজন। উপরোক্ত আদর্শচরিত্র এবং দেশপ্রাণ শিক্ষকমহোদয়গণের মধ্যে বীরেন্দ্রবাবু, দেবেন্দ্র-বাবু, প্রফুল্লবাবু, সরোজবাবু প্রমুখের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাবার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। তাঁরা অনন্যনিষ্ঠার সহিত চট্টগ্রামের তরুণ ছাত্রগণকে স্বদেশকে ভালবাসতে ও জনহিতব্রতে গড়ে তুলতে সাহায্য করে গেছেন।

বিস্মৃত কিন্তু অবিস্মরণীয়

চট্টগ্রামে বিপ্লবী সংগঠন দানা বেঁধে উঠার বেশ কিছুকাল পূর্বে অর্থাৎ চলিত শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে যে উদীয়মান বিপ্লবী একাধিক অসম সাহসিক কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি আজকের যুগে প্রায় বিস্মৃত। ইনি স্বর্গত চন্দ্রশেখর দে: জন্ম ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৯, মৃত্যু ১লা মার্চ ১৯৬৯ ইং।

কুমিল্লায় জন্মস্থান হলেও তিনি ও তাঁর পরিবার প্রায় সারা জীবন চট্টগ্রামের অধিবাসীই ছিলেন। তরুণ বয়স থেকেই স্বদেশী ভাবাপন্ন এবং আমরা বলতে পারি চট্টলের পরম্পরা ও পারিপার্শ্বিকেই তাঁর দেশমাতৃকার মুক্তিব্রতে অভিযান সুরু হয়। তিনি চট্টগ্রামে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে উনিশ বৎসর বয়সেই ঢাকা গমন করেন এবং প্রখ্যাত

বিপ্লবী নায়ক পুলিন দাসের সঙ্গে যোগ দিলেন ও অনুশীলন সমিতির সভ্য অর্থাৎ তাঁদের ছদ্মনাম "বোর্ডার" নামে দলভুক্ত হলেন। এত তরুণ বয়স সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও সংগঠনকার্যে দক্ষতা হেতু তথাকার ৫০০ বোর্ডারের উপর ইনি অধ্যক্ষরূপে [সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট] দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর সহকর্মীদের অন্যতম ছিলেন মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। ১৯০৯ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রায় বৎসর কাল জেলে বিচারাধীন থাকার পর মুক্তি পান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের শ্যেনচক্ষুর বাইরে থাকার জন্যে ফেরার হয়ে বৎসরাধিক কাটিয়েছিলেন। এই পলাতক অবস্থায় চন্দ্রশেখর মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে ছদ্মবেশে, যেমন নৌকার মাঝি, ষ্টেশনে কুলী কিংবা ঠেলাওয়ালার মত চলাফেরা করে করে বিপ্লবী কার্য চালিয়েছিলেন। তারপর চট্টগ্রামে ফিরে তাঁর ভ্রাতার প্রেসের [কোহিনুর প্রেস] পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং সুযোগ মত বিপ্লব কাজেও নিযুক্ত থাকতেন।

এই সময়েই চট্টগ্রামের পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড-চন্দ্রনাথ ধামের কুখ্যাত মোহান্ত যতীন্দ্র বন এই তরুণ বিপ্লবীর আগ্নেয়াস্ত্রে গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হন [৬ই আগষ্ট, ১৯১২]। হিন্দুধর্মকে কলঙ্কমুক্ত এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণকল্পে ও তীর্থযাত্রী সাধারণের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সন্ত্রাসমুক্তির উদ্দেশ্য যুববিদ্রোহী চন্দ্রশেখরকে এই দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত করেছিল। অপর এক সহ-বিপ্লবী [কারো মতে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, অবশ্য অসমর্থিত] সহ তিনি গভীররাত্রে হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে অনতিবিলম্বে চট্টগ্রাম চলে এসেছিলেন। সীতাকুণ্ডের এই মোহান্ত-হত্যা ঘটনা দীর্ঘকাল রহস্যাবৃত ছিল।

১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বরের রাত্রিশেষে কলকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে [২৯৬।১, আপার সার্কুলার রোড, বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড] এক বাড়ীতে বিরাট পুলিশবাহিনী হানা দিয়ে এক লোমহর্ষক বোমা তৈয়ারীর কেন্দ্র বা কারখানা আবিষ্কার করে ফেলে। বহুসংখ্যক তৈরী বোমা, মালমশলা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি পুলিশের হস্তগত হয়। চারদিকে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের মধ্যে জন ত্রিশেক বিপ্লবী বা সন্দেহাত্মক যুবক পুলিশের বেড়াজালে ধরা পড়ে যান। তন্মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী অমৃতলাল হাজরা [ওরফে শশাঙ্ক শেখর], চট্টগ্রামের চন্দ্রশেখর দে, ঢাকার দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ, কালীপদ ঘোষ, হিরণ্ময় ব্যানার্জি প্রমুখ।

অতঃপর, আলীপুর জেলে হাজতবাসকালে চন্দ্রশেখর অত্যদ্ভুত কৌশলে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও তৎকালীন রিপন কলেজের ছাত্র স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের নিকটে চলে আসেন। এতে তাঁদের মেসস্থ সকলেই অবাক্ হয়ে যান। মোকর্দমায় তাঁর পক্ষ সমর্থনের কোনও উপায় নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রশেখরের এই এক অসমসাহসিক অভিযান। বন্ধুসহ তাঁরা বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশের [তখনও তিনি 'দেশবন্ধু' হন নি] বাড়ীতে গমন করেন। দাশসাহেব চন্দ্রশেখরের চেহারাতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি একজন বিপ্লবী এবং সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছেন। মিঃ দাশের কথায় তাঁর জুনিয়র সহকারী ব্যারিষ্টার ব্যাগ্রাম (Mr. Bagram) চন্দ্রশেখরের মামলায় পক্ষসমর্থন করেন। ব্যাগ্রামের ফিঃ ইত্যাদি চিত্তরঞ্জনই বহন করেছিলেন। দাশসাহেব চন্দ্রশেখরকে বলেছিলেন, "তোমার মামলার ব্যবস্থা হয়ে গেল। তুমি এখন যে "বক্রপথে" জেল থেকে বেরিয়ে এসেছ, সে পথেই ওখানে ফিরে যাও।"

রাজাবাজার বোমার মামলায় অমৃতলাল হাজরা, চন্দ্রশেখর দে প্রমুখ অনেকেই এক্সপ্লোসিভ এ্যাক্টের ৪।৫ ধারায় অভিযুক্ত হন। আলীপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভীচ্ (Mr. Vitch) আই. সি. এস্-এর কোর্টে প্রাথমিক শুনানীর পর তাঁদের দায়রায় সোপর্দ করা হয়। অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ ই. প্যাণ্টন (E. Panton I.C.S.) আসামী অমৃত হাজরাকে ১৫ বৎসর এবং চন্দ্রশেখর প্রভৃতিকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন [৪ঠা জুন, ১৯১৪ ইং]। তারপর, এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলের শুনানী হয় এবং ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশ চন্দ্রশেখরের [এবং সম্ভবতঃ আরও কয়েকজনের] পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করে যাবতীয় অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন দাবী করে বক্তৃতা করেন। ফলে চন্দ্রশেখর এবং আরো কয়েকজন বেকসুর মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু অমৃত হাজরার ১৫ বৎসর কারাদণ্ড বহাল ছিল। বলাবাহুল্য, দাশমহাশয় চন্দ্রশেখর ও অন্যান্যের মামলা সম্পূর্ণ বিনা ফিঃ-তেই চালিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই চন্দ্রশেখর স্বগৃহে অন্তরীণাবদ্ধ হলেন। এই গৃহবন্দী থাকাকালেই তাঁর বিবাহ হয় এবং একটি টাইপ মেসিন ক্রয় করে টাইপিং শিখে নিলেন। বৎসরের মধ্যেই জলপাইগুড়ি বন্দীনিবাসে স্থানান্তরিত হয়ে যান। সরকার প্রদত্ত ৪০ টাকা বৃত্তিতে সাংসারিক খরচাদি চলত। ১৯১৯ সালে মুক্তি লাভ করে চট্টগ্রামে

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সরকার থেকে ২০০ টাকা আদায় করে আরো কয়েকটি পুরানো টাইপ মেসিন ক্রয় করে তিনি নিজস্ব "কমার্শিয়েল স্কুল" পরিচালনা করে সাফল্যমণ্ডিত হন। এর পরে চিটাগং কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নক্ষেত্রেও কিছু অবদান রাখেন।

চন্দ্রশেখর দে মহাশয়কে ব্যক্তিগতভাবে জানতাম। তাঁর যৌবনের কীর্তি কাহিনী আমার অগ্রজ ও তাঁর আজীবন অকৃত্রিম সুহৃদ স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের মুখে শুনেছি। তাঁর জীবন কেবল বিপ্লবের বহ্নিশিখায় প্রোজ্জ্বল নয়, জীবন-মরণ উপেক্ষাকারী দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত নয়, ইহা যথাসময়ে মহৎ থেকে মহত্তর সাধনার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। ত্যাগ-বীর্য-দীপ্ত ও পরহিতব্রতে মহীয়ান্, সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধে ধৃতিমান্ ও দেশমুক্তি-সংগ্রামে অন্যতম অগ্রণী যুবনায়ক চন্দ্রশেখর পরবর্তী জীবনে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনকালে গান্ধীজীর চট্টগ্রামে বিরাট সম্বর্ধনায় সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়কত্বে এবং আরো পরে রাষ্ট্রনায়ক জহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের জনসম্বর্ধনা-উপলক্ষে বিপুল জন সমাবেশ সংগঠনে সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান হয়ে চট্টলের যুববিদ্রোহের মহোচ্চ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি, প্রশান্ত অথচ দৃঢ় প্রত্যয়-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে চন্দ্রশেখর আজকের যুগে বিস্মৃতপ্রায় হলেও মহাকালের কপোলতলে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।[১]

প্রায়-বিস্মৃত [এক]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে [১৯১৪-১৮] চট্টগ্রামের বিপ্লবী ভাবধারা ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে সুরু করেছিল। ঢাকা ও কলকাতা থেকে অনুশীলনপন্থী বিপ্লবী কয়েকজন, বরিশালের 'স্বদেশবাণী' ও মৈমনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি'র কতিপয় যুবকর্মী বিভিন্ন সময়ে এককভাবে চট্টগ্রামের উদীয়মান্ বিপ্লবী ভাবাপন্ন ছাত্র ও যুবকবৃন্দকে প্রভাবিত করতে

১। [বিঃ দ্রঃ—শ্রীঅনন্ত সিংহের 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' পুস্তকে 'চন্দ্রশেখর কাকা' নামে বিপ্লবী চন্দ্রশেখর দে-র সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর আত্মকাহিনীতে কিছু বর্ণনা ব্যতীত তাঁর দুঃসাহসিক জীবনকাহিনী আর কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করেছি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী পি. কে. দে (রাম্) রক্ষিত তাঁর ডায়েরী এবং স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের স্বহস্তলিখিত স্মৃতিচারণ রচনা থেকে।]

থাকেন। এঁদের মধ্যে আত্মগোপনকারী প্রকাশ চৌধুরীর নাম পাওয়া যায়। ঢাকা থেকে আগত গোয়েন্দাবিভাগীয় বসন্ত চ্যাটার্জিকে হত্যার চেষ্টায় কয়েকজন বিপ্লবী সদরঘাটে তাঁকে আক্রমণকালে ভুলবশতঃ সত্যেন্দ্র সেনকে নিহত করেন।[১] এই ঘটনার প্রায় একই সময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের এক রিভলবার চুরির অনুসন্ধানকালে ঢাকার অনুশীলন দলের মোহিনী ভট্টাচার্যের নিকট কয়েকজন সহকর্মীর নামের তালিকা পুলিশের হস্তগত হয়। অমরেন্দ্র চৌধুরীকে এই ঘটনার নেতারূপে সন্দেহ করা হয় এবং সঙ্গে যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালে উক্ত অমরেন্দ্র ও মোহিনীবাবুসহ চট্টগ্রামের বহু যুবক ধৃত হয়ে আটক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রশেখর দে, পঙ্কজ চৌধুরী, ক্ষেমেন্দ্র দস্তিদার, ক্ষেত্রমোহন সেন, ধীরেন্দ্র দাস, নরেন্দ্র চৌধুরী, রমাপ্রসন্ন সিংহ, নগেন্দ্র দাসগুপ্ত, মণীন্দ্র সেন প্রভৃতি। তা ছাড়া, ভারতরক্ষা আইনে বিবিধ বিধি-নিষেধে স্বগৃহে অন্তরীণ ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে ছিলেন শাহ বদিয়ল আলম, কাজেম আলী মিঞা এবং আরও কয়েকজন। অধিকতর উৎসাহী বিপ্লবী কর্মী গিরিজাশঙ্কর চৌধুরীকে অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত হয়ে দু'বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

১৯১৭-১৮ সালে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অকুস্থল হয়ে চট্টগ্রাম সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইনবলে বিপ্লবী সন্দেহে সতেরো জন যুবককে চট্টগ্রামের অদূরে বঙ্গোপসাগরের কুতবদিয়া নামক ক্ষুদ্র দ্বীপাঞ্চলে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হয়। ১৯১৮ সালের প্রারম্ভে তাঁরা বন্দীনিবাসে প্রহরারত পুলিশ ও তত্ত্বাবধানকারী [সিকিউরিটি] অফিসারদের চরম ঔদাসীন্যে ও অবমাননাকর দুর্ব্যবহারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে জেলাকর্তৃপক্ষের সকাশে তাঁদের যাবতীয় অভাব-অভিযোগের প্রতীকার-ব্যবস্থা নিজেরাই করবার উদ্দেশ্যে ক্যাম্প অফিসারদের বিনানুমতিতে একযোগে অনেকদূর সমুদ্রে সাঁতার কেটে এবং কিছুদূর জেলে নৌকার সাহায্যে চট্টগ্রাম সহরে চলে আসেন। তাঁদের এই পলায়ন অভিযানে যাঁরা সহায়ক হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় সব-রেজেষ্ট্রী অফিসের

১। বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও সমাজসেবী শ্রীসঞ্জীবপ্রসাদ সেন এ-সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

কেরাণী মুন্সী মিঞা এবং যুব-ছাত্র যোগেশচন্দ্র পাল [পরে কক্সবাজারের ও চট্টগ্রামের নামকরা উকিল], অনঙ্গমোহন দাস, রাজকুমার পাল, উপেন্দ্র শীল প্রমুখ। কিন্তু চট্টগ্রামে পদার্পণ করামাত্রই তাঁরা পুলিশের কবলে পড়ে ধৃত হন এবং শীঘ্রই অন্তরীণ-বিধি লঙ্ঘন অভিযোগে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে বিচারার্থ প্রেরিত হন।

কলকাতার দেশপ্রাণ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ এই বিচারাধীন যুবকদের মামলা পরিচালনার জন্য চট্টগ্রামে ছুটে আসেন। তাঁর সহকারীরূপে এসেছিলেন বিখ্যাত এড্‌ভোকেট ফজলুল হক্, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তরুণ ব্যারিষ্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। বস্তুতঃ মিঃ সেনগুপ্তই চিত্তরঞ্জনের একান্ত-সচিবের মত আদালতে ও বিশ্রামাগারে সারাক্ষণ সক্রিয় ছিলেন। বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জন তাঁর বন্ধুবর এবং যতীন্দ্রমোহনের পিতা যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের বাসভবনেই এ কয়দিন অবস্থান করছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক ভাষণ

দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বাতাবরণ তখন বেশ সরগরম। মণ্টেগু চেমস্‌-ফোর্ড সংস্কার-প্রকল্প ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেসের চরম ও নরমপন্থী নেতাদের মধ্যে তীব্র মতভেদহেতু সারা দেশে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আদি নেতৃগণের "ব্রিটিশের হাত হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণে" স্বীকৃতি দেওয়া নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন প্রগতিবাদী বা গরমপন্থী নেতারা—মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক এবং বাংলার চিত্তরঞ্জন ও তাঁদের সমর্থকবৃন্দ। চট্টগ্রামে থাকাকালেই চিত্তরঞ্জন সদরঘাট বিশ্বম্ভর হলে বিশিষ্ট নাগরিকগণের জনসভায় এক জ্বালাময়ী ভাষণপ্রসঙ্গে ভারতবর্ষের গণজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথোচিত রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য প্রদানের দাবী ও সমসাময়িক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। দীর্ঘ নব্বই মিনিটব্যাপী ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর একান্ত ভাবপ্রবণ হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি তদবধি দেশের একচ্ছত্র জননায়ক সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিকে "উল্টো ডিগ্‌বাজী" আখ্যা দেন ও তাঁর মতিবিভ্রমের কঠোর নিন্দাবাদ করেন। তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমি চাই সমষ্টির কল্যাণ, সমগ্র দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। স্বাধীনতাই এই সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে।" চিত্তরঞ্জনের এই বক্তৃতা সেদিন "The great

সত্তের

transformation" আখ্যায় বিবিধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং নবজাগ্রত দেশবাসী তাকে অভিনন্দিত করেছিল।

চট্টগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের ফলে চিত্তরঞ্জন বঙ্গ-ভারতের নবযুগের অবিসংবাদী নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়ে যান। আর, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথম পর্যায়ের নেতৃগণের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হতে থাকে। চিত্তরঞ্জনের জীবনীকারদের মতে এই চট্টগ্রাম ভাষণের মাধ্যমেই তাঁর "লোকতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী" এবং "স্বদেশের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গের" প্রস্তুতির সূচনা দেশময় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে, স্বর্গত যাত্রামোহন সেন উক্ত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র যতীন্দ্রমোহন সভাশেষে সেদিনের প্রখ্যাত বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনকালে তাঁর মন্ত্রগুরু চিত্তরঞ্জনের দূরদর্শিতাপূর্ণ ভাষণে দেশের সমূহ অগ্রগতির দ্যোতনা প্রকাশ করেছেন বলে মন্তব্য করেন। এই নবজাগৃতির শুভলগ্নে চট্টগ্রামের স্থান চিরদিনের জন্য চিহ্নিত হয়ে রইল—এই ভবিষ্যৎ-বাণী সেদিন যতীন্দ্রমোহনের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল।

এবার চিত্তরঞ্জন প্রায় ১৪ দিন চট্টগ্রামে ছিলেন [৯-২২শে জুন]। বিদায় নেবার প্রাক্কালে তাঁকে স্থানীয় জনসাধারণ এক সম্বর্ধনা-সভায় অভিনন্দিত করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে দাশ মহাশয় সেদিনের তরুণ নায়ক যতীন্দ্রমোহন বহুতর গুণাবলী ও যোগ্যতার প্রতিশ্রুতি দেখাচ্ছেন এবং তিনি চট্টগ্রামের তথা বাংলার ভাবী দেশনেতা হয়ে উঠবেন—এই মন্তব্য করে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। দেশবন্ধুর এই ভবিষ্যদ্বাণী উত্তরকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

চার বৎসর পূর্বে বিপ্লবী চন্দ্রশেখরকে তিনি কারাদণ্ড থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন; এবার অন্তরীণাবদ্ধ সতেরো জন বিপ্লবী যুবককে দু'সপ্তাহ যাবৎ সম্পূর্ণ বিনাফিসে ডিফেণ্ড করে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদেশী সরকারের আনীত যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডন করে দিলেন—ইংরেজ বিচারক তাঁদের শাস্তি দেবার খাতিরেই যেন মাত্র তিনমাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন।

এই একই সময়ে ও স্থানে চিত্তরঞ্জন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনে আগামী সংগ্রামের তূর্যধ্বনিও তুলেছিলেন এই চট্টলভূখণ্ডে; তিন বৎসর পরে গান্ধীজী-প্রবর্তিত যুগান্তকারী অসহযোগের মর্মবাণীও চট্টগ্রামে ঘোষিত হয়েছিল তাঁরই কম্বুকণ্ঠে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন হয়ে উঠলেন তাঁরই

সার্থক আবিষ্কার। চট্টগ্রামকে সারা দেশের পুরোভাগে এগিয়ে যাবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান দেশবন্ধু এবং দেশপ্রিয়ের প্রায় সমভাবেই।

অসহযোগ-সংগ্রামে চট্টগ্রাম

অসহযোগ আন্দোলনে বাংলা যেমন ভারতের অগ্রবর্তী স্থান অধিকার করে, সে অনুপাতে চট্টগ্রাম বহুমুখী কর্মধারায় এবং ঘটনা-বিবর্তনে সকল জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভের মর্যাদা অর্জন করেছিল। বার্মা অয়েল কোম্পানীর কর্মী-ধর্মঘট [১৯২১ সালের এপ্রিল] ও তৎ-সম্পর্কিত সর্বাত্মক হরতাল এবং পরবর্তী আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের দীর্ঘ তিনমাসব্যাপী প্রায় পনেরো হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীর তদবধি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মঘট [যা **ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ষ্ট্রাইক নামে পরিচিত**] —এই দুই জন-বিক্ষোভে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তাঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব-জীবনেব প্রারম্ভেই শ্বেতাঙ্গ ধুরন্ধরদের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চট্টগ্রামের বহু ত্যাগব্রতী সংগ্রামী সন্তান—মহিমচন্দ্র দাস, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, বৃদ্ধ কাজেম আলি, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জি, প্রসন্নকুমার সেন, শিখ নেতা কৃপালদাস উদাসী, স্বামী দীনানন্দ, স্বামী জ্ঞানানন্দ, যুবনেতা চন্দ্রশেখর দে, বিপ্লবী দলনায়ক সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, চারুবিকাশ দত্ত প্রমুখ অনেকেই এবং স্কুল-কলেজের অগণিত ছাত্র। সহর ও জেলাব্যাপী হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল শ্রেণীর জনগণের অপূর্ব সমর্থনে, বিরাট কর্মযজ্ঞে ও শত শত ব্যক্তির কারাবরণে চট্টগ্রাম মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণামতে **"Chittagong to the fore :** চট্টগ্রাম পুরোভাগে" দাঁড়াবার সুনাম অর্জন করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতার গতিরোধে প্রযুক্ত ১৪৪ ধারা, গ্রেপ্তার ও বিবিধ সরকারী নির্যাতন উপেক্ষা করতঃ দেশপ্রিয়-সহধর্মিণী ইংরেজমহিলা শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা দেশনায়ক স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এই মহীয়সী মহিলা এর বারো বৎসর পরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঘোর দুর্দিনে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির কলকাতা অধিবেশনে মহানগরীর পুলিশী তাণ্ডবের মধ্যেও পরম দুঃসাহস নিয়ে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয়া নেলী সেনগুপ্তা এই চট্টগ্রামের এক সুযোগ্য সন্তানের

সহধর্মিণী হয়ে এবং দেশবিভাগের পরবর্তীকালে বহু বৎসর যাবৎ [তাঁর চিকিৎসার জন্য ১৯৭০ সালের ৫ই নভেম্বর কলিকাতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত] স্বামীর জন্ম-ভিটেমাটিতে পাক-সরকারের নিগৃহীত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিভাবিকারূপে বাস করেছিলেন। চট্টগ্রাম যেমন এই বর্ষীয়সী ভারত-সেবিকার আত্মদানে গর্ব ও গৌরব বোধ করে, শ্রীযুক্তা নেলীও চট্টগ্রামকেই সর্বকালের জীবন-তীর্থরূপে ভালবেসে গেছেন!

গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা বৎসর খানেক পরে হ্রাস পায়। পরে আইন-অমান্য ও সত্যাগ্রহ কর্মপন্থার সুরুতেই চৌরীচৌরাতে হিংসাত্মক ঘটনার পর সকল আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ ও তৎ-পূর্বাবধি দেশবন্ধু প্রমুখ সকল নেতা ও কর্মিসাধারণের কারাবরণের ফলে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর নৈরাশ্য ও হতাশা নেমে আসে। কারান্তরালে থেকে দেশবন্ধু গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং সহকর্মীদের সহিত আলোচনাপূর্বক দেশের সম্মুখে ভিন্ন প্রকল্প ও সংগ্রামনীতি উপস্থাপিত করার প্রস্তাব করেন, যেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে এতটা ত্যাগ, দুঃখবরণ ও গণজাগরণের সুফল ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। তাই, তিনি কাউন্সিল-প্রবেশ এবং তদ্বারা বিদেশী আমলাতন্ত্রীয় সরকারের দ্বৈতশাসন বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে নতুন পার্টি সংগঠন করতে চাইলেন। সদ্যঃকারামুক্ত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন এবং দেশবন্ধু-সমর্থক কংগ্রেসী সহকর্মীরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জনের অনুপস্থিতিতে তাঁরই সুযোগ্যা পত্নী, দেশনায়িকা শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সভা-নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করলেন [১৯২২ সালের এপ্রিল]। এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হল দেশপ্রিয়ের প্রিয় জন্মভূমি চট্টগ্রামেই। শ্রীযুক্তা বাসন্তী তাঁর সভানেত্রীর অভিভাষণে উক্ত নব রাজনৈতিক নীতি ও প্রকল্প গ্রহণের পক্ষে দেশবাসীকে অবহিত হতে আহ্বান জানান। এই নীতির ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর প্রতিবাদ ও অসন্তোষ সত্ত্বেও দেশবন্ধুর মুক্তির পরেই উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন স্বরাজ্য দল গঠন করা হয়। কিছু দিনের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল প্রমুখ সর্বভারতীয় বহুসংখ্যক নেতা দেশবন্ধুর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এই স্বরাজ্য পার্টির প্রভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভিন্নরূপে পরিচালিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, **অসহযোগ আন্দোলন-সংক্রান্ত অবিস্মরণীয় ঘটনাবলীর পর চট্টগ্রাম আর একবার ভারতের**

স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ের সূত্রপাত করে দিয়েছিল।

চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কারাদণ্ড হওয়ার পর চট্টগ্রাম থেকে বাইরে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার দিন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে বিরাট জনতা তাঁদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এসে পুলিশ ও গুর্খাসৈন্যের সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হন। ফলে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। এ সকল ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন যুব-সম্প্রদায় ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন। বিপ্লবীনায়ক শ্রীঅনন্ত সিংহ তাঁর "অহিংস আন্দোলনের পটভূমিতে প্রাথমিক বৈপ্লবিক সংগঠন" অধ্যায়ে লিখেছেন:

> "যদি দেশের গণশক্তি বৃটিশ সৈন্যদলকে পরাজিত করার মত উপযুক্ত অস্ত্রের সাহায্য না পায় তবে শুধু মুখ বুজে মার খাওয়াই সার হবে। আজ যদি আমরা কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, আরো যতীন মুখার্জির মত বিপ্লবী যুবক সৃষ্টি করতে পারি, তবে আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণও সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে আসবে।"[১]

প্রায়-বিস্মৃত—[২]

ইতিমধ্যে মাষ্টার-দা সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদল নানাবিধ সংগঠনে প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ করে দিয়েছেন। এই সংগঠনের অন্যতম কর্মী ছিলেন প্রেমানন্দ দত্ত।

চট্টগ্রামের ব্রাহ্ম-নেতা, স্বদেশবৎসল, সর্বজনশ্রদ্ধেয় হরিশচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্র প্রেমানন্দ ১৯ বৎসর বয়সে চিটাগং কাষ্টমস্ অফিসে প্রিভেন্টিভ অফিসার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। দু'বৎসর পরেই চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের সুরুতেই তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত ন্যাশানেল স্কুলে ইতিপূর্বেই ছাত্রেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এসেছে। এই বিদ্যালয়েরই শিক্ষক ছিলেন বিপ্লবী-নায়ক সূর্য সেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেদিন চট্টগ্রামে জনসভায় দেশবাসীকে যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের উদাত্ত আহ্বান জানান, সেদিনই চট্টগ্রাম কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণ যুবক সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দেন। অসহযোগ-স্বরাজ সংগ্রামের প্রথম পর্বেই রেলওয়ে

১। শ্রীঅনন্ত সিংহ প্রণীত 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম'—প্রথম খণ্ড, ২৪ পৃঃ।

ধর্মঘট চলাকালে পাহাড়তলীস্থ রেলওয়ে ধর্মঘটী কর্মীরা বাসস্থান ছেড়ে দেওয়ার আদেশ পেয়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের সঙ্কটত্রাণে জেলা কংগ্রেস-নায়ক যতীন্দ্রমোহন-প্রেরিত যে নয়জন স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ-কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে হাতকড়া পরিয়ে হাজতে আনীত হয়েছিলেন প্রেমানন্দ তাঁদের অন্যতম। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও সঠিক অপরাধ বা অভিযোগের প্রমাণাভাবে তাঁরা মুক্তি পেয়ে যান। অসহযোগ আন্দোলন থেমে যাওয়ার পরে প্রেমানন্দ তাঁর একই অঞ্চলের অধিবাসী তরুণ বিপ্লবী শ্রীঅনন্ত সিংহ ও তাঁর অপর সহকর্মী শ্রীরাজেন দাসের প্রভাবে এসে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। দু'তিন বৎসরের মধ্যেই প্রেমানন্দ ধীরে ধীরে বিপ্লব-বন্যায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যান। ১৯২৩ সালে শ্রীঅনন্ত সিংহের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পরৈকোড়া গ্রামে প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতিতে প্রেমানন্দও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর একাধিক বিপ্লবাত্মক ঘটনায় সম্পৃক্ত অনন্তলাল পলাতক অবস্থায় কলকাতা-শিবপুর প্রভৃতি স্থানে সঙ্গোপনে চলাফেরা করার সময় প্রফুল্ল রায় নামক এক বিচক্ষণ গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন।

যতদূর জানা যায়, কোনও পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী চট্টগ্রামের চিটাগং ক্লাবের পলো-গ্রাউণ্ডের [অর্থাৎ পল্টন ময়দানের] মধ্যস্থলে গাছগাছড়ার অন্তরালে প্রেমানন্দ ও প্রফুল্ল রায় একদিন [১৯২৪ সনের ২৫শে মে তারিখে] সন্ধ্যায় মিলিত হন। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক বিষয়াদি আলোচনার পর প্রেমানন্দ নাকি বলে উঠেন, "প্রফুল্ল বাবু, আপনি তো সাংঘাতিক লোক। মানিকতলা কেসের ও চট্টগ্রাম ডাকাতি মামলার অন্যতম আসামী অনন্ত সিংহকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনি এই জঘন্য চাকুরীতে থেকে দেশের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করবেন?" প্রফুল্ল নাকি জবাব দিয়েছিলেন, "আমি টাকার গোলাম। চাকুরী ছেড়ে আমি আর কি করতে পারি? বরং, আপনিই চট্টগ্রাম ছেড়ে বাইরে চলে যান।"[১] তৎক্ষণাৎ প্রেমানন্দের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠল। দুর্দান্ত পুলিশ কর্মচারী রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হলেন। আততায়ী রাত্রির অন্ধকারে উধাও হয়ে যান। গুলীর শব্দ ও আহত ব্যক্তির তীব্র আর্তনাদ শুনে নিকটবর্তী অঞ্চলের

১। শিপ্রা দত্ত: চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রথম শহীদ, যুগান্তর ৯ই অক্টোবর, ১৯৬০

কয়েকজন লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিকটস্থ পল্টন রোডবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তি চট্টগ্রামের সরকারী উকিল রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র সেন। প্রফুল্ল রায় ভীষণ আহতাবস্থায় উপস্থিত লোকজনের সম্মুখে নাকি বলেছিলেন, হরিশ দত্তের ছেলে প্রেমানন্দ তাঁকে গুলী করে পালিয়ে গেছে। পরে মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতেও তিনি প্রেমানন্দের নাম উল্লেখ করেছিলেন। পরদিন সকালে প্রেমানন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। সারা শহরে এই পুলিশ হত্যার ঘটনা ঘোরতর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

যথাসময়ে, সাব-ইন্‌সপেক্টর প্রফুল্ল রায়কে হত্যার অভিযোগে চট্টগ্রামের দায়রা জজ মিঃ এইচ. সি. ষ্টোর্স, আই. সি. এস. ও স্পেশ্যাল জুরী সমক্ষে প্রেমানন্দের বিচার হয়। প্রখ্যাত আইনবিদ্ ব্যারিষ্টার জে. এম. সেনগুপ্ত স্থানীয় উকিলগণসহ এই মামলায় প্রেমানন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। সুচতুর আইনজ্ঞ যতীন্দ্রমোহনের তীক্ষ্ণ জেরার মুখে প্রায় সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য বানচাল হয়ে যায়। তাই জুরীরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত জানালেন, আসামী নিদোষ। বিদেশী বিচারক হয়ে পড়েন বিস্মিত ও হতবাক; আর দেশবাসী বেশ আনন্দের সহিত এ সংবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু জুরীর সহিত একমত হতে না পারায় দায়রা জজ এ মামলা হাইকোর্টে রেফারেন্সের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। জষ্টিস্ গ্রীভ্‌স এবং মুখার্জি আসামীকে নিরপরাধ ঘোষণা করেন।

কিন্তু পরাধীন দেশে বিপ্লবীপ্রাণ দেশভক্তের নিস্তার নেই। সরকারী বেড়াজাল চারদিকে পাতা রয়েছে। জেল না হলে বিনাবিচারে আটক বা নির্বাসন! ১নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে প্রেমানন্দ দত্ত বন্দী হয়ে রইলেন কারাভ্যন্তরে। প্রেমানন্দের বিচারের পূর্বে ও পরে তাঁর মানসিক অবস্থা ও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কিছু বিবরণ শ্রীঅনন্ত সিংহ তাঁর 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' পুস্তকে প্রকাশ করেছেন:

> বর্ধমান জেল থেকে আমি গেলাম যশোর জেলে। প্রেমানন্দ কিছুদিন আগেও সেখানে ছিল। আমি গিয়ে ওর দেখা পেলাম না। কয়েকদিন আগে মুক্তি পেয়ে ও চলে গেছে চট্টগ্রামে—সেখানে নিজের বাড়ীতে অন্তরীণ হয়ে আছে।......যশোর জেলে আসবার পর প্রেমানন্দের ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন সবাই। কী যেন ভাবে ও সারাক্ষণ চিন্তা করে আর পায়চারি করে। সব সময় ভাবে তার জেলের

বন্ধু তিনটি তাকে সন্দেহ করছে। কিছুদিন পরে হঠাৎ তাদের একদিন ডেকে সে বলল, আমি কোনও কিছুই গোপন করতে চাই না। সব বলে দিচ্ছি। আমিই প্রফুল্লকে বলে দিয়েছিলাম কোথায় অনন্তকে পাবে। আমিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার পক্ষে ভাল হোক, মন্দ হোক, আমিই বলে দিয়েছিলাম প্রফুল্লকে। কিন্তু আমি দেশের এই উপকারটি করেছি যে পুলিশ তার দালালদের আর কখনো বিশ্বাস করবে না। আমি প্রফুল্লকে বলে অনন্তকে ধরিয়ে দিয়েছি, আবার তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমি প্রফুল্লকে হত্যা করে ফাঁসী যেতে চেয়েছি। কিন্তু এতেও আমার মনে শান্তি নেই। ভয় হচ্ছে এখনো আমার বন্ধুরা আমাকে সন্দেহ করে।"

শ্রীঅনন্ত সিংহ তাঁর নিবিড়, বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে আরও লিখেছেন :

"প্রেমানন্দ যা করেছে বা যা বলেছে, তার জন্য আমি তাকে কোনদিন দোষ দিই নি বা অবিশ্বাসী বলে ঘৃণা করি নি। একদল লোক থাকে বিশ্বাসহীনতা যাদের মজ্জাগত। আজীবন তারা দেশের শত্রুতা করে, বন্ধুত্বের মুখোস পরে শত্রুর কাজ করে এবং তার জন্য অনুতপ্ত হয় না কোনদিন। প্রেমানন্দ তাদের দলে নয়।......

"অত্যন্ত দুর্বল মূহূর্তে সে যা করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি সে তার নিজের জীবন দিয়ে করে যায় নি? অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে তার সমস্ত কলঙ্ক কি সোনা হয়ে ওঠে নি? রাঁচির মানসিক চিকিৎসালয়ে সে তার লুপ্ত জ্ঞান নিয়ে চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করে কি দিন কাটায় নি?... যখন অগ্নিযুগের বিশ্বাসঘাতকের দল এই স্বাধীন ভারতে দেশহিতৈষী সেজে ধন-মান-প্রতিষ্ঠা নিয়ে সমাজে বাস করছে, তখন মহৎ প্রাণের অধিকারী প্রেমানন্দকে কেন আমরা সুস্থ শরীরে অক্ষত চেতনায় আর ফিরে পেলাম না আমাদের মধ্যে?

"মুক্তকণ্ঠে দেশবাসীকে জানাতে পারি প্রেমানন্দ ছিল সাচ্চা বিপ্লবী। দুর্বলতা স্বীকার করবার সৎসাহস ছিল তার, ছিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার মত প্রাণ। জেলে থাকতেই নিজের অপরাধের জন্য প্রেমানন্দের মধ্যে মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ক্রমে ক্রমে সে ঘোর উন্মাদ হয়ে যায়। অবশেষে তার আত্মীয়েরা

তাকে রাঁচির মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হন। প্রায় এক বছর আগে প্রেমানন্দ মানসিক হাসপাতালে দেহত্যাগ করেছে। বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে প্রেমানন্দ নিশ্চয় অমর হয়ে থাকবে।" [১]

সহকর্মী ও সহধর্মী বিপ্লবী বীরের কী প্রাণপূর্ণ প্রশস্তি !

বিপ্লবের ঘনঘটায়

চট্টগ্রামে ১৯২০-২১ সালের ঘটনাবহুল অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তী সত্যাগ্রহের পরে বিপ্লবীদলের ক্রম-সংঘবদ্ধতা ও সংগঠন বন্যার রুদ্ররূপে দেশে প্লাবন নিয়ে এল। লাহোর কংগ্রেসে ভারতবাসীরা গ্রহণ করল পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প। সেই সঙ্কল্পকে সর্বপ্রথম সার্থক রূপ দিলেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী-যুবদল মহানায়ক সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে। অখণ্ড ভারতবর্ষের সুদূর প্রাচ্যতম প্রান্তদেশ **এই চট্টগ্রাম অভূতপূর্ব বিপ্লবী অভ্যুত্থানে স্বাধীনতার পতাকা প্রথম উড্ডীন করার গৌরব অর্জন করেছিল।** এই মরণ-জয়ী সংগ্রাম চলেছিল প্রায় দীর্ঘ চার বৎসরকাল (১৯৩০-৩৪)। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার ও তৎ-সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর বিস্তারিত কাহিনী এই গ্রন্থের একাধিক রচনা ও অন্য পুস্তকাদিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে জন্য এই সীমিত প্রবন্ধে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী ঐতিহ্য-পরিক্রমায় আর এক কীর্তিমান্ সন্তান—আদর্শ শিক্ষাব্রতী ও বিপ্লবী-স্রষ্টা মহাজীবনের উল্লেখ করতে চাই। **তিনি বীরাঙ্গনা বিপ্লবী কন্যা শ্রীমতী বীণা ভৌমিকের [দাস] পিতা এবং বিপ্লবী মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীক্ষাগুরু আচার্য বেণীমাধব দাস [জন্ম—নভেম্বর ২২, ১৮৬৬; মৃত্যু—সেপ্টেম্বর ২, ১৯৫২]।** চট্টগ্রামের সারোয়াতলী পল্লী-জননীর ক্রোড়ে তাঁর জন্ম।

সুভাষচন্দ্র বসু বাল্যকালে কটকে কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক বেণীমাধবের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর মহনীয় আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সমসাময়িক ছাত্র-বন্ধু, সহকর্মী ও জীবনীকার সকলেই একবাক্যে লিখে গেছেন এবং তিনি স্বয়ং আত্মজীবনীতে একাধিক স্থানে স্বীকার করেছেন, বেণীবাবুর সংস্পর্শে না গেলে তাঁর জীবনের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হয়ে যেত। স্বদেশে, বিদেশে, এমন কি কারাগার ও অন্তরীণ অবস্থা থেকেও তিনি পূজনীয় গুরুদেবকে পত্রাদি লিখে স্মরণ করতেন।

১। ১৯৬৩ সালের ৭ই নভেম্বর জীবনাবসান হয়।

বেণীমাধব সম্পর্কে বিপ্লবী কুলতিলক ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "জাতিকে গড়ে তোলার কাজে যাঁরা ব্রতী ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম,—শুধু অন্যতম নন, একেবারে অগ্রণী।" "সুভাষচন্দ্রের পরবর্ত্তী জীবনে কোনদিন তাঁর দেশপ্রেমের দীক্ষাগুরু বেণীমাধবকে ভুলতে পারেন নি। তাই নীরবে, সকলের অজ্ঞাতসারে দেশত্যাগের [১৭ জানুয়ারী, ১৯৪১] আগে সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্রের পিতা শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে ফোন করলেন—'আপনি দয়া করে একবার মাষ্টার-মহাশয়কে আমার কাছে নিয়ে আসুন।' দুই বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন সুভাষচন্দ্রের কাছে। একঘণ্টা তাঁরা সেখানে রইলেন। তারপর বৃদ্ধদ্বয় ফিরে এলেন—নীরব, নিস্পন্দ। অনুমান, সুভাষচন্দ্র দেশ হতে শেষ বিদায় নেবার পূর্বে গুরুপদধূলি ও আশীর্বাদ সম্বল করে বিদায় নিয়েছিলেন।" [১]

সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরী-ত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করে স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার পূর্ব-সন্ধিক্ষণেও গুরুদেব বেণীবাবুর উপদেশ ও আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।

কটকে শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দিনটিকে উপলক্ষ্য করে কিশোর বালক সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য ছাত্রদের প্রায়োপবেশন ও পরাধীন দেশের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে বাবার পরোক্ষ সহানুভূতি, আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মনে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল শিখা উদ্দীপিত হয়ে ওঠা"—এ রকম অনেক ঘটনা কন্যা বীণা ভৌমিকের রচনায় বিবৃত হয়েছে। ফলে, বেণীবাবুকে দিন কয়েকের মধ্যে কটক থেকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বদলী করা হয়। তখনকার দিনে সরকারী চাকুরেদের মধ্যে কেউ কেউ খদ্দর দেখলেও আঁতকে উঠতেন, পরা তো দূরের কথা। নির্যাতিত দেশকর্মীদের ছায়া মাড়ানোর কথাও তাঁরা ভাবতে পারতেন না। "কিন্তু সেই পরিবেশেই শুভ্র খদ্দরপরিহিত বাবার নির্ভীক উন্নত প্রদীপ্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হ'ত কবির বর্ণনা—'যে মস্তকে ভয় লিখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।"

অগ্নিযুগের বিখ্যাত উল্লাসকর দত্ত আন্দামান থেকে মুক্তি পেয়ে ফেরার পর তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী-নায়ক বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও তাঁর ভগ্নী সরোজিনী। উল্লাসকর নাকি প্রায় আসতেন।

১। বেণীমাধব দাসের পুত্র ডাঃ বিমলচন্দ্র দাস প্রণীত "স্মৃতি-তীর্থের ঘাটে ঘাটে" ও কন্যা শ্রীমতী বীণা ভৌমিক (দাস) প্রণীত 'পিতৃধন' প্রভৃতি পুস্তক অবলম্বনে।

বেণীমাধবের পুত্র-কন্যারা শুধু তাঁর অকৃত্রিম স্নেহধন্য নন, তাঁরা বিশেষ-ভাবে কন্যারা তাঁর অধ্যাত্ম-দেশাত্মবোধের মন্ত্রশিষ্যাও বটে। শ্রীমতী কল্যাণী ও বীণা অল্প বয়স থেকেই দুঃখী ও বিপন্নের সেবাব্রতী হয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয় কর্মেও কিছু উৎসাহী। কিন্তু, সাতই ফেব্রুয়ারী, উনিশশো বত্রিশ সালের পূর্বাহ্নে কলকাতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাভবনে এক অতি আকস্মিক, নাটকীয় ঘটনায় বীণা দাসের নাম সংবাদপত্রের শিরোনামায় জাজ্বল্যমান্ হয়ে ওঠে। তরুণী বালিকা বীণা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্নাতক হওয়ার পত্র গ্রহণ করতে গিয়ে চ্যান্সেলার গবর্ণর স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন সাহেবকে গুলী করে হত্যার অসম সাহসিক চেষ্টা করেন। ঘটনার পরদিন কলকাতার শ্রেষ্ঠ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক সংবাদপত্র 'দি ষ্টেট্‌সম্যান' সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলেন :

"Sir Stanley Jackson's interest in Bengal's students is well known ......It is, therefore, all the more tragic that a woman student, one waiting to her degree at the hands of the University's Chancellor, tried to murder him at the annual convocation at the Senate House on Saturday afternoon. Luck and the Vice-chancellor's alertness and courage saved him or worse......It was a merciful deliverance from peril...... **The assailant, it is understood, though a student of a Calcutta college and daughter of a man who served Government long and devotedly in educational work, comes from Chittagong. That may be a large part of the explanation of a very unpleasant business."**

অতঃপর, বীণা দাসের বিচারশেষে তিনি যে দারুণ মর্মস্পর্শী বিবৃতি বিচারপতির সকাশে দিয়েছিলেন, তার মূল্যও যথেষ্ট ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ বিবৃতির আংশিক উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হ'ল :

"......My object was to die, and if to die, to die nobly fighting against this despotic system of Government which has kept 300 millions people of my country in perpetual subjection, to its infinite shame and endless suffering......I had been thinking—if life is worth living in a miserable India ...Would not the immolation of a daughter of India and a son of England awaken India to the sin of its acquiescences to the

সাতাশ

continued state of subjection and England to the inequities of its proceedings ?......This was the question which kept thundering at the gates of my frenzied brain, like the incessant hammer-blow that could neither be muffled nor stilled !"

পরে জানতে পেরেছিলাম, শ্রীমতী বীণার এই অগ্নিক্ষরা বিবৃতি তাঁর অসীম স্নেহপ্রবণ পিতা, দেশাত্মবোধের অমর দার্শনিক বেণীমাধবেরই সারা-রাত-জেগে-লেখা পরাধীনতার বেদনা- ক্ষুব্ধ প্রাণের প্রতিবেদন—বিপ্লবী কন্যার দেশমুক্তিব্রতে অনির্বাণ বহ্নিশিখাময় মনোভাবের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে।

এখানে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ বোধকরি নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীমতী বীণা দাসের রাজ্যপালের উপর আক্রমণকালে আমি চট্টগ্রামে সাংবাদিক-কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার ও তৎ-সম্পৃক্ত যাবতীয় ঘটনাবলী এবং স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে ও অন্যান্য স্পেশ্যালে বিপ্লবী যুববৃন্দের সকল বিচারের (১৯৩০-৩৪-৪২ ইং) আমিই ছিলাম আদ্যোপান্ত একমাত্র সংবাদ-পরিবেশক। যেদিন বীণা দাস বিচারালয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন, সেদিন তার প্রতিলিপি চট্টগ্রামে প্রেরিত হয় স্থানীয় দৈনিক "পাঞ্চজন্য" কার্যালয়ে এসোসিয়েটড প্রেস মারফতে। সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে পাঠিয়ে উক্ত বিবৃতির বাংলা অনুবাদ করে দিতে অনুরোধ করেন। উক্ত বিবৃতি একাধিকবার পাঠ করেও তার রচনাবৈশিষ্ট্য ও ভাবসমৃদ্ধ বাক্যাদির সঠিক বঙ্গানুবাদ করতে সম্পাদক মহাশয় ও আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। নিশীথ রাত্রির স্তিমিত প্রহরে গভীর মনোনিবেশসহকারে দেশমুক্তিপাগল এই বিপ্লবী কন্যার প্রাণস্পন্দন ভাষান্তরিত করে গর্ব ও গৌরব বোধ করেছিলাম। পরে আমার আপন কাকাবাবুর গৃহে [বেণীবাবুর প্রাক্তন ছাত্র রায়বাহাদুর অম্বিকাচরণ দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট] একবার পরমশ্রদ্ধেয় বেণীমাধব দাস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎলাভের সুযোগ হয়েছিল।

কয়েক বৎসর পরে, যখন সাংবাদিক পেশা নিয়ে ওড়িশার শ্রেষ্ঠ নগরী কটক গমন করি (১৯৪৪-৬৭), সর্বপ্রথমেই বেণীবাবুর অবিস্মরণীয় কর্মক্ষেত্র র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে রক্ষিত তাঁর সুন্দর ও উজ্জ্বল তৈলচিত্র দর্শন করে ও সম্মুখে দাঁড়িয়ে পুনর্বার তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রণতি নিবেদন করেছিলাম। তারপরেও সাংবাদিক চাকুরী

থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর বাসভবনে তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডাঃ বিমলচন্দ্র দাসের সহিত পরিচিত হই। এই পরিচয়-সূত্রে বিমলবাবু ও তাঁর বিপ্লবী ভগিনী শ্রীমতী বীণা ভৌমিক প্রণীত তাঁদের পিতৃদেবের স্মৃতি-সম্বলিত একাধিক পুস্তকাবলী আমি ওরিশায় অদ্যাবধি জীবিত তাঁর প্রাক্তন ছাত্র এবং গুণগ্রাহী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের [যাঁরা বর্তমান ওরিশার স্রষ্টা ও নেতৃস্থানীয়] নিকট পাঠিয়ে প্রায়-বিস্মৃত যুগের সহিত যোগাযোগ করে দিয়েছিলাম। তদ্ব্যতীত আমারই প্রস্তাবে ডাঃ বিমলচন্দ্র বেণীমাধবের অমর স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁর একখানি মনোরম তৈলচিত্র কলকাতা মহাজাতি সদনে দান করেন এবং সদন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তা আরও কয়েকজন দেশবরেণ্য ব্যক্তির চিত্রের সহিত যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত তথায় অবস্থাপিত হয় [১৯৬৯]।

চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যনিকেতন ও কবি-মনীষীর প্রসূতিখ্যাত এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম অকুস্থল হিসাবে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু চট্টগ্রামকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। ১৯৩৮-৪০ সালের মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম ভ্রমণে অন্ততঃ দু'বার এসেছিলেন—প্রথম কংগ্রেস সভাপতিরূপে এবং দ্বিতীয় বার কংগ্রেস-সম্পর্ক ছেদ করার পরে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। কংগ্রেস-অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র [যতদূর মনে হয়] শহর ও পল্লী-সফরসহ তিনদিন চট্টগ্রামে থাকাকালে একদিন প্রবর্তক সংঘ পরিদর্শনে গিয়ে অত্যন্ত আনন্দবোধ করেছিলেন। সাংবাদিকের ভূমিকায় আমি তাঁর অতি নিকটেই ছিলাম। প্রবর্তকের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে অদূরে বঙ্গসমুদ্র ও কর্ণফুলী নদী এবং চারদিকে শৈল-নিবিড় অরণ্যানীর অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন: 'এমন সর্বাংশে সুন্দর দেশ, ইচ্ছা হয় এখানেই কিছুকাল থেকে যাই।' নবীনচন্দ্রের নাম উল্লেখ করলে ও তাঁর সাধের তৈরী "রম্য-শৈল" নামক অপর এক পাহাড়ের উপরস্থিত বাংলোখানি সুভাষচন্দ্রকে দেখালে পর তিনি অভিভূত হয়ে বলেছিলেন: 'এই নবীনচন্দ্রই তো ছিলেন বাংলায় স্বাদেশিকতা উদ্বোধনের অন্যতম কবি!'

সুভাষবাবুর দ্বিতীয় বার [অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালে) চট্টগ্রাম আগমন আরও গুরুত্বপূর্ণ। খুব সম্ভবতঃ তখন তাঁর আভ্যন্তরীণ বা গোপন কোনও উদ্দেশ্যও ছিল।

১৯৪০ সালের চট্টগ্রাম সফরকালে সুভাষচন্দ্রকে যে-সকল স্থানে সম্বর্ধনা করা হয়েছিল, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ কে. কে. সেন ও সুপারিণ্টেণ্ডিং ডাইরেক্টর রায়বাহাদুর উপেন্দ্রলাল রায় মহাশয়দ্বয়ের চা-ভোজ অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা, সেদিন অপরাহ্ন চার ঘটিকায় টি-পার্টির সময় উত্তীর্ণ হয়ে ৫টা/৫½ পর্যন্ত আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিগণ অপেক্ষা করে রইলেন। কিন্তু মুখ্য-অতিথির তখনও আগমন হল না! সকলেই বিস্ময়ে হতাশ হয়ে যান। সন্ধ্যা প্রায় ছয় ঘটিকায় সুভাষবাবু এসে উপস্থিত হয়ে সকলের কাছে অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁর কার্যসূচীর [প্রোগ্রামের] অতিরিক্ত সময়ে তিনি সেদিন অপরাহ্নে কোথায় গেলেন, তা দু'-তিনজন একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানত না। আমি সাংবাদিক হিসাবে প্রায় সকল সময় ভোর থেকে সন্ধ্যার পর অবধি তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি, আমিও এই ব্যাপারে কিছু জানতাম না। পুলিশবিভাগীয় লোকেরা সর্বত্রই তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করে থাকতেন। তাঁরাও সেদিন সুভাষচন্দ্রের শহর থেকে কোথাও যাওয়া বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, বরং আমাকেই খোঁজ করছিলেন। পরে আমি যে কোনও ভাবে সন্ধানী মন নিয়ে যে সাম্পানে চড়ে সুভাষবাবু ও তাঁর বন্ধুজনেরা কর্ণফুলীর মোহনার দিকে গিয়েছিলেন, সে মাঝির সঙ্গে বেশ ভাব করে একদিন জানতে পারি যে তাঁরা মোহনা ছাড়িয়ে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি দেখে দেখে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। আরও জেনেছিলাম যে, সুভাষবাবুর অপর তিন সঙ্গীর মধ্যে একজন ছিলেন চন্দ্রশেখর দে ও অপর দু'জন চট্টগ্রামের লোক ছিলেন না। আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ ও ১৯৪০ সালের চট্টগ্রাম সফরকালে একাধিক বার এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসিউরেন্স কোং-র বিশেষ এজেণ্ট শ্রীহরেন্দ্র কিশোর দত্তরায়ের বাড়ী থেকেই কয়েকবার টেলিফোন করেছিলেন—কোনও কোনও বার বন্ধ দরজায়!

সুভাষচন্দ্র ভারত ছেড়ে প্রথমে রাশিয়ায় ও তৎপর জার্মেনী গমন করে তৎকালীন যুদ্ধরত অক্ষশক্তিবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদির পর পরম দুঃসাহসিক অভিযানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। অতঃপর সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ সংগঠনপূর্বক "দিল্লী চলো—" সংগ্রামী আহ্বান দিয়ে যখন ভারত-অভিযানে প্রবৃত্ত হন, তখন এক সন্ধ্যায়

এক ভারতীয় সেনাবিভাগীয় অফিসারের [সামরিক গোয়েন্দা] সহিত বন্ধু-ভাবাপন্ন হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম—আই. এন্.এ-র সহিত ভারত অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ব্রহ্ম-সীমান্তে চট্টগ্রামে প্রবেশ করার উদ্যোগে যে কয়েকজন যুবক অতি সঙ্গোপনে কার্যরত ছিলেন [যাঁদের ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ "ফিফ্‌থ কলামিষ্ট"—Fifth-Columnist—আখ্যা দিয়েছিলেন] তাঁদের সন্দেহজনক ভাবে চলাফেরা দেখে ধৃত হবার পর তল্লাসী করে যে প্ল্যান ও কাগজপত্র হস্তগত করেন তন্মধ্যে কর্ণফুলীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগর থেকে চট্টগ্রাম সহরে পৌঁছে যাবার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত ও নির্দেশ দেওয়া ছিল। আর একখণ্ড ক্ষুদ্র নোটে লেখা ছিল, "এস. সি. বি." অনেক পূর্বে এই প্রবেশপথের সন্ধান রেখে গেছেন। এই ব্যাপারে আমার নিশ্চিত ধারণা হয় যে, ১৯৩০-৪০ সালে চট্টগ্রাম সফরে থাকাকালে সুভাবচন্দ্র যে নদী ও সমুদ্রপথে একদিন সারা-অপরাহ্ণ থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত "নিরুদ্দেশ" হয়েছিলেন, তার পেছনে গভীর উদ্দেশ্য ছিল এবং এই চট্টগ্রাম তাঁর ভবিষ্যৎ-প্রকল্পের বেশ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে (Strategic) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং নেতাজী সুভাষের দুঃসাহসিক অভিযানে চট্টগ্রামও যে নিবিড় সঙ্গোপনে সম্পৃক্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাধীনতার অভিযাত্রী নবীনচন্দ্র

চট্টগ্রামের বিপ্লবী-ঐতিহ্যের উৎস-সন্ধানে গিয়ে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের অবিস্মরণীয় সাহিত্যকৃতি "পলাশীর যুদ্ধ" রচনার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। এই কাব্যগ্রন্থই বাংলার জনমানসে স্বদেশপ্রেমের প্রদীপ্ত প্রতীক। "নবীনচন্দ্র বাংলার স্বাদেশিকতার প্রথম সচেতন ভেরীবাদক। "পলাশীর যুদ্ধ" রচনার (১৮৭৫) সাত বৎসর পর বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" রচিত হয় (১৮৮২)। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রেরণা সঞ্চার করেছে এই দুইটি গ্রন্থ। তন্মধ্যে অগ্রযাত্রীর সম্মান নিঃসন্দেহে নবীনচন্দ্রের।"[১]

নবীনচন্দ্রের তিরোধানের (১৯০৯) বারো বৎসরের মধ্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবর্গের ত্যাগপূত অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রাম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস বা অশস্ত্র গণবিক্ষোভে স্বাধীনতার জয়যাত্রা বহুদূর প্রশস্ত করে দিয়েছিল। [বিশ বৎসর পূর্ণ না হতেই কবির প্রিয়তম

(১) মল্লিনাথ-লিখিত 'জনান্তিকে' শীর্ষক রচনা: যুগান্তর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১

জন্মভূমিকে, তাঁর একই গ্রামের অন্যতম সু-সন্তান বীরাগ্রগণ্য (সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে অগ্নিযাজী নব ঋত্বিকদল প্রবল শক্তিশালী ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে সম্মুখ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে বৈপ্লবিক আদর্শবাদের এবং বিরাট কর্মযজ্ঞের পবিত্র হোমাগ্নি জ্বেলে সারাদেশে অসাধারণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন।) কয়েক বৎসর পরেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রোজ্জ্বল আলোকে ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রোমাঞ্চ-বৈচিত্র্যে চট্টগ্রাম

দীর্ঘকালের ইতিহাসে চট্টগ্রাম যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি রোমাঞ্চকর। আমাদের পিতৃ-পিতামহের কীর্তি-বিমণ্ডিত চট্টগ্রাম, যুগ যুগ ব্যাপী শক্তিপীঠ চট্টগ্রাম, জাতি ভাষা ও ধর্মের অপূর্ব সমন্বয়ে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানের সম-বাসভূমি চট্টগ্রাম, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্মরণীয় বনিয়াদ চট্টগ্রাম। অতীতের অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ব-প্রান্ত বাংলা প্রদেশ এবং বর্তমানের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পূর্ব-সীমান্তে এই চট্টলভূমি। প্রভাত-সূর্যের আলোক-সম্পাতে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম দীর্ঘ রাত্রির তন্দ্রা কেটে জাগরিত হয়, তারপর এই অরুণ-দ্যুতি দেশের অন্যপ্রান্তে বিচ্ছুরিত হয়। প্রকৃতির এই সত্যানুসরণ ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় অনুরঞ্জিত হয়ে চলেছে কালে কালে, যুগে যুগে। কালচক্রের আবর্তনে দেখতে পাই চট্টলের নব অভ্যুদয় ঘটেছে ভাস্বর আলোকে, ঘন দুর্যোগের পরিবেশে, মহিমময়ী ঊষার অঙ্কে। নব জন্মলগ্নে সকল প্রতিকূলতা পরাক্রমের মূর্তির সামনে শিথিল হয়ে পড়েছে, দিকে দিকে উড়েছে বিজয়কেতন।

[বিশেষ অনুরোধ: লেখকের অনুমতি বা অবগতি ব্যতীত কেউ যেন উপরোক্ত রচনার কোনও রকম আংশিক অথবা পুরোপরি অনুকরণ বা প্রতিলিখন (reproduction) না করেন—প. দ.]

চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতি ও অসহযোগ আন্দোলন

শ্রীসঞ্জীবপ্রসাদ সেন

[১]

চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির কাজ কখন আরম্ভ হয়েছিল, তা ঠিক মনে নেই। তবে ত্রৈলোক্য মহারাজের সঙ্গে চন্দ্রশেখর দে, গিরিজাশংকর চৌধুরী এবং কেলিসহর গ্রামের মোহিনী ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

১৯১২ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি আমার সহপাঠী কুমিরা গ্রামের নগেন্দ্র চৌধুরীর মাধ্যমে অনুশীলন সমিতির প্রভাবে আসি। এই বৎসর সদরঘাট ২নং নালাপাড়া গলির প্রবেশপথে ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন খাস্তগীরের চিকিৎসালয়ের সামনে **গোয়েন্দাসন্দেহে সত্যেন সেনকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এটাই চট্টগ্রামে প্রথম রাজনৈতিক হত্যা।** জুলাই মাসে একদিন সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছিল।' হঠাৎ পট্ পট্ করে তিনটি আওয়াজ পেলাম। কেউ বুঝতে পারে নি কিসের শব্দ। তাই কৌতূহলবশে রাস্তায় বের হয়েই জানতে পারে যে, সত্যেন সেনকে গুলী করা হয়েছে। তাঁর মৃতদেহ তোলা হয়েছে দক্ষিণাবাবুর চিকিৎসালয়ে। সত্যেন সেনের বাসা ছিল ২নং নালাপাড়া গলির ভিতরে। তিনি পোর্ট অফিসের হেড্‌ক্লার্ক বিপিন সেনের ভাই। জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার মামা। বেকার যুবক। বাড়ী ধলঘাট গ্রামে। অনুশীলন সমিতির কোন কর্মী তাঁকে হত্যা করেছিল।

কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র অমরেন্দ্র চৌধুরী অনুশীলন সমিতির অন্যতম কর্মী ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল কেলিসহর গ্রামে। পতেঙ্গা গ্রামের বিনয়কৃষ্ণ দে-ও আমাদের সহপাঠী ও সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় কলিকাতায়। এই অধিবেশনের অল্প কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম কলেজ ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রেরা অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বের হয়ে আসে। এই আন্দোলন সংগঠন করার কাজে বিনয়ের বিশেষ অবদান ছিল। বিনয় মৌলানা ইসলামাবাদীর সঙ্গে যোগাযোগ করে মুসলমান ছাত্রেরা যাতে মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে আসে তার ব্যবস্থা করেছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের দরুণ তখন মুসলমানসম্প্রদায়

ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর মৌলানা শওকত আলী চট্টগ্রামে গিয়ে খুব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়ায় মুসলমানেরা আরো ক্ষিপ্ত হয়েছিল। তার সুযোগ আমরা অনুশীলন সমিতির কর্মীরা গ্রহণ করার পূর্ণ চেষ্টা করি। আমরা মৌলানা ইসলামাবাদী ও শেখ্-এ-চাটগাম্ কাজেম আলী সাহেবের কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহযোগিতা পাই। **ভারতবর্ষে এর আগে কোথাও অসহযোগ আন্দোলন হয় নি। নাগপুর কংগ্রেসে** [ডিসেম্বর, ১৯২০] **অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বে চট্টগ্রামেই প্রথম অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। এ-বিষয়ে চট্টগ্রাম পথিকৃৎ।** তাই গান্ধীজী লিখেছিলেন : Chittagong to the fore.

ক্ষেমেশ দে [পরে অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক] এবং ক্ষেমেন্দ্র দস্তিদারও আমাদের সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র খুবই প্রতিভাবান ছিলেন। কলেজিয়েট স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক পণ্ডিত কৃপানাথ ঘোষালকে কোন ছাত্র কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি রহস্য করে বলতেন, 'ক্ষেমেন্দ্র আমার চাইতে সংস্কৃত ভাল জানে। ক্ষেমেন্দ্র পণ্ডিতকে জিজ্ঞেসা কর।'

মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক বীরেন্দ্র চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন। ঐ স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে নামকরা কর্মী ছিলেন শ্রীপুর গ্রামের রমণী গুপ্ত। তাঁর দ্বারা দলভুক্ত হয়েছিলেন আফছরউদ্দিন, সতীশ নাগ, ধীরেন্দ্র দাস [কাট্টলী গ্রাম], জ্ঞানেন্দ্র দাস, কামিনী শীল, ধীরেন্দ্র নন্দী, সুখদা নাগ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ও তার ছোট ভাই মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত।

আফছরউদ্দীনের মা হিন্দুবিধবার মত চলতেন ও নিরামিষ খেতেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিলেন। আমরা তাঁকে খুবই ভক্তি করতাম।

তখনকার দিনে দুর্গাপুর স্কুল ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। এটা আদর্শ স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বদেশীযুগের বিশিষ্ট কর্মী নগেন্দ্র দাশগুপ্ত। ঐ স্কুলের কুসুম ভট্টাচার্য অনুশীলন সমিতিতে ছিল।

কাজেম আলী স্কুলের বঙ্কিম সেন [চট্টগ্রামে প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা], উকিল রঞ্জন সেন ও ডাঃ কিরণ সেনের ছোট ভাই হীরণ সেন এবং নোয়াখালীর উপেন রায় ছিলেন অনুশীলন সমিতির সভ্য।

পটিয়া স্কুলে অনুশীলন সমিতির কর্মী ছিলেন আমিলাইশ গ্রামের গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন। তিনি ৭ বৎসর

কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। মুক্ত হওয়ার পর স্বগ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রধান শিক্ষক হিসাবে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু খুবই মর্মান্তিক হলেও খুবই বীরোচিত ও তাঁর চরিত্রের উপযুক্তই হয়েছিল। এক বর্ষার দিনে তিনি দু'জন মুসলমান ছাত্রসহ নৌকা করে শঙ্খ নদী পার হচ্ছিলেন। হঠাৎ নৌকাডুবি হয়। তিনি তীরে উঠে দেখেন, ছাত্র দুটি নেই। অত্যন্ত দক্ষ সাঁতারু গিরিজাশঙ্কর ছাত্রদের উদ্ধার করবার জন্য নদীতে লাফিয়ে পড়লেন। কিন্তু ছাত্রদের উদ্ধার করা গেল না। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রদরদী শিক্ষকেরও সলিল-সমাধি হল। তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন চট্টগ্রামে হিন্দুবিদ্বেষ চলছে। সহরে কয়েকজন ছুরিকাহত হয়েছে। তা সত্ত্বেও হিন্দুমুসলমান হাজার হাজার লোক তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিল। শ্রাদ্ধের দিন ২৪ ঘণ্টা গীতাপাঠ হয়েছিল। গীতা তাঁর মুখস্থ ছিল। গীতাই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ।

গিরিজাশঙ্করের এক খুড়তুতো ভাই রমণী চৌধুরীও দাদার শিষ্য ছিলেন। তিনি পরে বিহারে অভ্র বিভাগে চাকুরী নিয়ে নানা অভিজ্ঞতায় ও গবেষণায় ভারতে অন্যতম বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর গবেষণাপুস্তক সম্ভবতঃ Thacker Spink & Co. প্রকাশ করেছিল।

পটিয়া স্কুলের অন্যতম মেধাবী ছাত্র সতীশ নাগও অনুশীলন সমিতির একজন প্রসিদ্ধ কর্মী। তিনি বহু বৎসর অন্তরীণ ছিলেন। মুক্তির পর চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হতে এলে অধ্যক্ষ পূর্ণ কুণ্ডু মহাশয় ভয়ে তাঁকে ভর্তি করলেন না। পরে তিনি রেঙ্গুন গিয়ে ডাক্তারী পাশ করে সেখানে কিছুদিন ডাক্তারী করার পর নাগপুর গিয়ে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, শুনেছি। পটিয়া স্কুলের আর একজন মেধাবী ছাত্র ছিল গোমদণ্ডী গ্রামের ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য। চট্টগ্রাম কলেজে ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। সমিতির এই কর্মী পরে আত্মহত্যা করে। ঐ গ্রামের দেবেন্দ্র ভট্টাচার্যও পটিয়া স্কুলের ছাত্র ও অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল।

নয়াপাড়া স্কুলের একজন খুবই নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন অনুরূপ সেন। নগেন্দ্র চৌধুরী তাঁকে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে নিয়ে আসতেন। আত্মত্যাগের ও গীতার আদর্শ অনুসারে নিষ্কামভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন তুচ্ছ করে দলপতির নির্দেশ মত চলতে হবে ঠিক সৈনিকের মতই—এ কথা তিনি হৃদয়গ্রাহী করে খুব জোরের সঙ্গে বলতেন। আমরা তাঁর কথায় আত্মত্যাগের

প্রেরণা পেতাম। তিনি এলে পুরানো কর্মীদের সমাবেশ হত। তিনি পরে অন্তরীণ হয়েছিলেন এবং অন্তরীণ অবস্থাতেই যক্ষারোগে বেনারসে তাঁর জীবনাবসান হয়। এই স্কুলের ছাত্র প্রতাপ রক্ষিত ও বিনোদ সেন [উকিল] সমিতির নামকরা কর্মী ছিল। প্রতাপ রক্ষিত অনেক বৎসর কারারুদ্ধ ছিল। বিনোদ অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিনয় দে-র সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হাটে ও মেলায় বক্তৃতা দিত।

সারোয়াতলী স্কুলে ঢাকানিবাসী ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত নামক একজন শিক্ষক ছিলেন। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। ছাত্রদের উপর তাঁর বেশ প্রভাব ছিল। তিনি ভূতপূর্ব মন্ত্রী খগেন দাশগুপ্তের জেঠতুতো ভাই। তিনি পরে গান্ধীবাদী হয়ে ঢাকায় সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালের পরে মন্ত্রী খগেন দাশগুপ্তের সাহায্যে জলপাইগুড়িতে অনেক পতিত জমি নিয়ে এক বিরাট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। খরন্দীপ গ্রামের রাখাল দে তাঁর একজন বড় গান্ধীবাদী শিষ্য। সারোয়াতলী স্কুলের ক্ষেত্র সেনও অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

আনোয়ারার পরেশ চৌধুরী, সতীশ চক্রবর্তী ও মণীন্দ্র চক্রবর্তীকে আমি অনুশীলন দলভুক্ত করেছিলাম। কলেজিয়েট স্কুলের নরেশ গুহ, শৈলেশ গুহ, পরেশ গুহ ও উকিল রমেশ রক্ষিতের পুত্র কালীপদ রক্ষিত অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে এসেছিল।

১৯১৯ সালে রাউলাট বিলের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। অনুশীলনের কর্মীরা তাতে অংশগ্রহণ করে ছাত্রদের মধ্যে বেশ প্রেরণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। ১৯২০ সালে আমরা মনে করলাম, অসহযোগ আন্দোলনই গণ-আন্দোলনের প্রকৃষ্ট উপায় এবং জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আনতে না পারলে বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু হিংসাত্মক ঘটনার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। কয়েকজন সাহেব খুন করে ইংরেজকে ভীত শঙ্কিত করে যে দেশ থেকে তাড়ানো যাবে না—এই ধারণাই ক্রমশ বদ্ধমূল হতে থাকায় আমরা কয়েকজন অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার চেষ্টাই শ্রেয় মনে করে গান্ধীজী-প্রবর্তিত কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করতে থাকি।

[২]

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মৌলানা শওকত আলী চট্টগ্রামে এসে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে যাওয়ার পরে

ছাত্রমহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার সংকল্প দানা বেঁধে উঠে। নভেম্বর মাসে একদিন মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে অবস্থিত মাদ্রাসার ছাত্রেরা এবং জেলখানার পার্শ্বে অবস্থিত মাদ্রাসা স্কুলের ছাত্রেরা বের হয়ে এসে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে সহর পরিক্রমা করে। পরের দিন চট্টগ্রাম কলেজ ও সহরের অন্যান্য স্কুলের ছাত্রেরা বের হয়ে আসে ও হিন্দুমুসলমান ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে বিরাট মিছিল করে সহরের বড় রাস্তাগুলো দিয়ে ধ্বনি দিতে দিতে চলে, তখন জনসাধারণের মধ্যেও বেশ উৎসাহ দেখা যায়। মুসলমান ছাত্রদের তেমন অসুবিধা ছিল না, কারণ অভিভাবকেরা খিলাপৎ আন্দোলনের সমর্থক। কিন্তু সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল, তখন হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ অভিভাবকদের ভয়ে বাড়ীতে যেতে শঙ্কিত হল। টেরিবাজারের কোণায় একটি দোতলা মাটির কোঠায় থাকতেন ফতেয়াবাদের রোহিণী সেন এবং আরো কয়েকজন মেস করে। প্রায় ৫০।৬০ জন ছাত্র ঐ মেসে গিয়ে উঠল। কয়েকজন গেল চাকমা রাজার পাহাড়ের নীচে ময়দানে চারুবিকাশ দত্তের বাসায়। চাল-ডালের অভাব হল না, লামারবাজারের দোকানদারেরা প্রচুর চাল-ডাল দিলেন। রান্না করে ছাত্রদের খাওয়ানোর ব্যাপারে রোহিণীবাবুদের মেসের পাচক রামকুমার দাসের উৎসাহের অন্ত ছিল না।

দু'তিন মাসের মধ্যে ইসলামাবাদী সাহেব নন্দনকাননে পরীর দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠ্যক্রম ইসলামাবাদী পূর্বেই করে রেখেছিলেন—কিছুটা যেন মক্তব-ঘেঁষা, উর্দু অবশ্য পঠনীয়। কলেজের ছাত্রেরা কেউ কেউ পড়াতে লাগল। হিন্দু অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা গেল।

কাজেম আলী মিঞার উপদেশ অনুযায়ী এক জনসভা আহ্বান করা হল জে. এম. সেন হল-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে। সভায় ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, মহিমচন্দ্র দাস ও কাজেম আলী মিঞা প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। হঠাৎ অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অপ্রত্যাশিতভাবে সভায় হাজির। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বললেন, স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্রদের অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হতে বলে গান্ধীজী ভুল করেছেন। ছাত্রদের অবিলম্বেই স্কুল-কলেজে ফিরে যাওয়া উচিত। ছাত্রদের মধ্যে বিনোদ সেন ও অমূল্য সেন সবিনয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁকেও সরকারী চাকরী ছেড়ে এসে ছাত্রদের নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য আকুল

আবেদন জানাল। সভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে ত্রিপুরাবাবু ও মহিমবাবুকে অনুরোধ করা হল, চট্টগ্রামে আসার জন্য চট্টগ্রাম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজীকে যেন আমন্ত্রণ জানানো হয়। ছাত্রেরা অভিভাবকদের ও শিক্ষকদের অমান্য করে এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির মত না নিয়ে এ-রকম হুজুগে মেতে উঠে অন্যায় করেছে বলে ত্রিপুরাবাবু খুবই বকাবকি করলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা ঘরে ফিরে যাও।' সভা ভেঙ্গে গেল। তখন খুবই হতাশায় ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ইসলামাবাদী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কাজেম আলী মিঞার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। স্থির হল, ছাত্রেরা গান্ধীজীর কাছে যাবে। তখনই কাজেম আলী মিঞা ও ইসলামাবাদী সাহেব ১০ টাকা দিলেন। শিক্ষক বীরেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ থেকে ২০ টাকা ও নিজেরা আরো কিছু সংগ্রহ করে সেদিনই অতি গোপনে রাত্রির ট্রেনে রমণী গুপ্ত, বিনোদ সেন [পরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলার জুনিয়র উকিল] ও আমি বেনারস রওনা হই। খবরের কাগজে জেনেছিলাম, গান্ধীজী বেনারস আসছেন। ইসলামাবাদী সাহেব আমাদের পরিচয়পত্র দিলেন কলিকাতায় ওলি আহম্মদ ওলি নিজামপুরী [তখনকার 'আজাদ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক], বেনারসে ডাঃ আবদুল করিম এবং মৌলানা শওকত আলীর কাছে।

পথে গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের অনুসরণ করছে আশঙ্কা করে আমরা হঠাৎ রাণাঘাটে নেমে পড়লাম ও গঙ্গা পার হয়ে বেণ্ডেলে এসে বেনারসের গাড়ী ধরে পরের দিন শেষ রাত্রিতে বেনারস পৌঁছলাম। ডাঃ করিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানলাম, আগের দিন সন্ধ্যায় গান্ধীজী এলাহাবাদ চলে গেছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাড়ীতে মৌলানা শওকত আলী ও মৌলানা আজাদকেও পাওয়া যাবে। তিনি এই দুজনকে ইসলামাবাদীর কথা উল্লেখ করে গান্ধীজীর চট্টগ্রাম যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে লিখে আমাদের হাতে চিঠি দিলেন। তিনি ৪০ টাকা আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, ঐ টাকা শোধ দিতে হবে না। আমরা সাহস ও উৎসাহ পেলাম। রাত্রি ১১টায় এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছে মহাবিপদে পড়লাম। কথা যে কিছুই বুঝি না। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল, তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে প্রায় ১১-৩০ টায় আনন্দ ভবনের ফটকে এসে দেখি, ফটক বন্ধ। দুই বন্দুকধারী শান্ত্রী পাহাড়া দিচ্ছে। তারা কিছুতেই ফটক খুলে দেবে না। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে মালীর ঘরের বারান্দায় আমাদের

আটত্রিশ

রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে তিনি বিদায় হলেন। পরের দিন শওকত আলীকে চিঠি দেওয়ামাত্রই তাঁর খুশীর অন্ত নেই। হো হো করে হেসে উঠে আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে মৌলানা আজাদকে তাঁর চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। আমরা চিঠিও দিলাম। দুজনেই কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড হল ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। দেখি, গান্ধীজী সুতো কাটছেন আর অনেক মৌলভী তাঁকে ঘিরে বসে নানা আলোচনায় খুবই ব্যস্ত। শওকত আলী আমাদের হয়ে সকলকে চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা বল্লেন। গান্ধীজী মৃদু হেসে পাশের ভদ্রলোককে ভ্রমণতালিকা দেখতে বললেন। একটু আলোচনার পর স্থির হল, ১৪ই ডিসেম্বর [১৯২০] চট্টগ্রাম যাবেন। চট্পটে চঞ্চল যুবক জওহরলালকে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে দেখলাম। মৌলানা আজাদ, মৌলানা শওকত আলী এবং জওহরলালকেও চট্টগ্রামে যেতে আমন্ত্রণ জানানো হল।

ফেরার পথে ভাবছিলাম—যতীন্দ্রমোহন তো চিত্তরঞ্জনের অনুগামী, তিনি কি গান্ধীজীকে অভ্যর্থনার জন্য চট্টগ্রাম যাবেন? কলিকাতায় পৌঁছে আমরা চট্টগ্রামের মুসলমান ছাত্রদের একটি মেসে উঠলাম। সেখানে ওলি আহম্মদ ওলি নিজামপুরীও থাকেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর ১৪ই ডিসেম্বর [১৯২০] চট্টগ্রাম যাওয়ার খবর সংবাদপত্রে বের হয়েছে। মেসের ছাত্রদের আনন্দের সীমা নেই। 'সেনগুপ্তের বাড়ীতে যাব'—আমরা একথা বলতেই সকলেই আমাদের নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র। আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজামপুরী দুজনকে ঠিক করে দিলেন। বিকেল ৪টায় তাঁর ওয়েলেসলি ম্যানসন বাড়ীতে পৌঁছলাম। ছোট ফুটফুটে একটি ছেলে বের হয়ে এসে বলল, 'দাদা ক্লাবে গেছে।' ছেলেটি শ্রীরণেন্দ্র মোহন। তাকে বললাম, 'আমরা চট্টগ্রাম থেকে এসেছি। দাদাকে যেভাবেই হোক খবর দিতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।' প্রায় ১ঘণ্টা পরে সৌম্যদর্শন হাসিমুখ যতীন্দ্রমোহন বাড়ী এসে আমাদের মুখে সব শুনে বললেন, 'অসহযোগ আন্দোলনের জন্য দেশ প্রস্তুত হয় নি। আইন সভায় ঢুকে নতুন শাসনসংস্কার আইনে ইংরেজ যে কিছুই দেয় নি, একথা বুঝিয়ে দিলে জনসাধারণের অনেক বেশী কাজ হত।' অবশেষে বললেন, তিনি অবশ্যই চট্টগ্রাম যাবেন এবং তাঁর বাড়ীতে গান্ধীজীকে রাখার ব্যবস্থা করবেন। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং তাঁর

পরামর্শে অধ্যাপক জে.এল. ব্যানার্জীকেও চট্টগ্রামে যেতে আমন্ত্রণ করে আমরা চট্টগ্রাম রওনা হলাম।

চট্টগ্রামে পৌঁছে দেখি, ত্রিপুরাবাবু, মহিমবাবু ও কাজেম আলী প্রমুখ অনেকেই অভ্যর্থনার তোড়জোড় আরম্ভ করে দিয়েছেন। চারুবিকাশ দত্ত, বিনয় দে, অমূল্য সেন, কামিনী শীল ও সতীশ নাগ প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে গিয়ে হাটে ও নানা মেলায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও খিলাপতের প্রশ্ন নিয়ে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতা, বিদেশী বস্ত্রবর্জন, খাদি ও চরকার প্রচলন ইত্যাদি নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে অসহযোগের বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে।

গান্ধীজীর আগমন-বার্তা জনসাধারণের মধ্যে এক নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ আশঙ্কা করতে লাগল, সেনগুপ্ত যদি কলিকাতা থেকে না আসেন, তবে কী উপায় হবে? অতি বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার পি. সি. সেন রেঙ্গুন থেকে এসে আস্কর খাঁর দিঘীর উত্তর দিকে জে. এন. রায়চৌধুরীদের পাহাড়ে বাস করছেন। মহিমবাবুর পরামর্শমত আমরা ছেলেরাই তাঁর কাছে দল বেঁধে গেলাম। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'গান্ধীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সে আমার বাড়ীতে থাকবে, বেশ ভাল কথা।' তিনি গান্ধীজীকে বরাবরই 'সে' 'সে' বলছেন দেখে আমরা কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর ভাল পরিচয় ছিল।

অভ্যর্থনার উৎসাহে চট্টগ্রাম তখন ফেটে পড়ছিল। ঠিক এই সময়ে একদিন খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী হেমেন্দ্র দত্ত মহাশয় খবর দিলেন, গান্ধীজীর চট্টগ্রামের ভ্রমণসূচী বাতিল হয়েছে—
—তিনি কলিকাতা হয়ে নাগপুরে যাচ্ছেন। হতাশায় সকলেই যেন হতবাক্ হয়ে গেল। পরে জানা গেল, মহম্মদ আলী কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে মতৈক্যের জন্য খুব চেষ্টা করছেন এবং তাঁর অনুরোধেই চট্টগ্রামের ভ্রমণসূচী বাতিল হয়েছিল।

নাগপুর কংগ্রেসের যুবকংগ্রেসে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসাবে সত্যপ্রসন্ন সেন, শৈলেন চৌধুরী ও বিনয় দে-কে পাঠানো হল। হঠাৎ জানা গেল, অধ্যাপক নৃপেন ব্যানার্জীও দর্শক হিসাবে কংগ্রেসে যাবেন। তখন তিনি চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ।

নাগপুর কংগ্রেসে স্বয়ং চিত্তরঞ্জনই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব করলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল। গান্ধীজী বাংলা দেশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি চিত্তরঞ্জনকে চট্টগ্রামে যেতে বললেন। ১৯২১ সালের ১৪ই মার্চ চিত্তরঞ্জন চট্টগ্রামে গেলেন। যতীন্দ্রমোহন আইনব্যবসা স্থগিত রাখলেন, অধ্যাপক নৃপেন ব্যানার্জীই ছাত্রদের নেতৃত্ব নিলেন। অমূল্য সেনদের আকুল আবেদন সার্থক হল তিন মাস পরেই। ত্রিপুরাবাবুর আর সেই ক্ষোভ নেই। মহিমবাবু ওকালতি ছেড়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেন। যতীন্দ্রমোহন হলেন চট্টগ্রামের মুকুটহীন রাজা 'দেশপ্রিয়।'

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র একটি সহর **চট্টগ্রামেই যে সর্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনের যাত্রা সুরু হয়েছিল,** সেকথা গান্ধীজী সব চেয়ে বেশী জানতেন এবং জানতেন বলেই তখনকার দিনে চট্টগ্রামের এই প্রচ্ছদপটেই 'Young India'-তে তিনি 'Chittagong to the fore' প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লোকে আজ সে কথা ভুলে গেছে। আরো দুঃখের বিষয়, চট্টগ্রামবাসীরা পর্যন্ত সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা ভুলে গেছেন॥ [১]

১। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীশচীন দত্তকে লেখা পত্রাবলী থেকে সংকলিত।—সম্পাদক

চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও শহীদতীর্থ জালালাবাদ

ক্ষীরোদ সেনগুপ্ত

বীরবিপ্লবী সূর্য সেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে চট্টগ্রামে ফিরে আসার পর জেলার সর্বত্র সশস্ত্র বিপ্লবীদল গড়ে উঠতে লাগলো তাঁর নেতৃত্বে। তাঁর সঙ্গে আছেন দুই সহযোগী—অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেন। আর আছেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, রাজেন দাস, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য ও লোকনাথ বল প্রমুখ দুর্ধর্ষ তরুণ কর্মিবৃন্দ। একদিকে গোপন বিপ্লবী সংস্থা গড়া ও অন্যদিকে কংগ্রেসের সংগঠনকে সুদৃঢ় করা—দুই-ই চলেছে সমান তালে। কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না বিপ্লবী নেতারা। স্বাধীনতা লাভ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই ত্বরান্বিত হবে—এ বিশ্বাস নিয়ে অমিত বিক্রমে এগিয়ে যায় চট্টলার বীর তরুণের দল।

এ সময় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য বিপ্লবীদলের গতিমন্থরতা দেখে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন তাঁর সহকর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করলেন যে, বিপ্লব আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রসারতার জন্য চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলকে আর কালবিলম্ব না করে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে।

১৯২২ সালের শেষের দিকে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সময়ে দলের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ ও 'গুপ্ত সমিতি'কে অধিকতর শক্তিশালী করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। মাষ্টারদা ঘোষণা করলেন : চাই অর্থ, চাই উপযুক্ত হাতিয়ার আর চাই দুঃসাহসী জঙ্গী সৈনিক। বীরপ্রসূ চট্টলা মায়ের দামাল ছেলেমেয়েরা সেদিন তাদের প্রিয় নেতার ডাকে সাড়া দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে আনতশিরে অভিনন্দিত করেছিল। মুক্তির নেশায় তাদের হৃদয় তখন টগ্‌বগ্‌ করছে, রোষকষায়িত চোখে তখন আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে শোণিতঅর্ঘে মাতৃবেদী রাঙিয়ে দেবার দুরন্ত আবেগে।

১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। বিপ্লবী অনন্ত সিংহ, দেবেন দে, রাজেন দাস ও উপেন্দ্র ভট্টাচার্য আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় সতেরো হাজার

টাকা ছিনিয়ে নিলে চতুর্দিকে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। চারিদিকে ব্যাপক পুলিশী তৎপরতা দেখা যায় বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটিগুলো খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে। কিছুদিন পরে নাগরখানা নামক একস্থানে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে মাষ্টারদা ও তাঁর সহকর্মী অম্বিকা চক্রবর্তী ধৃত হন। কিছুদিনের মধ্যেই ডাকাতি মামালায় অভিযুক্ত বন্দিদ্বয় মুক্তিলাভ করেন। এই মামলায় ব্যারিষ্টার যতীন্দ্রমোহনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ্-এ-চাটগাম্ কাজেম আলী সাহেবের অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

চট্টগ্রামের ওপর বৃটিশ সরকারের কড়া নজর। গোয়েন্দাবাহিনী বেশ সক্রিয়। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ কর্মীরা ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। মাষ্টারদা ও সহযোগী নির্মল সেন আত্মগোপন করেন। এদিকে বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তি ও সংগ্রাম-প্রস্তুতিরও শেষ নেই। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা, ঢাকা, রাজসাহী, বরিশাল, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে কর্মীরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নির্মল সেন ব্রহ্মদেশে অস্ত্রসংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হন। মাষ্টারদা যুক্তপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি স্থানে গোপনে কর্মকেন্দ্র স্থাপনায় উদ্যোগী হন। কিছুদিন পর কলকাতায় এসে উপস্থিত হন ব্যাপক পুলিশী বেড়াজালকে ফাঁকি দিয়ে। সঙ্গে বহু কর্মী নানা কাজে নিযুক্ত। উদ্দেশ্য—ব্যাপক এক সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি। এ সময় শ্রীভুপেন্দ্রকুমার দত্ত, শচীন স্যান্যাল, রাজেন লাহিড়ী, যোগেশ চ্যাটার্জী প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের কর্ম পদ্ধতি, চিন্তাধারা ও অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। কিছুদিন পর শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলা ও কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় বহু কর্মী জড়িত হয়ে পড়েন। মাষ্টারদাকে ধরবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন শহরে নির্মল সেনের সঙ্গে যোগ দিলেন একে একে লোকনাথ বল, উপেন ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র মজুমদার, রাজেন দে প্রমুখ বিপ্লবীরা। সেখানেও ক্রিয়াকাণ্ডের বিরাম নেই। শত্রুপক্ষও খুব সজাগ। নির্মল সেন ও লোকনাথ বল চট্টগ্রামে ফিরে আসার পরই বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট আইনে ধৃত হন। তখন চট্টগ্রামের সাংগঠনিক কর্মভার ন্যস্ত ছিল সুখেন্দু দত্ত, মধু দত্ত, সতীন্দ্র রক্ষিত, মণীন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্র পাল প্রমুখ কর্মিবৃন্দের ওপর। এমন সময় হঠাৎ একদিন খবর এলো—মাষ্টারদা কলকাতায় ধৃত হয়েছেন।

জেতা ব্রিশ

১৯২৮ সালে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সদ্যোমুক্ত রাজবন্দীদের অভিনন্দন জানিয়ে সেদিন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন গান্ধীজীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—"Chittagong to the fore." স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে চট্টল বীরদের ভূমিকা পুরোভাগে। ১৯২১ সালে যতীন্দ্রমোহন-পরিচালিত বি. ও. সি-র শ্রমিক ধর্মঘটের সাফল্যে গান্ধীজীর সেই উক্তি উত্তরকালে সার্থক ও সফল হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লবের অজস্র কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

শুধু হাতিয়ার নয়, হাতিয়ার ধরার মতো উপযুক্ত শিক্ষারও প্রয়োজন। শহর থেকে গ্রামে সর্বত্র যুবকদের শরীরচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দলে দলে তরুণেরা নতুন উদ্যমে ছুরিখেলা, লাঠিখেলা, যুযুৎসু ইত্যাদিতে প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেছে। অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, সুখেন্দু দস্তিদার প্রমুখ ব্যায়াম-বীরদের ক্রীড়াকৌশল শত শত তরুণকে সেদিন প্রবল প্রেরণা ও উদ্দীপনা দান করেছিলো। প্রতিটি তরুণের অপূর্ব সুন্দর নয়নলোভন স্বাস্থ্যশ্রী দেখে মনে হলো, এরা যে কোনো বাধা-বিপত্তির সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম। এরা এগিয়ে যাবে শেকল ভাঙার দুর্বার স্বপ্ন বুকে নিয়ে।

১৯২৯ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে এক রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু। এই সম্মেলনে সামরিক পোষাকে স্বেচ্ছাসেবকদলের কুচকাওয়াজ এক অভিনব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলো। এদের অধিনায়ক ছিলেন শ্রীগণেশ ঘোষ। এই উপলক্ষে এক ছাত্রসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। ছাত্রদলের অধিনায়কত্ব করেন ছাত্রনেতা লোকনাথ বল এবং এই ছাত্রসম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সম্মেলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রতিটি তরুণ-তরুণীর মনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই বিরাট সাফল্যের মূলে ছিল দূরদর্শী, স্থিতপ্রাজ্ঞ মাষ্টারদার অপূর্ব সংগঠনকুশলতা।

চট্টগ্রামের আকাশে-বাতাসে বারুদের ঘ্রাণ অনুভূত হচ্ছে। প্রস্তুতি আর প্রস্তুতি। বিদেশী দুর্গকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্যে নববোধনের পরম পবিত্র সূচনা। গোপন বৈঠকে স্থির হলো, চরম এক আঘাতের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। চোরাগোপ্তা হত্যা বা ডাকাতি ইত্যাদির কথা এখন না ভেবে এ-অঞ্চলের গোটা শাসনযন্ত্রটাকে অচল করে তুলতে হবে। দলের প্রতিটি কর্মী সাধ্যমতো অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে। গোপন

ঘাঁটিগুলোতে চলেছে অস্ত্রচালনার শিক্ষাদীক্ষা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। এদিকে সরকারী গোয়েন্দার দল সন্দেহ করেছিলো— এদের সংঘের ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশ্য—বাইরে থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানী করা। একদিকে গোপন প্রস্তুতি, আবার প্রকাশ্যে কংগ্রেসের আদর্শে অন্যান্য কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ায় সেদিন সরকারপক্ষের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হয়েছিলো। এ সময়ে জেলা কংগ্রেসের নির্বাচনের ব্যাপারে ভিন্ন এক রাজনৈতিক দল পরাজিত হওয়ায় প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করে ফেরবার পথে মাষ্টারদার দলের এক সক্রিয় ছাত্রকর্মী সুখেন্দু দত্তকে ছুরিকাঘাত করে। ফলে কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। সভাকক্ষের অভ্যন্তরেও প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। সমস্ত আক্রোশ মাষ্টারদার ওপর। তাই তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়। নির্মল সেনও আহত হন। পাশে লোকনাথ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ সহকর্মীরা গর্জে উঠতে চাইলেও আহত মাষ্টারদা ভবিষ্যৎ কর্মযজ্ঞের ব্যাঘাতের আশঙ্কায় শান্তভাবে তাঁদের বিরত করেছিলেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, স্থিতধী মাষ্টারদার আচরণের ফলে লোকনাথ ও অনন্ত সিংহের পকেটস্থ রিভলবার সেদিন গর্জে ওঠে নি। অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রভৃতির পেছনেও কিছু গুণ্ডার দল লেগেছিলো। দুদিনেই তাদের শায়েস্তা করা হয়েছিলো।

মাষ্টারদা সূর্য সেনের "রিপাব্লিকান বাহিনী" অতি সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। সরকারের গোয়েন্দাবাহিনীর ওপর পাল্টা গোয়েন্দাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। সরকারপক্ষকে একেবারে নাজেহাল করে তুলল। হাতবোমা তৈরী করতে গিয়ে এ সময়ে হঠাৎ বিস্ফারণে তারকেশ্বর দস্তিদার ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস গুরুতররূপে আহত হওয়ায় কিছুদিন প্রস্তুতিপর্বের বাধাপ্রাপ্তি ঘটে। অবশেষে স্থির হয় চূড়ান্ত সংগ্রামের কর্মপন্থা। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল [গুড ফ্রাইডে] রাত্রে শুরু হবে এ্যাকসান (action)। আক্রমণ-পরিকল্পনা রচিত হলো। ছয়টি বিভাগে ভাগ হয়ে আক্রমণ চালানো হবে।

(১) জেলা পুলিশ হেড কোয়ার্টারস আক্রমণ, (২) স্থানীয় অক্সিলিয়ারী ফোর্সের কেন্দ্র ও অস্ত্রাগার অধিকার, (৩) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের কেন্দ্রীয় অফিস ধ্বংস ও যোগাযোগ বিচ্ছেদ, (৪) রেলপথ উচ্ছেদ, (৫) ইউরোপীয়ান ক্লাব দখল (৬) উচ্চপদস্থ বৃটিশ অফিসারদের বন্দী।

এই ছয়টি পর্যায়ে আক্রমণের জন্য ৬২ জন তরুণ বিপ্লবীকে বাছাই করা হলো। ভাগ করে দেওয়া হলো এক একজন কমাণ্ডিং অফিসারের অধীনে।

১৮ই এপ্রিলের অপরাহ্ন। আকাশে রক্ত-সন্ধ্যার রক্তরেখা দেখা দিয়েছে। সেই সন্ধ্যায় যোদ্ধৃবেশে নির্দেশমত প্রতিটি সৈনিক নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়েছে। আসন্ন প্রলয়ঝটিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আবেগে এরা উত্তাল। এদের চোখেমুখে যেন অশনিভরা বিদ্যুতের ঝলক। এরা দুর্বার গতিতে রণরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। শেষবারের মতো সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা প্রতিটি উপদলের সঙ্কল্প ও দায়িত্বের কথা বুঝিয়ে দিলেন। মেরে মরে জাতির শতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গাতে হবে—দেশকে জাগাতে হবে। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধ নিতে হবে।

রাত আটটার কিছু পূর্বে নির্মল সেন ও লোকনাথ বল তাঁদের দল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রেল অস্ত্রাগার দখলের উদ্দেশ্যে। অম্বিকা চক্রবর্তী তাঁর দল নিয়ে যান টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস করতে। রেলপথ উচ্ছেদকারীর দল ইতিপূর্বে বেরিয়ে গেছে। এদের নেতৃত্ব করেন উপেন ভট্টাচার্য। পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করার ভার নিয়েছেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ।

এবার এগিয়ে যাবার পালা। রাত প্রায় দশটা। বিপ্লবীরা নিজেদের দায়িত্বপালনে বেরিয়ে পড়েছে। একটা ট্যাক্সী পাহাড়তলী অস্ত্রাগারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ট্যাক্সীর ড্রাইভারকে মাঝপথে অজ্ঞান করে ফেলে রাখা হয়েছে। অস্ত্রাগাররক্ষী আগন্তুক দলকে 'মিত্র' ভেবে সামরিক কায়দায় মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত লোকনাথ বলকে অভিবাদন জানালো। পরে ভুল বোঝার আগেই সে আহত হয়ে ধরাশায়ী হলো। ইংরেজ কর্মচারী সার্জেণ্ট ফেরেল গুলীর আঘাতে নিহত হল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রাগার বিপ্লবীদের হস্তগত হল। ওদিকে অবিরাম গুলীবর্ষণের ফলে রক্ষীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় পাহাড়-শীর্ষের পুলিশ-অস্ত্রাগার ফেলে। ইতিমধ্যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস এবং রেলপথ উচ্ছেদের ফলে চট্টগ্রামকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বিপ্লবী যোদ্ধারা মহোল্লাসে ক্ষিপ্রবেগে এসে সমবেত হয় পুলিশ-পাহাড়ের শীর্ষে, যেখানে মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে নৈশগগন কেঁপে উঠছে। বীর সৈনিকের দল রাইফেল হাতে পাহাড়-শীর্ষে বিজয়পতাকাতলে জাতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর এক অভেদ্য দুর্গ স্থাপিত করে।

অভূতপূর্ব জয়ের উন্মাদনায় চট্টলামায়ের বীর বিপ্লবী তরুণের দল আজ অবপর্যায়ে সিংহবিক্রমে এগিয়ে চলেছে দুরন্ত জোয়ারের স্রোতের মতো।

পুলিশ অস্ত্রাগার দাউ দাউ করে জ্বলছে। বারুদের স্তূপে পেট্রোল ছড়াতে গিয়ে তরুণ হিমাংশু সেনের গায়ে আগুন ধরে যায়। তাকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে ফেলা হল। কিন্তু মৃত্যুর গ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করা গেল না। একমাত্র ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা তখন সাময়িকভাবে বর্জন করতে হলো, কারণ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সংগ্রামীরা পৌঁছুবার আগেই ক্লাব-প্রাঙ্গণ জনশূন্য হয়ে গেছে। এ সময়ে স্থানীয় ওয়াটার ওয়ার্কস থেকে পুলিশবাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীবাহিনীর গুলীবিনিময় চলতে থাকে। দুপক্ষের সংগ্রামে পুলিশবাহিনী পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এরা বিপ্লবীদের সমরকৌশলে হতবাক্ হয়ে যায়। তখন সাময়িক নিরাপত্তার প্রয়োজনে বিপ্লবীরা শহরের প্রান্তে পাহাড়ের ঝোপে ঝাপে আশ্রয় নিয়ে সুযোগ মত শত্রুপক্ষের ওপর গেরিলা কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে সামাল সামাল রব। ১৮ই এপ্রিলের শেষরাত্রেই সহরের সমস্ত ইউরোপীয়ান নরনারী প্রাণভয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় জাহাজে আশ্রয় নেয়। ১৯ শে এপ্রিলের প্রভাতসূর্যের কিরণে ঝলমল করেছে বিপ্লবীদের জয়পতাকা। বৃটিশ শাসকের দল তখন চট্টলভূমি থেকে প্রায় তিনদিন সম্পূর্ণ বিতাড়িত।

বিপ্লবীবাহিনী পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছে। অনিদ্রায়, অনাহারে শ্রান্ত—তবুও চলার বিরাম নেই। চরম খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে। নিকটবর্তী গ্রাম থেকে অবশেষে অম্বিকা চক্রবর্তী এক হাঁড়ি খিচুড়ী যোগাড করে নিয়ে এলেন। এতে দলের কি উল্লাস! এ'কদিন পাহাড়ে কাটিয়ে ২২শে এপ্রিল সকালবেলা যোদ্ধারা শহরের অনতিদূরে জালালাবাদ পাহাড়ের বুকে আশ্রয় নেয়। এ খবর কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছুতে দেরী হল না। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট; ডি. আই. জি; এস. পি; মিলিটারীর মেজর; ক্যাপ্টেন প্রভৃতি হোমরা-চোমরাদের পরামর্শসভা বসে গেল। স্থির হল, বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতেই হবে।

ক্যাপ্টেন টেইটের অধীনে ইস্টার্ণ রাইফেলস বাহিনী ও সুর্মাভেলী বাহিনী দুদিক থেকে জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। একটা দল ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের কাছে গিয়ে হাজির। ঐ পাহাড়ের শীর্ষে রয়েছে সমবেত বিপ্লবীফৌজ। মিলিটারীর আগমন-বার্তা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সকলে যে যার পজিসন

নিয়ে সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত। মাষ্টারদা এ-যুদ্ধ পরিচালনার ভার দিলেন লোকনাথ বলের ওপর। লোকনাথ তৎক্ষণি সামরিক কায়দায় সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদাকে অভিবাদন জানিয়ে সৈন্তদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন। মাষ্টারদা নিজেও দলের অন্তান্তদের সঙ্গে পজিসন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পেছনের দিক থেকে অস্ত্র সরবরাহ করার ভার পড়ল নির্মল সেনের ওপর। কেউ অগ্রবর্তী সারিতে, কেউ রয়েছে মধ্যভাগে আবার কেউ আছে পেছনে। সকলেই লোকনাথের আদেশের অপেক্ষায়। মুহূর্তের মধ্যে লোকনাথের বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হলো— "Fire"। সঙ্গে সঙ্গে সরকারীবাহিনীর ওপর বিপ্লবীদের প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ শুরু হলো। ওদিক থেকেও পাল্টা জবাব আসতে লাগলো। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল তুমুল সংগ্রাম চললো। বিপ্লবীদের প্রচণ্ড আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে সরকারী সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে অন্তত্র সরে যেতে বাধ্য হল।

এদিকে কর্ণেল ডেলাস স্মিথের নেতৃত্বে আর এক বিরাট সেনাদল রাইফেল ও ভারী মেসিনগান থেকে গুলীবর্ষণ শুরু করে দেয়। প্রায় তিনদিক থেকে বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু সেনানায়ক লোকনাথ কিংবা অন্তান্ত যোদ্ধারা কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে সমানে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাইফেলের ভীমগর্জনে মেদিনী কেঁপে উঠেছে। বিরাম-বিহীন মরণপণ সংগ্রাম। হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটি গুলী লোকনাথের ভাই টেগরাকে [হরিগোপাল বল] ঘায়েল করে। 'সোনা ভাই, আমি চললাম—তোমরা শেষ পর্যন্ত লড়বে।'—টেগরার এই শেষবাণী। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। পরাজিত শত্রুবাহিনী কেনোমতে পালিয়ে যায়।

এই যুদ্ধে ১২ জন বিদ্রোহী শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। অম্বিকা চক্রবর্তী, বিনোদ দত্ত ও বিনোদ চৌধুরী গুরুতর আহত হন। শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যাও নগণ্য নয়।[১]

এই যুদ্ধের অভূতপূর্ব সাফল্যে অন্যতম নেতা নির্মল সেন সেনাপতি লোকনাথ বলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: "যে অতুলনীয় বীরত্ব

১। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 'History of Freedom Movement in India, Vol. III., P-499'-এ লিখেছেন: It is said that Sir Charles Tegart, while assaulting the raiders, taken prisoners, cursed them and said "you have killed 64 of our men."—সম্পাদক।

তুমি আজ জালালাবাদের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখালে তার জন্যে আমরা সবাই গর্বিত। বিজয়ী বীরের মর্যাদা নিয়ে তুমি তরুণ বাংলার স্বপ্নের মানুষ হয়ে থেকো।" অভিভূত লোকনাথ সকলের সামনে নির্মলদার চরণধূলি মাথায় তুলে নিলেন। সর্বাধিনায়ক স্বল্পভাষী মাষ্টারদা বল্লেন: "বেশ সুষ্ঠুভাবেই সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছ।"

মৃতদেহগুলো সারিবদ্ধভাবে রেখে মাষ্টারদা নির্দেশ দিলেন—"সকলে গার্ড অব অনার দাও।" রাতের অন্ধকারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে এই বীর শহীদদের শেষ অভিবাদন জ্ঞাপন করা হলো। নিহত এই বারোজন যোদ্ধাদের মধ্যে ছিল নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল (টেগরা), মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত ও পুলিন ঘোষ। অর্ধেন্দু দস্তিদার পরে হাসপাতালে মারা যান।

জীবিত বিপ্লবী যোদ্ধারা ক্লান্ত—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে, কারও কারও দেহে ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। প্রায় সকলেরই রক্তাক্ত ঘর্মাক্ত কলেবর, চোখে মুখে বিদ্যুতের ঝলক। মাষ্টারদা বললেন: "প্রস্তুত হও, এক্ষুনি যেতে হবে।" ২২শে এপ্রিলের রাতের অন্ধকারে শুরু হলো নিরুদ্দেশ যাত্রা। অতি সংগোপনে রাইফেল কাঁধে চলেছেন বিজয়ী অভিযাত্রীর দল। আত্মগোপন করে রইলেন বিভিন্ন গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে।

পরদিন সূর্যোদয়ে ইংরেজের সেনাবাহিনী সমস্ত পাহাড় ঘিরে ফেলেছে। প্রবল গুলীবর্ষণের মধ্যে সন্তর্পণে শীর্ষে উঠে দেখে পাহাড় শূন্য—কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তাদের মুখে তখনও যেন ফুটে রয়েছে পরম শান্তির চিহ্ন। প্রতি জনের বুকে লেখা "ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি।" একজনের দেহে তখনও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল। তিনি অর্ধেন্দু দস্তিদার। তাঁকে পাঠানো হলো জেলের হাসপাতালে। পাহাড়ের বুকে নিহত বীরদের ফটো তুলে নেওয়া হলো। সেদিন ইংরেজ সামরিক কর্মচারীরাও শ্রদ্ধাভরে এই মুক্তিপূজারী তরুণ বিদ্রোহী শহীদদের সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানায়। বাংলাদেশের কচি কাঁচা দুলালদের দুঃসাহসিক সংগ্রাম-নৈপুণ্য দেখে তারাও স্তম্ভিত। অবশেষে বীর শহীদদের প্রাণহীন দেহ চারটি চিতায় সাজিয়ে পেট্রোলসিক্ত করে ঐ বিপ্লবতীর্থ জালালাবাদ পাহাড়ের শীর্ষে দাহ করা হয়।

উদয়প্রকাশ

জালালাবাদ যুদ্ধের পরে

যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত

জালালাবাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর চট্টগ্রামের বিদ্রোহীবাহিনী গ্রামের বিভিন্ন আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া গেরিলাপদ্ধতিতে আঘাতের পর আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে থাকেন।

শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে জালালাবাদ যুদ্ধের দুই একদিন পূর্বে পাহাড়ের আশ্রয়স্থল হইতে অমরেন্দ্র নন্দীকে সহরে প্রেরণ করা হয়। পুলিশবাহিনী তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চেষ্টা করে; কিন্তু অমরেন্দ্র ধরা দেওয়ার পরিবর্তে ২৪শে এপ্রিল আত্মহত্যা করিয়া শহীদের মৃত্যু বরণ করে।

৬ই মে রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী, স্বদেশ রায় ও সুবোধ চৌধুরী গ্রামের আশ্রয়স্থল হইতে সহরস্থ শ্বেতাঙ্গমহল আক্রমণ করিতে আসে। কালারপোলে ও জুলধা গ্রামে পুলিশ ও গ্রামবাসীর সহিত সংঘর্ষে সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী ধৃত এবং অন্য ৪ জন নিহত হয়।

১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট তাহার দলবল লইয়া চন্দননগরে আত্মগোপনকারী চট্টল বিপ্লবী লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তদের অবস্থানগৃহ ঘিরিয়া ফেলিলে উভয় পক্ষে গুলীবিনিময় হয়। ফলে মাখন ঘোষাল গুলীবিদ্ধ হইয়া মারা যায়। অন্যদের গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রাম জেলে পাঠান হয়।...৯ই অক্টোবর অন্যতম বিপ্লবীনেতা অম্বিকা চক্রবর্তী অসুস্থ অবস্থায় পটিয়ার গুপ্ত আস্তানা হইতে গ্রেপ্তার হন।...১লা ডিসেম্বর পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ ক্রেগকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলবশত চাঁদপুরে রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জীকে ট্রেনের মধ্যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী হত্যা করিয়া ধৃত হয়।

১৯৩১ সালের ১০ই জুলাই দিল্লী হইতে যতীন রক্ষিত আসিয়া আত্মগোপনকারী মাষ্টারদা ও দলের অনেকের সহিত কধুরখিল গ্রামে সুবোধ চৌধুরীর বাড়ীতে সাক্ষাৎ করেন এবং উত্তর ভারতীয় বিপ্লবীদলের সহিত একটি কর্মসূচীতে কাজ করার কথা আলোচিত হয়।...১৬ই মার্চ ডি. আই. বি-র দারোগা শশাঙ্ক ভট্টাচার্য তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন দে-কে অনুসরণ

করিতে গিয়া বরমা গ্রামে গুলীবিদ্ধ হয়। ২রা জুন ডিনামাইট দ্বারা কোর্ট বিল্ডিং ধ্বংস করার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতে গিয়া অনিল রক্ষিত, প্রভাত দত্ত, রবি সেন, অর্ধেন্দু গুহ ও মধু গুহ প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয়। ২৭শে জুন চট্টগ্রাম জেল ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিয়া বন্দীদের জেল-মুক্তির ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। ৩০শে আগষ্ট ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টার আসানুল্লাকে হরিপদ ভট্টাচার্য খেলার মাঠে গুলী করিয়া হত্যা করে। হরিপদ ধরা পড়ে। তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী দৈনিক 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার প্রেস ভাঙ্গিয়া দেয়, সহ-সম্পাদক হীরেন্দ্র চৌধুরীর মাথা ফাটাইয়া দেয়, স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সহর ও গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের উপর অকথ্য মারধর, বাড়ীঘর ভাঙ্গা ও জ্বালাইয়া দেওয়া, স্কুল ঘেরাও করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রহার করা প্রভৃতি চলিতে থাকে। পুলিশেরা প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দুর দোকান লুঠ ও জ্বালাইয়া দেওয়ার কাজ চালাইতে থাকে। যতীনবাবু পুলিশ পোষাকে সমস্ত সহর ঘুরিয়া সহরময় অত্যাচারের কাহিনী মহিমচন্দ্র দাসকে বলিলে মোটরযোগে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে বাহির হইয়া গুণ্ডাদলকর্তৃক বাধা-প্রাপ্ত হন।...চট্টগ্রামের সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ করিয়া মহিমবাবু ও যতীন রক্ষিত কলিকাতায় গিয়া সেনগুপ্ত ও সুভাষ বসুকে চট্টগ্রামের ঘটনাবলী জানান এবং তজ্জন্য অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভায় উভয়ে ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। উক্ত সভায় বে-সরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সেনগুপ্ত সদস্যদের লইয়া চট্টগ্রাম আসেন এবং সহর ও গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করেন। তদন্তে প্রমাণিত হয়, ১৫০০০০ লক্ষাধিক টাকা হিন্দুদের উপর পাইকারী জরিমানা ও হিন্দু স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াও যখন দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই তখন তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কেম্প গুণ্ডা, বে-সরকারী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী দ্বারা উক্ত ঘটনা ঘটাইয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট বে-আইনী ঘোষিত হইলে কলিকাতার জনসভায় অধ্যাপক নৃপেন ব্যানার্জি ও জে. এম. দাশগুপ্ত তাহা প্রচার করায় তাঁহাদের ৯ মাস সাজা হয়। সেনগুপ্ত বিলাত গিয়া পার্লামেণ্ট সদস্যদের নিকট চট্টগ্রামের ঘটনাবলী বর্ণনা করার ফলে মিঃ কেম্পের সিভিল সার্ভিস চাকরী যায়। সেনগুপ্ত বিলাত হইতে ফিরিবার পথে বোম্বে পোর্টে গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে রাঁচিতে অন্তরীণ করা হয় এবং সেখানে ১৯৩৩ সালের ২২শে জুলাই তাঁহার জীবনাবসান হয়।

যতীন রক্ষিত বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স হইতে মুক্ত থাকার জন্য মাষ্টারদার নির্দেশে দিল্লী চলিয়া যান। তথায় থাকিয়া চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর প্রচার এবং বিপ্লবীদের আত্মগোপন ও কোর্টে অভিযুক্তদের মোকদ্দমার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং টাকা সংগ্রহের জন্য ইন্দুমতী সিংহকে দিল্লী পাঠাইবার জন্য ভার করেন। ফলে তাঁহাকে দিল্লী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া বাংলাদেশে লইয়া আসা হয়। তাঁহার গ্রেপ্তারে দিল্লীর ছাত্রেরা হরতাল পালন করে। টিবিয়া কলেজ ছুটি দেওয়া হয়। ছাত্রেরা বন্দী যতীনবাবুর মোটর মধ্যস্থানে রাখিয়া শোভাযাত্রাসহকারে জেল গেট পর্যন্ত গমন করে। গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি নওজওয়ান ভারত সংঘের কার্যকরী সমিতির সভ্য হন এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং মাষ্টারদা সূর্য সেন প্রভৃতি আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলিয়া নেওয়া সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট নওজয়ান সংঘের পক্ষ হইতে ডেপুটেশনের নেতৃত্ব করেন। উক্ত ডেপুটেশনকে ভিত্তি করিয়া গবর্ণমেন্টের পরামর্শে জে. এম. সেনগুপ্ত বাংলার বিভিন্ন জেলে ও ক্যাম্পে গমন করিয়া নেতৃস্থানীয় বন্দীদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ হওয়ায় উক্ত আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিসনকে মাষ্টারদার দলের শৈলেশ রায় ১৯৩২ সালের ২৯শে জুলাই গুলী করিয়া হত্যা করে। সরোজ গুহ নোয়াখালীর রমেন ভৌমিকসহ ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্ণোকে ২৮শে অক্টোবর গুলী করিয়া নিহত করে।...

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী আস্কর খাঁ দীঘির পাড়স্থ প্রবর্তক সংঘে স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য পাঠ করার ফলে বঙ্কিম সেন, হেম রক্ষিত, পঙ্কজ চৌধুরী ও বীরেন্দ্র চৌধুরী জেলবরণ করেন।...৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় চট্টগ্রামের মেয়ে বীণা দাস গভর্ণর ষ্টেনলী জ্যাকসনকে গুলী করিয়া ধৃত হন।

...১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও আইন সভার সদস্য চট্টলগৌরব মহিমচন্দ্র দাস কলিকাতায় মারা গেলে তাঁহার মৃতদেহ চট্টগ্রামে আনার পর অগণিত নরনারী শবানুগমন করে।...তাঁহার মৃতদেহ জে. এম. সেন হল প্রাঙ্গণে দাহ করা হয়। তাঁহার পর ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত হন।......

তাঁহার

এম. এন. রায়ের জেল হইতে মুক্তির পর যুগান্তর দল নিজেদের বিলুপ্তি ঘোষণা করিয়া পঞ্চায়েৎ প্রথায় কংগ্রেসের অল্টারনেটিভ লিডারশিপের কর্মপন্থায় বিশ্বাস করিয়া কাজ করিতে থাকেন। চট্টগ্রামের যতীন রক্ষিত, সতীভূষণ সেন, শচীন গুহ, বিনোদ চৌধুরী, মহেন্দ্র চৌধুরী, মতিলাল চক্রবর্তী প্রভৃতিও এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে আস্থা রাখিয়া কংগ্রেসে কাজ করিতে থাকেন।......

১৯৩৯ সালে রামগড় কংগ্রেসের পর এম. এন. রায় র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠন করিয়া কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন। তখন বি. পি. সি. সি-র সভাপতি সুরেন ঘোষের সহিত চট্টগ্রামের দলও এম. এন. রায়ের নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে কাজ করিতে থাকেন। পরন্তু যতীনবাবুদের দলের শচীন গুহ, সুনীতি হাজারী, শিশিরবিন্দু দত্ত ও যোগেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন উকিল অনিল গুহকে সভাপতি করিয়া কংগ্রেসের বাহিরে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল গড়িয়া তুলেন। যতীনবাবুদের আর এক দল ধীরেন শর্মার সম্পাদকত্বে লোকমান খাঁ শেরওয়ানীকে সভাপতি করিয়া অফিসিয়েল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুভাষ কংগ্রেসের সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে তাহা ফরওয়ার্ড ব্লক নামে অভিহিত হয়। তাহাতে অনুশীলনের প্রতাপ রক্ষিত, শ্রীপতি নন্দী, শ্যামাপদ বিশ্বাস এবং মাষ্টারদার দলের দ্বিজেন দস্তিদার ও কেদারেশ্বর চক্রবর্তী প্রভৃতিও যোগদান করে। সুভাষ বোসের আপোষহীন সংগ্রামের পক্ষে প্রচারের জন্য আফসারউদ্দিন চৌধুরী ও ত্রৈলোক্য মহারাজ চট্টগ্রাম আসিলে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। তাহা ভঙ্গ করিয়া তাঁহারা অভিযুক্ত হন এবং ১ বৎসর কারাবরণ করেন। তাঁহাদের সমর্থনে কমিউনিষ্ট পার্টির যশোদা চক্রবর্তী, কংগ্রেস সোস্যালিষ্টের পক্ষে মধু গুহ এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষে অমিয়কৃষ্ণ সেন [চুনী]-কে লইয়া বামপন্থী সঙ্ঘ মারফৎ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলে প্রশান্ত দাশগুপ্ত ও আরও ২।৩ জন ১ মাসের জন্য কারাবরণ করে। মুজাফ্ফর আহমদের সভাপতিত্বে বাগদণ্ডী গ্রামে কৃষক সম্মেলন হয়। সুখেন্দু দস্তিদার ছিল ভোলান্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক।

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন ক্যাপটেন কেমারণের নেতৃত্বে পুলিশ ও সামরিক-বাহিনী ধলঘাট গ্রামের সাবিত্রী দেবীর বাড়ী ঘেরাও করিল। সরকারী-বাহিনী ও আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের মধ্যে গুলীবিনিময়ের ফলে কেমারণ নিহত হয় এবং বিপ্লবীদের পক্ষে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা পলাইতে সমর্থ হন। এই ঘটনা সম্পর্কে ধৃত দীনেশ দাশের

বিপ্লব

৪ বৎসর জেল হয়। সাবিত্রী দেবী ও তাঁহার পুত্র রামকৃষ্ণেরও জেল হয়। রামকৃষ্ণ জেলে মৃত্যুবরণ করে।……

আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের ধরাইয়া দিবার জন্য জনপ্রতি ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। কেমারণ হত্যার পর তাহা ১০০০০ টাকা করা হয়। নেতা সূর্য সেনের জন্য আরও ১০০০০ টাকা অধিক ঘোষিত হয়।

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে প্রফুল্ল দাস, সুশীল দে, মহেন্দ্র চৌধুরী, কালীকিঙ্কর দে, পান্না সেন, শান্তি চক্রবর্তী ও বীরেশ্বর রায় অংশগ্রহণ করে। ইহাতে বহু ইউরোপীয়ান আহত ও নিহত হয়। কিন্তু দলের নেত্রী কুমারী প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইয়া আত্মহত্যা করেন। প্রীতিলতা নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে না চাহিলে মাষ্টারদা দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলেন: "বাংলায় বীর যুবকের অভাব নেই। বালেশ্বর থেকে কালারপোল পর্যন্ত এদের দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারবার বীর যুবকদের তাজারক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতি শক্তির খেলায় মেতেছে—ইতিহাসের সে অধ্যায় আজো অলিখিত রয়ে গেছে। তোমার সাফল্য বা আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হয়ে চলুক—এই-ই আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ অবলোকন করুক—এদেশের মেয়েরাও স্বাধীনতা-যুদ্ধের পশ্চাতে রয়েছে।"…ভাবী পথযাত্রীদের জন্য প্রীতি যেই পথ রচিয়া গেল, সেই পথে আগাইয়া আসিবার জন্য সেই দিনের মেয়ের দল যাঁহারা মাষ্টারদাকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কল্পনা দত্ত, কুন্দপ্রভা সেন, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রক্ষিত, আলোরাণী রক্ষিত, নিরুপমা বড়ুয়া, বকুল দত্ত ও মতিপ্রভা সেনগুপ্তা প্রভৃতি।

১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী গৈরলা গ্রামের মহিমচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ীতে …মাষ্টারদা ও ব্রজেন সেন ধৃত হন।…২০শে মার্চ মাষ্টারদাকে জেল হইতে মুক্ত করার জন্য জেলে বন্দী সুখেন্দু দস্ত অমূল্য বিশ্বাসের সাহায্যে বাহিরে তারকেশ্বর দস্তিদারের সহিত সংযোগ স্থাপন করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ জেলের বাহিরে লাল দীঘির পাড়ে পুলিশ দলের শৈলেশ রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া যে চিঠি পায়, তাহাতে জেলের ২য় ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। শৈলেশ রায়ের ২ বৎসর জেল হয়।…১৯শে মে আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামের পূর্ণ তালুকদারের বাড়ীতে এক সংঘর্ষে তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত ও সুধীন্দ্র দাশ গ্রেপ্তার হয়। গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার ও বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত নিহত হয়।……

চুয়াত্ত

১৯৩৪ সালে অনুশীলন দলের নেতৃস্থানীয়েরা কোন কাজ ব্যতীত গ্রেপ্তার হওয়ায় দলের অবশিষ্ট যুবকদের তা পছন্দ হয় নাই। তাহাদের কয়েকজন আত্মগোপন করিয়া কিছু করার চেষ্টায় অর্থের প্রয়োজনে বাথুয়া ডাকাতি করিয়া দলের মোক্ষদা চক্রবর্তী, প্রিয়দা চক্রবর্তী, মহেশ বড়ুয়া ও হরিহর দত্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয়। তাহাদের ৭ বৎসর কারাদণ্ড হয়। মহেশ বড়ুয়া রাজসাহী জেলে মারা যায়।......

সূর্য সেনের গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে ১৯৩৪ সালের ৯ই জানুয়ারী রাত্রিতে আহার করিবার সময় কিরণ সেন ও খোকা নন্দী হত্যা করে। ৭ই জানুয়ারী পল্টন ক্রিকেট খেলার মাঠে ইউরোপীয়ানদের আক্রমণ করিবার সময় নিত্যগোপাল সেন ও হিমাংশু ভট্টাচার্য প্রাণ হারায় এবং কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তী ধৃত হয়। ৭ই জুন মেদিনীপুর জেলে কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তীর ফাঁসী হয়।

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসী হয়।

১৯৩৫ সালের ১৫ই জুন গোয়ালন্দে অন্তরীণাবস্থায় গোয়ালন্দ থানার ও. সি. এম্‌দাদ আলিকে হত্যার অপরাধে চট্টগ্রামের রোহিণী বড়ুয়ার ১৮ই ডিসেম্বর ফাঁসী হয়।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বদানে অকৃতকার্য হইয়া বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তী আত্মহত্যা করিবার পূর্বে মাষ্টারদাকে লিখে: "ব্যর্থতার গ্লানি ও পরাজয়ের কলঙ্ক মাখিয়া আপনাকে এই মুখ কি করিয়া দেখাইব? আপনার কৃতী সহধর্মীদের পাশে এই অকৃতী অধমের অবস্থান মানায় না। তাই আজ জন্মের মত বিদায়। আপনার অযোগ্য শিষ্য শৈলেশ্বর।" দলের ছেলেদের অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিবার সময় সুচিয়া গ্রামের বিপ্লবী বীরেন দে হঠাৎ বন্ধুর গুলীতে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কানুনগোপাড়ার বিপ্লবী সুকুমার কানুনগো অনবধানতাবশতঃ গুলীবিদ্ধ হইয়া মারা যায়। নয়াপাড়ার অশ্বিনীকুমার গুহ মেদিনীপুর জেলে, ধোরলার নীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য হিজলী বন্দীশিবিরে ও কানুনগোপাড়ার ব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী বহরমপুর বন্দীশিবিরে আত্মহত্যা করে। কানুনগোপাড়ার নীরেন্দ্রলাল রক্ষিত অসুস্থ অবস্থায় জেল হইতে মুক্তির পর নিজ বাড়ীতে মারা যায়।

১৯৩৩ সালে পুলিশ অফিসার হেম গুপ্তের রিভলভার চুরির অপরাধে

পঞ্চায়

কোয়েপাড়ার তেজেন সেনের ৭ বৎসর জেল হয়। এক গুপ্তচরকে হত্যা করার চেষ্টায় হাওলা গ্রামের অমূল্য আচার্যের ১০ বৎসর জেল হয়।……

১৯৩৮ সালে জেল হইতে মুক্তির পর অনুশীলন দল ও মাষ্টারদার দলের কেহ কেহ ননী সেনগুপ্তকে সম্পাদক করিয়া চট্টগ্রামে জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেন এবং কংগ্রেসকে প্ল্যাটফরম করিয়া কৃষক, মজুর ও ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন গড়িয়া তুলেন ও "অধিকার" পত্রিকা প্রকাশ করেন। সরকার তাহা বন্ধ করিয়া দিলে "সংগ্রাম" পত্রিকা বাহির করেন।……

কংগ্রেস দখল করিবার জন্য কমিউনিষ্টরা নানা ফ্রণ্টে দল গঠন করিয়া যেমন কাজ করিতেছিল, মাষ্টারদার দলের যতীনবাবুরাও সুখেন্দু দত্তকে সম্পাদক করিয়া সতীভূষণ সেন ও অন্যান্য বন্ধুদের সহায়তায় নানা ফ্রণ্টে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করিয়া প্রাচীন কংগ্রেসপন্থী হইতে কংগ্রেস দখলের জন্য সচেষ্ট হন। অল্পদিনের মধ্যে যতীনবাবুদের দলে পুনঃ আদর্শগত ভাঙ্গন ধরে। সুখেন্দু দত্তের নেতৃত্বে দীনেশ দাশ, পুলিন দে প্রভৃতি কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলে যোগদান করিয়া ভিন্নভাবে কৃষক, মজুর ও ছাত্রদের মধ্যে কাজ করিতে থাকে।

১৯৪২ সালে মাষ্টারদার দলের নেতৃস্থানীয় কর্মী শশাঙ্ক চৌধুরী 'ভারত ছাড' আন্দোলনের ফেরার নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ও প্রাদেশিক কংগ্রেস নেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত প্রভৃতির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া কংগ্রেসের কর্মপন্থার পুস্তিকা ও অর্থ চট্টগ্রামে প্রেরণ করে।…অন্নদা দে, চিত্ত [চৌধুরী] ও অনন্ত দাস প্রভৃতি সৈন্যদের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিতে থাকে। শিশিরবিন্দু দত্ত, শঙ্কু দস্তিদার, হরেন ভৌমিক, জগদীশ ভট্টাচার্য, হরিসাধন সেন ও পরেশ বল প্রভৃতির চেষ্টায় সহরের উপর খাসমহাল অফিস জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। উক্ত সময়ে রাণী রক্ষিত আর্থিক ও অন্য সর্বপ্রকারে বিপদের ঝুঁকি নিয়া আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সাহায্য করিয়াছিলেন। রাঙ্গুনিয়ায় সৈন্যদের পিকেট অফিস, মীরেশ্বরীতে ভরদ্বাজ হাট ও করের হাট পোষ্টঅফিস, খাসমহাল অফিস জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ধূমের নিকট রেললাইন তুলিয়া ফেলা হয় এবং টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হয়। উক্ত কাজের জন্য সেনারা গোপনে পেট্রোল ও যন্ত্রপাতি সাহায্য করিয়াছিল। দুর্গাপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক তারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, শিক্ষক বাণীশ দে, কংগ্রেস সম্পাদক বরদা নন্দী, কুমুদিনী মজুমদার, কবি ইব্রাহিম, নগেন ভারতী, অন্নদা দে, হরেন, কিরণ ও শশাঙ্ক ভৌমিক, বীরেন চক্রবর্তী ও নীরব কর্মী সঞ্জীবপ্রসাদ সেন প্রভৃতি

ছাপ্পান্ন

অনেকেই বন্দী হন। অনন্ত দাস সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করিতে গিয়া ধৃত হইয়া ৯ মাস কারাবরণ করেন। চট্টগ্রামের দায়িত্বশীল কর্মী শচীন গুহ, দ্বিজেন পাল, পুলিন দে, ফণীন্দ্র দাশগুপ্ত, সুরেশ বণিক, ধীরেন শর্মা প্রভৃতি আন্দোলনের পূর্বেই গ্রেপ্তার হইয়া যায়।.........

১৯৪৩ সালে সুভাষ বোস রেঙ্গুন হইতে চট্টগ্রামের মারফৎ বাংলা তথা ভারতের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন।......চট্টগ্রামবাসী বহু যুবক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। চট্টগ্রামবাসী উক্ত সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য করেন। তন্মধ্যে শাকপুরার চৌধুরী পরিবার লক্ষাধিক টাকা দান করেন। কানুনগোপাড়ার খোকা রক্ষিত আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করে এবং বৃটিশবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ দলের সহিত বৃটিশ ফৌজের লড়াই সুরু হইলে সুভাষ বোসের সহিত সংযোগরক্ষাকারী মৌ: মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর সহিত তাঁহার সহকর্মী জালাল আহাম্মদ, হামিদালী আলিগরী, সৈয়দ সুলতান আহাম্মদ ও খুরসেদ আলী খন্দকার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। ইসলামাবাদীকে পাঞ্জাবের মীনওয়ালী জেলে পায়ে ও হাতে কড়া লাগাইয়া শির নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল।.........

১৯৪৬ সালের ১৭ই আগষ্ট সকালবেলা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরদিন মুসলিম লীগ শোভাযাত্রা বাহির করিলে তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট এ. করিম লীগপতাকা-শোভিত মোটরে করিয়া শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সেইদিন বিকালে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট নেতা রামমনোহর লোহিয়ার চট্টগ্রামে আগমন উপলক্ষে মুসলিম হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ সভা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে লীগ ভোলান্টিয়ারেরা ইটপাটকেলসহ আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়।...সহরের নানাস্থানে ছুরিকাহত হইয়া অনেক লোক নিহত হয়। দুই লরীভর্তি লীগ ভোলান্টিয়ার বহদ্দারহাট ও কর্ণালহাটের নিকট গিয়া পথচারীদের হত্যা করে এবং রাত্রে সহর ও গ্রামাঞ্চলে কয়েকটা দোকান লুঠ করে।...জেলা লীগ সভাপতি জনাব রফিক আহামদ সিদ্দিকী ও অন্যান্য লীগ নেতৃবৃন্দ উক্ত প্রকার বিদ্বেষ প্রচার ও জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া হিন্দুদের আশ্বস্ত করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে সরাইয়া নিতে গভর্ণমেণ্টের নিকট ডেপুটেশন দেন। রাজনীতির নামে নিরপরাধ মানুষের জীবন লইয়া স্বার্থান্বেষী নেতাদের ছিনিমিনি খেলার খেয়ালকে সংযত করার জন্য বাংলার

সাতার

বিপ্লবী সমাজের ন্যায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও দলমতবিরোধের লড়াই ভুলিয়া সুসংহত অভিযান চালায়। ইতিমধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিলে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে হাজার হাজার দেশবাসী তাঁহাদের অভিনন্দন জানায়।

১৯৪৭ সালে মাউন্টবেটন কর্তৃক দেশ ভাগ ঘোষণার পর ময়মনসিংহ প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে চট্টগ্রাম হইতে যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি গমন করেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার সহিত বীণা দাস, রাণী রক্ষিত, বেলা চৌধুরী, স্বর্ণপ্রতিমা বল ও প্রীতি নন্দী প্রভৃতি মেয়েদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। উক্ত কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব অনুযায়ী নেলী সেনগুপ্তাকে সভাপতি ও যতীন রক্ষিতকে সম্পাদক করিয়া চট্টগ্রাম কংগ্রেস সংখ্যালঘু রক্ষা সাবকমিটি গঠিত হয়। তেভাগা আন্দোলনের জন্য জ্যৈষ্ঠপুরার কালীপদ দে, রমণী দে ও সুরেন দে এবং কাঞ্চনগোপাড়ার প্রভাত রক্ষিত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয়। পরে খালাস পায়।

মীরাট কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে দেশভাগ স্বীকার করিয়া লয়।······যখন বাংলাদেশও [অবিভক্ত বাংলা] বিভাগের প্রস্তাব হয়, তখন জে. এম. সেন হলে সুরেশ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। তাহাতে হালদা ও কর্ণফুলী নদীর পূর্ব এবং শঙ্খনদীর উত্তর হিন্দুপ্রধান অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের সহিত যুক্ত করিয়া ভারতীয় এলাকায় লইয়া যাইবার প্রস্তাবকে রেডক্লিফ কমিশনের নিকট উপস্থিত করার জন্য যতীন রক্ষিতের উপর ভার দেওয়া হয়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রেবতীরমণ দত্তের সহায়তায় ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক স্মারকলিপি রেডক্লিফ কমিশনের নিকট উপস্থিত করেন। শেষ পর্যন্ত রেডক্লিফ রোয়েদাদ যখন কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ মানিয়া নেন, তখন চট্টগ্রামবাসী সংখ্যালঘুরাও তাহা স্বীকার করিয়া লয়। [১]

১। 'যুগধর্ম' [স্বাধীনতা-দিবস সংখ্যা, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৫] পত্রিকায় প্রকাশিত যতীন্দ্রমোহন রক্ষিতের 'পাক-ভারতের স্বাধীনতা-ইতিহাসে চট্টগ্রামের দান' প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।—সম্পাদক।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের শেষ বহ্নিশিখা

সুখেন্দুবিকাশ চক্রবর্তী

চট্টগ্রামে জালালাবাদ লড়াইয়ের পর সহর ও গ্রামের বুকে ইংরেজ রাজত্বের অত্যাচার দুঃসহ হয়ে উঠল। সুদূর বর্মা থেকে ধুরন্ধর মণীন্দ্র চৌধুরীকে চট্টগ্রামে এনে ডি-আই-বি ইন্সপেক্টরের পদ দেওয়া হল। গ্রামে গ্রামে বসল পুলিশ ক্যাম্প। স্কুলের ছাত্রদের লাল-নীল পরিচয় পত্র নিয়েই চলাফেরা করতে হল। পিটুনী করের চাপে জনজীবন হয়ে উঠল অতিষ্ঠপ্রায়।

মাষ্টারদা ও অন্যান্য নেতারা একে একে ধরা পড়লেন। অন্যদিকে বি-সি-এল-এ অ্যাক্টে গ্রাম ও সহরের তরুণদের জেলে টেনে আনা হল।

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের ফাঁসী দলের অবশিষ্ট তরুণদের উপর হানল এক প্রচণ্ড আঘাত। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির কর্মীদেরও বিশেষ কেউ বাইরে নেই। কে কোথায় কিভাবে আত্মগোপন করে আছেন, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। দলে বিশ্বস্ত কর্মীরও একান্ত অভাব। বৈপ্লবিক কর্মের প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলোর উপর পুলিশের কড়া নজর। কানুনগোপাড়া, সারোয়াতলী, ধোরলা, ধলঘাট, শ্রীপুর, গৈরলা, পটীয়া অঞ্চল, কোয়েপাড়া, নয়াপাড়া, পড়ৈকোরা, আনোয়ারা প্রভৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগ রেখে চলা একরূপ অসম্ভব হয়ে উঠল। ওদিকে জালালাবাদ যুদ্ধের অন্যতম নেতা বিনোদ দত্তের কোন সন্ধান পুলিশ করতে পারল না। তিনি খুব সঙ্গোপনে মীরেশ্বরাই থানার গ্রাম্য ঘাঁটিতে আশ্রয় নিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার একটি বিরাট অঞ্চলে দলের বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনার ভার পড়ল কানুনগোপাড়ার বিনোদ বলের উপর। তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ। দেবেন্দ্র শর্মা, আবদুল হক, শশধর চক্রবর্তী, জ্যৈষ্ঠপুরার প্রবোধ সেন সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। শাকপুরার অন্তরীণাবদ্ধ ধীরেন চৌধুরীও [বাঘা ধীরেন] গোপনে যোগাযোগ রাখলেন।

সরকারী প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে নানা খেলাধূলার আসর জমে উঠার সাথে সাথে দলের কার্যকলাপ খেলাধূলাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠতে থাকে। খেলোয়ারদের মধ্যে রিক্রুট-কাজের ভার দেওয়া হল পরেশ বলের উপর।

উনবাট-

সঙ্গে রইল জঙ্গী ক্যাডার নির্মল সিংহ। কুখ্যাত আসানুল্লার হত্যাকারী হরিপদ ভট্টাচার্যের ছোট ভাই ননী ভট্টাচার্য ও নরেন সেন পোপাদিয়া অঞ্চলে আবার এক মজবুত ছাত্র ইউনিট গড়ে তুলল। সারোয়াতলী, ধোরলা, কানুনগোপাড়া, শ্রীপুর, কধুরখিল, গোমদণ্ডী, কোয়েপাড়া, মহামুনি ও করণখাইন প্রভৃতি গ্রামেও শক্তিশালী গোপন ছাত্র-সংগঠন পুনর্গঠিত হল।

বিপ্লবের জন্য চাই men, money & arms [জনবল, অর্থবল ও অস্ত্রশস্ত্র]। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে টাকার দরকার। দেবেন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে গ্রামে একটি ডাকাতি করতে গিয়ে আবদুল হক ও প্রবোধ সেন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে গেল কয়েক বছরের জন্য। দলের নতুন কর্মীরা মা-বোনদের গায়ের গয়না চুরি করে দলের দাদাদের হাতে তুলে দিতে কসুর করল না। জলধর চক্রবর্তীর বাড়ীর গয়না চুরিও এরূপ একটি দুঃসাহসিক ঘটনা।

দলের নতুন রিক্রুটের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আড়ালে কারও কারও বাড়ীতে, পাহাড়ে, জংগলে কর্মী সমাবেশ হতো। ১২ই জানুয়ারী ও ২২শে এপ্রিল ছিল শোকদিবস। দলের কর্মীরা সারাদিন উপোস করতো আর কালো ব্যাজ পরিধান করতো। ১৮ই এপ্রিলের 'লাল ব্যাজ' ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগাতো।

দেখতে দেখতে গড়িয়ে যায় বছর। ১৯৩৮ সালের মধ্যে রাজবন্দীরা মুক্তি পেয়ে গ্রামে গ্রামে ফিরে এলেন। দলের কর্মীরা এতে খুশী হলেও মহাভাবনায় পড়ল। এ কি! তাঁদের মুখে নতুন কথা। ওভাবে দেশোদ্ধার হবে না। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ছাড়া স্বাধীনতা আসতে পারে না। কথায় কথায় Thesis, Antithesis & Synthesis। জেল থেকে ফিরে-আসা দাদাদের অনেকেই রক্তপতাকার পথের যাত্রী। আবার কেউ কেউ জয়প্রকাশের কংগ্রেস সোস্যালিজমের আদর্শে অনুপ্রাণিত। বাকী কিছু সংখ্যক নেতা ও কর্মী মাষ্টারদার বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ধারক ও বাহক হয়েই রইলেন। এঁদের পুরোধায় ছিলেন কানুনগোপাড়ার যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত, শচীন্দ্রনাথ গুহ, মতিলাল চক্রবর্তী, ননী সেন, শিশিরবিন্দু দত্ত, জগদীশ ভট্টাচার্য ও জ্ঞানেন্দ্র কানুনগো, গৈরলার ব্রজেন সেন, পরৈকোড়ার শংকু দস্তিদার প্রমুখ। আবার সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হওয়ার পর বেতাগীর ধীরেন শর্মা, পরৈকোড়ার শংকু দস্তিদার ও কুমিরার সুরেশ বণিক

প্রভৃতি ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেন। ফলে মাষ্টারদার পন্থাবলম্বী কর্মীর সংখ্যাও কমে এল। অবশ্য মাষ্টারদাপন্থী কর্মীদের বৃহত্তর কর্মপরিধি ছিল না বললে ভুল করা হবে। যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত ও বিনোদ চৌধুরী প্রকাশ্যে কংগ্রেস সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। হিন্দু মিশনের আড়ালে সহরে ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে তোলার ভার পড়ল মহেন্দ্র চৌধুরী ও শিশির দত্তের উপর। মতিলাল চক্রবর্তী কৃষক সমিতির মাধ্যমে সংগঠন পরিচালনার ভার নিলেন। বনপ্রিয় ভট্টাচার্য ও চাপরা গ্রামের যোগেশ চক্রবর্তী সহরে ছাত্র আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আর স্বল্পভাষী শচীন্দ্রনাথ গুহ 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের আড়ালে থেকে সহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। পাটনীকোটা গ্রামের চিত্ত দাশ ও ফণি দাশ ছাত্র আন্দোলনের পুরোধায় এলেন।

১৯৩৮ সালের পর থেকে সরকারী কড়াকড়ি বেশ কিছুটা শিথিল হওয়ার ফলে সংগঠনের কাজকর্মে প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করতে বিশেষ কোন অসুবিধা হল না। ছাত্র আন্দোলন ও যুব-আন্দোলনে আমরা এগিয়ে গেলাম।

এ-সময়ে দলের কার্যকলাপ বহুমুখী হলেও মুখ্যত সংগঠন মাষ্টারদা-অভিমুখীই ছিল। তরুণকর্মী ও ছাত্রদের জন্য জাতীয়তাবাদী বই-পুস্তক কেনা হল। পাঞ্জাব কাহিনী, বাংলায় বিপ্লববাদ, নির্বাসিতের আত্মকথা প্রভৃতি বই তরুণদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। জেল থেকে ফিরে-আসা দাদারা পলিটিক্যাল ক্লাশ পরিচালনা করতেন। প্রতি বছর ১২ই জানুয়ারী ও ১৮ই এপ্রিলে আমরা গোপনে কোথাও-না-কোথাও মিলিত হতাম। খাওয়া-দাওয়া ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন ও সংহতি-সংকল্প ঘোষণা করা হত। স্কুল-কলেজে ইউনিয়নের নির্বাচনে আমরা কমুনিষ্টদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। চট্টগ্রাম সহরে আমাদের রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য নেহাৎ কম ছিল না। আর জাতীয় কংগ্রেসের সাথে আমরা যুক্ত থাকলেও সশস্ত্র বিপ্লবের ভাবনা-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ছিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হল ১৯৩৯ সালে। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকেই যতীন রক্ষিত, শচীন্দ্রনাথ গুহ, বিনোদ চৌধুরী ও মতিলাল চক্রবর্তী প্রমুখ ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে গ্রেপ্তার হলেন। দলের নেতৃত্ব দেওয়ার মত বাইরে তেমন কেউ রইলেন না। ওদিকে আগষ্ট আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সারা ভারত কেঁপে উঠলেও চট্টগ্রাম শান্ত। যুদ্ধ ভারতের দ্বারপ্রান্তে। চট্টগ্রামে

মিত্রবাহিনীর দাপাদাপি ও আরাকানে জাপানী সৈন্যের পদধ্বনি আমাদের বিচলিত করে তুলল। এই তো ইংরাজকে আঘাত করার উপযুক্ত সময়!

দূর থেকে ডাক এল—সংগ্রামের ডাক। সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে টাকা ও কাগজপত্র এল কংগ্রেস সেক্রেটারী বরদা নন্দীর কাছে। বরদাবাবু অহিংস গান্ধীবাদী, আর তাঁর শক্তিসামর্থ্যও অত্যন্ত সীমিত। তিনি যোগাযোগ করলেন হিন্দুমিশনের ছদ্মবেশী বিপ্লবী শিশির দত্তের সঙ্গে।

ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। তাঁরাও এগিয়ে এলেন। চট্টগ্রামের ঐ সামরিক পরিমণ্ডলে গণ-আন্দোলন চালানোর কোন সুযোগ ছিল না। তবে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যটুকু কোনরকমে বজায় রাখার চেষ্টা চলল। নেতৃত্বের পুরোধায় এলেন শিশির দত্ত।

কিছু একটা করতেই হবে। এসময়ে আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না। দলের এক গোপন সভায় সকলে গর্জে উঠলেন।

এবার কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করে ক্যাডার যোগাড় করা আর একটি সঠিক ও নির্ভুল প্ল্যান-অব-অ্যাকশন তৈরী করা। শিশির দত্তের বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর সকলের আস্থা ছিল। আর তিনি সহরের আট-ঘাট জানতেনও ভাল করে।

আমাদের মূলঘাঁটি—সহরের বনপ্রিয় ভট্টাচার্যের বাসাবাড়ি। পাথরঘাটা অঞ্চল। নিষ্প্রদীপ সহরে ঐ জায়গাটা ছিল নিরিবিলি। ছক্ কেটে প্ল্যান-অব্-অ্যাকশন তৈরী করা হল। আক্রমণের আসল লক্ষ্য— খাসমহাল ভবন। কাছারী পাহাড়ের গায়ে টিনের ছাউনি ও বাঁশের বেড়ার ঘর। রাত্রে ৩/৪ জন সশস্ত্র সিপাহী পাহারা দেয়। অবশ্য ওরা ঘুমিয়েই সজাগ থাকে। কাজেই সুযোগ আছে। দেওয়ান বাজার ও রহমতগঞ্জের পোষ্ট অফিসগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হবে—ঠিক হল। গ্রাম থেকে বাছাই বাছাই কর্মীকে সহরে আনা হল। সহরে আছে প্রিয়নাথ ঘোষ ও নন্দু কানুনগো প্রমুখ। কানুনগোপাড়া গ্রামের জ্ঞানেন্দ্র কানুনগো, চিত্ত চৌধুরী, পরেশ বল, নির্মল সিংহ, গোবিন্দ কানুনগো, শশধর চক্রবর্তী ও সুধীর চক্রবর্তী, কোয়েপাড়ার হরিসাধন সেন, ধোরলার বিপিন চক্রবর্তী, গোমদণ্ডীর রাম ও লক্ষ্মণ নামক দু'ভাই সহরের এল। আরো অনেকের নাম স্মরণ করতে পারছি না। তিন-চারটি গ্রুপে কর্মীদের ভাগ করে অ্যাকশনের জায়গায় পাঠান হল।

স্থানের সঙ্গে পরিচিত কর্মীর উপর রইল দায়িত্ব। প্রয়োজনবোধে কাজে লাগতে পারে মনে করে কর্মীদের প্রত্যেককে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হল।

রাত ১২টার পর একই সময়ে অ্যাকশন। আগষ্ট বিপ্লবের ইস্তাহার ছড়িয়ে দেওয়া হল—'বন্দুকের গুলীকে ভয় করিও না।' পোষ্টাফিস আক্রমণ তেমন একটা সফল হল না। অর্ধদগ্ধ পোষ্টাফিসগুলো আক্রমণের ব্যর্থতার সাক্ষী হয়ে রইল। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখায় খাসমহাল পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সরকার টের পেল। শহরবাসীও কিছুটা আঁচ পেল। কিন্তু দেশবাসী জানল না, কে বা কারা একাজ করল।

তারপর আবার গ্রেপ্তার। তবে দলের অ্যাকশননিষ্ঠদের অনেককে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল না। যারা অন্যান্য রাজনৈতিক কাজের পুরোভাগে ছিল তাদের প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হলেন। চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে মীরেশ্বরী থানায় ১৯৩০ সালের বিদ্রোহের আত্মগোপনকারী নেতা বিনোদ দত্তের পরিচালনায় তরুণ বিপ্লবীরা মীরেশ্বরী থানার ভরদ্বাজ হাট, খাসমহাল অফিস ও করের হাট পোষ্ট অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ওদেরও অনেককে নানা ধারায় চট্টগ্রাম জেলে টেনে আনা হল। পুলিসের অভিযানে সুদীর্ঘ বার বৎসরের আত্মগোপনকারী নেতা বিনোদ দত্ত অবশেষে ধরা পড়লেন।

এই সময় নীরব কর্মী সঞ্জীবপ্রসাদ সেন, কবি ইব্রাহিম, কংগ্রেস সম্পাদক বরদা নন্দী, দুর্গাপুরের বীরেন চক্রবর্তী ও শশাঙ্ক ভৌমিক, পোপাদিয়ার ননী ভট্টাচার্য ও নরেন সেন এবং কানুনগোপাড়ার ননী সেন, জ্ঞানেন্দ্র কানুনগো, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ আমরা অনেকেই কারারুদ্ধ হই।

মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টল বিপ্লবের শেষ বহ্নিশিখা সঞ্জীব চক্রবর্তী, পরেশ বল, হরিদাস চক্রবর্তী, নির্মল সিংহ, শশধর চক্রবর্তী ও সুধীর চক্রবর্তী প্রমুখ মুষ্টিমেয় তরুণের হাতে তুলে দিয়ে দলের বাকী কর্মীরা আবার কারাবাসের অন্তরালে চলে গেলেন।......

বিপ্লবীদের বিপ্লব-সাধনা সফল হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। স্বাধীনতার আলোকে অপসারিত হল পরাধীনতার অন্ধকার।

'নমস্কার করি, অভিনন্দিত করি'

[চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহ (১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০) সম্পর্কে যুগান্তর বিপ্লবী দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র "স্বাধীনতা"র ২৪শে এপ্রিলের (১৯৩০) সংখ্যায় 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিভাগে প্রকাশিত মন্তব্য ও 'ধন্য চট্টগ্রাম' শীর্ষক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পর-পর মুদ্রিত হল।—সম্পাদক।]

বাংলার সুদূর প্রান্তে চট্টগ্রামে বিপ্লবী বাংলা বিদ্রোহ বিস্ফোরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শতাব্দী ব্যাপিয়া ইংরেজ জাতির নির্মম অত্যাচারের ফলে ভারতের বিদ্রোহী আত্মা বিভিন্ন স্থানে সরকারকে একাধিকবার আঘাত হানিয়াছিল; কিন্তু চট্টগ্রামের মত এরূপ সফলতা আর কোথাও দেখা দেয় নাই।

বিদ্রোহী বাংলার এই যুদ্ধাভিযান স্মরণ করিয়া জাতির মস্তক আজ শ্রদ্ধায় নমিত হইয়াছে; আশা উৎসাহ ও আনন্দগৌরবে বুক ফুলিয়া উঠিয়াছে—যুগ যুগ ধরিয়া নিষ্পেষিত জাতির প্রতিশোধ-স্পৃহা ও মর্মের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা আজ আবার এই কয়টি বিদ্রোহী তরুণের মধ্য দিয়া রূপ নিয়াছে যে!

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে, স্বার্থসর্বস্ব এই ইংরেজ জাতিরই বর্বরোচিত নির্যাতনে বহু শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত হইয়া আর একটি স্বাধীনতালাভেচ্ছু জাতি ইংরেজ জাতির শিরে এমনি বিদ্রোহের বজ্র আঘাত হানিয়াছিল,—মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে—আয়ার্লণ্ডে, ঠিক এমনি ইষ্টারের ছুটির দিনে—এমনি শুক্রবারেই। ইষ্টার বিদ্রোহ [Easter Rising] নামে এই বিদ্রোহ জগতের ইতিহাসে রক্তোজ্জ্বল রহিয়াছে। সেই দিন হইতে আয়ার্লণ্ডের বিপ্লবীরা ঘরে বাইরে ইংরেজকে এমনি ভীষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, অনতিবিলম্বেই ইংরেজকে তার পক্ষে একমাত্র কার্যকরী যুক্তি 'গুঁতোর যুক্তি' মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল।

বাংলার তথা ভারতের বিদ্রোহী আত্মা আজ সেই অনাগত দিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিয়া তুলিবার সাধনায় লিপ্ত আছে। নমস্কার করি, অভিনন্দিত করি, বাংলার এই বিদ্রোহী সন্তানদের—যারা জাতিকে আজ এমনি মরিয়া হইয়া বিপ্লবের রক্তপথে আগাইয়া চলার ও সফলতার প্রেরণার ইঙ্গিত দিয়া গেল।

ধন্য চট্টগ্রাম

ধন্য চট্টগ্রাম !

আজ বহু বৎসরের সাধনার পর বাঙ্গালীকে সার্থকতার মুখ দেখাইলে ! ভীরু বলিবে, কী সর্ব্বনাশ ; আত্মসম্মানজ্ঞানহীন বলিবে, এ কি অন্যায় ; কাণ্ডজ্ঞানহীন বলিবে, কি আর হ'ল ; হিসাবী বলিবে, সুদূর চট্টগ্রামে না হইয়া কলিকাতা নগরীতে হওয়া উচিত ছিল, অথবা কয়েকস্থলে একই সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল ; বুদ্ধিমান বলিবে, গান্ধী-আন্দোলনকে আর খুব অল্প দিনের মধ্যেই যখন বিদেশী বর্ব্বর নিষ্পেষণে নিঃশেষ করিয়া আনিবে, তখনই এই ন্যায়ের দণ্ডের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। ভীরু, আত্মসম্মানবিবর্জ্জিত, কাণ্ডজ্ঞানহীনের কথার কোন জবাব নাই। হিসাবী আর বুদ্ধিমানকে বুঝিতে যুগ যুগের নির্য্যাতিত মানবের বিপ্লবী আত্মার দীর্ঘ শ্বসন যখন ন্যায়ের দণ্ডের আকারে নামিয়া আসে, তখন সে কোন হিসাব আর প্রয়োজন মানিয়া আসে না। দৈনন্দিন কাজের গ্রহনক্ষত্রের আনাগোনার মাঝখানে বিপ্লবের হিসাবকিতাবহীন ধূমকেতুর গতি,—সে আসে সকল হিসাব ভাঙ্গিয়া, অন্ধ, মূঢ় প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া, গ্রহনক্ষত্রের গতি আর প্রগতির নিয়মশৃঙ্খলাকে ওলটপালট করিয়া দিয়া। ওলটপালটই তাহার হিসাব, আঁকাচুরাই তাহার বুদ্ধি। বিপ্লব প্রকৃতির মতই দুর্ব্বার আর প্রকৃতির মতই তাহার মঙ্গলরূপ সহস্র অমঙ্গল, আশঙ্কা, নির্য্যাতন, ক্লেশের আবরণে আচ্ছাদিত।

জাতির স্বাধিকার লাভের চেষ্টা আপাতদৃষ্টির হিসাব আর কল্যাণকে বাঁচাইয়াই সুরু হইয়াছিল। কিন্তু স্বার্থান্ধ কাপুরুষ উন্মত্তের মত নিরপরাধ নিরস্ত্রের উপর নির্ম্মমভাবে লাঠি ও গুলি চালাইয়া দেখাইল, পরের দাসত্বকেই উপজীবিকা করিয়া যে সব বর্ব্বরের জাত আজ দুনিয়ায় প্রভুত্ব করিতেছে, তাহাদের ক্রূর চেষ্টার সম্মুখে জগতে অখণ্ড শান্তিপ্রতিষ্ঠাকামীর দিন আজও সুদূরে। শতাব্দীর দাসত্বের অপমানে গঞ্জনায় জাতীয় চিত্তের মাঝে যে বিস্ফোরকের পাহাড় সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, কলিকাতায়, কালিকাপুরে, নীলাক্ষ নিরপরাধের নির্য্যাতনে তাহাতে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইল—ভবানীপুরে আগুন জ্বলিয়া গেল, চট্টগ্রামে অগ্ন্যুৎপাত হইল।

ধন্য চট্টগ্রাম, তুমি কেবল জাতিকে সার্থকতার মুখ দেখাও নাই, কেবল জাতির লাঞ্ছিত আত্মসম্মানকে বাঁচাও নাই, তুমি জাতির বিপ্লবী প্রাণকে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাপকতার আদর্শের সহিত পরিচিত করাইয়াছ। জাতির লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তর দিতে শিখাইয়াছিলেন ক্ষুদিরাম, জাতির কলঙ্ক ঘুচাইয়াছিলেন কানাইলাল, জাতির ভিতরে যে মনুষ্যত্ব জাগিতেছে, ব্যক্তিগতভাবে সত্যেন, বীরেন, খিংড়া প্রভৃতি তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন বিপ্লব অঙ্কের সুরুতেই। বাঙ্গালী কাপুরুষ, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে জানে না—এই অপবাদ ঘুচাইয়া দুইজন লইয়া হউক, পাঁচজন লইয়া হউক যুদ্ধোদ্যমের আদর্শ বাঙ্গালীকে প্রথম দেখাইয়াছিলেন যতীন্দ্রনাথ। যুদ্ধের সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু আঘাত করিবার পূর্ব্বেই পরাধীন জাতির অগণিত বাধায় ব্যাহত হইয়া যুদ্ধের ও যোদ্ধার আদর্শ বাঙ্গালী জাতিকে শিখাইয়া অসম্পূর্ণ কার্য্যের ভার দেশবাসীর উপর সমর্পণ করিয়া তিনি অমরলোকে চলিয়া যান। চট্টগ্রাম তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্যে প্রথম হাত দিয়াছে। আক্রমণ করা, একটা সহরে, একটা বা পাঁচটা জেলায় শত্রুর গতায়াত ও সংবাদ আদানপ্রদানে বাধা জন্মাইয়া বিদেশী শাসকের একাধিক কেন্দ্রকে একই কালে আক্রমণ করা, লুণ্ঠন করা, অধিকার করা—বিপ্লবের ক্রমবর্দ্ধমান এই আদর্শের সূচনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে চট্টগ্রামে। জানি, দুইটি ইংরেজের রক্তের প্রতিশোধ হইবে বহু স্বদেশপ্রেমিকের, বহুতর নিরপরাধের রক্তপাতে। কিন্তু এই ত চাই, নির্য্যাতনের পরে নির্য্যাতনে অধিকতর মানুষ জাগুক, স্বাধীনতার উদ্যমের ব্যাপকতর আদর্শ সফল হউক। একটা জাতির দাসত্বের কলঙ্ক মুছিবার প্রয়াসে রক্তপাতের হিসাবে মূঢ় জাতিকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়া লাভ কি?

বিদেশী শাসক আবার বিনাবিচারে বন্দী করিবার আইন পাশ করিয়াছে। জাতির বড় আদরের সুরেন্দ্রমোহন, বিপিনবিহারী, অরুণচন্দ্র, প্রতুলচন্দ্রকে এবং আরও বহু দেশপ্রাণ কর্ম্মীকে বিদেশী শাসক জাতির বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। এ বেশ হইয়াছে, এই ত চাই, ইহাদের অপরাধ কি, প্রশ্ন করিব না। বিদেশীর হস্তে চির-নির্য্যাতিত, আর বিদেশীর প্ররোচনায় স্বদেশীয়ের দ্বারা লাঞ্ছিত এই সব অমূল্য জীবনের এই ত সার্থকতা। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত আদর্শকে মানুষের অসহ্য নির্য্যাতন সত্বেও শত হতাশা নৈরাশ্যের আঁধার দুর্য্যোগের ভিতর দিয়াও মায়ের

অধিক আদরে যত্নে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ইহারা সেই ক্ষুদিরামের যতীন্দ্রনাথের দিন হইতে চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের দিনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এখানেই ইহাদের জীবনের সার্থকতা! আজ চট্টগ্রামের প্রদর্শিত পথে ব্যাপকতর আদর্শের জীবনে নূতন কর্মীদল বাহির হইয়া আসুক—জেলার পরে জেলায় বিদেশী শাসকের ক্ষমতার অভিমান আর মোহ ধূলিসাৎ হউক, জয় হইতে জয়ের অভিযানে জাতি মত্ত হইয়া উঠুক, সাফল্য হইতে সাফল্যের পানে ছুটিয়া জাতির আত্ম-অবিশ্বাস দূর হইয়া থাক, অগণিত ভবিষ্যদ্বংশীয়ের কৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধাভিনন্দন জাতির যুবকদের উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলুক! স্তরের পর স্তর আঁধার কাটিয়া গিয়া পূর্ব দিগন্তে উষার আলো দেখা দিতেছে। আর দেরী নাই।*

---

* স্বাধীনতা, ২৪শে এপ্রিল ১৯৩০

The most beautiful spot in the whole of undivided India where nature in her unstinted bounty has lavished her best treasures—the pleasing fields, evergreen forests on hills and hillocks running everlastingly, silently flowing streams coursing for the restless sea stretching in the vast expanse nearby,—became the centre of the most heroic deed unparalleled in the history of revolutionary actions in India and elsewhere.

Kalicharan Ghosh

জালালাবাদের মুক্তিযুদ্ধ

গণেশ ঘোষ

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বিদ্রোহীদের অতর্কিত প্রচণ্ড আক্রমণে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন মুহূর্তেই ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীরা শহরের দুইটি প্রধান অস্ত্রাগারই দখল করে নিয়েছে,—একটি টিলার উপরে পুলিশের অস্ত্রাগার এবং অপরটি অকজিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্রাগার। অমনি অকস্মাৎ আক্রমণে চট্টগ্রামের যোগাযোগ কেন্দ্র, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ভবনও বিদ্রোহীরা দখল করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। চট্টগ্রামের সাথে বাইরের রেল-সংযোগও বিদ্রোহীরা ভেঙে চুরে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাবমুক্ত স্বাধীন চট্টগ্রামে বিদ্রোহীরা তাদের সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সাময়িক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে।

চট্টগ্রামে এখন আর বিদেশী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব অথবা নিয়ন্ত্রণ নেই; চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা এখন দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীদের হাতে।

কিন্তু বিদ্রোহীদের একথা আদৌ অজ্ঞাত ছিল না যে এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলবে না এবং কিছুতেই চলতে পারে না। আগামী ৪৮ ঘণ্টা, ৭২ ঘণ্টা, কিম্বা ৯৬ ঘণ্টা অথবা আর স্বল্প কিছু কালের মধ্যেই বাইরে থেকে নানা পথে এবং নানা ভাবে চট্টগ্রামে প্রভূত পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ আসবেই; বিদ্রোহী শক্তির সাথে তাদের একটা বোঝাপড়া অর্থাৎ শক্তিপরীক্ষা হবেই; সমগ্র বিদ্রোহীশক্তিকে তারা সম্পূর্ণভাবে এবং নিঃশেষে ধ্বংশ করবার চেষ্টা করবেই; বিদ্রোহের প্রতিশোধ হিসাবে চট্টগ্রামে অমানুষিক নিষ্ঠুর নিপীড়ন করে সাম্রাজ্যবাদ ভারতের যুবশক্তির কাছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের সকল সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের কাছে, একটি সতর্কতার উদাহরণ নিশ্চয়ই স্থাপন করতে চাইবে।

তাই বিদ্রোহীদের পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল, সশস্ত্র বিদ্রোহের পর সাম্রাজ্যবাদের সাথে ওই অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে সাম্রাজ্যবাদের ফৌজের সাথে সামনাসামনি বোঝাপড়ার চেষ্টা করতে হবে এবং সেই প্রত্যক্ষ সংঘাতে প্রাণ দিতে হবে।

ভারতবর্ষে তৃতীয় দশকের (১৯২০-৩০) শেষ ভাগের পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক উত্তপ্ত . জনগণের ব্যাপকতম অংশ উত্তরোত্তর অধিকমাত্রায় অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সমগ্র জনগণের দাবী ছিল অবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করা হোক্; আর বিলম্ব করা চলবে না। জনগণের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সাইমন কমিশন নিয়োগ করে উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় জনগণের প্রতি চরম অপমান প্রদর্শন করে এবং সমগ্র দেশবাসী কর্তৃক বর্জিত এই সাইমন কমিশনের সংস্পর্শে ভারতের অন্যতম সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা পাঞ্জাবকেশরী লালা লজপত রায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে যেন দাবাগ্নি সৃষ্টি করে দিল।

ভারতীয় পরিস্থিতির এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তাদের বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল অপ্রত্যাশিত অকস্মাৎ আক্রমণে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনযন্ত্র বিকল করে দেওয়া এবং স্বল্পদিনের জন্য হোলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে একটি বিকল্প স্বাধীন বিপ্লবী সাময়িক সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা ও ঐ সরকারের রক্ষার জন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীর প্রাণপণ করে সংগ্রাম করে যাওয়া ও শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন করে দেওয়া। ঐ বিকল্প সাময়িক বিপ্লবী সরকার শেষ পর্যন্ত কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না—এ কথা বিদ্রোহীরা সঠিকভাবে জানতেন এবং বুঝতেন। তাই সেই সরকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়ার অর্থ সুনিশ্চিত ও অবধারিত মৃত্যু—এ কথাও তাঁরা খুব ভাল করেই জানতেন এবং সেই ভাবে নিজেদের প্রস্তুত করেছিলেন। মৃত্যুই ছিল সুনিশ্চিত লক্ষ্য; সেই জন্য চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি অর্জনের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন এক কথায় তাকে তাঁরা বলতেন 'মৃত্যুর কর্মসূচী' (Programme of death)।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং মৃত্যুর কর্মসূচী নিয়েছিলেন ঐ সময়ে এবং ভারতবর্ষের ঐ পরিস্থিতিতে এই উদ্দেশ্যে যে দেশের জনগণের কাছে শুধু মাত্র একটি সম্ভাব্য এবং অর্জনীয় আদর্শ স্থাপন করবার জন্য। একটি স্থান

সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হোলেই সমগ্র ভারতবর্ষ মুক্ত হয়ে যায় না সত্য ; কিন্তু একটি স্থানের বীরত্বপূর্ণ একটি ঘটনা দেশের সমগ্র যুবশক্তিকে না হোলেও যুবশক্তির একটি বড় অংশকে ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণে অনুপ্রাণিত করবে ; বিদ্রোহের ঐ পথ গ্রহণে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করবে। এই ছিল বিপ্লবীদের আশা।

অস্ত্রাগার দখল করে বিদ্রোহীরা পেয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে মাস্কেট রাইফেল এবং তার গুলি। মাস্কেট রাইফেল অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ফৌজী রাইফেলের ('৩০৩ রাইফেল) গুলি বিদ্রোহীরা পান নি ; তাই বহু পরিমাণে ফৌজী রাইফেল পেলেও সেগুলি বিদ্রোহীদের কোন কাজে লাগে নি।

আসন্ন আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের কাছে থাকবে ফৌজী রাইফেল এবং মেশিনগান। বিদ্রোহীবাহিনীর হাতে আছে কেবলমাত্র মাস্কেট রাইফেল। এই নিকৃষ্ট ধরণের অস্ত্র নিয়েও সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের বিরুদ্ধে কিছু পরিমাণে দৃঢ় প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে যদি আসন্ন সংঘর্ষের সময় কোন একটি উঁচু পাহাড়ের উপর বিদ্রোহীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই কথা বিবেচনা করেই বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন পাহাড়ের উপর ঘাঁটি করে বসেছিলেন।

সেদিন জালালাবাদ পাহাড়ে। দিন ২২শে এপ্রিল। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার পর চতুর্থ দিন। সময় বৈশাখ মাস। দিনের বেলা অসহ্য গরম। জালালাবাদ পাহাড়ে বড় গাছ নেই, তাই ছায়াও নেই। ছোট ছোট লতা গুল্ম ছায়াও দিতে পারে না, সূর্যের তাপও হ্রাস করতে পারে না। সকাল বেলা আটটা নয়টার মধ্যেই সকলের জলপাত্রের জল প্রায় সবটুকুই ফুরিয়ে যায় ; তারপরই আরম্ভ হয় অবর্ণনীয় কষ্ট। যতই দিন বাড়তে থাকে অবস্থা সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। রোদের গরমে টিনের জলপাত্র এবং মাস্কেট রাইফেল এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে হাত ঠেকানো যায় না, মনে হয় ফোস্কা পড়ে যাবে। অসহনীয় তৃষ্ণায় বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে, মুখের লালা শুকিয়ে যায়, জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, কথা বলাই যায় না। অজান্তে কারও কারও হাত শূন্য জলপাত্র তুলে মুখে নিয়ে যায় ; অত্যুপ্ত টিনের পাত্র ওষ্ঠ স্পর্শ করলেই সম্বিত ফিরে আসে। গত কাল দুপুর বেলা একজন অসহ্য তৃষ্ণায় থাকতে না পেরে রাইফেল পরিষ্কার করবার খানিকটা তেল গলায় ঢেলে দিয়েছিল। দিন মনে হয় অস্বাভাবিক দীর্ঘ। কখন যে সূর্য অস্ত যাবে, সন্ধ্যা আসবে ! সূর্য যে এক সময়ে সত্যিই অস্ত যায়, সন্ধ্যা হে-

যথার্থই আসে, গরম যে বাস্তবিকই কমে যায় এবং রাত্রিকালে ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ লাগে—একথা দিনের বেলা ঐ অবস্থায় অনেকেরই বিশ্বাস হয় না।

আজ তিন দিন ধরে দিনের বেলা এই অবস্থাই চলছে। দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে বেশীর ভাগ যুবকই নিশ্চল অনড হয়ে পড়ে থাকে। দেখে মনে হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত অসহ্য তৃষ্ণায় এবং অসহনীয় গরমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। শুধু অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে থাকে পাহাড়ের উপরের চারদিকের প্রহরীরা। দুপুরের পর অত্যধিক গরমে যখন হাওয়া অতিশয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন দূরে নীচে মরীচিকার মত দেখা যায়। চোখের উপর হাত রেখে ভ্রু কুঁচকে দৃষ্টি প্রখর করে প্রহরীরা এক দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যদি অকস্মাৎ অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়। এমনি করে দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা সতর্ক থাকতে হয়। এইটুকু সময়ের জন্য মনে হয় তাদের তৃষ্ণা বা গ্রীষ্ম বোধ থাকে না।

সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনায় সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা সূর্য সেন বিপ্লবীবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব লোকনাথ বলের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন।

সেদিন ২২শে এপ্রিল।

দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গিয়েছে। সমগ্র পাহাড়টি নীরব নিস্তব্ধ। পাহাড়ের উপরে প্রায় সবটা যায়গায় দুইজন তিনজন করে, বেশীর ভাগ যায়গায় একা একা সশস্ত্র বিপ্লবী যুবকেরা ছড়িয়ে পড়ে আছে। হয়ত বা এখানে ওখানে দুই একজন অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলছে; এত নিম্নস্বর যে ঠিক পাশেই সব কথা শোনা যাচ্ছিল না। কারণ, প্রধানতঃ শুষ্ক মুখে শুষ্ক জিহ্বার আড়ষ্টতা।

তখন অপরাহ্ণ প্রায় চারটা। পাহাড়ের উপরের প্রহরীরা এবং আরও অনেকে দেখতে পেল কিছু দূরের ঐ রেল লাইনের উপর দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে শহরের দিক থেকে একখানা ট্রেন এলো। ট্রেনটি কিন্তু সোজা চলে গেল না, ঐ দূরে একটি যায়গায় গিয়ে থেমে গেল। যে যায়গায় ট্রেনটি থামল সেই যায়গাটি পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় না, যায়গাটি ঘন ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের আড়ালে। যায়গাটি কিন্তু একটি রেল ষ্টেশন নয়। ঐ অস্বাভাবিক যায়গায় ট্রেনটিকে থামতে দেখে পাহাড়ের উপর প্রায় সকলেরই মনে হোল ঐ ট্রেনটি একটি সৈন্যবাহী ট্রেন, শহর থেকে বহু সৈন্য নিয়ে এসেছে।

পাহাড়ের উপরের বিদ্রোহী সেনারা স্পষ্ট বুঝতে পারল এত দিন যার জন্য এত কষ্টের মধ্যেও অপেক্ষা করা হয়েছে আজ সেই বহু প্রত্যাশিত আক্রমণ আসন্ন হয়ে এসেছে। মাষ্টারদা আবার লোকনাথ বলকে ডেকে আদেশ দিলেন, সমগ্র বিপ্লবীবাহিনীকে পরিচালিত করে আসন্ন আক্রমণ পরাভূত করবার জন্য প্রস্তুত হোতে। লোকনাথ বল বিদ্রোহী সৈনিকদের সম্বোধন করে অনুচ্চ কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন, সকলেই যেন আসন্ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। লোকনাথ বল আরও বললেন, দেশের স্বাধীনতার জন্যে আসন্ন যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া বড় কথা নয়; সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদের আসন্ন আক্রমণ প্রতিহত করা; সাম্রাজ্যবাদী ফৌজকে পরাজিত করা, দেশপ্রেমের আদর্শ সমুজ্জল রাখা এবং এই দায়িত্ব পালনের পথে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকা। লোকনাথ বল বিশেষ জোর দিয়ে আরও বললেন, তাঁর দ্বিতীয় আদেশের পূর্বে কেউ যেন নিজের রাইফেল থেকে একটি গুলিও না নিক্ষেপ করে। সকলেই রাইফেলে গুলি ভর্তি করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণতে আরম্ভ করল।

উপর থেকে দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের ৪।৫ জনের কিম্বা ২।৩ জনের ছোট ছোট এক একটি দল হঠাৎ এক ঝোপের আড়াল থেকে অতি দ্রুত ছুটে গিয়ে অপর একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে এবং এমনি করে বহু সংখ্যক ফৌজী সেপাই নীচে থেকে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠে আসছে। উপরের বিপ্লবী সৈন্যরা ক্রমশঃই অধৈর্য হয়ে উঠছে; কিন্তু সেনাপতির আদেশ না পেলে গুলি নিক্ষেপ করবার উপায় নেই। সকলেই অপরিসীম আগ্রহে এবং অস্থির ব্যাকুল অন্তরে সেনাপতির দ্বিতীয় আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।

অল্প কয়েক মুহূর্ত পরেই, অন্যদের কাছে মনে হচ্ছিল যেন একযুগ, যখন সেনাপতি লোকনাথ বল নিশ্চিত হলেন যে শত্রুদের আর উপরে উঠতে দেওয়া নিরাপদ নয় তখন তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে সেনাপতির আদেশ শোনা গেল—"হল্ট"। এবং এক মুহূর্ত পরেই সেই অতি প্রত্যাশিত নির্দেশ—"ফায়ার"। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৬০ জন অধীর বিপ্লবী যুবকের হাতের রাইফেল এক সাথে গর্জন করে উঠল এবং অদূরবর্তী নীচু ঢালু অংশে সুনিশ্চিত মৃত্যুর অমোঘ পরোয়ানা ছড়িয়ে দিল।

যারা নীচে থেকে অতি নিঃশব্দে উপরে উঠে আসছিল এবং আশা করছিল চুপে চুপে উপরে উঠে এসে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত বেয়নেট আক্রমণে উপরের

অপদার্থ সমগ্র বিদ্রোহীবাহিনীকে শুধু ছত্রভঙ্গ করেই ফেলবে না, তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে নতুবা তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলবে, তারাই উপর থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। এবং অবস্থা বুঝতে পারার আগেই তাদের মধ্যে অনেকে প্রাণ হারিয়ে, অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে গেল। তাদের অবস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়েছে, ঐ স্থানে আর তাদের নিজেদের গোপনে অথবা আড়ালে রাখা সম্ভব হবে না, এবং পাহাড়ের ঐ ঢালু গায়ে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে আশ্রয় পাওয়ার কোন রূপ সম্ভাবনা নেই এবং উপর থেকে ঐ গুলিবর্ষণের মধ্যে পাহাড়ের ঐ প্রায় খাড়াই অংশটুকু কিছুতেই খুব দ্রুত উঠে যাওয়া সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ মুহূর্তে পেছন দিকে ফিরে ছুটে নীচে নেমে যেতে আরম্ভ করল। সেই সময়ে আরও অনেকে প্রাণ হারিয়ে গড়িয়ে পড়ল, আরও অনেকে গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেল। অনেকের পা গেল, অনেকের হাত গেল; বাকী সকলে ছুটে গিয়ে নীচে অদূরবর্তী একটি শুষ্ক নালার মধ্যে আশ্রয় নিল। এই নালার ভিতরের অংশ পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় না; এ পাশের একটি উঁচু ঢিবি এবং ঘন বনজঙ্গল ঐ নালাটিকে উপরের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে।

উপরে বিদ্রোহীবাহিনীর প্রত্যেকটি যুবকই যতদ্রুত সম্ভব এবং যত বেশী সম্ভব গুলিবর্ষণ করে চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে "বন্দেমাতরম্" "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক" প্রভৃতি রণধ্বনি চিৎকার করে চলেছে।

এদিকে উপরে উঠতে ব্যর্থ এবং অসমর্থ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের সেপাইরা প্রাণভয়ে নীচে নালার মধ্যে জড় হবার পর ফৌজের অফিসার কর্তৃক তারা প্রচণ্ডভাবে ভর্ৎসিত হয়। অফিসারেরা তাদের ভীরু কাপুরুষ অপদার্থ প্রভৃতি গালাগালি দিয়ে পুনরায় আদেশ দেয়, প্রত্যেকেই যেন নিজের নিজের রাইফেলে বেয়নেট লাগিয়ে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে ছুটে উপরে উঠবার চেষ্টা করে। অফিসারেরা এই বলে সেপাইমনে সাহস এনে দেবার চেষ্টা করল যে অতগুলি সাহসী সৈন্যের হাতে পড়ন্ত রোদে ঝক্ ঝক্ করা বেয়নেট দেখেই উপরের "বাঙালী লেড়কা লোগ" ভয়েই আত্মসমর্পণ করবে, তাদের হাতে আর রাইফেল চলবে না।

অফিসারদের এই সব কথায় সেপাইদের মনে কতখানি বিশ্বাস এবং

সাহস এসেছিল সে কথা জানা যায় নি, কিন্তু পুনরায় আক্রমণের আদেশ পেয়ে সেপাইরা ঐ অসম্ভব কাজে আবার এগিয়ে আসতে বাধ্য হোল।

এবারও সেনাপতির নির্দেশে দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীবাহিনী প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকারে সমগ্র জালালাবাদ পাহাড় প্রকম্পিত করে তোলে।

অসম্ভব! ঐ গুলিবর্ষণের মুখে সেপাইদের পক্ষে এক পাও অগ্রসর হয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হোল না; আগের বার তারা যতটুকু উঠতে পেরেছিল, এবার ততটুকুও তারা এগিয়ে যেতে পারে নি। পূর্বাপেক্ষা আরও অল্প সময়ের মধ্যেই হতাহতের সংখ্যা এবার আরও বেশী হোল।

মুহূর্তে সেপাইরা পেছন ফিরে আবার জোর দৌড়ে নীচের সেই শুষ্ক নালার মধ্যে গিয়ে জড় হোল। পাহাড়ের উপরে তখন প্রচণ্ডভাবে গুলিবর্ষণের সাথে অবিশ্রাম প্রচণ্ড চিৎকারে বিপ্লবের জয় ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংশ কামনা করা হচ্ছিল ও যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের পরাজয় ঘোষণা করা হচ্ছিল।

এবার সামরিক অফিসারেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল যে ঐভাবে বিদ্রোহীবাহিনীর ঐ প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মুখে কিছুতেই পাহাড়ে ওঠা সম্ভব হবে না এবং "বাঙালী লেড়কা লোগকো!" ভয় দেখিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যাবে না। তখন যে কয়জন অফিসার ওখানে উপস্থিত ছিল পরামর্শ করে স্থির করল জালালাবাদ পাহাড়ের দুই দিকের দুইটি উঁচু পাহাড়ে মেশিন গান বসিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের উপরে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করে বিদ্রোহীদের ধ্বংশ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুইটি মেশিন গান গ্রুপ জালালাবাদ পাহাড়ের দুই দিকে চলে গেল।

এদিকে দ্বিতীয়বার আক্রমণের চেষ্টার পর বেশ কিছু সময় কেটে গেছে। বিদ্রোহীবাহিনীর নেতারা বুঝতে পারছেন না, এবার আক্রমণ কি ভাবে এবং কোন দিক থেকে আসবে। পাহাড়ের উপরের প্রত্যেকটি সৈন্য এবং নেতৃবৃন্দ অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে রইলেন। সেনাপতি আজ্ঞা দিলেন, কেউই যেন অনর্থক রাইফেলের গুলির অপব্যবহার না করে।

নিস্তব্ধতা এবং অনিশ্চয়তা বেশীক্ষণ রইল না। অকস্মাৎ অদূরবর্তী দুইটি পাহাড়ের উপর থেকে মেশিন গানের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ আরম্ভ হোল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী বাহিনীর যুবকেরাও প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করে এবং সাথে

সাথে গগনবিদারী রণধ্বনি চিৎকার করে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের নতুন আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করল। যে দুইটি পাহাড় থেকে মেশিন গানের গুলি আসছিল সেই দুইটি পাহাড়ে মাস্কেট রাইফেলের গুলি পৌঁছায় না, অথচ সেখান থেকে মেশিন গানের গুলি এসে মারাত্মকভাবে এই পাহাড়ে পড়ছিল।

তখন সূর্য ঠিক অস্ত যাচ্ছে।

(দুই পক্ষ থেকেই প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ চলছে। বিদ্রোহীদের পক্ষে একটি বিপদ দেখা দিল। কয়েকটি গুলি বর্ষণের পরেই ধোঁওয়া এবং কালিতে মাস্কেট রাইফেল অচল হয়ে পড়ছিল। নির্মলদা পাহাড়ের এক কোণে বসে ঐ সব অচল রাইফেল পরিষ্কার করে, তেল দিয়ে পুনরায় চালু করে দিচ্ছিলেন। এবং সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা গড়িয়ে গড়িয়ে এবং বুকে হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন যুবকদের কাছ থেকে তাদের অচল রাইফেল এনে নির্মলদার কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন এবং পরে আবার সেগুলি যথাস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। এর ফলে বিদ্রোহীবাহিনীর গুলিবর্ষণের পরিমাণ এবং প্রচণ্ডতা কোন সময়েই হ্রাস পায় নি।)

কিন্তু দুইদিক থেকে, মেশিন গানের গুলি আসার ফলে জালালাবাদ পাহাড়ের উপর বিপর্যয় আরম্ভ হোল। প্রথমেই দুরন্ত চঞ্চল অসম সাহসী বে-পরোয়া বিদ্রোহী বালক টেগ্‌রার (হরিগোপাল বল) বুকে গুলি লাগে এবং টেগ্‌রা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই টেগ্‌রাকে অনুসরণ করে শহীদের মৃত্যু বরণ করে অমরত্ব লাভ করেন ত্রিপুরা সেন, নির্মল লালা, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত, মধুসূদন দত্ত, প্রভাস বল, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, জিতেন দাশগুপ্ত, মতি কানুনগো এবং অর্ধেন্দু দস্তিদার। এঁদের মধ্যে মতি কানুনগো এবং অর্ধেন্দু দস্তিদার আরও কয়েকঘণ্টা বেঁচে ছিলেন। অম্বিকাদা, বিনোদ দত্ত এবং বিনোদ চৌধুরীও গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা জালালাবাদ পাহাড় পরিত্যাগ করে সেই রাত্রেই চলে যেতে পেরেছিলেন। এই তিন জনের মধ্যে শেষোক্ত দুই জন সেই মুক্তিযুদ্ধের গৌরব বহন করে আজও আমাদের মধ্যে আছেন।

দুইটি মেশিনগান থেকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে কয়েক সহস্র রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করেও জালালাবাদ পাহাড়ের মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী "বাঙালী লেড়কার"

রাইফেল স্তব্ধ করা সম্ভব হোল না। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘিরে আসছে। কি হবে? যদি বে-পরোয়া বিদ্রোহী যুবকেরা সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি এসে এই দুইটি মেশিনগানের ছোট পাহাড় ঘিরে ফেলে দেয় তাহলে কি হবে?

আর ইতস্ততঃ না করে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ তখনিই যথাসম্ভব দ্রুত পদক্ষেপে গিয়ে অপেক্ষমান ট্রেনে উঠে শহরের নিরাপত্তায় ফিরে যায় এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের অফিসারদের হিসাবে, অভিজ্ঞতায় এবং জ্ঞানে গুরুতর ভুল ছিল। তারা বেতনভুক সৈন্য পরিচালনা করে অভ্যস্ত। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিকামী একজন দেশভক্ত তরুণ দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে কত সহজে মৃত্যুকে অবজ্ঞা করতে পারে এবং জাতীয় মুক্তির জন্য কি করতে পারে সে ধারণা তাদের কোথা থেকে আসবে? তাই তো সেদিন তাদের ঐ শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। (মুষ্টিমেয় দেশভক্ত তরুণ বিদ্রোহীদের ভয়ে সেদিন বহু সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদী ফৌজকে স্পর্ধিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতাকা গুটিয়ে নিয়ে পলায়ন করে চলে যেতে হয়েছিল।) বিচারের সময় এ কথা তো তারা শত চেষ্টা করেও অস্বীকার করতে পারে নি।

এক সময়ে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ বন্ধ হোল। বিদ্রোহীদের গুলিবর্ষণ কিন্তু অব্যাহত রইল,—অবশ্য একতরফা ভাবে। ক্রমে ক্রমে তাও কমে এসে এক সময়ে বন্ধ হয়ে গেল এবং সমগ্র পাহাড়ে আবার নীরবতা নেমে এলো।

সমগ্র জালালাবাদ পাহাড় তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং নীরব নিস্তব্ধ।

বিদ্রোহী সৈন্যেরা শুনতে পেল ঐ দূর দিয়ে সেই ট্রেনখানি তীব্র স্বরে বাঁশী বাজিয়ে অন্ধকারের মধ্যে শহর অভিমুখে চলে গেল।

সেদিন (২২শে এপ্রিল ১৯৩০ সাল।

মাষ্টারদার নির্দেশে এবং বিদ্রোহীবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ লোকনাথ বলের আদেশে সমগ্র বিপ্লবীবাহিনী সমবেত হয়ে শহীদ সাথীদের প্রতি শেষ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।)

তারপর দুইভাগে ভাগ হয়ে বিদ্রোহী তরুণেরা জালালাবাদ পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে নেমে নীচে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যায়।

———

যুববিদ্রোহের জ্বলন্ত স্মৃতি

অনন্ত সিংহ

[মাষ্টারদা [সূর্য সেন] আমাদের বিপ্লবী সমিতির প্রেসিডেন্ট।......চট্টগ্রাম শহর আকস্মিকভাবে দখল করে সাময়িক বিপ্লবী সরকার গঠন করার পরিকল্পনার প্ল্যানটি মাষ্টারদা অনুমোদন করলেন। আমাদের লোকবল ও অস্ত্রবল নিয়ে সীমিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনাটি সফল করবার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হল। স্থির হল—১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ রাতের অন্ধকারে ঝটিকাবেগে অতর্কিত আক্রমণে সমস্ত অস্ত্রাগার দখল করা হবে। অস্ত্রাগার আক্রমণের পাঁচ মিনিট আগে টেলিফোন-আবাসটি ধ্বংস করা হবে। শহরের বন্দুকের দোকানগুলি করায়ত্ত করা হবে। টেলিগ্রাফ তার ছিন্ন ও দু'টি স্থানে রেললাইন তুলে ফেলে বাহির থেকে সৈন্য আমদানীর বিলম্ব ঘটাতে হবে। এই কর্মসূচীকে বাস্তব রূপ দিতে প্রথম আক্রমণ আরম্ভে আমরা চৌষট্টি জন সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম।

*　*　*　*　*

১৮ই এপ্রিল, [১৯৩০] বেলা ২-৩০ মিনিটের সময় হেডকোয়ার্টারে মিটিং। ঠিক সময়ে আমি হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হলাম। গণেশও হাজির। নির্মলদা, অম্বিকাদা ও মাষ্টারদা আগে থেকেই কংগ্রেস অফিসে (মাষ্টারদার বাসা) ছিলেন। খুব সামান্য একটু তরল কথাবার্তা ও হাসিঠাট্টার পর আমরা সবাই গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়ায় আলোচনা সুরু করলাম।

কোন্ সময় কাকে কোথায় হাজির হতে হবে, কোন্ কোন্ ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে, অস্ত্রশস্ত্র বিলি করার ঠিকমত ব্যবস্থা, কোন্ কোন্ পথ ব্যবহার করা নিরাপদ, বিভিন্ন নেতা ও বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগ রক্ষার উপায়—সংকেত, সংকেত বাক্য, বিশেষ শ্লোগান ইত্যাদি সবকিছু বারবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হল।

*　*　*　*　*

নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আমাদের গাড়ী ওয়াটার-ওয়ার্কসের কাছে এসে পড়ল। হেড্ লাইট জ্বালিয়েই আসছিলাম। রাস্তাটির বাঁকে পূর্ব চিহ্নিত স্থানে মাষ্টারদা একজন বডিগার্ডের সঙ্গে উপস্থিত। রাস্তার ধারে বড় একটি গাছের ব্যাকগ্রাউণ্ডে—মোটরের হেড্লাইটের আলোতে—

আপাদমস্তক সাদা পোশাকে সজ্জিত মাষ্টারদাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল! মাথায় তাঁর খদ্দরের সাদা গান্ধী টুপীর মত শক্ত ইস্তিরি করা উষ্ণীষ। টুপিটির সম্মুখভাগের ডানদিকে টাকার সাইজের উজ্জ্বল ধাতু নির্মিত ভারতবর্ষের প্রতীক। পরনে খদ্দরের লম্বা সাদা কোট। কোটের বোতামগুলিও উজ্জ্বল ধাতু নির্মিত—বাঁ দিকের বুকের উপর ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেন্টের জন্য বিশেষ ডিজাইন করা একটি উজ্জ্বল মেডেল শোভা পাচ্ছে। তা ছাড়া বুকে-পিঠে কালো ভেলভেটের উপর ঝক্‌ঝকে জরীর কাজ করা আমাদের তৈরী বিশেষ ব্যাজটি চোখ ঝলসে দিচ্ছে। এই পোশাকের সঙ্গে মালকোচা দিয়ে পরা সাদা ধপধপে ধুতি ও টেনিস খেলার সাদা জুতো পায়ে মাষ্টারদার এই অপরূপ বেশ দেখে মনে হচ্ছিল—সমুদ্রে ভাসমান একটি হিমশৈল; তার প্রচণ্ড সংঘাত আজ বৃটিশ রণতরীর সমাধি রচনা করবে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব খর্ব করবে।

মাষ্টারদার পাশে এসে আমাদের গাড়ি থামল। নিমেষে আমরা ছ'জন নেমে এক সারিতে দাঁড়ালাম। গণেশের কমাণ্ডে আমরা ছ'জন মিলিটারী কায়দায় মাষ্টারদাকে অভিবাদন জানালাম। মাষ্টারদা স্যালুট গ্রহণ করে প্রশ্ন করলেন—"সব ঠিক আছে?" গণেশ উত্তর দিল—"সব ঠিক।"

মাষ্টারদা—"এতক্ষণে টেলিফোন-ভবন ধ্বংস হওয়ার কথা। ধ্বংস না হওয়ার কি কোন সম্ভাবনা আছে?"

আমি—"টেলিফোন-ভবন ধ্বংস না হওয়ার পার্থিব কোন কারণ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস টেলিফোন-ভবন ধ্বংস হয়েছে।"

মাষ্টারদা—"A. F. I. অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটির শেষ মুহূর্তে কোন বিচ্যুতির কারণ আছে কি?"

গণেশ—"না, কোন ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি না।"

মাষ্টারদা—"ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলের আপোষহীন মনোভাবের পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা কি আছে?"

গণেশ—"না, না, অসম্ভব! জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ আজ তারা নেবেই।"

খুব সংক্ষেপে এইরূপ দু'চারটি কথার পর আমরা ছ'জন গাড়ীতে উঠে বসলাম। পরস্পর জেনে নিলাম প্রত্যেকের পিস্তল বা রিভলবারের চেম্বারে টোটা ভর্তি আছে কি না।

গাড়ি পঞ্চাশ-ষাট গজ এগিয়ে যেতেই দেখা গেল টিলার উপর রাইফেল-ধারী প্রহরীরা পায়চারী করছে। আমাদের গাড়ী এসে অস্ত্রাগারের সামনে হঠাৎ থেমে গেল। মিলিটারী ইউনিফরমে খুব উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের পোশাকে গণেশ ও আমি সামনে, আর আমাদের পেছনে বিধু, হরিপদ, সরোজ ও হিমাংশু। আমরা লক্ষ্য স্থির রেখে ধাপে ধাপে দ্রুত উঠতে লাগলাম। দশ বারোফুট টিলাটি উঠতে পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড সময়ও লাগে নি। সাস্ত্রীর থেকে তিন হাতের ব্যবধানে আমার ও গণেশের পিস্তল একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। মূল-উপড়ানো গাছের মত কাঁপতে কাঁপতে সাস্ত্রী মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। তিন চার লাফে এগিয়ে গিয়ে আমরা গার্ডরুম আক্রমণ করলাম। ছুটে যাওয়ার সময় ফায়ার করতে করতে এগিয়েছি। আক্রমণের প্ল্যান অনুযায়ী আমরা সমস্বরে গগনবিদারী—ইনক্লাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক—শ্লোগান দিয়ে পুলিশ লাইন মুখরিত করে তুলেছি। রাত্রে অতর্কিত আক্রমণ, পিস্তলের গুলি, সাস্ত্রীর পতন, গার্ডরুমের দিকে ফায়ার, সঙ্কেত অনুযায়ী পুলিশ লাইনের চারপাশে আমাদের ছোট ছোট সাতটি দল গুপ্তস্থান হতে অন্ধকারের নির্জনতা ভঙ্গ করে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তোলে যে দারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে পুলিস কেবল গার্ডরুম থেকে নয়, পুলিস ব্যারাক থেকেও ভীত ত্রস্ত হয়ে যেখানে যে পেরেছে পালিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অস্ত্রাগার আমাদের দখলে এসে গেল। মাষ্টারদা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটি দল প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল।

এবার মাষ্টারদা হুকুম দিলেন—"বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পুড়িয়ে ফেল"। মাষ্টারদার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য ইউনিয়ন জ্যাকের বহ্নিউৎসব হ'ল। মাষ্টারদা হুকুম দিলেন, "জাতীয় পতাকা তোলা হোক"। দুজন তরুণ বিপ্লবী বীরদর্পে এগিয়ে গেল। বিজয়গৌরবে জাতীয় পতাকা তোলা হ'ল, আমাদের বিউগল্ বেজে উঠল। এমন সময় গাড়ীর তীব্র আলো জ্বালিয়ে অম্বিকাদারা সদলবলে এসে পড়লেন। মাষ্টারদা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—"টেলিফোন-ভবন নিশ্চিহ্ন হয়েছে তো?"

অম্বিকাদা—"টেলিফোন-ভবন এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

মাষ্টারদা—"কোন পক্ষে কেউ হত বা আহত হয় নি তো?"

অম্বিকাদা—"কেউ-ই না।"

মাষ্টারদা—"খুব আনন্দ হচ্ছে। বিনা রক্তপাতে সরকারী টেলিফোন-ভবন ধ্বংস করার নজীর ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সমুচিত প্রতিশোধ নেবার জন্য নরেশ, ত্রিপুরা, দেবু, অমরেন্দ্র, বীরেন ও মনোরঞ্জন হাতবোমা ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বৃটিশ শত্রুকে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়েছিল। তারা খুব ধীর ও মন্থর গতিতে ফিরে এল। মনে হল কোন উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই—তারা যেন শ্রান্ত, ক্লান্ত ও নির্জীব হয়ে পড়েছে।

মাষ্টারদা নরেশকে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমরা একেবারে চুপচাপ কেন? কি হয়েছে তোমাদের?"

নরেশ—"কিছু হয় নি। আমরা সবাই দৈহিক সুস্থ; কিন্তু আমরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছি।"

মাষ্টারদা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন—"নরেশ, তোমরা অক্ষম হয়ে ফিরে এলে? বুঝতে পারছি না। খুলে বল কি হয়েছে?"

নরেশ বলতে লাগল—"আমরা প্লান মত ক্লাব-গৃহের কাছে গেলাম। আমরা ঝটিকাবেগে বিভিন্ন দরজা ও জানালা দিয়ে ক্লাবঘরে প্রবেশ করি—কিন্তু আশ্চর্য! হল ঘর একেবারে শূন্য! সাহেবরা আটটা ন'টায় মধ্যে সবাই বাড়ী চলে গেছে।"

মাষ্টারদা—"ঐ নিয়ে তোমরা মন খারাপ করো না। চট্টগ্রাম শহর আমাদের দখলে, প্রতিশোধ আমরা নেবই।"

নির্মলদা ও লোকনাথের নেতৃত্বে A.F.I. আর্মারি দখলের একঘণ্টারও পর আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছি। আমি গিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

* * * * *

অর্ডার হল—সঙ্গে সব ক'টি রিভলবার এবং যতগুলি সম্ভব রাইফেল ও লুইসগান নেওয়া হোক্। বাকি সব ধ্বংস কর। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় সব রাইফেল ও তিনটি লুইসগান ভেঙ্গে ফেলা হল। কতগুলি রাইফেল ও দুটি লুইসগান গাড়ি দুটিতে বোঝাই করা হল, তারপর A.F.I. আর্মারিতে আগুন দেওয়া হল। আর্মারিটিকে বিদায় জানিয়ে আমাদের দু'টি গাড়ি পুলিশ লাইনের দিকে অগ্রসর হল।

আমরা পুলিশ লাইনের টিলার উপর উঠার সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারদা আগে এসে সবার কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন।

নির্মলদা মাষ্টারদাকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন ও আমরা সবাই অক্ষতদেহে ফিরে এসেছি জানালেন। তারপর মাষ্টারদাকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দিয়ে আমি বললাম, "মাষ্টারদা—আমাদের জয়ের গৌরব একেবারে ম্লান হয়ে গেছে। A.F.I. আর্মারিতে রিভলবার, ম্যাগাজিন রাইফেল ও লুইসগান আমরা প্রচুর পেয়েছি, কিন্তু আশ্চর্য! সেখানে একটি কার্তুজও পাই নি।"

মাষ্টারদা—"কি? কি? একটি কার্তুজও পাও নি?"

লোকনাথ—"না—একটিও না।"

"তা কি করে সম্ভব হতে পারে?" এই প্রশ্নটুকু করে মাষ্টারদা একেবারে চুপ হয়ে গেলেন।

পুলিশ লাইনে আমাদের অনেক সময় কেটে গেল। বৃটিশের প্রধান ঘাঁটি সব আমাদের দখলে। টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত, টেলিগ্রাফ লাইন বহির্জগত হতে বিচ্ছিন্ন, দুটি স্থানে রেল লাইন ধ্বংস করা হয়েছে, পুলিশেরা সব প্রাণভয়ে পালিয়েছে।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। এ কি? খুব নিকট থেকেই লুইসগান ফায়ার হচ্ছে! অবিরাম ধারায় গুলি চলছে।

বজ্রকণ্ঠে আমাদের মধ্য থেকে হুকুম হল—ওয়াটার ওয়ার্কস লক্ষ্য করে দ্রুত গুলি চালাও। আমাদের চৌষট্টিটি মাস্কেট্রি এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল। এই খণ্ডযুদ্ধ মিনিট চার পাঁচ চলেছে। শত্রুপক্ষ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলে মাষ্টারদা সাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার গঠন করে একটি proclamation দিলেন। ঘোষণাটি নিয়ে দিলাম। মাষ্টারদা ঘোষণা করলেন:

প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ!

ভারতের বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব আজ ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনীর উপর ন্যস্ত। ভারতবাসীর অন্তরের বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করবার জন্য আমরা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করেছি।

আজ বিশেষ গৌরবের কথা, আমাদের বাহিনী চট্টগ্রামে বৃটিশ সরকারের ঘাঁটিগুলি অধিকার করেছে; শত্রুর অস্ত্রাগার অধিকৃত, শহরের কেন্দ্রীয় টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত, বহির্জগতের সঙ্গে তারবার্তা বিচ্ছিন্ন, রেল লাইন উৎপাটিত। বাইরের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শত্রুর সেনাবাহিনী পরাস্ত। অত্যাচারী বিদেশী সরকারের অস্তিত্ব লুপ্ত।

জাতীয় পতাকা আজ উচ্চে উড্ডীয়মান। জীবন ও রক্তের বিনিময়ে একে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি আমি—সূর্য সেন, এতদ্বারা ঘোষণা করছি চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্রী বাহিনীর বর্তমান পরিষদই সাময়িক বিপ্লবী সরকারে পরিণত হয়ে নিম্নলিখিত জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে—

(১) আজকের জয়কে সুনিশ্চিত করবার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে;

(২) ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করে তুলতে হবে;

(৩) আভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করতে হবে;

(৪) সমাজদ্রোহী ও লুণ্ঠনকারীদের শাসনে রাখতে হবে;

(৫) এবং এই সাময়িক বিপ্লবী সরকারের পরবর্তী নির্দেশগুলি সম্পন্ন করতে হবে।

আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার চট্টগ্রামে প্রত্যেক সাচ্চা তরুণ-তরুণীর কাছে' সম্পূর্ণ বাধ্যতা ও সক্রিয় সহযোগিতা আশা ও দাবী রাখে।

বন্দেমাতরম্

মাষ্টারদা ঘোষণাপত্রটি ধীরে ধীরে জোরের সঙ্গে পাঠ করলেন। ঘোষণাপত্রটি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমাণ্ড এল—In honour of our Provisional Revolutionary Government—Three round Fire !" আমরা পর পর তিন বার গুলি ছুঁড়লাম। বিউগল বেজে উঠল! তারপর তিনবার জয়ধ্বনি দিলাম—বন্দেমাতরম্।

একটু আগেই খণ্ডযুদ্ধে শত্রু পশ্চাদপসরণ করেছে—তাদের লুইসগান নিস্তব্ধ। তবু শত্রু নিশ্চিহ্ন হয় নি। মাষ্টারদা আমার সামনে এগিয়ে এসে বললেন—মেসিনগানের বিরুদ্ধে আমাদের মাস্কেট্রি কি করতে পারবে? আমি কোন উত্তর দিলাম না। চুপ করে রইলাম। মাষ্টারদা পায়চারি করতে করতে আরো তিন চার বার কাছে এসে বলেছেন বা স্বগতোক্তি করেছেন—মেসিনগানের কাছে আমরা আর কতক্ষণ? মাস্কেট্রি নিয়ে কতখানি কি করতে পারব? আমাদের হাতে ম্যাগাজিন রাইফেল যদি থাকত! লুইসগান যদি একটিও ব্যবহার করতে পারতাম!

মাষ্টারদা শেষবারের মত বললেন—"মেসিনগানের বিরুদ্ধে আমাদের মাস্কেট্রি কি করতে পারবে?" ঠিক সেই সময়ে আবার শত্রুর মেসিনগান গর্জন করে উঠল,—ট্যাট ট্যাট। দ্বিতীয় বার শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের প্রত্যুত্তরে আমাদের থেকে Volly fire ও মুখে অনবরত 'বন্দেমাতরম্' ও 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি চলল। মেসিনগানের অজস্র গুলিবৃষ্টির জবাব দিচ্ছি মাস্কেট্রি দিয়ে। বেচারা ইংরেজগোষ্ঠী কি আর করে! সাহেবদের কার্তুজ ফুরিয়ে গেল। আবার যুদ্ধ বন্ধ করতে হল।

আর দেরী করা যায় না। শত্রুপক্ষ যত বেশী সময় পাবে—তত বেশী সুযোগ নেবে। হুকুম হল, পেট্রোল ঢাল—আগুন দাও। হিমাংশু চারিদিকে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে যেমন সমস্ত আর্মারিতে আগুন জ্বলে উঠল, ঠিক তেমনি হিমাংশুর সমস্ত পোষাকে চক্ষুর পলকে আগুন ধরে গেল। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় হিমাংশু ছুটে এসে গাড়ীর পেছনের সিটে উঠে পড়ল। গণেশ আমার পাশে। আমি নতুন শেভ্রোলে গাড়ী করে হিমাংশুকে সহরে রাখতে নিয়ে গেলাম।

মাষ্টারদা, অম্বিকাদা ও নির্মলদা প্রধান দলের সঙ্গে রইলেন। তখন রাত প্রায় তিনটে। হিমাংশুকে রেখে খুব তড়িৎ বেগে আবার পুলিস লাইনের দিকে ছুটলাম, কিন্তু ফিরে এসে মাষ্টারদা ও প্রধান বাহিনীর আর দেখা পেলাম না। প্রধান বাহিনী তখন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। চারদিন তাদের সঙ্গে যোগাযোগের বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে চলে গেলাম এবং চন্দননগরে আশ্রয় নিলাম।*

---

* 'সূর্য সেন স্মৃতি' গ্রন্থ থেকে সংকলিত

স্বাধীনতার প্রথম আলো

লোকনাথ বল

২২শে এপ্রিল ভোরবেলা আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরে জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৮ই (১৯৩০) এপ্রিল অস্ত্রাগার দখল করার পর চট্টগ্রাম আমাদের করায়ত্ত হয়। তারপর তিন দিন বিভিন্ন পাহাড়ে আমাদের দিন কাটে। এ ক'দিন একরকম অনাহারেই আমাদের থাকতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের দু'একটা কাঁচা আম এবং ঘোলা জল এই ছিল আমাদের খাদ্য ও পানীয়। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে উঠার সময় বহু গ্রামবাসী আমাদের দেখতে পেয়েছিল। আমরা জানতাম আমাদের সংবাদ সেদিন পুলিশের কাছে গোপন থাকবে না। তাই একটা চরম হিসাবনিকাশের জন্য আগে থেকেই সেদিন প্রস্তুত হয়েছিলাম। অবশ্য প্রস্তুত হয়েছিলাম বললে কথাটা ঠিক হবে না। তিন দিনের অভুক্ত, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ফলে পরিশ্রান্ত, আমরা তখন একরকম মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।.........বেলা অনুমান পাঁচটা, হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের রক্ষী বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনি করে উঠল। যে যেখানে ছিলাম ছুটে এসে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখলাম, একদল সৈন্যবাহিনী সঙ্গীন উঁচিয়ে আমাদের পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে। আমরা তাড়াতাড়ি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। সৈন্যবাহিনী যখন আমাদের রাইফেলের গুলির পাল্লার ভিতর এসে পড়ল তখন আমি গুলিবর্ষণের নির্দেশ দিলাম। আমাদের গুলিবর্ষণ সুরু হতেই সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করল। কিছু দূর গিয়ে তারা পেল একটি পাহাড়ী খাল। সেখানে তখন জল ছিল না বললেই হয়। সেই খালের ভিতরে নেমে তারা আশ্রয় গ্রহণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলিবর্ষণের জবাব সুরু হল। অনুমান পনের মিনিট পরস্পর গুলিবর্ষণেরপর আমরা হঠাৎ লুইসগানের গুলিবর্ষণের আওয়াজ পেলাম। প্রথমেই আমার ছোট ভাই 'টেগরা' আহত হয়ে পড়ে গেল। আমাকে সম্বোধন করে 'টেগরা' বলল, 'সোনাভাই! আমি চললাম, তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করো।'

লুইসগানের গুলিবর্ষণ ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে ত্রিপুরা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্মল লালা, অর্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত এবং মতি কানুনগো আহত হয়ে পড়ে গেল। তাদের রক্তে লাল হয়ে উঠল জালালাবাদের মাটি, জাতির পরাধীনতার, জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরু হল স্বাধীনতাকামী শিশুদের রক্তে।.........

তখন অনুমান সাতটা। হঠাৎ সরকারী সৈন্যবাহিনীর দিক থেকে তিন বার হুইসেলের আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলিবর্ষণের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সবাই লাফিয়ে উঠে দেখলাম সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলিবর্ষণ স্বরু হল। আমাদের 'বন্দেমাতরম্' এবং 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে তখন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! (একদিকে তিন দিনের অভুক্ত, পথশ্রমক্লান্ত জনপঞ্চাশেক বিপ্লবী (আমাদের অধিকাংশই ছিল পনের ষোল বছরের বালক), অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞ, রণবিদ্যায় পারদর্শী গভর্ণমেণ্টের বাছাই করা সৈন্যবাহিনী।)....পরাধীন জাতির ইতিহাসে বিপ্লবীদের সেদিনের জয়লাভ কম গৌরবের বিষয় নয়। (জালালাবাদের শহীদরা তাদের রক্ত দিয়ে তাদের প্রাণ দিয়ে বিশ্বের সম্মুখে সেদিন প্রমাণিত করেছিল ভারতবর্ষের তরুণরা কাপুরুষ নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য, জাতির কলঙ্ককালিমা ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য হাসিমুখে তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে। জালালাবাদের শহীদরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।)

বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের কার্যক্রম ডাকাতির ও খুনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারী উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীকে খুন করা একটা আদর্শ বিপ্লবী কার্য বলে পরিগণিত হত। আমাদের মনে হল, প্রচলিত আন্দোলনের গতি ও তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। ক্ষমতা হস্তগত করাই সমস্ত বিপ্লবী কার্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তদনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত করলাম চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে দেশের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করব। আক্রমণের দিন ঠিক হল ইংরেজী ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত দশটা। ঐদিন ছিল গুড্ ফ্রাইডে (Good Friday)। একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল ঐ দিনটার সাথে জড়িয়ে। আইরিশ প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর ইষ্টার বিদ্রোহের রক্তরাঙা স্মৃতি আমাদের তরুণ প্রাণে দিত আগুনের ছোঁয়াচ।

চট্টগ্রামের রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল নির্মলদা (শ্রীযুক্ত নির্মল সেন) এবং আমার উপর। মাষ্টারদা (সূর্য সেন) ছিলেন আমাদের সর্বোচ্চ নেতা। আমাদের কার্যের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম তাঁরই নির্দেশে। নির্মলদা এবং আমার মধ্যে সাব্যস্ত হল রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করব আমি। ১৮ই এপ্রিল বেলা তিনটের সময় আমি স্থানীয় ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে একজন ড্রাইভারকে বললাম, ঐ দিন রাতে আটটার সময় গাড়ী নিয়ে আমার বাসায় যেতে। আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু বেরুব বেড়াতে। সন্ধ্যার সময় নির্মলদা, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, জীবন ঘোষাল (মাখন), ফণি নন্দী, সুবোধ চৌধুরী এবং আমি সামরিক পোষাক পরে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছি। আমার গায়ে ছিল উচ্চ ইংরেজ সামরিক কর্মচারীর পোষাক এবং অন্যেরা সৈন্যের পোষাকপরিহিত ছিল। আটটার সময় ট্যাক্সি এলে আমরা গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে পাহাডতলীর দিকে গাডী চালাবার নির্দেশ দিলাম (পাহাড়তলী ষ্টেশন চট্টগ্রাম শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত)। রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সম্মুখের পথ দিয়ে যাবার সময় আমরা দেখে গেলাম, অস্ত্রাগারের অবস্থা অন্যান্য দিনের মত স্বাভাবিক।' আমাদের গাডী যখন পাহাড়তলী ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে পৌঁছল, তখন আমি ড্রাইভারকে গাডী থামাতে বললাম। গাড়ী থামতেই আমি এবং রজত গাডী থেকে নেমে ড্রাইভারের দিকে রিভলভার লক্ষ্য করে তাকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলাম। ড্রাইভার আমাদের নির্দেশ পালন করল। আমরা ড্রাইভারকে রাস্তার পাশের বাঁশ খেতে নিয়ে যাই এবং তার হাত-পা বেঁধে ক্লোরোফরমের সাহায্যে তাকে অজ্ঞান করে দিই।

প্রায় দশটার সময় আমাদের গাড়ী রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সাইড্ গেটে গিয়ে উপস্থিত হল। পাহাড়তলী থেকে ফিরে আসবার সময় গাড়ী চালাবার ভার নিয়েছিল জীবন ঘোষাল। অস্ত্রাগারের সম্মুখে আমাদের ছয় জন সাথী আমার নির্দেশানুযায়ী আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। তাদের একজন এসে ধাক্কা দিয়ে গেট খুলে দিলে আমাদের গাড়ী অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। অস্ত্রাগারের রক্ষী আমাদের পরিচয় জানার জন্য চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'Halt, who comes there ? (থাম! কে আসছে ?)।' তার জবাবে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'Friend. (বন্ধু)।' তারপর আমাদের গাড়ী অস্ত্রাগারের সিঁড়ির সামনে গিয়ে থামল। আমি একা গাড়ী থেকে

নেমে এসে অস্ত্রাগারের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। আমার কাছ থেকে তখন রক্ষীর দূরত্ব ছিল অনুমান সাত আট হাত। রক্ষীকে আমি ডাকলাম, 'Sentry, ইধর আও (রক্ষী! এদিকে এসো)।' রক্ষী আমার সম্মুখে এসে সামরিক কায়দায় আমাকে অভিবাদন করল। তার ডান হাত রাইফেলের বাট্ স্পর্শ করা মাত্রই আমি বাঁ হাত দিয়ে তার রাইফেল চেপে ধরি এবং ডান হাতে তার বুকের সামনে রিভলভার লক্ষ্য করে বলি—'আমরা স্বদেশী, আমরা অস্ত্রাগার দখল করতে এসেছি। তুমি পালিয়ে যাও।' আমি তাকে রাইফেল ছেড়ে দিতে বলার পর সে হঠাৎ আমার হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিল। আমি তখন বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করি, সে আহত হয়ে পড়ে গেল। অন্য তিনজন রক্ষী তাদের রাইফেল ধরবার চেষ্টা করলে আমি এবং আমার সাথীরা ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করে তাদের প্রতিহত করলাম। আমাদের প্রথম গুলির আওয়াজ শুনেই অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেল তার ঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে অস্ত্রাগারের রক্ষীকে ডাকল। আমি তাকে হুঁসিয়ার করে বললাম, 'আমরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর সভ্য। আমাদের নেতার হুকুমে আমরা অস্ত্রাগার দখল করছি। তুমি যদি আমাদের কোনো অনিষ্ট করার চেষ্টা কর, তাহলে জেনো তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।' আমার কথা শোনার পর সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং অনতিবিলম্বে আমাদের আক্রমণ করার জন্য তার রিভলভার নিয়ে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্ষীর গুলিতে আহত হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার স্ত্রী তখন আমার কাছে তাঁর এবং তাঁর শিশুর জীবন ভিক্ষা চাইলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি আমাদের মায়ের মত। আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী নই। আমরা তাঁকে হুঁসিয়ার করেছিলাম। আপনি নির্ভয়ে ঘরের ভিতরে যান, কেউ আপনার অনিষ্ট করবে না।'

পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং এবং গণেশ ঘোষের উপর। ঐ অস্ত্রাগার ছিল একটি ছোট পাহাড়ের উপর। রাত দশটার সময় আমাদের সাথীরা একখানা গাড়ী করে অস্ত্রাগারের কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং সিঁড়ি বেয়ে অস্ত্রাগারের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। দূর থেকে অস্ত্রাগারের রক্ষীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন, রক্ষী আহত হয়ে পড়ে গেল। আমাদের সাথীরা তখন গুলিবর্ষণ করতে করতে অস্ত্রাগারের দিকে ছুটে যান। অস্ত্রাগারের অন্যান্য রক্ষীরা তখন প্রাণের

ভয়ে পালিয়ে গেল। পুলিশ অস্ত্রাগারকে আমাদের সামরিক হেডকোয়ার্টারে পরিণত করা হল এবং আমাদের সর্বোচ্চ নেতা, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম, আমাদের প্রিয় মাষ্টারদা নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর। রাত দশটার সময় তিনি এবং আর কয়েকজন সাথী টেলিগ্রাফ অফিসে যান এবং রিভলভার দেখিয়ে এক্সচেঞ্জ বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে সরিয়ে হাতুড়ির সাহায্যে এক্সচেঞ্জ বোর্ড চুরমার করে দেন। আক্রমণের সংবাদ পেয়ে টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর বন্দুক নিয়ে ছুটে আসেন; কিন্তু আমাদের সাথীদের গুলিবর্ষণের ফলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

১৮ই এপ্রিলের দু'তিন দিন আগে আমাদের কয়েকজন সাথী রেলওয়ে লাইন কেটে দেবার জন্য সহর পরিত্যাগ করে যান। ১৮ই এপ্রিল রাত ১০টার সময় তাঁরা ধুম এবং লাঙ্গলকোটের মাঝামাঝি রেলওয়ে লাইন কেটে দেন।

চট্টগ্রাম আমাদের করায়ত্ত হল। পরে আমরা শুনেছিলাম, চট্টগ্রামের সমস্ত ইংরেজ পুরুষ, রমণী ও শিশুরা সমুদ্রগামী একখানা জাহাজে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আজীবন পরাধীনতার দূষিত হাওয়ায় লালিত-পালিত হয়ে জীবনে সেদিন আমরা প্রথম পেলাম স্বাধীনতার আলো, স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়ার প্রথম পরশ। সে এক অপূর্ব অনুভূতি! পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত পবিত্রতা দিয়ে বুঝি গড়ে উঠেছিল সেই অনুভূতি!*

---

*সৌজন্য: স্বাধীনতা সংখ্যা—যুগান্তর

প্রণতি

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

কে বলে বালেশ্বরের চষাখণ্ডে আত্মদান ব্যর্থতার ভিতরই শেষ হয়ে গেছে ? বর্ষার ঐ প্রান্তরে যে কোরকের জন্ম পনের বছর পরে জালালাবাদের বিশালতর রণভূমিতে তাই অর্ধস্ফুট। আর এক যুগ অবসানে শত শহীদের রক্ত-সরোবরে তাই রক্তকমল তমলুকের জাতীয় সরকারে। পাঁচ বছর পরের ভারত সরকার স্বয়ম্ভূও নয়, বিদায়ী বিদেশীর বরদানেও তার জন্ম নয়। ইতিহাসের কলিগুলি অমনি করেই দেখা দেয়, অমনি করেই ফোটে।

১৯২০ সালের শেষ। প্রথমবারের বন্দীজীবন থেকে যখন মুক্ত হয়ে আসি পূর্ণদা (ফরিদপুরের পূর্ণ দাস) বলেন, "চট্টগ্রামের একটি দল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব, আপনিই দেখাশুনো করবেন।" বলি, "আচ্ছা।" সূর্যবাবুর প্রায় সমবয়স্ক একজনের সাথে আলাপ করিয়ে দেন।

কয়েকদিন পরে কংগ্রেস হবে নাগপুরে। কয়েক বন্ধু জেল থেকে আগেই ছাড়া পেয়েছেন। বলেন, "আমরা নাগপুরে যাব না ; তুমি যাও, গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা কর, তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের বিপ্লবী সম্ভাবনা কতটা। তাই বুঝে দলের কর্মপন্থা স্থির করা যাবে।"

নাগপুরে গান্ধীজিকে সরাসরি প্রশ্ন : "আপনি বলেছেন, আপনার প্রোগ্রাম দেশ মেনে নিলে এক বছরে স্বরাজ দেবেন। কথাটার অর্থ কি এই যে, এক বছরে দেশকে তৈরি করে নিয়ে বৎসরান্তে কংগ্রেসকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারতের পার্লিয়ামেন্ট বলে ঘোষণা করবেন ?"

"**Exactly that's my idea**"—বলেন গান্ধীজি।

আমি বলি, "তাতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে না। **But that'll at once raise the movement to a revolutionary pitch.** আর জাতির পক্ষে সেইটাই মস্ত লাভ। সেই হিসাবে এই এক বছর আমরা আমাদের প্রোগ্রামে ফিরে যাব না, একান্তভাবে আপনার নেতৃত্ব মেনে কংগ্রেসের কাজ

করব। কিন্তু বৎসরান্তে ওরকম কিছু না হলে আবার আমাদের পন্থায় ফিরে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার আমাদের থাকবে।"

সূর্যবাবুর বন্ধু এর পর কয়েকবার আমায় বলেছে, "সূর্যবাবু একবার আপনাকে চট্টগ্রাম যেতে বলেছেন।" কিন্তু সারা '২১ সালটি নানা দিকের দৌড়ঝাঁপে পেরে উঠি নি।

প্রথম চট্টগ্রাম যাই ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে এবং ৩ মাস ওখানে কাটাই। সূর্যবাবুর সাম্যাশ্রমে তখন একখানিমাত্রই ঘর। একসঙ্গেই থাকি। সর্বদা তিনি কর্মব্যস্ত। দিনেরাতে তবু অনেক কথাই হয়। স্বল্পবাক মানুষ—অল্পকথার প্রসার বিস্তৃত। আর, অমন দরদী খোলামনের সাথে কোনো কথাই রাজনৈতিক পর্যায়ে নামে না, সহজে প্রাণ খুলে কথা বলা চলে। আমাদের আত্মপান্ত বলি; গান্ধীজির সাথে কথাও। সূর্যবাবুর ভাল লাগে—মন খুলেই বলেন সেকথা।

তাঁর কথা যা বলেন, সংক্ষেপে বলছি।—বহরমপুর কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন ১৯১৭ সালে। ওখানে গিয়ে পান অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তীর গড়া যুগান্তরের একটি গ্রুপ। এঁদের এক জনের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গ হন। তাঁর কাছে ক্রমে জানতে পান, যুদ্ধের কালে জার্মানীর কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্যের সম্ভাবনায় বিপ্লবোত্থানের চেষ্টা হয়। দেশের একটি দল বাদে আর সব দল যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে এক হয়। চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কয়েকটি সঙ্গী নিয়ে বালেশ্বরে যুদ্ধ করে যতীন্দ্রনাথ প্রাণ দেন।

এর পর সূর্যবাবু বলেন, ব্যর্থ তো হবেই। এই দেশ, এতকাল ছিল অসাড়। এমন দেশ একটিমাত্র ধাক্কাতেই স্বাধীন হয়ে যাবে? বিপ্লবের প্রকৃতি তো এ নয়। কিন্তু ঐ সময় এই চেষ্টাটারই প্রয়োজন ছিল। যে-দল—ওর সামিল হয় নাই, তাঁরা দেশভক্ত হ'তে পারেন, কিন্তু বিপ্লবী কখনই নন। আর, দুর্ভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামে তাঁরা সেই দলেরই ছিলেন।

বহরমপুর থেকে চট্টগ্রাম এসে কয়েকটি বন্ধুকে এসব বলেন। এঁদের কেউ কেউ পুরোনো দলেই রয়ে যান, আর কয়েকজন ভিন্ন দল গড়তে থাকেন। কংগ্রেসের দায়িত্বও তাঁরা নেন। এক বন্ধুর কলকাতায় থাকাখাওয়ার অসুবিধা নেই। তাকে কলকাতায় পাঠান, বলে' দেন এমন কোন দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাদের ঐ বিপ্লবোত্থানচেষ্টার সঙ্গে যোগ ছিল। বিশেষ করে ফরিদপুর গ্রুপের কথা বলেন। কারণ, বালেশ্বরের পাঁচজনের তিনজনই

ছিলেন ফরিদপুরের। এই ভাবেই পূর্ণদার সঙ্গে এবং পরে আমার সঙ্গে পরিচয়।

চট্টগ্রামে আমি থাকতেই চৌরিচৌরার ঘটনার ফলে গান্ধীজির প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার। তিনি নিজেও গ্রেপ্তার হন। ইতিমধ্যে তাঁকে দেওয়া এক বছরের ওয়াদা ফুরিয়ে গেছে। দলের কর্মপন্থা পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে। এপ্রিলমাসে বাসন্তী দেবীর সভানেত্রীত্বে প্রাদেশিক রাজনৈতিক কনফারেন্স চট্টগ্রামে। দেশপ্রিয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। আমাদের বহু সহকর্মী প্রতিনিধি। এই সুযোগে বারো জন নেতৃস্থানীয়ের এক সভা ডাকি। সূর্যবাবু একজন।

স্থির হয়, বিপ্লবী গুপ্ত দল পুনর্গঠিত করা হবে। অস্ত্র সংগ্রহও সুরু হবে। কিন্তু তা ব্যবহারের আগে আবার আলোচনা হবে। এর পর আমি চট্টগ্রাম ছেড়ে আসি।

সিদ্ধান্ত সর্বত্র পৌঁছে দেবার বার্তা নিয়ে আমরা কয়েকজন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ঘুরে আসি।

আবার ধরপাকড়। ১৯২৩ সালে আমরা ধরা পড়ার পর সূর্যবাবু নেতৃত্ব নেন। চট্টগ্রামে কিছু ঘটনার পর তিনি কলকাতায় আসেন। এর পর দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা। ভূপেন চাটার্জির হত্যা। সূর্যবাবুও পরে গ্রেপ্তার।

১৯২৮ সালে সবারই মুক্তি। কলকাতায় কংগ্রেস। ভলান্টিয়ারদল গড়া বিপ্লবীদলেরই প্রয়োজনে। সুভাষচন্দ্র G.O.C. কারণ, ভলান্টিয়ার দলের চেয়ে আন্দোলন হওয়ার প্রয়োজন বেশি ছিল—সেদিক দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব যুবমন আকর্ষণ করবে। করেওছিল। চট্টগ্রামও তার প্রমাণ।

দলগড়াই তো সব নয়। সাদৃশ্যে মনে জাগায় ১৯১৬ সালে আইরিশ সিনফিনদের উদ্যম। তার প্রেরণা কম কাজ করেছিল? '৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত্রে যে ঘোষণাপত্র প্রচার হয় তা পর্যন্ত সিনফিনদের ম্যানিফেষ্টোর অনুবাদ।

'২৮ সালে মুক্তির পর থেকে সূর্যবাবু কলকাতায় আসেন কয়েকবার। বলেন "স্বাধীনতা" কাগজখানার কথা। পাগল করে' রেখেছে ছেলেদের। পেতে একদিন দেরি হ'লে অস্থির করে' মারে। ঐটিই তখন যুগান্তর দলের মুখপত্র। ১৯৩০-এর এপ্রিলেই উঠে যায়। শেষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "ধন্য চট্টগ্রাম।"

মাঝে একবার চেষ্টা হয়েছিল দুইদলের মিলনের। আন্দোলনে দলে মিল হয় কখনও? অথচ ও ভুল আমাদের প্রাচ্যমন করবেই। ফল হ'ল আরও ভাঙাভাঙি, ঘরের খবর পরের হয়ে যাওয়া।

সাবধান ছিলাম। তবু কালোমেঘ একখানি দেখা দেয়। আমাদের দিক থেকে গোপন কাজ দেখাশুনার ভার ছিল আমার উপর। দক্ষিণেশ্বর গ্রুপের উত্তরপাড়াবাসী এক সহকর্মীর সাহায্যে গোপন খবর সংগ্রহের জন্যে খুব ছোট ছেলের একটি দল গড়া হয়েছিল। কোনো কোনো সহকর্মীর চলাফেরার উপর তারা নজর রাখতো অবশ্য আমার দেওয়া বাইরের অন্য খবরের ভিত্তিতে। এতে কোনো কোনো বন্ধু অকারণ সন্দেহ থেকে মুক্তও হন।

এক্ষেত্রে সংবাদের ভিত্তি আছে জানা গেল। সূর্যবাবুকে বলি, বলার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই। একটু অনুসন্ধানের পর তিনি যা করেন, করার আগে তা আমায় বলেন নাই। করে' এসে বলেন। তখন বলি, করলেন তো—সামাল দিতে পারবেন? জবাব দেন, সে আমি জানি। কিন্তু সে যা বিপদ সে তো চট্টগ্রামে। এখানে হ'লে তো আরও মারাত্মক। এই ছিল তাঁর চরিত্রের একটি দিক। অসাধারণ দিক।

বিপদ হয়েছিল। তিনি জানাবার আগেই এখানে বসে' যা খবর পাই তা থেকেই বুঝেছিলাম। যাঁর মারফৎ তিনি খবর পাঠালেন তাঁকে দিয়েই আমিও বলে' পাঠাই এখানে যা যা জেনেছি ওখানকার সম্বন্ধে। সূর্যবাবু আমায় বলে' পাঠিয়েছিলেন, বিপদ যা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, অন্যান্য জায়গার জন্যে যদি অপেক্ষা করেন, তা হ'লে আয়োজন যা হয়েছে সব পণ্ড হবে।

বলে' পাঠাই, প্রয়োজন নেই অপেক্ষা করার। পরে অন্যত্র যা হবার হবে। বেশি সাবধানী হয়ে সব দিক রক্ষার চেষ্টার চেয়ে যা সম্ভব ওখানে করুন।

এর পর তো ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ব্যাপার আগে বুঝলাম ধরপাকড়ে। পরে জানলাম খবরের কাগজে।

জালালাবাদের খবর সকালের কাগজে পড়লাম যেদিন সেইদিন সন্ধ্যাতেই গণেশ আমাদের ৭১ নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে।

জালালাবাদের সাথে আর আমার কি যোগ? না আর একটু আছে। কয়েকদিন পরে নির্মলের চিঠি। যতদূর জেনেছিলাম, পাঁচখানা চিঠি এসেছিল,

দু'খানা আমার হাতে পড়ে। একই ভাষা, একই মর্ম। সম্বোধনে, ভাষায় বুঝতে অসুবিধা হ'ল না—চিঠি নির্মলেরই—বড় বড়, ট্যাড্সা অক্ষরে লেখা। একখানা সোজা আমার ঠিকানায়; একখানা পূর্ণদার ঠিকানায়। এই দু'খানাই আমি পাই।

আমার নামের খানা পোষ্টাফিসে অন্য কতকগুলি চিঠির সঙ্গে এক স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসার তুলে নেয়। নিয়ে এক টেবিলে রেখে বাথরুমে যায়। একটি কেরানী চিঠিখানির প্রতি নজর রেখেছিলেন। ঐ সুযোগে তুলে নিয়ে পকেটে রাখেন। পরে সরস্বতী লাইব্রেরীতে কিরণদাকে দিয়ে যান।

চিঠির বক্তব্য সহজ। কিন্তু ব্যথায় ভরে ওঠে মন—অভাব, জঙ্গলের লতাপাতায় পেট ভরে। আগে তো ভবিষ্যৎ আন্দাজ করা সম্ভব হয় নি। হ'লে কি গণেশ, অনন্ত—দু'জনই চলে' আসতেন এদিকে?

ভাগ্যক্রমে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এক সভা কয়েক দিন পরেই। কুমিল্লার পুরোনো সহকর্মী বসন্ত মজুমদারকে একপ্রান্তে ডেকে সব বলি। তিনি দেখি কামিনীবাবুকে ডাকেন। কামিনীকুমার দত্ত দলের ছিলেন না, কিন্তু বুঝি একাজে সামিল হয়েছেন। বলেন দু'জনাই, আপনি ভাববেন না, যোগাযোগ হয়েছে; কিছু পাঠিয়েও এসেছি। খবর যেমন পাব আরও পাঠাব। আপনাকেও জানাব।

এর পর তো আমিও ধরা পড়ি। তবে একথা জেনেছিলাম, এঁরা সাধ্যমতো করেছিলেন। বসন্তবাবু তো নেবেনই, কামিনীবাবুও নানাভাবে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। যুগধর্মে অনেক সাধারণ মানুষও নিয়েছিলেন।

আমার আর কি বলবার থাকতে পারে—জালালাবাদের এই দ্বাদশ শহীদকে শতকোটি প্রণতি জানানো ছাড়া? উদাহরণ দিয়ে যদি বুঝতে হয় তাহলে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—কথাটার মর্ম বুঝতে পারা যায় এইসব মরণলোভাতুরদের মরণ আর জীবন থেকেই। নিঃশেষে নিজেকে দিয়েও ইতিহাসে এরা কখনও ফুরিয়ে যান না—পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

মাষ্টারদা ও লোকনাথ

শ্রীসতীভূষণ সেন

(একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে মাষ্টারদার জন্ম।) সর্বদেশে ও সর্বকালে মধ্যবিত্তরাই জাতির কৃষ্টি বহন করে থাকে। (প্রভাতে কাজে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। সারা বছর অর্ধাহারে বেঁচে থাকে।) জীবনের সব সৌন্দর্য ও আনন্দ নিঃশেষ করে দিয়ে, জাতির জ্ঞান ও কৃষ্টির বর্তিকা জ্বালিয়ে রাখে। এরাই জাতির মেরুদণ্ড, নীতির তন্ত্রধার, সমাজের রক্ষক। এরা রাজভক্ত, ধর্মভীরু ভদ্রসন্তান।

আবার যখন জাতির জীবনে অন্যায় অবিচার ও পাপ বাসা বাঁধে, সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, তখন সেই পাপের উদ্ধত শাসনকে প্রতিহত ও পরাজিত করবার জন্য, (এই মধ্যবিত্তের মাঝেই এমন একটি জীবনের আবির্ভাব ঘটে, যিনি নিজের পথ নিজেই সৃষ্টি করেন।) তিনি জগতে আনেন অশান্তির অভিশাপ, ঘটান বিশৃঙ্খলা। আগ্নেয়গিরির মত হঠাৎ একদিন জ্বলে উঠে, রাজশক্তি সমাজবন্ধন লোকাচার সব ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করে দেন। সেই ভগ্নস্তূপের উপরে নতুন সমাজ গড়ে ওঠে, জাতি নবজীবন লাভ করে।

(মাষ্টারদা ছিলেন তাঁদেরই একজন।) সাধারণ বাঙ্গালীর চেয়ে ক্ষুদ্রকায়, ক্ষীণদেহ একটি ব্যক্তি। দেহের বর্ণ শ্যাম, মাথার সামনে চুলের চাইতে টাক বেশী, উন্নত ললাটের গাম্ভীর্য আরো বেশী করে চোখে পড়ে। পরিচ্ছদ অমার্জিত, চেহারাতেও এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যে দেখলেই মাথা নত হয়ে আসবে। স্বভাবত গম্ভীর, কথা বলেন কম। শান্ত সমাহিত মুখে মৃদু হাসি, চোখে বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি, অথচ সব ছাপিয়ে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ।

সেদিন মাষ্টারদার আর এক মূর্তি দেখল লোকনাথ। মাষ্টারদা তাকে বলেছিলেন অতুলকে ডেকে আনতে। [অতুল নামটা কাল্পনিক, ঘটনাটি সত্য] অতুল এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। নিমেষে দুহাত ছিটকে গেলেন মাষ্টারদা। চোখ দুটি এমন জ্বলে উঠল যে, হতবুদ্ধি হয়ে গেল অতুল। আরম্ভ হল তাঁর তিরস্কার, যাঁর সম্মুখে শক্তিমান যুবক অতুল থর থর করে কাঁপতে

লাগল, একটু প্রতিবাদ করতে পারল না। ঐ অতোটুকু মানুষের মধ্যে যে এতখানি তেজ ও ক্রোধ থাকতে পারে, তা লোকনাথের কল্পনার অতীত ছিল।

লোকনাথকে আদেশ করলেন, "য়্যারেষ্ট হিম"! লোকনাথ পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কাঁধের উপর হাত রাখল, বলল, "ইউ আর আণ্ডার য়্যারেষ্ট!"

"লোকনাথ, তুমি ওর সঙ্গে যাও। রিভলভারটা নিয়ে আসবে। সব সময় সঙ্গে থাকবে। পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করবে।"

কিন্তু গুলি করবার অস্ত্র তিনি লোকনাথকে দেন নি। লোকনাথের সঙ্গে শুধু একখানি ছোড়া। কোমরে গোঁজা, পাঞ্জাবীটা সেখানে উঁচু হয়ে উঠেছে। তারই উপর নির্ভর করে লোকনাথ অতুলকে 'এসকর্ট' করে নিয়ে চলল। প্রায় পনেরো ঘণ্টা ট্রেন জার্ণি, অনাহার, অনিদ্রা। অবশেষে সিলেটের একটি ছোট সহর থেকে নিষিদ্ধ বস্তুটি সংগ্রহ করে আনলো লোকনাথ।

একটু পুরানো কথায় ফিরে যাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব একটা যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে বাংলার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ স্থির করেছিলেন, আর রক্তাক্ত বিপ্লব নয়; এবার প্রকাশ্য অসহযোগ আন্দোলনে নামবেন। তাই বলে অস্ত্র শস্ত্র যার কাছে যা ছিল, তা কিছু আর নদীতে বিসর্জন দিলেন না।

তরোয়ালকে মাটির নীচে পুঁতে রাখলে যুদ্ধ বন্ধ হয় সত্য, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটি লাঙ্গলের ফলা হয়ে ভূমিকর্ষণ আরম্ভ করে না। তার জন্য চাই মানুষের প্রত্যয় ও আগ্রহ। বিপ্লবী ছেলেরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল, কিন্তু আন্দোলনের ভাবের বন্যায় ভেসে গেল না।...তরোয়ালে মরচে পড়তে লাগল, ছেলেরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, বিদ্রোহ করতে চাইল। কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করতে হল মাষ্টারদাকে। কিন্তু তাঁরই কি চুপ করে থাকতে ভাল লাগছিল? তিনিও কি নদীতীরে কুটিরে বসে আগামী অগ্নিময় দিনের স্বপ্ন দেখছিলেন না? কিন্তু যাঁদের তিনি বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁদের নির্দেশই বা অমান্য করবেন কি করে, আরো কিছুদিন না দেখে?

চাটগাঁর রেল ও ষ্টীমার ষ্ট্রাইক ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে ওখানকার অসহযোগ আন্দোলনে ইতি পড়ল। অনেকের চাকরী গেল, অনেকের ব্যবসা নষ্ট হল। আর্থিক ক্ষতি হল বহুজনের। লেখাপড়ায় ইতি পড়ল বহু ছেলের। বিরাট জমজমা ন্যাশনাল স্কুল উঠে গেল। একবছরে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন ভাঙ্গলো।

রণক্লান্ত মধ্যবিত্ত, নিজ নিজ জীবনের ছিন্ন সূত্রগুলি জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই সময় সুযোগ পেল গুণ্ডারা। সহরে সিরাজ্যা গুণ্ডা, গ্রামে আজ্যাচোরা ডাকাত। 'চা'য়ের দোকানে এদের ঘাঁটি, গাড়ীওয়ালা সাম্পানওয়ালা এদের বাহিনী, ধনী সওদাগরেরা পৃষ্ঠপোষক, প্রধান শিকার হিন্দু। হিন্দু ছেলেরা পথে ঘাটে অপমানিত হয়, লাঞ্ছিত হয়, মেয়েরা ইস্কুলে যেতে ভয় পায়। চায়ের দোকান নেই এমন পথ কোথায় সহরে? কান বন্ধ করে পথ চললেই কি সব সময় পথ পাওয়া যায়?

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত হিন্দু, ছোট খাট মানুষ এরা। ছোট খাট আশা নিয়ে, ছোট ছোট সুখের সন্ধান করে। পরাধীন দেশের মানুষ, দেশ থেকেও নেই। দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি নেই, পদে পদে বিভীষিকা। ভবিষ্যতের দিকে চায়, দেখে অনিশ্চয়তার নিবিড় অন্ধকার।...পুলিশ কি ছিল না দেশে? নিশ্চয়ই ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে খাটুনীর পরে হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছিল। হয়ত বা মজা দেখছিল।

সরল মানুষ সূর্য সেন। সরলতাই অবশেষে তাঁকে পথের সন্ধান ছিল। ভয়কে জয় করেছিলেন, তাই সত্যকে অনুসরণ করতে কোথাও বাধলো না। গুপ্ত সমিতির স্বাভাবিক গোপনতা পরিহার করে সামনে এলেন। উচিত অনুচিত বিবেচনার সময় আর নেই। মানুষের শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে, মানুষের পাশবিকতার সামনে।

কে দাঁড়াবে? তাঁর সম্বল তো কয়টি ইস্কুল কলেজের ছেলে! মা বাবাকে শুধাও, শুনবে ছেলেরা নিরীহ দুর্বল। হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কর, উল্টে প্রশ্ন করবে, "হিন্দু আবার কবে মুসলমান গুণ্ডার সঙ্গে লড়তে পারে?

তখনো ফিসিক্যাল কালচার ক্লাবে চাটগাঁ ছেয়ে যায় নি। তখনো লোকনাথ যুবক দলের প্রিয় "লোকাদা" হয় নি; দুহাতে দুটি চলন্ত মোটর থামিয়ে শক্তির পরীক্ষায় জনতাকে বিস্ময়মুগ্ধ করে নি। ...হঠাৎ একদিন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল খবরটা—

"আরে ভাই যা পিটালো সিরাজ্যার দলকে লোকা বল।"

"চুপ চুপ, কে কোথায় শুনে ফেলবে:...."

"সিরাজ্যার বাড়ীতে চড়াও হয়ে হাণ্টার দিয়ে পিটিয়েছে। সিরাজ্যা শুধু চেঁচিয়েছে, "আমি না, আমি না; আর করবো না!"

চোখের পলকে ছোট ছোট নিরীহ মানুষদের দুনিয়ার রং বদলে গেল। তাদের ঘরের ছেলের এত তেজ? পথে ঘাটে দোকানে তাচ্ছিল্য অপমানকে সহ্য না করলেও তো চলে! গর্বে তাদের বুক ফুলে উঠল! মনে মনে বলল, দীর্ঘজীবী হোক্ লোকনাথ।

মাষ্টারদার নাম তখনো জনতার কাছে পরিচিত হয় নি। কিন্তু তাঁর কুটির তরুণদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ছেলেদের সদ্যজাগ্রত আগ্রহে তিনি সমিধ সংযোগ করেন। ছেলেদের শুষ্ক শঙ্কিত মনে নতুন আশা নতুন সাহস পল্লবিত হয়ে ওঠে। তারা ক্লাবে যায়, শরীর চর্চা করে। ক্লাবে ক্লাবে সহর ও পল্লী ছেয়ে যায়। ছেলেদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের অন্তরালে, বাড়ীতে স্কুলে মাঠে ক্লাবে, ভাবী "ডেথ প্রোগ্রামে"র গোপন চাকা ক্রমশঃ দ্রুততর গতিতে আবর্তিত হতে আরম্ভ করে, যার পরিণতি ইতিহাসের পাতায় লেখা জালালাবাদের যুদ্ধ। ইতিহাসের দুটি নাম—বিপ্লবী সরকারের প্রেসিডেন্ট সূর্যকুমার সেন, কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল লোকনাথ বল।

The name of Surya Sen redounds to the glory of India and would become a by-word in every Indian home for everything that goes to the making up of an uncompromising, dauntless revolutionary fighter out for the emancipation of his country from foreign thraldom at the cost of bitterest suffering that leaves indelible landmarks on the difficult path leading to the goal.

Kalicharan Ghosh

চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিবরণ-ব্যবসা

অম্বিকা চক্রবর্তী

শ্রীচারুবিকাশ দত্ত লিখিত “চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন” এবং শ্রীআনন্দ গুপ্ত লিখিত “চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী” ও “মাষ্টারদা”—এই তিনটি বই সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থান হইতে আমার বহু পরিচিত ও অপরিচিত বন্ধুরা আমার মতামত প্রকাশের জন্ম পত্রের দ্বারা এবং ব্যক্তিগতভাবে অনবরত অনুরোধ জানাইতেছেন। এই বইগুলি সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশের ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। যাহারা রাজনৈতিক জীবনের দেউলিয়াপনায় আত্মত্যাগের পুঁজি ভাঙ্গিয়া নিজের প্রচারপত্র ছাপাইয়া দুই পয়সা করিতে চায় ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে তাহাদের প্রতি আমি ঘৃণা পোষণ করি এবং তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার সুযোগ দিবার ইচ্ছা আমার নাই। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি গৌরবোজ্জ্বল ঘটনার সহিত নিজেদের জড়িত করিয়া নিরপেক্ষভাবে অবিকৃত ইতিহাস রচনা করা আলোচ্য লেখকদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে কিনা, এই কথা জনসাধারণকে এই যুগে বুঝাইতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কর্মবশে ও বয়সের গুণে আমার উপর যে সত্যাসত্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব আছে, তাহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, চট্টগ্রাম শহীদেরা যে স্বাধীনতার জন্ম আত্মত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের সেই বাঞ্ছিত স্বাধীনতা যেদিন লাভ হইবে সেইদিন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশিত হইবেই। তৎপূর্বে আমি শুধু সেই বিদ্রোহ-বিবরণের নামে যে ব্যবসাবৃত্তি প্রশয় পাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে সাবধান করিতে পারি। জনসাধারণের ও বহু পরিচিত বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া এই বইগুলি সম্বন্ধে তাই সংক্ষেপে আমার বক্তব্য উপস্থিত করিতে হইল।

প্রারম্ভেই আমি বলিতে চাই—শ্রীচারুবিকাশ দত্তের “চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন” এবং শ্রীআনন্দ গুপ্তের “চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী” দুইটি পুস্তকের কোনটিতেই অবিকৃত বিদ্বেষমুক্ত কল্পনাবিহীন যথাযথ কাহিনী স্থানলাভ করে নাই। নিজেদের প্রয়োজনে সুযোগ ও সম্ভবমত ঘটনাকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত

করিতে, এমন কি স্বীয় স্বার্থের হানিকর বহু ঘটনাকে বাদ দিতেও তাঁহারা কসুর করেন নাই। সরকারী কাগজপত্র, যাহার অধিকাংশের সঙ্গে মূল ঘটনার বহুল অংশের সামঞ্জস্য নাই, তাহা হইতেও লেখকগণ নিজ নিজ সুবিধামত এইখান ঐখান হইতে ঘটনাকে সরকারী দলিলের অংশবিশেষ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন—লোকচক্ষে পুস্তককে ঐতিহাসিক ঘটনার খাঁটি দলিল হিসাবে প্রমাণিত করিবার জন্য। সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের তৈয়ারী দলিলের উপর যদি এতই গুরুত্ব দিতে হয় তাহা হইলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সংক্রান্ত পরপর তিনটি মামলার দলিলাদি সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন এই "পুস্তক"-লেখকদের সততার পরিমাণ কতদূর। অধিকন্তু যাঁহারা পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বীকারোক্তি পাঠ করিলেও পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন কোন কোন ঘটনা কি পরিমাণ বিকৃত হইয়াছে; সততা ও নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার শুভ প্রচেষ্টা যদি লেখকদের থাকিত, তাহা হইলে এত তাড়াহুড়া করিয়া চট্টগ্রাম বিপ্লবের সহিত সংশ্লিষ্ট জীবিত কর্মীদের অনেকের অজ্ঞাতে একই সময়ে দুইজন লেখক কর্তৃক একই ঘটনা দুইভাবে চিত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত না।

শ্রীচারুবিকাশ দত্তের লিখিত পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে গিয়া শ্রীমান লোকনাথ বল তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণ শ্রীযুক্ত চারুবিকাশকে না চিনিতে পারিলেও শ্রীমান লোকনাথকে চিনিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। বিশেষত যাহারা তাঁহার বর্তমান দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাহাদের নিকট তাঁহার এই ভূমিকা মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকিবে না। কিন্তু আমার সত্যই দুঃখ হয়, আমি যখন ১৯৩০ সালের লোকনাথ বল এবং বর্তমান লোকনাথ বলের দিকে তাকাই। আমার আরো অত্যধিক দুঃখ হয় যে তিনি চট্টগ্রামের বিপ্লবী শহীদদের আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল উদ্দেশ্যকে তাঁহার বর্তমান মতবাদের ভূমিকায় অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের স্মৃতিকে অপমানিত করিয়াছেন বলিয়া। তাঁহার লিখিত ভূমিকায় শ্রীচারুবিকাশ দত্তের যে পরিচয়পত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা বর্তমান লোকনাথেরই পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর ও তাঁহারই উপযুক্ত বটে। শ্রীচারুবিকাশের রাজনৈতিক ভূমিকা এবং চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের (সূর্য সেনের দলের) সঙ্গে চারুবিকাশের সম্বন্ধের কথা শ্রীমান লোকনাথ এত অল্প সময়ের মধ্যে

স্বার্থের প্রয়োজনে ভুলিয়া গেলেও চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের জনসাধারণ এত সহজে তাহা ভুলিয়া যান নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। সূর্য সেনের সঙ্গে শ্রীমান-লোকনাথের "বিপ্লবী নেতা" চারুদার বহুদিনের "রাজনৈতিক পরিচয়" ও "প্রীতির বন্ধন" ছিল বলিয়া ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্যই তো বটে! এই পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন যদি না থাকিবে তাহা হইলে সূর্য সেন ১৯২১ সালে শ্রীচারুবিকাশকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিপ্লবী দলের যাহা সর্বোচ্চ দণ্ড তাহা প্রদান না করিয়া কি ভাবে স্বীয় দল হইতে শ্রীচারুবিকাশকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন? সূর্য সেনের সঙ্গে শ্রীচারুবিকাশের রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন যদি স্থায়ী না-ই হইবে তবে ১৯২৯ সালে কংগ্রেসী নির্বাচনী সভায় শ্রীচারুবিকাশের দলের লোক সূর্য সেন ও নির্মল সেনের মাথা ফাটাইয়া দিবার ও সূর্য সেনের অতি প্রিয় কর্মী সুখেন্দুকে ছুরিকার আঘাতে হত্যা করিবার পরও দিনের পর দিন সূর্য সেনের দলকে 'গুণ্ডার দল' আখ্যা দিয়া রাস্তাঘাটে শ্রীচারুবিকাশ ও তাঁহার দলের লোকেরা নির্বিঘ্নে ঘুরিয়া বেড়াইতেন কি করিয়া? চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পরও 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ গুণ্ডার দলের কাজ' বলিয়া শ্রীচারুবিকাশ ও তাঁহার সহকর্মীরা গ্রামে গ্রামে স্বদেশী লবণ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন কোন সাহসে? অস্ত্রাগার আক্রমণের পর পলাতকদের কাহারো কাহারো সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে পুলিশ ও মিলিটারীর সহায়তা যখন চারুবিকাশের দলের ছেলেরা করিয়াছে, তখনও সূর্য সেনের সঙ্গে শ্রীচারুবিকাশের 'পরিচয় ও প্রীতির' বন্ধন ছিন্ন হয় নাই, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। না হইলে ফাঁসির মঞ্চ হইতে কি করিয়া সূর্য সেন তাঁহার সহকর্মীদের ডাক দিয়া বলিয়া গেলেন—'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রুদের দুষ্কার্যের প্রতিশোধ লইতে গিয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সংগ্রামের বৃহত্তর শত্রুকে দৃষ্টিপথ হইতে হারাইয়া ফেলিও না।'—আর চারুবিকাশ-লোকনাথ তাহা সঙ্গে সঙ্গে নোটবুকে টুকিয়া লইলেন!

সূর্য সেনের ফাঁসীর পরও তাঁহার বিপ্লবী আত্মা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে শ্রীচারুবিকাশের 'পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন' ছিন্ন হয় নাই। যদি ছিন্ন হইবে তবে ১৯৪৫ সালে এ্যাসেম্বলী নির্বাচনের সময় সূর্য সেনের সহকর্মিনী কল্পনা দত্তের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন 'চারুদা' অকথ্য ভাষায় ইতরতার ব্যবসা খুলিয়া তাঁহার বর্তমান মুনিবদের পুরস্কার পকেটস্থ করিলেন, অথচ সূর্য সেনের বিপ্লবী আত্মার অভিসম্পাত শ্রীচারুবিকাশের উপর বর্ষিত হয়:

নাই তো! রাজনীতির দিক দিয়া সূর্য সেনের সঙ্গে শ্রীচারুবিকাশের 'পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন' ছিল এইরূপ ঘনিষ্ঠ; তাহার বাহিরে একথাও নিশ্চিতরূপে সত্য যে সূর্য সেনের স্ত্রী পুষ্পকুন্তলের নিকট-জ্ঞাতিভাই হিসাবে শ্রীচারুবিকাশের সূর্য সেনের সহিত 'পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন' থাকিবেই। তাই বোধ হয় শ্রীমান লোকনাথ তাঁহার ভূমিকায় খুবই বুদ্ধিমত্তার সহিত লিখিয়াছেন, 'আমাদের সহিত তাঁর যোগসূত্র, দলের দিক দিয়ে অভিন্ন না হলেও তাঁর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।' চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত চারুবিকাশ দত্তের নিজস্ব কীর্তি আরও 'অনস্বীকার্য।'

শ্রীচারুবিকাশ দত্ত যে সব বিষয়ের ভিত্তি করিয়া "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" লিখিয়াছেন শ্রীমান লোকনাথ বল সে সমুদয়ের একটি ফিরিস্তি দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় 'অনেক তথ্য তাঁর জানা, আমরাও (লোকনাথ বল) সরবরাহ করেছি অনেক। আরো অনেক কিছু তিনি সংগ্রহ করেছেন সরকারী দলিলপত্র থেকে।' পাঠকেরা বুঝিতেই পারেন: যে চারুবিকাশ বরাবর সূর্য সেনের দলের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আসিয়াছেন, সূর্য সেনের দলের বিরোধী পৃথক দল গঠন করিয়াছেন, সূর্য সেনের দলকে 'গুণ্ডার দল' আখ্যা দিতে কসুর করেন নাই, সেই চারুবিকাশের নিকট চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী কি পরিমাণ জানা থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্রীলোকনাথ বল ও তাঁহার মতাবলম্বীরা যে কাহিনী সরবরাহ করিয়াছেন তাহা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে সরবরাহ করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা পাঠকেরা শ্রীলোকনাথ বলের লিখিত ভূমিকায় এই লাইন কয়েকটি হইতেই বুঝিতে পারিবেন: 'যারা আজ প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে আমাদের শিশু স্বাধীন রাষ্ট্রকে আঘাত করতে, তাকে দুর্বল করতে প্রয়াসী, তারা নিশ্চিত দেশদ্রোহী। জাতির ক্ষমাহীন ক্রোধ, বিপ্লবী তরুণ তরুণীদের দুর্জয় আঘাত তাদের ধ্বংস করুক।' —চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে ১৯৩০ সালে যাঁহারা বিপ্লবী ছিলেন, বর্তমান রাজনৈতিক মতবাদের বিভিন্নতায় তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুবিধাবাদী মতবাদের আশ্রয় নেন নাই, তাঁহারা অনেকেই শ্রীলোকনাথ বলের মতে দেশদ্রোহী এবং তিনি তাঁহাদের ধ্বংস কামনা করেন। কাজেই এই সমস্ত 'দেশদ্রোহী' চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারীদের সম্বন্ধে শ্রীলোকনাথ বল কিরূপ তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। বিশেষতঃ সূর্য সেনের দলের যে পরিচালক-কমিটিতে

পাঁচজন সভ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীলোকনাথ বল ছিলেন না। কাজেই তিনি কি পরিমাণ নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করিতে পারেন তাহাও সচেতন পাঠকেরা অনায়াসেই বুঝিবেন।

তৃতীয়ত, শ্রীচারুবিকাশ দত্ত সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের তৈয়ারী সরকারী দলিল-পত্র হইতে তাঁহার সুবিধা ও খুশিমত অনেক তথ্য বাদ দিয়া তাঁহার প্রয়োজনে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সব তথ্যের অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য ও সঠিক নহে—এই কথাই আমি প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীমান লোকনাথ বল রাজনৈতিক দরিয়ায় হাবুডুবু খাইবার সময় যাহা কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহাই আশ্রয় করিয়া বাঁচিবার অলীক আশায় যদি শ্রীচারুবিকাশের আশ্রয় লইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে দোষ দিবার কিছুই নাই,—এই লোকনাথকে কৃপা করিতে পারিলেই যথেষ্ট।

শ্রীচারুবিকাশ তাঁহার লিখিত 'পূর্বাভাসে' 'জীবিত কর্মীদের প্রতিটি ব্যক্তির কর্ম ও কীর্তিকে যথোচিত মর্যাদা দান করিয়াছি' বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, এই উক্তির অসারত্ব উপরিলিখিত কারণ মনে রাখিলে কাহারও বুঝিতে দেরী হয় না। বরং ভালো করিয়াই বুঝা যায়—কেন চারুবিকাশ এমন কথা জোর গলায় চেঁচাইয়া বলিতেছেন। কিন্তু বলিতে গিয়া আবার তাঁহার নিজ স্বভাব ও বৃত্তিটিও এই 'পূর্বাভাস'-এইতো প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটি লাইন হইতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন: 'গভীর বেদনার সঙ্গে বলিতেছি—ইতিহাসের এই গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের নায়ক ও কর্মীদের মধ্যে কেহ কেহ আজ ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে গ্রথিত হইয়াছেন। এই কম্যুনিষ্ট দলটি পরাধীন ভারতে ছিল ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্যতম শত্রু। ৪২-এর অভ্যুত্থানে ইহাদের দেশদ্রোহীর ক্লেদাত্মক ভূমিকা জাতির ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীন ভারতেও এই দলের ভূমিকা আজ রাষ্ট্রদ্রোহীর। এই দলেরই পক্ষপুটাশ্রয়ে থাকিয়া চট্টলার বিপ্লবী ভূমিকার ইতিহাস লিখিবার হাস্যকর প্রচেষ্টা হইয়াছে। হয়তো ইহা উদ্দেশ্যমূলক অথবা দলের প্রয়োজনে বিকৃত। তাই এই ইতিহাস লিখিবার সময় সে কথা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতা ও কর্মীসমাজের অনেকেই আমাকে বারে বারে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সাবধান-বাণী সর্বসময়ে স্মরণ রাখিয়াছি।'—স্মরণ রাখা প্রয়োজনও। কারণ রাজনীতির বালাই না থাকুক, আর্থিক যোগাযোগ

অমান্য করা চলে না। কিন্তু শ্রীচারুবিকাশের এই উক্তিতে একটি গ্রাম্য কাহিনী মনে পড়ে। গ্রামের চুরির তদন্তে আসিয়া দারোগাবাবু চোরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—এই গ্রামে চুরি করে কাহারা? চোরটি উত্তরে বলিয়াছিল—'হুজুর, আমি আর আমার মামু ছাড়া গ্রামের সবাই চোর।'

কোনো 'দলের পক্ষপুটাশ্রয়ে থাকিয়া' চট্টলার বিপ্লবী ভূমিকার ইতিহাস লিখিবার হাস্যকর প্রচেষ্টা যে অতীব ঘৃণিত কাজ তাহা আমি স্বীকার করি এবং এই সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া এই কথা বলিতে চাই—শ্রীচারুবিকাশ যদি শ্রীআনন্দ গুপ্ত লিখিত "চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী"কে 'দলেরই পক্ষপুটাশ্রয়ে থাকিয়া লিখিত' হইয়াছে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়া থাকেন, তবে তিনি ও জনসাধারণ জানিয়া রাখুন—কম্যুনিস্ট পার্টির সহিত শ্রীআনন্দ গুপ্তের এই "চট্টগ্রাম বিদ্রোহেব কাহিনী" লিখিবার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। এমন কি আনন্দ গুপ্তের লিখিত বই শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টির নয়, আমারও অজ্ঞাতে লেখা হইযাছে। চালুনী সুঁচের ছিদ্র লইয়া যখন বাডাবাডি করে, তখন বেশী কথা না বাডাইয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে সব নেতা ও 'কর্মীসমাজের' অনেকের সাবধান-বাণী স্মরণ রাখিয়া শ্রীচারুবিকাশ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-কাহিনী লিখিয়াছেন, সেই সব নেতা ও কর্মীসমাজ কাহারা? যাঁহারা অতীতে দলীয় জীবনে একে অন্যের মাথা ফাটাইয়াছেন, মতবিরোধী দলের কর্মীকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করিয়াছেন এবং বর্তমানে সুবিধাবাদী 'অহিংস' দাদারূপে কংগ্রেসী সাজিয়া বিরুদ্ধবাদীদের সংহার করিতে লাঠি, ছুরি, গুলি চালাইতেও কসুর করেন না এবং স্বীয় দলের আওতায় না আসিলে 'রাষ্ট্র-বিদ্রোহী' 'দেশদ্রোহী' 'স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরমশত্রু' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া অন্যের আত্মদানের পুঁজি, দরকার হইলে কংগ্রেস-তহবিলের পুঁজি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করেন—ইহারাই কি সেই 'নেতা' 'কর্মীসমাজ'? শ্রীচারুবিকাশ তাঁহার সারাজীবন চট্টগ্রাম বিপ্লবী-দলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও তাহাদের গৌরবদীপ্ত ('অধ্যায়ের') ইতিহাস রচনা করিতে নিজেকে লজ্জিত মনে না করিতে পারেন, কারণ কোনো সুবিধাবাদীর পক্ষে এত সহজে দু'-পয়সা ও স্বীয়দলের ও নামের প্রচারপত্র ছাপাইবার সুযোগ হওয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে চারুবিকাশ কতই না সুকৌশলে তাঁহার নিজের ও তাঁহার বর্তমান মুনিব 'যুগান্তর' এবং প্রাক্তন মুনিব 'অনুশীলন'

দলের প্রচার-পত্র ধান ভান্‌তে শিবের গান হিসাবে এই বইতে সন্নিবেশ করিয়াছেন! যেন চট্টগ্রাম-বিদ্রোহ ইঁহাদেরই কীর্তি-কাহিনী!

ঔদ্ধত্যের, অনধিকার-চর্চার ও লজ্জাহীনতার একটা সীমা আছে। তাই বিস্ময়ের সীমা থাকে না যখন দেখি—সূর্য সেনের দলের গোপন বৈঠকের কথোপকথন পর্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীচারুবিকাশ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, একজন দল-হইতে-বহিষ্কৃত বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন লোকের পক্ষেও অন্য দলের গোপন বৈঠকের তথ্য জানা সম্ভবপর হইয়াছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায়—শ্রীচারুবিকাশের পুলিশ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তাহা হইলেও বলিতে হইবে পুলিশের কাছে এইরূপ কোন স্বীকারোক্তি নাই এবং ঐ সমস্ত গোপন বৈঠকে উপস্থিত কোনও ব্যক্তি শ্রীচারুবিকাশের চালনায় সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘটনাকে বিকৃত করিতে, মিথ্যার আশ্রয় লইতে, কাল্পনিক ঘটনা নিজ ইচ্ছামত তৈয়ারী করিতে তিনি যে কসুর করেন নাই—শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার প্রয়োজনের খাতিরে রাতকে দিন ও দিনকে রাত করিতেও ক্রটী করেন নাই। এই সমুদয় বিকৃত, মিথ্যা ও কাল্পনিক ঘটনার প্রতিবাদ করিতে হইলে তাঁহার লিখিত "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" হইতেও এক বৃহদাকার পুস্তক প্রকাশ করিতে হয়। শুনা যাইতেছে এই সমুদয় মিথ্যা, বিকৃত ও কাল্পনিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কোন কোন ফিল্ম-কোম্পানী কথাচিত্র তৈয়ারী করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। শ্রীচারুবিকাশের বইয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অসত্য-ভাষণের প্রতিবাদ করা এবং সত্য ঘটনা বর্ণনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়; কিন্তু এই বইটি অবলম্বনে যাঁহারা ফিল্ম তুলিবেন, তাঁহাদের পক্ষে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের কাহারো কাহারো চরিত্র বিকৃত রূপে উপস্থিত করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত ফিল্ম-কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্বের যে সমস্ত ঘটনা এই বইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা যে কি পরিমাণে বিকৃত, দুই একটা নমুনামাত্র এখানে উদ্ধৃত করার মত স্থান ও সুযোগ আছে। পাঠকেরা তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারিবেন—শ্রীচারুবিকাশের সমস্ত ঘটনা জানিয়া লিপিবদ্ধ করিবার সততা কতদূর! এই ক্ষেত্রে ১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বরকে উপলক্ষ্য করিয়া চারুবিকাশ যে সমস্ত মিথ্যা গল্প ফাঁদিয়াছেন তাহা হইতে মাত্র এই কয়টি

ঘটনার উল্লেখ করিতেছি : তিনি লিখিয়াছেন, নাগরখানা-যুদ্ধে পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত নিরাপদ আশ্রয় হইতে বনবিভাগের সাহেবের গুলিতে শ্রীদেবেন দে আহত হইয়াছিলেন। প্রথমত, নাগরখানা পাহাড়ের আশেপাশে তখন কোন সাহেবের বা অফিসারের বাংলো ছিল না। কিন্তু আসল কথা কোনো সাহেবের গুলিতে অথবা অন্য কাহারও গুলিতে শ্রীদেবেন দে আহত হন নাই। শ্রীদেবেন দে এখনও সশরীরে বর্তমান আছেন এবং কলিকাতায় উপরেই থাকেন। এই সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এখনো তাঁহার পক্ষে স্মরণ করা অসম্ভব হইবে না যে, পাহাডের নীচ হইতে পাহাড়ে উঠিবার পূর্বে সমতল ধানী জমির উপরে একটা গ্রাম্যলোকের গাদাবন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া শ্রীযুক্ত দেবেন দে তাঁহার কোষে গুলিবিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া চেঁচাইতে থাকেন এবং চলিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তখন শ্রীঅনন্ত সিং তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া পাহাডে তোলেন; পাহাডে উঠিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে কোথাও গুলি লাগে নাই। ঘটনাটি এত সুবিদিত যে, চট্টগ্রামের ছেলেরা এই ঘটনা লইয়া এখনও কৌতুকাভিনয় করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, নাগরখানা-যুদ্ধের জীবিত ব্যক্তিদের কাহারো কাহারো বীরত্ব এবং পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা ইত্যাদির কাহিনী প্রকাশ করিলে লেখকের এবং তিনি যে-দলের পক্ষপুটাশ্রয়ে থাকিয়া এই কাহিনী লিখিয়াছেন তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থের হানি ও লজ্জার কারণ থাকিতে পারে, বুঝিতে পারি। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবিত নাই তাঁহার বীরত্ব ও তাঁহার উপর অমানুষিক পুলিশ-নির্যাতনের কাহিনী জনসাধারণের কাছে ঠিকভাবে উপস্থিত করিতে ভয়ের কারণ কি ছিল বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীচারুবিকাশের কাল্পনিক কাহিনীমতে আমরা দেখিতে পাই—নাগরখানার পথে বিপ্লবীদলের সঙ্গে পুলিশের ও কাল্পনিক রেজার্স সাহেবের দুইবার খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছে এবং পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে কেহই হতাহত হন নাই; দ্বিতীয় বারে শ্রীদেবেন দে 'আহত' হইয়াছেন এবং সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তীকে পুলিশ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধরিয়া আনিয়াছে। সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী কখন কি ভাবে গুলিবিদ্ধ হইলেন লেখকের লেখায় প্রকাশ থাকিলে পাঠকদের নিকট লেখকের এই সুচতুর কাল্পনিক কাহিনীতে সততার অভাব কি পরিমাণ প্রকাশ পাইয়াছে ধরা পড়িত। লেখক লিখিয়াছেন, 'দৈহিক শক্তিতে নেতা সূর্য সেন ছিলেন বরাবরই দুর্বল।' যাহারা সূর্য সেন সম্বন্ধে কিছুই জানে না তাহারা নেতা সূর্য সেনকে খর্বাকৃতির মানুষ

দেখিয়া হয়তো এরূপ ভুল ধারণা করিতে পারে। কিন্তু আমরা নেতা সূর্য সেনকে কোন বিপ্লবী কাজের সময় এবং নাগরখানা-যুদ্ধের সময়েও দৈহিক শক্তিতে দুর্বল দেখি নাই। বরং আশ্চর্য হইয়া উহার বিপরীত রূপই তাঁহার বরাবর দেখিয়াছি। সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, রাজেন দাস দৈহিক শক্তিতে দুর্বল বলিয়া অবসন্ন হইয়া ক্লান্তি দূর করিতে নাগরখানা পাহাড়ে সঙ্গের অপর তিনজনকে বিদায় দিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, ইহা লেখকের শুধু উদ্ভাবনা নয়, উদ্দেশ্যমূলক উদ্ভাবনাও। সমস্তদিনব্যাপী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেণ্ট ও জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধিত পুলিশ ফোর্স লইয়া চারিদিকে পাহাড়টাকে ঘিরিয়া ফেলিতে আসিলেন। তখন ছয় জন বিপ্লবী এক এক ভাগে তিনজন করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পাহাড়ের দুইদিক হইতে গুলি চালাইতে থাকেন। পাহাড়ের অপরদিকের পুলিশ বিপ্লবীদিগকে পেছন দিক হইতে যাহাতে ঘিরিয়া ফেলিতে না পারে তজ্জন্য এইরূপ যুদ্ধ-কৌশল গৃহীত হয়। এই সংঘর্ষের সময় সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী আহত হইয়া পড়িয়া যান। দুইজন সশস্ত্র অবস্থায় পুলিশের হাতে ধৃত হইয়া অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেন। দুইজন বিপ্লবী ধৃত হইয়াছে শুনিয়া পাহাড়ের অপরদিকের পুলিশবাহিনী অতি উল্লাসের সহিত ধৃতব্যক্তি দুইজনকে দেখিতে ছুটিয়া আসে। সেই সুযোগে রাত্রির অন্ধকারে অনন্ত সিং, দেবেন দে, উপেন ভট্টাচার্য ও রাজেন দাস চলিয়া যান। রাত্রি নয়টার সময় সূর্য সেনকে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কটেজ হস্‌পিটালে এবং অম্বিকা চক্রবর্তীকে চট্টগ্রাম জেনারেল হস্‌পিটালে আনা হয়। রাত্রি বারোটার সময় অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহাদের দেহ হইতে গুলি বাহির করা হয়। তাই, 'পরদিন নবপ্রভাতের প্রথম আলোকসম্পাতে পর্বতগাত্রে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর এলায়িত দেহ পুলিশ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল'—এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে শ্রীচারুবিকাশ যদি তাঁহার প্রয়োজনে 'কাব্য' করার চেষ্টায় আগেকার রাত্রির সেই ঘটনা গোপন করিয়া 'পাহাড়ের মাথায় প্রভাত জাগিয়াছে, নবারুণের প্রথম রশ্মি পাহাড়ের বৃক্ষলতাগুলিকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে, পাখীর প্রভাত-কাকলি মানুষের জীবনের নবপ্রভাতের ঘোষণা করিয়া চলিল'—ইত্যাদি বলিয়া পাঠকদের কাব্যরসের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাতকে দিন করিয়া তেমন কিছু ভুল করেন নাই। কিন্তু কাব্যরস ছাড়াও তাঁহার অন্য লক্ষ্য ছিল। তাই লেখক এক জায়গায়—ধৃত সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী পুলিশের কাছে জবানবন্দী

দিয়াছেন বলিয়া যে স্বকল্পিত গল্প উল্লেখ করিয়াছেন—তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি শ্রীচারুবিকাশকে আহ্বান জানাইতেছি। সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী পুলিশের কাছে জবানবন্দী দেওয়া তো দূরের কথা, পুলিশের কাছে নিজেদের নাম পর্যন্ত বলেন নাই। জজ্ কোর্টে মামলার সময় চার্জশীট গঠন করিবার পর তাঁহারা তাঁহাদের নির্দোষিতা সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন। কোনো বিপ্লবীর ধৃত হইবার পর পুলিশের কাছে নির্দোষ জবানবন্দী দেওয়া কে অপমানকর ও বিপজ্জনক এই কথা চারুবিকাশের মনে না হইলেও বিপ্লবী সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর উহা বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। এই সূত্রে পাঠকদের ইহা বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, শ্রীচারুবিকাশ তাঁহার কাল্পনিক মিথ্যা ও অপমানকর লেখার জন্য যদি প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ না করেন, তবে যথাসময়ে আইনতঃ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে।

এরূপ অন্য একটি কথা—শ্রীচারুবিকাশ লিখিয়াছেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে ব্যারিস্টারীর ফি বাবদ পারিশ্রমিক দেওয়া বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব হইল না। আমাদের মামলা পরিচালনার জন্য দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে কলিকাতায় এক হাজার টাকা প্রথমেই দেওয়া হইয়াছিল। মামলা পরিচালনার জন্য তিনি যেদিন চট্টগ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন সেই দিন কোর্টের পূর্বে তাঁহার বাসায় আরও এক হাজার টাকা সম্পূর্ণ তাঁহাকে দিতে পারা যায় নাই, তাই তিনি মামলা সুরু হইবার সময় কোর্টে আসিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; অবশ্য উক্ত এক হাজার টাকা আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা সংগ্রহ করিয়া বাসায় তাঁহাকে দিলে তিনি কোর্টে আসিয়া উপস্থিত হন। কাজেই এই সব অপ্রিয় ঘটনাতে শ্রদ্ধেয় দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে টানিয়া না আনিলেই লেখক ভাল করিতেন। আজ এই কথা এইখানে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম বলিয়া আমিও অত্যন্ত দুঃখিত।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে চারুবিকাশের "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" এবং শ্রীআনন্দ গুপ্তের "চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী" দুই বইয়ের কোনটিতেই অবিকৃত যথাযথ ঘটনা স্থান পায় নাই। নিজ নিজ প্রয়োজনে লেখকেরা কাল্পনিক, অতিরঞ্জিত, বিকৃত ঘটনা সমাবেশ করিয়াছেন; শুধু তাহা নহে, এই সব ঘটনাকে রূপ দিতে গিয়া দলের নেতাদের নিকট জ্ঞাত ও অজ্ঞাতকুলশীল অনেক অপ্রধান কর্মীকে বিপ্লবী বীরের আসনে বসাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, ফলে মূল ঘটনার সঙ্গে পুস্তকে সন্নিবেশিত অনেক ঘটনার কোন

সামঞ্জস্য নাই। এক পুস্তকে যাহাদের বিপ্লবী বীরত্বের কাহিনীতে লেখক পঞ্চমুখ হইয়াছেন, অন্য পুস্তকে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুর উল্লেখ নাই। এইরূপ হীন প্রচেষ্টা শুধু দলের সাধারণ কর্মীদের বিষয়ে হইয়াছে তাহা নহে, নেতাদের লইয়াও হইয়াছে। শ্রীচারুবিকাশের পুস্তকে শ্রীমান লোকনাথকে 'জালালাবাদ-যুদ্ধের অধিনায়কে'র ভূমিকায় চিত্রিত করা হইয়াছে। আনন্দ গুপ্তের পুস্তকটিতে লোকনাথের ছবিটি পর্যন্ত স্থান পায় নাই। কল্পনা দত্ত সম্বন্ধে শ্রীচারুবিকাশও তাহাই করিয়াছেন। জীবিতদের নিয়াই যে লেখকেরা এরূপ ছিনিমিনি খেলিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, মৃত শহীদদের সম্বন্ধেও লেখকদের একই মনোভাব দেখিতে পাই। লেখকদের ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মৃত শহীদদের জীবনের অনেক বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর উল্লেখই করা হয় নাই। লেখকেরা হয়ত বলিবেন উহা তাঁহাদের জানা নাই। কিন্তু যাহাদের জানা আছে সাধারণ সৌজন্যের খাতিরেও তাহাদের কাছে লেখকেরা কিছু জানিতে চাহেন নাই কেন? এমন কি সূর্য সেনের বিপ্লবী জীবনটাকে লেখকেরা ইচ্ছামত চিত্রিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা যেমন খুশি তাঁহার জীবনের অনেক মূল্যবান ঘটনা ও বিপ্লবী কাহিনী বাদ দিয়াছেন। আমি ভাবিতে পারি নাই কোনো লেখকের হাতে বিপ্লবী বীর সূর্য সেনের জীবনী অসম্পূর্ণ ও বিকৃতভাবে লিখিত হইতে পারে। সূর্য সেনের ফাঁসির মঞ্চের শেষ বাণী এখনও চট্টগ্রামের বহু রাজনৈতিক বন্দীর ঘরে ঘরে আছে। তাঁহার সে বাণীটি পর্যন্ত যথাযথ উদ্ধৃত না করিয়া লেখকদের ইচ্ছামত সেই বাণীর বিকৃত বিশ্লেষণ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে।

সূর্য সেনকে লইয়া যখন এই খেলা চলিতে পারে তখন বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ বিষয়ে যে যাহা খুশি করা চলিবে তাহা আশ্চর্য নয়। অবশ্য বিপ্লবী দলের অনেকেই তাহা পড়িয়া হাসিবেনও।

বাংলার বিপ্লবী দলে কংগ্রেসের মত সভা ডাকিয়া দলের রুই কাত্‌লা চুনো পুঁটি সবাইকে একত্র করিয়া ভোটের জোরে প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইয়া কোন 'অ্যাকশনের' কার্যক্রম ঠিক হইত না। অন্তত সূর্য সেনের দলে এইরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। কিন্তু শ্রীচারুবিকাশের লেখনীতে প্রকাশ—অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের আগে ও পরে দলের ছোট বড়দের সভা ডাকিয়া অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অ্যাকশনের কার্যক্রম ও নেতা ঠিক করা হইয়াছে। শ্রীচারুবিকাশ শুধু নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন তাহা

নহে, বাংলার বিপ্লবী দলের লৌহ-দৃঢ় শৃঙ্খলা ও গোপনীয়তার মাথায়ও কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

এই 'সিনেমা'-সৌভাগ্য শ্রীমান আনন্দ গুপ্তেরও কাহিনীর উদ্দিষ্ট কি না জানি না। কিন্তু শ্রীআনন্দ গুপ্তের "চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী" ও তাঁহার লিখিত "মাষ্টারদা" (সূর্য সেনের জীবনী) যে এইভাবে প্রকাশিত হইবে তাহা আমার ধারণার অতীত ছিল। তিনিও তাঁহার খুশিমত স্বীয় খেয়ালের সমর্থনে সরকারী দলিলপত্র হইতে অনেক লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বহুলাংশে শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া রচনা করিয়াছেন। নিজেকে সবজান্তা বলিয়া প্রচার করিতে গেলে এইরূপ ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সময় শ্রীমান আনন্দ মাত্র ষোড়শ বর্ষীয় বালক ছিলেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সমস্ত কার্যক্রম এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আগেকার এবং পরেকার সমস্ত ঘটনা তাঁহার জানা থাকা সম্ভবপরও ছিল না। তাঁহার লেখা হইতে বোঝা যায় তাঁহার জনকয়েক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ও নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। তাঁহার লেখনীতে বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনকে যে কত ছোট করা হইয়াছে তাহা তাঁহার মত তরুণের পক্ষে হয়ত বোঝা সহজ নয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা ভাষায় প্রকাশ করাও দুঃসাধ্য। দলের যে সমস্ত কর্মীর বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না এবং ভয়ে যাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য দলের কাজ ছাড়িয়া দিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, দুই পয়সা উপার্জন করিতেও কম চেষ্টা করেন নাই, তাঁহাদের অজ্ঞাত-বাসের কাহিনী এই পুস্তকে পাতার পর পাতা লেখা হইয়াছে, কিন্তু বিপ্লবী নেতা সূয সেনের পলাতক জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী, যাহা চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে আজও সুবিদিত, তাহার উল্লেখ পুস্তকের কোথাও নাই। ফেণী-সংঘর্ষ হইতে সুরু করিয়া চন্দননগর-সংঘর্ষ পযন্ত শ্রীমান আনন্দ ও তাঁহার দুই-তিনটি বন্ধুর কীর্তি-কলাপের কাহিনীতে পুস্তক ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। অথচ চট্টগ্রামের মাটিতে থাকিয়া বিপ্লবীদের অজ্ঞাতবাসের বহু কঠিন, ক্লেশকর, বীরত্বপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কাহিনী তাঁহার পুস্তকে স্থান লাভ করে নাই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রথম পর্যায়ের মামলায় সরকার পক্ষ ডাকাতি, লুঠ, খুন প্রভৃতি বাবদ ভারতীয় দণ্ডবিধি-অভিযোগ উত্থাপন করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের মামলায় সরকার পক্ষ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারায় (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা) রুজু করে। সেই সময়ে মামলায় আইন-সংক্রান্ত বহু বিতর্কমূলক ও রহস্যজনক প্রশ্নের

উদ্ভব হয়। কিন্তু শ্রীমান আনন্দ প্রথম মামলার কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া যেরূপ উৎসাহ দেখাইয়াছেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় মামলার বর্ণনা করিতে গিয়া সেরূপ উৎসাহ তো দূরের কথা, উহার কোনও গুরুত্বদানও প্রয়োজন মনে করেন নাই। আমি আগেই বলিয়াছি তাঁহার রচনা পক্ষপাতিত্ব দোষ হইতে মুক্ত নহে। যেখানে লোকনাথ বলের ছবির জন্য একটু স্থান হয় নাই, সেখানে শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও শহীদ অমরেন্দ্র নন্দীর পাশে জীবিত কোনো কোনো মুখ্য বা গৌণ বন্ধুর ফটো স্থান লাভ করিয়াছে। তাড়াহুড়ার জন্যই হউক অথবা তাঁহার অনিচ্ছাকৃত অবহেলার জন্যই হউক, অনেক শহীদের ছবি তাঁহার পুস্তকে স্থান পায় নাই। মৃত শহীদদের সকলের ফটো পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল না, কিন্তু শহীদদের যথাসম্ভব সকলের ফটো পুস্তকে স্থান না দিয়া জীবিত বন্ধুদের ফটোর স্থান করিয়া দেওয়া শুধু দুঃখের বিষয় নহে, কলংকের ব্যাপারও বটে। এই পুস্তকের বিস্তৃত প্রতিবাদ যখন বাহির হইবে, তখন প্রত্যেকটি বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিব। শ্রীআনন্দ গুপ্ত লিখিত "চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী" পুস্তকে শ্রীমান অনন্তলাল সিংহ এক সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। সেই ভূমিকায় তিনি তাঁহার বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার ও বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভূমিকা পাঠ করিবার সময় পাঠকদের এবং তাঁহার সহকর্মী ও বন্ধুদের মনে তাঁহার সম্বন্ধে কয়টি প্রশ্ন স্বতই উঠিবে। তিনি সেই সমুদয় প্রশ্নের জবাব ইচ্ছা করিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন কি না জানি না। আর যদি ভুলক্রমে তাঁহার সেই সমস্ত কৃতকার্যের কাহিনী বাদ পড়িয়া থাকে, তবে পাঠকদের কৌতূহল মিটাইবার জন্য এখনও প্রকাশ্যে সেইগুলি প্রচার করিলে তাঁহার অনেক বন্ধু ও পাঠক উপকৃত হইত। প্রধান দুই একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়: চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় হইবার কথা ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ একই সময়ে হওয়ার কথা ছিল। বিভিন্ন দলের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করিতে চলিয়া গেলেন, এমন কি লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের দল Auxiliary Force Armyর সীমানার মধ্যে ঢুকিয়াও পড়িয়াছিলেন, এমন সময় খবর আসিল—অনন্ত সিং তাঁহার মাতাপিতা ও পরিবারস্থ লোকজনের নিরাপত্তার জন্য নেতাদের অজ্ঞাতে ও বিনা অনুমতিতে তাঁহাদিগকে বরিশাল ষ্টীমারে রাখিতে জাহাজ-ঘাটে গিয়াছেন। তাঁহার আসিতে দেরী হইবে।

সময় এক ঘণ্টা পিছাইয়া দেওয়া হউক। দ্বিতীয়ত, পুলিশ-লাইনে যখন বিপ্লবীদের উপর শত্রুপক্ষের লুইস গানের গুলির বর্ষণ শেষ হয় নাই, তখন তিনি ও তাঁহার অপর তিন বন্ধু অগ্নিদগ্ধ হিমাংশুকে নেতাদের বিনা অনুমতিতে লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং পুনরায় বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যথাসময়ে ফিরিয়া আসেন নাই। তৃতীয়ত, চন্দননগরে আত্মগোপনের সময় নেতাদের অজ্ঞাতে ও বিনা অনুমতিতে লর্ড সিংহ রোডে গিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। চতুর্থত, ফাঁসির রজ্জু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য চট্টগ্রাম জেলে বিচারাধীন অবস্থায় পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেট হিকস্ সাহেবের সঙ্গে ডিনামাইট-মামলার দায় মীমাংসা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রহস্যপূর্ণ ঘটনার শ্রীঅনন্ত সিংহের লিখিত ভূমিকায় ও শ্রীআনন্দ গুপ্তের লেখায় কোথাও উল্লেখ বা উত্তর নাই। অথচ শ্রীআনন্দ গুপ্ত 'আমাদের ভুল ত্রুটি' হেডিং দিয়া একটি অধ্যায় পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়া পাঠকদের অনেক কিছু জানিবার কৌতূহল মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীমান আনন্দ ও শ্রীচারুবিকাশ দত্তের হাতে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী যথাযথভাবে রচিত হইলে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতাম, ইহা বলাই বাহুল্য। *

---

* সৌজন্য: পরিচয়, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯

'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি'

চন্দ্রকুমার সেন

[সূর্য সেনের জেঠতুতো দাদা চন্দ্রকুমার সেন এবং এই গ্রন্থের সম্পাদক, চট্টগ্রামের জে, এম. সেন্স ইনষ্টিটিউটে সহকর্মীরূপে (১৯৪৬-৫০) কাজ করতেন। মাষ্টারদা সম্পর্কে সম্পাদকের ঔৎসুক্য জেনে চন্দ্রবাবু তাঁকে অনেক কথা, অনেক তথ্য দিনের পর দিন শোনান। অবশেষে সম্পাদকের অনুরোধে চন্দ্রবাবু তাঁকে লিখিতভাবে যা দিয়েছিলেন, তার অবিকল অনুলিপি এখানে মুদ্রিত হল।—সম্পাদক]

জন্ম: (চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে সূর্য্য সেন জন্মগ্রহণ করে।) পিতা রাজমণি সেন। ৫।৬ বৎসর বয়সে পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠতাতের (গৌরমণি সেন) তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়। জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না। সহোদর ভ্রাতা না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অকৃত্রিম সহোদর-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক ছিল। বাল্যকাল হইতে পিতা ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন। পুত্রও পিতৃগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। জীবনে ইহা বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল।

শিক্ষা: প্রথমে গৃহে শিক্ষালাভ করে। পরে গ্রামের দয়াময়ী উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়ে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে নয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে। ঐ স্কুল তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল না। এজন্য চট্টগ্রাম সহরে নেশনেল হাইস্কুলে ভর্তি হয়। ঐ স্কুল হইতে ১৯১২ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তৎপরে চট্টগ্রাম কলেজ হইতে আই, এ, পরীক্ষা এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়। অঙ্কশাস্ত্রে তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।) ছাত্রজীবনে সহপাঠী ও বন্ধু-

ছাত্র তাহার নিকট অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিত। তাহার শিক্ষাপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা শুনা যায়। এজন্য তখন হইতে ছাত্রসমাজ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

মধুর আলাপ, সদয় ব্যবহার, সরলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণে কঠোরতা ও ধর্ম্ম-প্রবণতা প্রভৃতি গুণ তাহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মিথ্যাবাদীকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করিত। মিথ্যাবাদীকে কখনও প্রশ্রয় দিত না। জীবনে কখনও মিথ্যাকথা বলে নাই। ছাত্রজীবনের একটি দৃষ্টান্ত লিখিত হইল:

চট্টগ্রাম কলেজে থার্ড ইয়ারের বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ......পরীক্ষার দিন কোন অনিবার্য্য কারণে পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইতে তাহার বিলম্ব ঘটে। প্রশ্নপত্র দেওয়ার ১৫।২০ মিনিট পরে সে হলে প্রবেশ করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট seat-এ বসে। পুস্তক ও ছাতাও সঙ্গে থাকে। পালির অধ্যাপক মহিমবাবু (মহিম বড়ুয়া) তাহার এই ত্রুটির প্রকৃত কারণ জানিয়াও অধ্যক্ষ সাহেবের গোচরীভূত করেন। ইহাতে মহিমবাবুর কৃতিত্ব কি পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল জানি না। যাহাই হউক, অধ্যক্ষ মহাশয় তাহার পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেন এবং তাহার অভিভাবককে (চন্দ্রকুমার সেন) ট্রান্সফার লইয়া যাইবার জন্য জানান। বাধ্য হইয়া ট্রান্সফার লইতে হয়। অন্যান্য কারণে ও অকৃতকার্য্যতার ভয়ে বহু ছাত্র ঐ কলেজ হইতে ট্রান্সফার লইতে বাধ্য হয়। তাহার সহপাঠী ও বন্ধু অগেশ রক্ষিতও ট্রান্সফার লন। তাহার (সূর্য্য সেনের) ট্রান্সফারে অধ্যক্ষ মহাশয় Bad conduct বলিয়া মন্তব্য করেন। ইহাতে তাহার ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল মনে করিয়া সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এই সার্টিফিকেট গোপন করিয়া অন্য কলেজে ভর্ত্তি হইতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করে। পরে অগেশবাবু ও সে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে যায়। তখনকার অধ্যক্ষ হুইলার সাহেব। তিনি ছুটিতে ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোন সদাশয় অধ্যাপকের দয়ায় তাহারা উভয়ে সে কলেজে ভর্ত্তি হয় এবং সেই কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করে। সার্টিফিকেট গোপন করিয়া অন্য উপায়ে ভর্ত্তি হওয়া তাহার অভিপ্রেত ছিল না।

বি, এ, পড়িবার সময় খরচ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কানুনগোপাড়ার ৺কিশোরী দত্তের নিকট হইতে তাহার অভিভাবক কিছু টাকা গ্রহণ করে। কথা থাকে যে, ঐ টাকার পরিবর্ত্তে সে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিবে। কিন্তু তিনি বিবাহ দেওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া ঐ টাকা আদায়ের জন্য কোর্টে

উপস্থিত হন। কোর্টে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা মোকর্দ্দমা জয়ের আশা নাই বলিয়া তাহার (সূর্য সেনের) পক্ষের লোকেরা তাহাকে ভয় দেখাইল, ইহাতে সে কোর্টে জবানবন্দী দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। টাকা পরিশোধ দিয়া মোকর্দ্দমা নিস্পত্তি করা হইল। মিথ্যাকে সে কি প্রকার ভয় করিত তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

বিবাহঃ বি, এ, পাশ করিবার পর কিশোরীবাবুদের জ্ঞাতি নগেন্দ্র লাল দত্তের কন্যাকে বিবাহ করে। পাত্রী রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। তাহা হইলেও বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার তেমন ছিল না। অভিভাবকগণের পীড়াপীড়িতে সে এই বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। উভয়ের সে সম্বন্ধ তেমন মধুর হয় নাই। কারণ উভয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সংসারের প্রতি তাহার আগ্রহ ছিল না।

কর্ম্মজীবনঃ প্রথমে সে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হরিশ দত্তের নেশনেল স্কুলে স্বল্প বেতনে শিক্ষকতা করে। অসহযোগ আন্দোলনের পরে ঐ স্কুল উঠিয়া গেলে উমাতারা স্কুলে অঙ্কশিক্ষকের পদ গ্রহণ করে। প্রাইভেট টিউসনেও তাহার সুনাম হয়। ছাত্রসমাজ তাহার শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বহু ছাত্র তখন হইতেই তাহার চরিত্রকে অনুকরণ করিতে থাকে। বাগাড়ম্বর তাহার ছিল না। স্বল্পভাষী ছিল। অর্থপূর্ণ ও উপদেশমূলক কথা বলা তাহার অভ্যাস ছিল। অবসর সময়ে সে নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিত। নির্জ্জনে ও নিঃসঙ্গে সে যে সময় কাটাইত তাহা ঈশ্বরচিন্তা ও দেশসেবার চিন্তা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ছাত্রগণ দেশসেবার অনুপ্রেরণা পাইয়া যে দল গঠন করিয়াছিল তাহা .... নামে অভিহিত। সে বিলাসী ও সুখভোগী ছিল না। সাধারণভাবে জীবনযাপন করিত। দরিদ্র ছাত্রদিগের শিক্ষার ভার নিজে বহন করিত। বিনা পারিশ্রমিকে অনেক দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার ভার লইত। এমন কি নিজ পরিবারের অভাব-অনটনের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না। স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ অর্থদ্বারা নিজের খরচ নির্ব্বাহ করিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা পরের বিশেষতঃ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিত। কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিত না। এবং যাহাকে সাহায্য করিত তাহাকে ইহা প্রকাশ না করিবার জন্য নিষেধ করিয়া দিত। কোন প্রকারে তাহা প্রকাশিত হইলে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইত। এজন্য তখনকার ছাত্রগণ তাহার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ ছিল।

সে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পিতার কোন কাজকর্ম্ম ছিল না। পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর নির্ভর করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহার আচরণে ও ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

সূর্য্য সেন ও চট্টগ্রামের চারুবিকাশ দত্ত প্রভৃতি চট্টগ্রামের দেওয়ান বাজারে উকীল সুরেন দাসের বাসায় থাকিতেন। সে সময় চারুবাবুর সঙ্গে তাহার রাজনৈতিক মতানৈক্য ঘটে। বিপ্লবীদলে মেয়েদের স্থান দেওয়া তখনকার অবস্থায় তাহার মত ছিল না। ইহাই তাহাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণ। কিন্তু এই মতানৈক্য এমনই চরমে উঠে যে, যাহার ফলে তাহাকে ঐ বাসা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়।

মাঝি রে, তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল্,
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয়-পথিক চ'ল্‌বি ফিরি
দ'ল্‌বি পাহাড় কানন গিরি
হাঁকছে বাদল, ঘিরি' ঘিরি'
নাচ্‌ছে সিন্ধুজল।
চল্ রে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল্।

॥ সর্বহারা : নজরুল ॥

মাষ্টারদা সূর্য সেনকে যেমন দেখেছি

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ কানুনগো

স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত বিপ্লবী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক ;
নহে প্রেয়সীর অশ্রুজল।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা বীর বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন (মাষ্টারদা) সম্পর্কে কবির এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ হতে দেশকে মুক্ত করার মহান্ ব্রতে এবং দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে বহুবীর ও বিপ্লবীসন্তান আত্মাহুতি দিয়ে দেশের মৃত্যুভয়হীন সন্তানদের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন। ঋষি অরবিন্দ, বারীন ঘোষ প্রভৃতি মুরারীপুকুরের বিপ্লবী গোষ্ঠী, বালেশ্বর বুড়ীবালাম অভিযানের নেতা বাঘা যতীন এবং অগ্নিশিশু শহীদ ক্ষুদিরাম প্রভৃতি মাষ্টারদার পূর্বসূরী ছিলেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন এবং ১৯১৮ সালে বি. এ. পাশ করার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বৌদির সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিবাহিত হয়েও যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী শ্রীমার [সারদা দেবীর] মত তাঁর অপরূপ-রূপলাবণ্যময়ী পত্নী পুষ্পকুন্তলা দেবীকে বিবাহের অব্যবহিত পরে (তাঁর শাশুড়ীর কাছে শুনেছি ফুলশয্যার দিন প্রাতঃকালে) কি করে মহাশক্তি কালীর সম্মুখে কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিয়ে সেদিনই গৃহত্যাগ করে তাঁর অভীষ্ট বিপ্লব সাধন-পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, এ পরম বিস্ময়ের বিষয়। বিপ্লবী মহানায়কের বৈশিষ্ট্যই এই। অন্যদিকে তাঁর রূপ-লাবণ্যময়ী স্ত্রীও মা সারদামণির মত অস্বাভাবিক আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মাষ্টারদার বিপ্লব-সাধনার ব্রতে সহায় হয়েছিলেন। তাই মাষ্টারদার পূত স্মৃতির সঙ্গে এই মহীয়সী নারীকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, যিনি সাধারণ গৃহের কুলবধূ হয়েও পতিদেবতার সাধনার সিদ্ধির জন্য সারদামণি দেবীর ন্যায় দুশ্চর তপস্যায় রত ছিলেন।

মাষ্টারদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯১৯ সালে। তখন আমি নয়াপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র। বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর আমরা কতিপয় ছাত্র স্বর্গত শিক্ষক অতুলচন্দ্র সেনের প্রেরণায় একটি সমাজ সেবা সংঘ (Social Service league) সংগঠন করি। এই সংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল—সমাজ কল্যাণ, দুঃস্থ ও আর্তের সেবা, নৈতিক চরিত্র গঠন, নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলন এবং ছেলেদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। এই সংঘের অর্থভাণ্ডারে প্রথমতঃ স্বর্গত মোক্ষদারঞ্জন রায় (বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও রেক্টর) ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা দেন। আমাদের সংঘের বিশিষ্ট সমাজসেবী, সহপাঠী একজন কর্মী (৺প্রমথনাথ সরকার) কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। আমি ও আমার অন্য দুইজন সহপাঠী ও কর্মী তার সেবাশুশ্রূষার জন্য পশ্চিম নয়াপাড়া গ্রামে একরাত্রে নয়াপাড়ার জনৈক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে (৺শ্যামাচরণ সেন—শ্যামডাক্তার নামে তিনি অভিহিত ছিলেন) নিয়ে রোগীর বাড়ী যাই এবং ডাক্তার মহোদয়ের নির্দেশে রোগীর শয্যাপার্শ্বে থেকে তার সেবাশুশ্রূষার কাজে নিযুক্ত থাকি। এমন সময় গভীর রাত্রে মাষ্টারদা ও তাঁর বন্ধু অন্যতম বিপ্লবী নেতা চারুবিকাশ দত্ত (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-গ্রন্থ প্রণেতা) খবর পেয়ে আমাদের ঐ রোগী সহপাঠী ও কর্মীকে দেখতে আসেন। ঐ বন্ধুটী মাষ্টারদার খুব প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত কর্মী ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ঐ বন্ধুটি আরোগ্য লাভ করে। মাষ্টারদা ও চারুবাবু একদিন ওখানে থেকে আমাদের অনেক উপদেশ দেন এবং আমাদের কাজের উৎসাহ দিয়ে আবার চট্টগ্রাম সহরে ফিরে যান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সে সময় মাষ্টারদা চট্টগ্রাম সহরে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

তারপর আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে পড়ি, সে সময় মাষ্টারদার চট্টগ্রাম সহরের বাসাবাড়ীর খুব নিকটে তাঁর খুড়শ্বশুরের বাড়ীতে (দেওয়ানজী পুকুরের দক্ষিণে তাঁর শ্বশুর বাড়ীর সংলগ্ন বাড়ীতে) গৃহ-শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। এ সময় প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আলাপাদি হত। তিনি তখন দেওয়ান বাড়ী পাহাড়ের নীচে দক্ষিণ ভূর্ষী গ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের (মাটীর কোটা খড়ের ছাউনীযুক্ত) বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন এবং নিকটস্থ একটি মেসে আহারাদি করতেন। মাষ্টারদার বাড়ীটিতে দু'টী কক্ষ ছিল। একটি কক্ষে তিনি উপাসনাদি করতেন। অন্য কক্ষে তাঁর শয়নের ব্যবস্থা ছিল এবং লোকজনের বসবার জন্য চৌকি পাতা ছিল।

এখানে দু'টী আলমারী ভর্তি পুস্তকাদি ছিল। পুস্তকের মধ্যে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস, বঙ্কিমচন্দ্র ও কবি নবীন সেনের গ্রন্থাবলী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতার বই প্রভৃতি ছিল। এগুলি ব্যতীত গীতা, চণ্ডী, রামকৃষ্ণ কথামৃত, স্বামী বিবেকানন্দের অনেক বইও ছিল। তিনি তখন উমাতারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর বাড়ীটি অনেকটা ব্রহ্মচারীর আশ্রমের মতই ছিল।

তাঁর বাড়ীতে তখন বিপ্লবী সহকর্মীরা প্রায়ই যেতেন এবং গোপনে পরামর্শাদি করতেন। তিনি খুব সাদাসিধে ও অল্পভাষী লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও সংগঠনপটু ব্যক্তি বিরল। বিপ্লবী পরিকল্পনা বা পরিচালনার কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত ও প্রকৃত নেতা ছিলেন।

১৯২৩ সালে আমি যখন চতুর্থ বার্ষিক বিজ্ঞানের ছাত্র, সে সময় আমি আমার আত্মীয় স্বর্গত চন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের বাড়ীর একটি ঘরে থাকতাম এবং শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয় আখেরার (সন্ন্যাসীদের আশ্রম) পশ্চিম দিকে (দেওয়ানজী পুকুরের দক্ষিণে) একটি মেসে (স্বর্গত পূর্ণেন্দু সেন মহাশয়দের মাটির কোটা দ্বিতল বাড়ী) আহারাদি করতাম। ঐ সময় মাষ্টারদাও কিছুদিন ঐ মেসে খেতেন এবং এসময়ে ও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হত। যদিও মাষ্টারদার বিপ্লবী সংগঠনের সভ্য বা কর্মী হওয়ার আমার সৌভাগ্য হয় নি, তথাপি মাষ্টারদা আমাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন ও আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন। একবার চট্টগ্রাম হতে তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতির সময় তিনি তাঁর দু'জন বিখ্যাত কলিকাতার বিপ্লবী বন্ধুদের (পরে জেনেছিলাম তাঁদের নাম চারু রায় (?) ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত) একদিন চট্টগ্রামে থাকার ও খাওয়ানোর ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

দেশের মুক্তিসংগ্রামে বিশেষতঃ সশস্ত্র বিপ্লব অভিযানে যথেষ্ট অর্থ ও আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন। তা অনুধাবন করে ক্রমশঃ অর্থ, বন্দুক, বোমা, রিভলবার ও পিস্তল প্রভৃতি সংগ্রহ হতে থাকে। ১৯২৩ সালে ডিসেম্বর মাসে মাষ্টারদার নির্দেশে তাঁর বিশ্বস্ত ও অত্যন্ত দুঃসাহসী বিপ্লবী কর্মী ও শিষ্য অনন্ত সিংহ আরও ৩।৪ জন কর্মী আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর কয়েক সহস্র (অনুমান ২০০০০) টাকা দুপুর বেলা লুণ্ঠন করেন। এই ঘটনা অনেকেই জানেন। এই দুঃসাহসিক কাজে যদিও

মাষ্টারদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি, তবুও তিনি এই লুণ্ঠন ব্যাপারে জড়িত আছেন মনে করে পুলিশ তাঁকে ও অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের খোঁজ করে তাঁদের ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় থাকে। কিন্তু প্রায় ৩ বৎসর পুলিশের নানা কৌশল, চক্রান্ত ও বেড়াজাল অতিক্রম করে এবং অমানুষিক শারীরিক কষ্ট সহ্য করে ও মানসিক নানা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কোন সময় অনশনে বা অর্ধাশনে থেকে আত্মগোপন করেছিলেন। এই আত্মগোপনকাহিনী অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর।

১৯২৫ সালে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে তিনি কলিকাতায় ৮নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে চট্টগ্রামবাসীদের এক মেসে অন্যতম বিখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গত প্রমোদ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট ৩।৪ দিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতে আসেন। তখন উল্লিখিত মেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। সেখানে চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও ছাত্র অনেকেই থাকতেন। প্রমোদবাবু তখন কলেজের ছাত্র। আমার অগ্রজ স্বর্গত সৌরীন্দ্রনাথ কানুনগোও তখন ঐ মেসে থাকতেন। তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন। সেখানে আমার প্রায়ই যাতায়াত হত।

আমি তখন স্বর্গত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের বৈঠকখানা রোডের বাড়ীতে থাকতাম এবং আইন কলেজে পড়তাম। সকালবেলা আইনের ক্লাস হত। অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় আমি সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে এবং ঝামাপুকুর লেনের এক বাড়ীতে প্রাইভেট টিউশনী করতাম। একদিন অপরাহ্ণে আমি যখন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেই সময় চট্টগ্রামের কুখ্যাত গোয়েন্দা সাব-ইন্সপেক্টার শচীন ভৌমিক আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিসের পাশে ৩।৪ জন লোকসহ (Plain dress Police) চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, পূর্বে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মাষ্টারদার Shelterএ তাঁকে ধরবার জন্য শচীন ভৌমিক চট্টগ্রাম হতে কলকাতায় প্রেরিত হয়েছিল। আমি তখন তার মতলব বুঝতে পেরে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের ঐ মেসে যাই এবং প্রমোদবাবুর কক্ষে [দোতলার] জানালার ফাঁকে মাষ্টারদাকে দেখি। ঐ মেসে "অকুলু" নামক বিহারবাসী একজন ভৃত্য ছিল। সে প্রমোদ বাবুর খুব বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিল। এই ব্যবস্থা ছিল যে অধ্যাপক রায় ও অফিসের বাবুরা ও অন্যেরা খাওয়ার পর তাঁদের কর্মক্ষেত্রে

চলে গেলে "অকুলু" মাষ্টারদার খাবার নিয়ে উপরে গিয়ে দিয়ে আসবে। মাষ্টারদা তখন সবে আহার করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, মাষ্টারদা আমাকে খুব বিশ্বাস ও স্নেহ করতেন। আমি দরজার কাছে যেতেই তিনি আস্তে দরজা খুলে দেন। আমি কথা বলবার চেষ্টা করতেই তিনি মুখে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে চুপ থাকবার নির্দেশ দেন এবং একটি কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছোট অক্ষরে লিখে জানান—Don't talk, I am absconding, please go." আমিও তখন সেই কাগজে লিখে জানাই "D. I. B. Police Sachin Bhaumick is near about." সঙ্গে সঙ্গে কাল বিলম্ব না করে মাষ্টারদা ক্ষিপ্রগতিতে প্রাচীর টপকিয়ে পাশের বাড়ীতে [জনৈক জ্ঞানবাবুর বাড়ী—তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সে সময় বাড়ী ছিলেন না] যান এবং তাঁর বাড়ীর খিড়কী দরজার অর্গল খুলে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যান। প্রায় আধঘণ্টা পর থানার পুলিসসহ শচীন ভৌমিক ঐ মেসে এসে প্রমোদবাবুর ঘরে ও আশে-পাশে সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে খোঁজ করে এবং ভৃত্য অকুলুকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমি মাষ্টারদাকে পূর্বোক্ত খবর লিখে জানিয়ে পুলিস আসার আগেই বের হয়ে ঝামাপুকুর লেনে আমার ছাত্রকে পড়াতে যাই। পরে শুনেছিলাম সন্ধ্যার পর অধ্যাপক রায় ও অফিসের বাবুরা এলে পুলিস Search-warrant দেখিয়ে ঐ বাড়ীর (মেসের) ঘর খানাতালাসী করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে incriminating কোন clue না পেয়ে চলে যায়। পরের দিন সকাল বেলা চন্দ্রশেখর সেনের বাড়ী গিয়ে আমার খোঁজ করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের সন্দেহ হয়েছিল আমার দ্বারা তাদের অভিযান পণ্ড হয়েছিল। আমি এবিষয়ে কিছুই জানি না বলি। প্রকাশ থাকে যে শচীন ভৌমিক পূর্ব হতে আমাকে জানত। মহান্ বিপ্লবী নেতা মাষ্টারদাকে অন্ততঃ ঐ দিন সময়মত আত্মগোপনের ইঙ্গিত দিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।

এই ঘটনার প্রায় দেড় বৎসর পরে ১৯২৬ সালের শেষভাগে কলিকাতার রাস্তায় তিনি ধরা পড়েন এবং বিচারের জন্য চট্টগ্রামে প্রেরিত হন; কিন্তু রেল কোম্পানীর টাকা লুঠ করার মোকর্দমায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণাভাবে তিনি খালাস পান। অনন্তবাবুরাও এই মোকর্দমায় মুক্তিলাভ করেন। যদিও মাষ্টারদা ঐ মোকর্দমায় খালাস পান, সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সেও

তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু এখানে তিনি বিপ্লবীদের সাথে গোপনে সংযোগ স্থাপন করে যাচ্ছেন সন্দেহ করে তাঁকে বোম্বাই রত্নগিরি জেলে বন্দী করে রাখা হয়। ১৯২৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে তাঁর স্ত্রীর গুরুতর অসুখের জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে একমাসের Special leaveএ বাড়ী আসবার অনুমতি দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর স্ত্রী তাঁর উপস্থিতিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরলোকগতা সাধ্বী স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধশান্তির পর তিনি আবার রত্নগিরি ফিরে যান এবং এর কিছুদিন পরেই তিনি জেল হতে মুক্তিলাভ করেন।

এর পর মাষ্টারদার নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরাট পরিকল্পনার প্রস্তুতি আরম্ভ হল। বিভিন্ন উপায়ে বিপ্লবীরা বহু স্থান হতে [কেউ পিতা বা অভিভাবকের বাক্স ভেঙ্গে, কেউ বা আত্মীয়ার স্বর্ণালংকার বিক্রী করে] প্রয়োজনীয় অর্থ এবং আগ্নেয়াস্ত্র—বন্দুক, বোমা, রিভলভার ও পিস্তল ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী তরুণের দল মাষ্টারদার মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত বিটিশ সরকারকে প্রচণ্ড আঘাত হানবার বা উৎখাত করার অন্য উপায় নাই স্থির করে তিনি ও তাঁর সহকর্মী বিপ্লবীরা Indian Republican Army [ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনী] সংগঠন করেন। মাষ্টারদা ছিলেন চট্টগ্রাম শাখার সর্বাধিনায়ক বা প্রেসিডেণ্ট। শুনেছি, এরূপ পরিকল্পনা স্থির ছিল যে যুগপৎ বা একদিনেই সব স্থানে সশস্ত্র বিপ্লব-অভ্যুত্থান হবে, কিন্তু অন্যান্য জেলার নেতারা ও কর্মীরা সময়মত প্রস্তুত না থাকায় মাষ্টারদা ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী গোষ্ঠীর কর্মীরা ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে অনেক দুঃসাহসিক কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন এবং স্থানীয় শাসন-যন্ত্র বা ব্রিটিশ সরকারকে সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত করে দেন। এর পরে ২২শে এপ্রিল ১৯৩০ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের বিখ্যাত জালালাবাদের যুদ্ধ ও অন্যান্য স্থানের খণ্ডযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী অনেকেই জানেন। এসব ঘটনার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যখন অনেক বিপ্লবী ধরা পড়েন এবং চট্টগ্রামে Special Tribunal-এ রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁদের বিচার চলছিল, তখনও মাষ্টারদা ও কয়েকজন দুঃসাহসী বিপ্লবী কর্মী আত্মগোপন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের ধরবার জন্য বা গোপন তথ্য সরবরাহের জন্য প্রলোভন স্বরূপ পাঁচ থেকে দশ হাজার

টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। তবুও দেশের বহু লোক এমন কি অনেক সরকারী কর্মচারী বিভিন্ন উপায়ে মাষ্টারদা ও অন্যান্য বিপ্লবীদের নিরাপত্তা ও আত্মগোপনের সহায়তা করেছেন এবং বিচারাধীন আসামীদের বিরুদ্ধে যে মোকর্দমা চলছিল তার জন্য অর্থ সাহায্যও করেছেন।

এই মহাপ্রাণ, সর্বত্যাগী ও দেশপ্রেমিক মহানায়কের প্রতি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দেশের অধিকাংশ লোকের অটুট শ্রদ্ধা ছিল। কি করে তাঁকে পুলিশের হাত হতে রক্ষা করা যায় এই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। অনেকেই বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় দিয়েছেন। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক অর্থের প্রলোভনে এবং পদোন্নতির আশায় দেশদ্রোহী কতিপয় সরকারী কর্মচারী মাষ্টারদাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বা গোপন তথ্য (আশ্রয়স্থল ইত্যাদি) সরবরাহের জন্য তৎপর হয়। এ সমস্ত চক্রান্ত সত্ত্বেও তিনি প্রায় ৩ বৎসর দেশবাসীর সহায়তায় আত্মগোপন করতে সমর্থ হন। অনেক বিপ্লবী বন্ধুর নিকট জেনেছি, তিনি আত্মগোপন কালেও "গেরিলা" পদ্ধতিতে শত্রুবাহিনীকে আঘাত হানবার এবং বিচারাধীন বিপ্লবী আসামীদের মুক্তির জন্য ডিনামাইট চালিয়ে জেলখানা উড়িয়ে দেওয়ার জন্যেও সচেষ্ট ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন তাঁর আত্মগোপনের সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করছি। আমি সে সময় চট্টগ্রাম সহরে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলাম। পিতৃদেবের অসুখের সংবাদ পেয়ে আমি চট্টগ্রাম সহর হতে অপরাহ্নে মটরলঞ্চযোগে কর্ণফুলী নদীর তীরে ভাণ্ডালজুরি ঘাটে নেমে দেশের বাড়ী যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে পটীযার উকীল সারদাচরণ দেও ছিলেন। একটু যেতেই পথিমধ্যে দু'জন পুলিশ কর্মচারী আমাদের Challenge করে Identity Card দেখাতে বলে। সে সময় সন্ধ্যা ৬½টা কি ৭টা হবে। তখন সহরে ও গ্রামে কারফিউ আইন প্রচলিত থাকায় Identity Card ছাড়া সন্ধ্যার পর কারো চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিল। আমার Identity Card থাকাতে আমাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সারদাবাবুকে (তাঁর Identity Card না থাকায়) ধরে ৺মনোমোহন কানুনগো মহাশয়ের কাঠের গুদামের বাড়ীতে নিয়ে যায়। ঐ সময় ওখানে শ্রীপুর Military Campএর ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টার মণি দাশগুপ্ত আরও অনেক পুলিস সহ সাময়িক Camp

করেছিল। এই পুলিস ইন্সপেক্টার আসামুল্লা দারোগা হতে আরও অত্যাচারী ও ধূর্ত ছিল। পূর্বের গোপন সংবাদ জেনে তারা সেদিন জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে আত্মগোপনকারী মাষ্টারদাকে ধরার জন্য প্রতীক্ষায় ছিল এবং রাত্রে ঐ গ্রামের সন্দেহজনক আশ্রয়কেন্দ্র তল্লাসীর মতলব করছিল। এই খবর আমি পথে যেতে আমার পরিচিত এক চৌকিদারের নিকট পাই।

আমি যখন রাস্তা হতে নেমে মাঠের মধ্য দিয়ে ৺শরৎ ভক্ত (হরিপদ দের পিতা) এবং কৃষ্ণকুমার দের বাড়ীর নিকটে একটি আকক্ষেতের নিকটে আসি সে সময় ঐ আকক্ষেতে ৪।৫ জন লোক খস্‌খস্‌ শব্দ করে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকে। কোন চোর বা অবাঞ্ছিত লোক সন্দেহ করে আমি টর্চের আলো ঐদিকে ফেলি এবং "ঐখানে কে" এই কথা বলি। এমন সময় সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের উপরও দুজন লোক একসঙ্গে টর্চ ফেলে বলে, "আমরা আপনাকে চিনি। আপনি বাড়ী যান, টর্চ জ্বালাবেন না। যদি খাবার বা টাকা পয়সা কিছু সঙ্গে থাকে আমাদের দিয়ে যান।" যে দু'জন লোক আমাকে ঐ কথা বলেন তাঁদের আমি চিন্‌লাম—একজন ধোরলা গ্রামের সুশীল দে ও অপরজন হরিপদ দে। সে সময় মাষ্টারদা বেড়ার খুব নিকটে আসেন এবং ভয় না করে আমাকে বাড়ী যেতে বলেন। আমি তাঁকে ভাল করে দেখি। তাঁর পরণে একটি লুঙ্গী ও গায়ে একটি ফতোয়া ও একটি কাল গায়ের কাপড় ছিল। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দশটি (১০) টাকা দিই (এর বেশী আমার নিকট তখন ছিল না) এবং অসুস্থ পিতৃদেবের জন্যে যে কিছু ফল ও বাড়ীর ছেলেদের জন্য কিছু কলা ও কিছু বিস্কুট ইত্যাদি ঝোলায় নিয়ে যাচ্ছিলাম তার বেশীর ভাগ তাঁদের দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলি, "মণি দাশগুপ্ত ও তার দলবল বোধহয় আপনাদের খোঁজে ঘুরছে এবং এখন ভাণ্ডালজুরি ঘাটের নিকট দেখে এলাম। আপনারা সরে পড়ুন।" এই কথা বলে আমি বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। মনে হল মাষ্টারদা ও তাঁর বিপ্লবী সঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে আকক্ষেত হতে বেরিয়ে হরিপদ দের বাড়ীর গোয়ালের পাশ দিয়ে মাঠে নেমে জ্যৈষ্ঠপুরার সীমানা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে অন্য গ্রামে তাঁদের আশ্রয়কেন্দ্রে যান। এদিনও তাঁর আত্মগোপনে সহায়তা করতে পেরে আমার আত্মপ্রসাদ হয়েছিল। এরপর আর তাঁকে দেখি নাই।

এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে জনৈক অর্থলোভী বিশ্বাসঘাতকের গোপন সংবাদে মাষ্টারদা গৈরলা গ্রামে পুলিশের হস্তে ধরা পড়েন

তারপরে বিচারের প্রহসনে Special Tribunal তাঁর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন এবং চট্টগ্রাম জেলে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী ফাঁসীর মঞ্চে তিনি আত্মাহুতি দেন।

মাষ্টারদা জাতীয় মুক্তির জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং সকল ভারতবাসীর অন্তরে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় চিরদিন অক্ষয় হয়ে রয়েছেন।

মাষ্টারদার নেতৃত্বে সেদিনকার বিপ্লব প্রচেষ্টা তখন ভারতের স্বাধীনতা আনতে পারে নি, কিন্তু সেই বিপ্লব-অভ্যুত্থান ভারতের জনগণকে বিশেষতঃ ভারতের যুবশক্তিকে মৃত্যুভয়হীন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ করতে শিখিয়েছিল, যার ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

মৃত্যুর পূর্বে মাষ্টারদা দেশবাসীর জন্য বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ বিপ্লবী যুবসম্প্রদায়ের জন্য অমূল্য বাণী রেখে গেছেন। "আমার অসমাপ্ত কাজের ভার তোমাদের হাতে দিয়ে গেলাম। এগিয়ে যাও, বন্ধুগণ, এগিয়ে যাও।"

মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে মাষ্টারদার মহৎ জীবনের অবসান হয়। তিনি আজ অমৃতলোকে। তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। এই প্রসঙ্গে অন্যতম মহত্তম বিপ্লবী মহানায়ক Martin Luther King-এর একটি বাণী স্মরণ করে এই নিবন্ধ শেষ করলাম।

"The Quality and not the longevity of one's life is what is important. If you are cut down in a movement that is designed to save the soul of a nation, then, no other death could be more redemptive."

হে বীর বিপ্লবী সাধক, তোমাকে প্রণাম!

মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন

শবদেহ রহস্যের যৎকিঞ্চিৎ

শচীন দত্ত

বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন শুধু যে চট্টগ্রাম বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক ছিলেন তা নয়। ভারতীয় বিপ্লব অভ্যুত্থানের ইতিহাসে তাঁর ছিল অসাধারণ ভূমিকা। স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরম ঐতিহ্যময় তাঁর ও সহ-বিপ্লবিগণের অবদান। এক তরুণদলকে সশস্ত্র বিপ্লবাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ এবং দুর্ধর্ষ সংগ্রামী বাহিনীতে পরিণত করে স্বল্পকাল মধ্যে ঘটনার পর ঘটনার আঘাতে প্রত্যাঘাতে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শাসকের চরম বিপর্যয় ঘটানোর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল বলা যেতে পারে। জীবনে ও মরণে একাধারে সর্বাধিক রোমাঞ্চ, বিস্ময় ও রহস্যঘন ব্যক্তিত্ব তাঁর। অতি শীর্ণকায় ও একান্ত অনাড়ম্বর এই মানুষটির অমানুষী দৈবশক্তির উৎস ও প্রসার এবং লোকোত্তর প্রতিভা স্রষ্টার মহাগৌরবে বিধৃত হয়েছে যুগ-যুগান্তরের কাল-পরিক্রমায়।

১৯৩৪ সনের ১২ই জানুয়ারী মধ্য রাত্রে চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসী-মঞ্চে বিপ্লবী বীর সূর্য সেন ও তরুণ সহযোগী তারকেশ্বর দস্তিদারের জীবনান্ত হওয়ার পর তাঁদের মৃতদেহ সম্পর্কিত ব্যাপার দীর্ঘকাল অজানা বা রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ফাঁসীর পর তাঁদের মরদেহ কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় বা দাহ বা কি করা হয় সে সম্পর্কে বহুকাল অনেক জল্পনা-কল্পনা চলেছিল। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকেও যথাসময়ে খবর দেওয়া হয় নি। মৃতদেহদ্বয় জেলের অভ্যন্তরে বা চট্টগ্রাম শহরের ভিতরে বা বাইরে কোথাও সংকার করা হয় নি। তা'হলে সে সংবাদ কোনও রকমে প্রকাশ পেয়ে যেত। সূর্য সেন তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর ও বে-সরকারী ইউরোপীয়ানগণেরও সমভাবে সাংঘাতিক ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মৃত বা জীবিত এই বিপ্লবী বীরের ছায়া ও কায়া যেন তাঁদের সময়ে অ-সময়ে আঁতকিয়ে তুলত। এ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দৃশ্য বহুবার বহুস্থানে আমার নিজের নজরে এসেছে। সুতরাং বিপ্লবী অধিনায়ক সূর্য সেনের দেহাবশেষও যেন কোনও মতে দেশবাসীর হস্তে

বা নয়নগোচরে আসতে না পারে কর্তৃপক্ষ সেদিকে অতি সন্তর্পণে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সুরু থেকেই চট্টগ্রাম বিপ্লবের যাবতীয় ঘটনাবলীর (১৯৩০-৩৫।৪২ ইং) এবং বহুসংখ্যক স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল ও স্পেশ্যাল বিচারগুলির সারা ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রগুলিতে এবং সংবাদ-সংস্থাব মাধ্যমে সংবাদ-বিবরণী পরিবেশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমি নিযুক্ত ছিলাম। তখন সাংবাদিক হিসাবে সরকারী বে-সরকারী সকল মহলেই আমার যোগাযোগ ছিল। তা সত্ত্বেও উপরোক্ত খোঁজখবরের হদিশ নির্ধারণ আমার পক্ষেও দীর্ঘকাল সম্ভব হয় নি। তবে, শেষ পর্যন্ত যে হার মেনেছি তাও বলতে চাই না। বেশ কয়েক মাস পরে এই পরম জিজ্ঞাসা ও রহস্যের সন্ধানসূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম রেলওয়ে কলোনীর জনৈক প্রবন্ধর ইংরাজ কর্মচারীর বাসভবনে তাঁর মেম সাহেবের অনবধানতায় রাখা এক ডায়েরীর মধ্যে।

ঘটনাটি এরকম। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় উক্ত ইউরোপীয়ান মহোদয় ও তাঁর পত্নী আমাকে চা-ভোজে তাঁদের বাংলোয আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন আমি "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকাবও চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি ছিলাম। তাই ইউরোপীয়ান মহলে আমার খানিকটা যোগাযোগ ও মর্যাদা ছিল। চা-পান ও সাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার পর সাহেব এক টেলিফোন-বার্তা পেয়ে অন্যত্র বেরিয়ে যান। মেম সাহেবকে বলে গেলেন: 'মিঃ দত্তকে কথাবার্তায় engaged রেখো। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।' বৃষ্টিও বেশ জোরে চলছিল। মেম সাহেব খুবই কথা বলেন। চা-র পরে নানারকম খাবারও আসছিল। আমার ভিতরে কিন্তু সেই সন্ধানী মন—মাষ্টারদার মরদেহ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা জেগেই রয়েছে। যদি কথাবার্তার ফাঁকে কোনও হদিস্ মিলে যায়! কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে থাকে। তাই আমরা বাংলোর ভিতর তাঁদের ষ্টাডি রুমে গিয়ে বসেছি। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মেমসাহেব আমাকে কয়েকটি বিলাতী ম্যাগাজিন দিয়ে কি কারণে ভিতরে চলে যান। 'Don't mind' বলে গেলেন। তাঁর টেবিলের কোণে রাখা এক ডায়েরী জাতীয় নোট-বইয়ের উপর আমার কি জানি হঠাৎ নজর পড়ল। কেমন যেন ঔৎসুক্য নিয়ে বইটির পাতা উল্টাতেই 13th January তারিখের পৃষ্ঠায় এক লাইন

লেখা : The Ship—the cruiser—left early hours with precious cargo on board. What a relief—What a relief......! লেখাটি ভয়ানক তাৎপর্যপূর্ণ। আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলল। অনেক কিছু আমার মনের মুকুরে ভেসে উঠছে তখন। আমি সত্যিই বিস্ময়বিমূঢ়। একটা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে শোফায় অর্ধহেলানভাবে ভাবছি আর ভাবছি। মাষ্টারদার দেহাবশেষের ইঙ্গিত কি অবশেষে পেয়ে গেলাম! Cruiser-এর বিষয়ে ডিসেম্বরের শেষদিকে চট্টগ্রাম পোর্টে নোঙর-ফেলা একখানি বৃহৎ জাহাজের চেহারা আমার চোখের উপর ভেসে উঠেছে। প্রায় পনেরো মিনিট পরে মেমসাহেব ফিরে এলেন: 'Sorry, excuse me, Mr,Dutt. I have detained you. I had some work inside.' সঙ্গে সঙ্গে কফি এল। আবার ওঁদের ক্লাবের নানাকথা স্বরু করলেন। আমি মনে মনে ভাবছি, তুমি বাবা ভিতরে গিয়ে ভালোই করেছিলে। যাক্—মিনিট দশেকের মধ্যে সাহেব ফিরে এলেন এবং ড্রাইভারকে দিয়ে আমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রস্থান করি।

পরদিন আমি পোর্ট অঞ্চলে গেলাম এক বিদেশী কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। উদ্দেশ্য: ডিসেম্বরের শেষদিকে যে ক্রুজারখানি এসেছিল সে কবে পোর্ট ত্যাগ করে গেছে তার কিছু খবর মিলে কি না। কিন্তু সাহেব অনুপস্থিত। অবশ্য, আমার পরিচিত এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এসিষ্ট্যাণ্ট ওখানে ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় ডেপুটি ম্যানেজারের কক্ষে কি একটা দেখে এসে বললেন ক্রুজার ১২।১৩ই জানুযারী শেষ রাতে চট্টগ্রাম ছেড়ে গেছে। এদিকে আমার সন্ধানী মন আরও কিছু জোরদার হল।

তারপর কয়েক বৎসর কেটে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যাপক প্রতিক্রিয়ায় অনেক স্থানীয় ব্যাপার চেপে যায়। ১৯৪৪ সনের প্রারম্ভে আমি "অমৃত বাজার পত্রিকা"র ওড়িশা রাজ্যে বিশেষ প্রতিনিধির কাজে যোগ দিতে চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাই। কটকে পৌঁছার কিছুদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক প্রধান অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হয়। ভদ্রলোক বেশ সংস্কৃতিবান্ ও বিবিধ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ বলে মনে হল। তাঁর সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপেই জানলাম যে তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও পরবর্তী বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলীর কোনও কোনও ব্যাপারের তদন্ত কার্যে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। তিনি তখন আমাকে সাংবাদিকরূপে দেখেছেন, যদিও তখন

আলাপ হয় নি। দ্বিতীয় দিন আমাদের দেখা হয় কটকের এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারের বাড়ীতে। তখন আবার চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কথা ওঠে। তিনি নিজেই বলেছিলেন ইংরাজ বীরের জাত বটে, কিন্তু সূর্য সেনের ভয়েই কাবু হয়ে পড়েছিল। তাঁকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে ক্ষান্ত হয় নি। তাঁর মৃতদেহখানি রাতের গহন অন্ধকারে নিয়ে একেবারে সমুদ্রে নিমজ্জন করে দিল। কী আহাম্মকী! যদি কোনও মুনি-ঋষি মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে তাঁর শবে প্রাণসঞ্চার করে দেয়! আমি চুপ থেকেই শুনে যাচ্ছিলাম। আমার চট্টগ্রাম থাকাকালে মাষ্টারদার মৃতদেহ সম্পর্কিত তথ্যের পরিষ্কার সমর্থন পেয়ে যথেষ্ট পুলক অনুভব করলাম।

আরও এক সুষ্ঠুতর সমর্থনের তথ্য এখন স্মরণ হয়। ওড়িশা থাকাকালে এক সম্মেলন উপলক্ষে পুরী গিয়েছিলাম। অপরাহ্নে সমুদ্রতীরে খানিকক্ষণ বিশ্রাম-ভ্রমণ অবস্থায় চট্টগ্রামের পূর্ব-পরিচিত এক রেলওয়ে অফিসারের (অ-বাঙালী) সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ। তিনি ১৯৩০-৩৫।৩৬ সনে চট্টগ্রামে ছিলেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কলকাতায় অন্য এক রেলওয়ে সংস্থার ঊর্ধ্বতন পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার মাধ্যমে আমাদের পূর্ব অন্তরঙ্গতা ফিরে এল। তাঁর স্বনামধন্য পিতা ছিলেন ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় প্রথম ভারতীয় ডাইরেক্টর জেনারেল। এই প্রসিদ্ধ মনীষীর মৃত্যুর পর চট্টগ্রাম থেকেই আমি তাঁর জীবনালেখ্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য লিখে পাঠিয়েছিলাম। বন্ধুবর পুরাণো স্মৃতিচারণায় চলে গেলেন। আমারও আনন্দ হল। তখন অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভায় সম্মুখে নীল সিন্ধুজল অপূর্ব শোভা ধারণ করছিল। তিনি সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যেন কতটা আবেগভরে বলে উঠলেন:

'Mr. Dutt, how do you like this wonderful moment! This sea is so sacred with the holy Seat near-by of Lord Jagannath. It was here, we are told, Chaitanya Mahaprabhu disappeared in the limitless blue. And, for us the moderns, the Bay holds yet greater significance. Do you remember Chittagong's memorable Surya Sen's mortal remains had been consigned in the holy waters somewhere in this sea. But, it was far, far from Chittagong Coast......!'

তাঁর চোখমুখ যেন লাল হয়ে উঠছিল। আমি জানতে চাইলাম কবে, কীভাবে সূর্য সেনের মৃতদেহ এভাবে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়। আমি কিছু অসমর্থিত খবর জানতাম, কিন্তু বিশেষ নয়। তিনি বলেন: 'I am also not aware of details. This is what a friend—a Military Intelligence Officer once told me.' তিনি আরও বলছিলেন, তাই সমুদ্র দেখলেই ঐ কথা তাঁর মনে হয়। 'It was not for any spiritual fulfilment of anybody. It was just a method in madness. The powers that ruled were shedding themselves of unusual fear that Surya Sen spelt for them. Oh—those unforgettable days in Chittagong! Long live Chittagong Revolution.'

বন্ধুবর খুবই অভিজাত বংশীয় দেশপ্রেমিক ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি আজ বেঁচে নেই।

এখন আসল ব্যাপারে আসছি। পূর্ব-ভারতীয় নৌ-বাহিনীর এক বিরাট ব্রিটিশ রণপোত ডিসেম্বরের শেষাশেষি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে নোঙর ফেলেছিল। এ শ্রেণীর ক্রুজার প্রতি বর্ষ ভারতীয় উপকূল বন্দরসমূহ পরিক্রমায় চট্টগ্রামেও আসত এবং রেঙ্গুন হয়ে সিঙ্গাপুরে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাত। এবার ক্রুজারখানি প্রায় ১০।১২ দিন থেকে গেছিল। আমি নিজেও এ বিষয়ে একদিন ওদিকে দেখে ভেবেছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে যে অস্বাভাবিক গুরুত্ব রয়েছে কি করে বুঝব? ক্রুজারখানির চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার তারিখ দু'দিকেই সমর্থন মিলে গেল। মেমসাহেবের মতে "precious cargo" এবং "What a relief…?" শব্দ কয়েকটির অর্থ কিঞ্চিৎ ভাবলেই বোঝা যাচ্ছিল—আমাদের সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নায়কের দেহাবশেষ এবং তাঁর জীবন-সমাপ্তি বিদেশীর রাহুমুক্তি ও তজ্জনিত উল্লাস!

সুতরাং ব্যাপারটি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ১২ই জানুয়ারী (১৯৩৪) শেষ রাত্রেই উক্ত ক্রুজারখানি সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলল কর্ণফুলীর মোহানা থেকে বঙ্গোপসাগরের প্রবল জলোর্মি ভেদ করে। পূর্বাকাশে প্রভাতসূর্যের উদয়শিখরে সুদূরে গাঢ় রক্তিমাভা ধীরে ধীরে সুনীল জলধির অসীমে মিলিয়ে যাচ্ছে। চট্টল-সীমার বাইরে, দূরে—আরও দূরে নীলাম্বুর বক্ষে শহীদযুগলের মরদেহ বিসর্জন দিয়ে

সেই রণতরী সুদূর সিঙ্গাপুরের দিকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। সর্বত্যাগী দেশ-প্রেমিকদের নশ্বর দেহ সেদিন যে মহাসমুদ্রের অতলে বিলীন হল, উত্তরকালে তারই 'অনন্ত শয়নে শায়িত নাভিকমলে ফুটে উঠেছে স্বদেশের স্বাধীনতার শুভ্রকমল।' এ জীবনের উৎসর্জনে রচিত হল ভারত-স্বাধীনতার গৌরচন্দ্রিকা !

সাগরচুম্বিতা ধরিত্রীর এই ভূ-ভাগ, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া। এখানেই পরবর্তী কয়েক বর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল। এ শুধু ইতিকথা নয়—ইতিহাসের নেমিসিস (nemesis)। ভাগ্যচক্রের নির্মম ক্রুর পরিহাসে ব্রিটিশের গর্ব-গৌরব দিনের শেষাঙ্ক এই মহাসাগর সন্নিকটেই প্রকটিত হচ্ছিল। এখানেই নিমজ্জিত মহামানব সূর্য সেনের অমর প্রাণের বিপ্লববহ্নি জেগে রয়েছিল অনির্বাণ শিখায়। 'এ আগুন নিভিবে কেমনে'—কবির অব্যর্থ বাণী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় তথা এশিয়ার জলভাগেই সেকালের অদ্বিতীয় ব্রিটিশ রণপোত ('রিপাব্লিক' ও 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স') সলিলসমাধি প্রাপ্ত হয়। এখানেই ব্রিটিশের পূর্ব গোলার্ধের অন্যতম নৌ-ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন। এখানেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিরভাস্বর সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। যুদ্ধশেষে সাময়িক উদ্ধার ও পরিবর্তন হলেও এখানেই সূচিত হয়েছিল সমাপ্তির সুরু—beginning of the end of the British glory !

(ফাঁসীর মঞ্চে টেনে নেওয়ার পূর্বে পুলিশ ও প্রহরীর দারুণ প্রহারে জর্জরিত হয়েও মাষ্টারদা উদাত্ত কণ্ঠে শেষ বাণী উচ্চারণ) করেছিলেন—প্রথম যৌবনে একদিন পণ করেছিলাম মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যাব। আজ সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতে চলল। (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্) বন্দেমাতরম্।

'মুক্তিপথের অগ্রদূত, হে পরাধীন দেশের
রাজবিদ্রোহী, তোমাকে শতকোটী নমস্কার।'

দ্রষ্টব্য : ৬২ পৃঃ—মেম সাহেব হলেন মিসেস্ নোলান, তৎকালীন চট্টগামস্থ ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট-পত্নী।

৬৩ পৃঃ—কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক প্রধান অফিসার হলেন ভুজঙ্গ সরকার (রায় সাহেব)।

৬৪ পৃঃ—অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার হলেন এস্. পি চ্যাটার্জী (রায় বাহাদুর)।

৬৪ পৃঃ—রেলওয়ে অফিসার হলেন এস্. সি. সাহানী। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে ইলেট্রিফিকেসানে Financial Adviser হয়েছিলেন।

৬৫ পৃ:—Military Intelligence officer সম্ভবত Major Armstrong.

সূর্য সেনের সান্নিধ্যে

শচীন্দ্রনাথ গুহ

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী। মধ্যরাত্রি। কারারক্ষী চট্টগ্রামের পাষাণকারার দু'টি কক্ষ খুলে দেখল—বন্দীরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বন্দীরা শান্ত, সমাহিত—চাঞ্চল্যের লেশমাত্র তাঁদের চোখে-মুখে নেই। এই পৃথিবী থেকে তাঁদের বিদায় নিতে হবে আজ একটু পরে—এ খবর তাঁদের জানা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতের মুক্তি-সাধনায় তাঁরা আজীবন নিমগ্ন ছিলেন। সে সাধনা তাঁদের সফল হয় নি বটে, কিন্তু তাঁরা সাফল্যের পথ দেখিয়েছেন এবং সেই দুর্গম দুস্তর রক্তঝরা পিচ্ছিল পথে চলার মতো অসংখ্য মুক্তিপাগল যুবক তৈরী করে গেছেন—পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের অন্তিম মুহূর্তে এই তাঁদের সান্ত্বনা। তাই ফাঁসির মঞ্চে আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁরা শান্ত, সমাহিত।

এই দু'জন মহান্ মুক্তিসাধকের মধ্যে একজন হলেন ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, যিনি মাষ্টারদা নামে সর্বাধিক পরিচিত। অপরজন ঐ দলের অন্যতম নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার, যিনি সহকর্মীদের কাছে পরিচিত ছিলেন 'ফুটুদা' বলে। চট্টগ্রামের কারান্তরালে এই দু'জন বিপ্লবীর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

(চট্টগ্রাম বিদ্রোহের মহানায়ক সূর্য সেন ১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চ চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।) এক সম্ভ্রান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তিনি। তাঁর পিতা রাজমণি সেন অত্যন্ত সরল অথচ তেজস্বী ছিলেন। মাতা শশীবালা ছিলেন ধর্মপরায়ণা।

(সূর্য সেন নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করে চট্টগ্রাম সহরে হরিশ দত্তের ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯১২ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন চট্টগ্রাম কলেজে।)

বিদ্যালয়ে শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ সূর্য সেন; কিন্তু এই বিপ্লবী নায়কের বিপ্লবী মানস তাঁর জন্মগত। মহাবিদ্যালয়েই ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল তাঁর যথার্থ স্বরূপ। বি. এ. পড়ার সময় তাঁর সাহস ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা সুরু হয়েছে। একদিন প্রশ্নপত্র দেওয়ার প্রায় ১৫ মিনিট পরে তিনি উপস্থিত হন পরীক্ষাগৃহে। বসে পড়লেন নিজের নির্দিষ্ট আসনে। তাঁর সঙ্গে ছিল ছাতা এবং বই। সেগুলি অন্যত্র রেখে আসার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। টেবিলের উপর রাখলেন বই এবং ছাতা। সূর্য সেন নিবিষ্ট মনে উত্তর লিখছেন। হঠাৎ পরীক্ষাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক তাঁর কাছে এসে বই রাখার কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

ধীর স্থির সূর্য সেনের সংক্ষিপ্ত উত্তর: বইটি বিকেল বেলার পরীক্ষাসংক্রান্ত। তত্ত্বাবধায়ক খবরটা দিলেন কলেজের অধ্যক্ষকে। সূর্য সেনের এই কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও তাঁকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হল না।

পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক এবং অধ্যক্ষের এই ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হন সূর্য সেন এবং তাঁর সহপাঠী অগেশ রক্ষিত। দু'জনেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিলেন। সূর্য সেনের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে মন্তব্য করা হল—Bad Conduct. অধ্যক্ষের এই মন্তব্যে সূর্য সেনের কলেজীয় শিক্ষার পথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। কেউ কেউ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট জাল করে অন্য কলেজে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিতে রাজী নন সত্যনিষ্ঠ সূর্য সেন। অবশেষে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের একজন অধ্যাপক ও অস্থায়ী অধ্যক্ষ তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উক্ত কলেজে ভর্তি করেন। এই কলেজ থেকে তিনি ১৯১৭ সালে স্নাতক হন।

উক্ত কলেজের দেয়ালে প্রায়ই দেখা যেত বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র। বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ঔৎসুক্য জাগে সূর্য সেনের মনে। যোগাযোগ স্থাপিত হল। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রভাবে সূর্য সেন দীক্ষিত হন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে।

নতুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে সূর্য সেন ফিরে এলেন চট্টগ্রামে। শিক্ষকতা সুরু করলেন ন্যাশনাল হাই স্কুলে। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদে কোন

আড়ম্বর ছিল না, কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রাণ ছিল— ছাত্রদের প্রতি স্নেহ এবং মমতায় ভরা মহৎ প্রাণ।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। আসমুদ্রহিমাচল প্রকম্পিত বিক্ষোভের তরঙ্গাঘাতে। ন্যাশনাল হাই স্কুলের ছাত্ররাও প্রতিবাদে মুখর। ছাত্রদের প্রতিবাদ-সভায় শান্তস্বভাব সূর্য সেনের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হল বজ্রনির্ঘোষ প্রশ্ন: প্রতিশোধ নিতে পারবে?

ছাত্ররা মুগ্ধ হল সূর্য সেনের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র-মাধুর্য, দৃঢ়চিত্ততা এবং আন্তরিকতায়। সমস্বরে ছাত্রদের কণ্ঠ থেকে জবাব এল: পারব, স্যার, পারব।

অল্পদিনের মধ্যে সূর্য সেন ছাত্রদের হৃদয় জয় করলেন। শিক্ষক সূর্য সেন হলেন প্রিয় মাষ্টারদা।)

(সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবী দল ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠল। সংগৃহীত হল কয়েকজন বিপ্লবী সৈনিক। সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে চাই প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র।

এই বিপ্লবী দল ১৯২৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানীর ১৭ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। পুলিশ বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার খবর পেয়ে যায়। ফলে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদেব তীব্র সংঘর্ষ হল নাগড়খানা পাহাড়ে। ধৃত হলেন সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী। পরে বিচারে তাঁরা বেকসুর মুক্তি পান।)

এই সময় বাংলা দেশে বিপ্লবান্দোলনের প্রসারতা দেখে শাসকশক্তি ভয় পেয়ে যান। তাঁরা বিনা বিচারে আটক রাখার উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রবর্তন করেন। ফলে চট্টগ্রাম তথা বাংলা দেশের বহু বিপ্লবী নেতা ও কর্মী বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। কিন্তু সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল না। তিনি বাংলা, আসাম ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে তৎপর হন। অবশেষে তিনি কলিকাতায় ১৯২৬ সালের ৮ই অক্টোবর গ্রেপ্তার হন। মেদিনীপুর ও রত্নগিরি জেলে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়।

১৯২৮ সালে চট্টগ্রামের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত সূর্য সেনও কারামুক্ত হলেন। তখন আবার সুরু হল বিদ্রোহের প্রস্তুতি। প্রস্তুতি সমাপ্ত হল। নিখুঁত পরিকল্পনাও প্রস্তুত। এল শুভ আঘাতের দিন।

১৯৩০ সাল। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ধারা দ্বিমুখী—অহিংস এবং সহিংস। ১২ই মার্চ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস ডাণ্ডি অভিযান। ১৮ই এপ্রিল পূর্ব প্রান্তে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সহিংস বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।

১৮ই এপ্রিল। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বিপ্লবী দলের বিভিন্ন অংশের যুগপৎ আক্রমণে চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার ও রেলওয়ে অস্ত্রাগার অধিকৃত ও ভস্মীভূত। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ ভবন বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত। সৈন্য চলাচলে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরের অদূরে ধুম ষ্টেশনের কাছে রেল লাইন অপসারিত। চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হল বহির্জগৎ থেকে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত।

অতর্কিত এই আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদীর কাছে অভাবনীয়। ইংরেজরা জাহাজে করে আশ্রয় নিল সমুদ্রের বুকে আত্মরক্ষার তাগিদে।

বৃহত্তর পরিকল্পনা রূপায়িত করার প্রয়োজনে বিপ্লবীরা আশ্রয় নিয়েছেন পাহাড়ে। গ্রীষ্মের দুঃসহ দাবদাহ। বিপ্লবীদের আহার নেই, নিদ্রা নেই। পাহাড়ী ফলমূলে তাঁদের আংশিক ক্ষুন্নিবৃত্তি হচ্ছে। বৈশাখের কৃপণ আকাশ থেকে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে। বৃষ্টির জল সামান্য লেগে আছে গাছের পাতায় পাতায়। বিপ্লবীদের বুক ফেটে যাচ্ছে তৃষ্ণায়। তাঁরা জিহ্বা একটু একটু ভিজান সেই সামান্য জলবিন্দুতে।

এই ভাবে দিন কাটে।

২২শে এপ্রিল। বিপ্লবীরা সেদিন জালালাবাদ পাহাড়ে। অপরাহ্ণে দেখা গেল, সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনী সঙ্গীন উঁচিয়ে ছুটে আসছে সেই পাহাড়ের দিকে। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন আসন্ন যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন লোকনাথ বলকে। জেনারেল লোকনাথ বল। তাঁর নির্দেশে বিপ্লবীরা প্রস্তুত হয়ে আছেন আসন্ন সংগ্রামের জন্য। সৈন্যবাহিনী বিপ্লবীদের রাইফেলের পাল্লার মধ্যে আসামাত্রই জেনারেলের তীব্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—Fire। একসঙ্গে গর্জে উঠল বিপ্লবীদের রাইফেল। একদিকে বেতনভুক্ সেনাদল, অপরদিকে দেশের মুক্তিসাধনায় নিবেদিতপ্রাণ তরুণ বিপ্লবীদল। ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছিয়ে গেল সৈন্যবাহিনী। আশ্রয় নিল শুষ্ক নালায়, ঝোপঝাড়ের অন্তরালে। কিছুক্ষণ

পরে আবার এগিয়ে এল তারা। আবার সুরু হল তীব্র সংগ্রাম। পরাজয়ের কালিমালিপ্ত সেনাদল পালিয়ে গেল রাত্রির অন্ধকারে। এই রুদ্র-মধুর অপরাহ্নে এগারজন বিপ্লবী বরণ করলেন শহীদের মৃত্যু।

বিপ্লবী থামে না—থামতে জানে না। সহবিপ্লবীর উষ্ণ শোণিতধারা দেখেও তার চলার গতি স্তব্ধ হয় না। তাই চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা শত্রুর উপর আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগলেন মাষ্টারদার নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায়। কালারপোল, চন্দননগর ও ধলঘাটের খণ্ডযুদ্ধ; পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার তারিণী মুখার্জি, ডি. আই. বি. ইনস্পেক্টার আসানুল্লা, কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এলিসন এবং ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্নো হত্যা; চট্টগ্রামে ইউরোপীয়ান ক্লাব এবং ক্রিকেট খেলার মাঠে বোমা নিক্ষেপ; চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্লিয়ারীর প্রাণনাশের প্রচেষ্টা. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাক্‌সনের প্রতি গুলীবর্ষণ; চট্টগ্রামের কোর্ট বিল্ডিং ধ্বংস করার আয়োজন, মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে চট্টগ্রাম জেল থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা এবং দেশদ্রোহী নেত্র সেনের হত্যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিপ্লবীদের দৃপ্ত পৌরুষ এবং আদর্শনিষ্ঠা।

চট্টগ্রামের এই অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল দিকে দিকে। আবার জাগল বিপ্লবী বাংলা। সর্বত্র দেখা গেল নবজীবনের চাঞ্চল্য। যুবসমাজে তখন রক্তের নেশা। বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই গর্জে উঠল বিপ্লবীদের অগ্নিনালিকা।

এই অভ্যুত্থানের তরঙ্গ শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ রইল না। সে তরঙ্গ আঘাত হানল সুদূর বার্মাতেও।

এই বিপ্লবী মহানায়ক মাষ্টারদা ১৯৩৩ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে গ্রেপ্তার হন পটিয়া থানার গৈরলা গ্রামে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস নাম্নী এক প্রৌঢ়া মহিলার বাড়ীতে। গ্রেপ্তারের কারণ হল এক মহিলার অজ্ঞতা এবং নেত্র সেনের লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতা।

ভগৎসিং, রাজগুরু, সুখদেব ও বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সংগঠন Hindusthan Socialist Republican Association-এর বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বিশদ সংবাদ রাখতেন মাষ্টারদা আত্মগোপনের সময়েও।

যোগাযোগ রাখা হত দিল্লীর টিব্বিয়া আয়ুর্বেদ কলেজের ছাত্র বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন রক্ষিতের মাধ্যমে। দিল্লীর আইন পরিষদে বোমানিক্ষেপের অভিযোগে ধৃত ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের বিচারের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হত লাহোরের 'Tribune' পত্রিকায়। ঐ বিচারের সংবাদ জানার জন্য মাষ্টারদা নিয়মিত বিশেষ আগ্রহসহকারে পত্রিকাটি পড়তেন।

সূর্য সেন শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবান্দোলনের গতি-প্রকৃতি জানবার জন্য যে আগ্রহী ছিলেন, তা নয়। বহির্ভারতের রাজনৈতিক গতিধারার প্রতিও ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। বিশাল ভারতের এক প্রান্তে মুষ্টিমেয় একদল বিপ্লবীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যে ভারত স্বাধীন হবে—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল না। তিনি মনে করতেন, চট্টগ্রামের এই সশস্ত্র বিদ্রোহ পরবর্তীকালের গণবিদ্রোহের সূচনা। তাই বার্মাতে নেতা সায়া সেনের নেতৃত্বে যে গণবিদ্রোহ সুরু হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ জানবার আগ্রহ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। রাসবিহারী এবং রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রমুখ বিপ্লবী নেতারা জাপানকে কেন্দ্র করে যে Pan-Asian Movement সুরু করেছিলেন, তার গতিধারার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল।

'স্বাধীনতা' পত্রিকায় (২৭শে মার্চ, ১৯৩০) 'বার্মার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা' নামক আমার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মাষ্টারদার নির্দেশে আমি বার্মা থেকে ফিরে আসার পর মাষ্টারদা ও নির্মলদা ঐ প্রবন্ধকে ভিত্তি করে আমার কাছ থেকে অনেক তথ্য জেনে নিয়েছিলেন।

বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের কঠোর-কঠিন হৃদয়ের অন্তরালে স্নেহের ফল্গুধারা ছিল প্রবহমান। সহকর্মীদের প্রতি তাঁর যে কতখানি দরদ ছিল, তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছে তারাই উপলব্ধি করেছে। সূর্য সেনের মধ্যে আবেগ ছিল, উচ্ছ্বাস ছিল। তবে তা অতি সংযত। কোমলতা এবং কঠোরতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল এই মহাপ্রাণ মাষ্টারদার মধ্যে। তাই তো তিনি বিপ্লবী, তাই তো তিনি মহানায়ক।

মাষ্টারদার মধ্যে ছিল একটি রসিক মন। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কবিতা ও গান তাঁর খুব প্রিয় ছিল। দেখেছি—কানুনগোপাড়া গ্রামের নরেন্দ্র দত্ত (নুপুর) এবং কোয়েপাড়া গ্রামের শহীদ শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর ভাই রুণু

চক্রবর্তী (সন্ধ্যারানী) প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীরা যখন গান গাইত, মাষ্টারদা সে গান শুনতেন তন্ময় হয়ে। তাঁর মন যেন চলে যেত দূরে—বহু দূরে। তাঁর কী তন্ময়তা! তাঁকে দেখে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠত প্রাচীন ভারতের শান্তস্নিগ্ধ তপোবন এবং তাতে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন মুনিঋষিদের ছবি।

সূর্য সেনের মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভাও ছিল। কিন্তু বিপ্লবী নেতার কর্মব্যস্ত জীবনে তা পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ ঘটে নি। আত্মগোপনকালে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী। ১৯৩১ সালে আমার গ্রেপ্তারের পূর্বে তার কিছু অংশ আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর গ্রেপ্তারের সময় এই অমূল্য গ্রন্থটি পুলিশের হস্তগত হয়। সূর্য সেন যে সাহিত্য-প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তার আরো পরিচয় মেলে ফাঁসির মঞ্চে আত্মবিসর্জনের পূর্ব দিন লিখিত তাঁর শেষ মর্মবাণী এবং চট্টগ্রামের পাষাণকারার অন্তরাল থেকে লেখা তাঁর পত্রাবলীতে। তাঁর বৌদির কাছে লেখা (৫।১২।১৯৩৩) একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি:

> আপনার কাছে হয়ত আমার শেষ চিঠি।··· ···দিন ভালই কাটছে। চার পাঁচ দিন আগে একদিন সন্ধ্যার সময় একদৃষ্টে একমনে আকাশের দিকে চেয়েছিলাম। নির্মল জ্যোৎস্নায় সমস্ত নীল আকাশ ভরে গিয়েছিল। অসংখ্য নক্ষত্র সুন্দর ফুলের মত সারা আকাশে ফুটে রয়েছিল। গাছগুলি নীরবে যেন প্রকৃতির এই শোভা উপভোগ করছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মন প্রকৃতির এই বিমল সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে গেল। মনে পড়ে গেল তাঁর কথা, যিনি এই সুন্দর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের আনন্দের জন্য প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার খুলে রেখেছেন।”

কানুনগোপাড়া ও জ্যৈষ্ঠপুরা কেন্দ্রের বিপ্লবী কর্মীরা গোপনে একটি হাতেলেখা মাসিক পত্রিকা বের করত। পত্রিকাটির নাম ‘শক্তি’। এই পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লাল কালিতে মাষ্টারদার লেখা থাকত। জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক বিনোদ দত্ত এবং শহীদ শৈলেশ্বর চক্রবর্তীও মাঝে মাঝে লিখতেন।

এই রকম বহু বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ দেখতে পাই মাষ্টারদার মধ্যে। কিন্তু এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তা সম্যক ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

এই বিচিত্র মহানায়কের মৃত্যু নেই, তিনি কালজয়ী।

শহীদ বীরেন দে'র বিপ্লব-সাধনা

প্রশান্ত দাশগুপ্ত

চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের বিক্ষিপ্ত ও বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাপঞ্জীর সংযোজন দুরূহ ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এই ধরণের একটি দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ অনুরোধ করলেন আমার জানা বিপ্লবী যুগের বিচ্ছিন্ন ঘটনার যোগসূত্র সংযোজন করতে। যে যুগের বৈপ্লবিক কর্মপ্রবাহের উপর আলোকপাত করতে নির্দেশ পেলাম, তা' ছিল কঠোর গোপনীয়তার যুগ, নীরবে আত্মোৎসর্গের যুগ—আত্মবিলুপ্তির যুগ। ঐ সব হারিয়ে-যাওয়া, ফেলে-আসা বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর মালা গাঁথার প্রচেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। বিস্মৃত যুগের বিক্ষিপ্ত ঘটনার উপর আলোকপাত করার মধ্যে আত্মপ্রচারের প্রবণতা থাকে, বিশেষতঃ বর্তমান প্রচার-বিপ্লবের যুগে—যে যুগে মানুষ কাজের তুলনায় প্রচারকে দেশসেবার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে।

প্রচার-বিপ্লবের একটি ঘটনা উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। অপ্রাসঙ্গিক হলেও ঘটনাটি উল্লেখের প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি কানপুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি সম্মেলনে পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪০০ শত প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন এই সম্মেলনে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, গদর পার্টির নেতা ভাই পরমানন্দ, কাকোরী ষড়যন্ত্রের অন্যতম বর্ষীয়ান্ নেতা শচীন্দ্রনাথ বক্সী, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী সুরেন্দ্র পাণ্ডে, শহীদ ভগৎ সিং-এর ভ্রাতা কুলবীর সিং, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম নেতা পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্র শেখর চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের আত্মভোলা বীর সৈনিক সর্বশ্রী দ্বিজেন দস্তিদার, অর্ধেন্দু গুহ, সরোজ গুহ, বিনোদ দত্ত, বনবিহারী দত্ত, কালী দে প্রমুখ বিপ্লবিগণ যোগদানকারী প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন। আরো ছিলেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণকারী সর্বশ্রী আশু দে, কাশীশ্বর দত্ত, মিহির বসু, মাণিক উপাধ্যায়, ফটিক

উপাধ্যায়, ভোলা মজুমদার, মন্থ মজুমদার, শশধর ভট্টাচার্য, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য ও প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীবীণা ভৌমিক। আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যতম প্রখ্যাত নেতা ডাঃ পবিত্র রায় ও সুশীল খাস্তগীর এবং জগদীশ চ্যাটার্জী ও অধ্যাপক রবি বসু প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিভিন্ন সভাসমিতিতে বিশেষতঃ কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুর মহাপালিকা ও লক্ষ্ণৌ মহাপালিকার পক্ষ থেকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয়।

এই সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা বার বার আমার মনে উদিত হয়েছে। মরণজয়ী বিপ্লবীরা, যাঁরা ফাঁসী, গুলী, কারাযন্ত্রণা ও ও নির্যাতনকে অগ্রাহ্য করে পরাধীন ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা কি কখনো এ'ধরণের সম্বর্ধনার প্রত্যাশা করেছিলেন? মুক্তি-পাগল স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রেরণা ও স্বপ্ন ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ-মুক্ত ভারতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শৃঙ্খলমুক্ত ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ২৫ বৎসর অতিক্রান্ত। কিন্তু দেশ দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত নয়। স্বাধীনতা-আন্দোলনের আত্মোৎসর্গকারী অগ্রদূতদের মানব-মুক্তির স্বপ্ন এখনো অপূর্ণ। বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ দেহ বর্ষীয়ান্ বিপ্লবীদের মনে বিপ্লবের অনির্বাণ বহ্নিশিখা দেখে অভিভূত হয়েছি। তাঁরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা রিক্ত নন—দেশকে ও সমাজকে সেবা করার মত মানসিক সাহস ও সম্পদ তাঁদের অব্যাহত রয়েছে। শোষণের বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অবসানের জন্য সংগ্রামে তাঁরা কৃতসংকল্প।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কানপুর সম্মেলনে এমন দু'য়েকজন ভূয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীর সংস্পর্শে এলাম, যাঁরা শুধু আত্মপ্রচারের দ্বারা বিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রণীর আসন দখল করে নিয়েছিলেন, অথচ যাঁদের অতীত বৈপ্লবিক কার্যাবলীর কোন নির্ভরশীল প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারা গেল না। এঁদের মধ্যে একজন চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং ২৫ বৎসর কারান্তরালে অতিবাহিত করেছেন বলে প্রচার করছিলেন। নেতাজীর সঙ্গেও নাকি ১০ বৎসর কারাবাস করেছেন। ঔৎসুক্য বোধ করলাম চট্টগ্রামের লোক দীর্ঘ দিন নির্যাতনের ইতিহাস রচনা করেছেন জেনে। কোন্ জেলে নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন অনুসন্ধান করে সন্তোষজনক

উত্তর পেলাম না। যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূত হোমানলে হাসিমুখে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের আত্মদানের স্বীকৃতি নেই, অথচ প্রচারসর্বস্ব ভূয়া সংগ্রামীরা দেশের স্বীকৃতি আদায় করে ফুলের মালা কুড়িয়ে সমাজে শীর্ষস্থান দখল করে আছেন। এটাই আমাদের দেশের চরম দুর্ভাগ্য।

তাই বলছিলাম, হারিয়ে-যাওয়া যুগের বিক্ষিপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী সংযোজনের মধ্যে আত্মজাহির করার প্রবণতা প্রশ্রয় পায়। আমার প্রচেষ্টা সেই প্রবণতামুক্ত হবে কি না সন্দেহ। দুর্বল স্মৃতি-শক্তির উপর নির্ভরশীল লেখায় সত্যের বিকৃতি ঘটে। দিনপঞ্জীর ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু সতর্ক থাকব, যতখানি সম্ভব তথ্যগত ভুল-ত্রুটি পরিহার করার।

চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থান বাংলার বিপ্লববাদ ইতিহাসের একটি গৌরবময় উজ্জ্বলতম অধ্যায়। এই অভ্যুত্থান বাংলা দেশ তথা ভারতের যুবশক্তিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বৃটিশ শাসনের অবসান বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী শক্তির একমাত্র সাধনা ছিল। কিন্তু গুপ্ত হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থান তার ব্যতিক্রম। এই প্রথম সম্মুখ সংগ্রামে রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ। সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বীর বিপ্লবী সূর্য সেনের অভিনব সংগ্রামী পরিকল্পনা। বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পড়েছি। জেনেছি —লাহোর ষড়যন্ত্র, আলিপুর ষড়যন্ত্র, হাওড়া ষড়যন্ত্র, খুলনা ষড়যন্ত্র, ঢাকা ষড়যন্ত্র, বরিশাল ষড়যন্ত্র, ও আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ। পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই গোয়েন্দা বিভাগ বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থান একমাত্র ব্যতিক্রম। চট্টগ্রাম বিপ্লবের পরিকল্পনা যাতে ব্যর্থ না হয় আগে থেকেই মাষ্টারদা সতর্ক ছিলেন। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীরা তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। এমন কি চট্টগ্রামের বিপ্লবীশক্তি, যাঁদের তিনি বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তাঁরাও অনেকে পরিকল্পনার ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকতেন না বলে প্রকাশ। চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের কয়েকজন অধিনায়ক সমস্ত পরিকল্পনার ব্লু-প্রিণ্ট রচনা

করেছিলেন। জীবিতদের মধ্যে তাঁরা হলেন সর্বশ্রী গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। কঠোর সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন বলে চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। না হয় বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য বিপ্লবী প্রচেষ্টার মত অঙ্কুরেই প্রকাশ হয়ে পড়ত ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। এখানেই মাষ্টারদার ও চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের সাফল্য, কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ কেন্দ্র আক্রমণ, পুলিশ লাইন আক্রমণ, জালালাবাদ পাহাড়ের ঐতিহাসিক বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ, ফেনী সংঘর্ষ, কালারপোল সংঘর্ষ, গহিরা সংঘর্ষ, ডিনমাইট ষড়যন্ত্র, অত্যাচারী পুলিশ ইন্সপেক্টার আসানুল্লা হত্যা, এলিসন ও ডুর্নো আক্রমণ, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ও ক্রীকেট মাঠের সংঘর্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিপ্লবী ঘটনাপঞ্জীর উপর অনন্তদা ও আনন্দ গুপ্ত বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করেছেন। উক্ত ঘটনাপঞ্জীর উপর আলোচনা পূর্ব-প্রকাশিত আলোচনার পুনরাবৃত্তি হবে। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিপ্লবের অন্যতম অধিনায়ক অনন্তদার নিপুণ ঘটনা-বিশ্লেষণের পর উক্ত বিষয়সমূহের উপর নতুন কোন আলোকপাতের অবকাশ আমার অন্তত নেই। বিপ্লবীদের মধ্য থেকে শুধু একটি মাত্র চরিত্র অঙ্কণে আমার অনিপুণ লেখনীকে সীমাবদ্ধ রাখব।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের অন্যতম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন ৺বীরেন্দ্রচন্দ্র দে। যিনি এখনো পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস-রচয়িতাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছেন, যিনি এখন ইতিহাসে অনুল্লেখিত ও অবজ্ঞাত থেকে গেছেন, অথচ যাঁর বিপ্লবী আন্দোলনে অবদান অনস্বীকার্য, তাঁর সংগ্রামী চরিত্রের প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে আমার একমাত্র লক্ষ্য। আত্মগোপন অবস্থায় তাঁর জীবনদীপ লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্বাপিত হয়েছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম যথাযোগ্যভাবে সমাদৃত হবে না এটা জাতির পক্ষে অগৌরবের। আজ যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণের কৃতিত্ব অর্জন করছেন, পুরস্কৃত হচ্ছেন ও ফুলের মালা কুড়োচ্ছেন তাঁদের তুলনায় এই মরণজয়ী বীরের কৃতিত্ব বা আত্মোৎসর্গ

কম গৌরবব্যঞ্জক নয়। এই সব বিস্মৃতপ্রায় শহীদের জীবন-কথা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্থান না পেলে আমরা, তাঁদের উত্তর সাধকেরা অপরাধী বলে গণ্য হব।

বিপ্লবী বীর ৺বীরেন দে পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচিয়া গ্রামের এক গরীব চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ফিরিঙ্গী বাজারের ঘরামী-জীবিকা-নির্ভর ৺চন্দ্রনাথ দের সন্তান বীরেন দে। চট্টগ্রাম গ্র্যাজুয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১৫/১৬ বৎসর। সুঠাম পেশীবহুল দেহ। মাষ্টারদার একান্ত অনুগত ও চট্টগ্রাম বিপ্লবী সংগঠনের আত্মভোলা অন্যতম সংগঠক। নীরব কর্মী। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ এবং শহীদ নরেশ রায়ের নেতৃত্বে ১৮ই এপ্রিল ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের অন্যতম সৈনিক, আত্মগোপন অবস্থায় চট্টগ্রামের গ্রাম-গ্রামান্তরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য নিয়োজিতপ্রাণ শহীদ বীরেন দে। একবার বিপ্লবী প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহ অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য পার্টির সদস্যদের মাষ্টারদা আহ্বান জানিয়েছিলেন। সকলেই উৎসাহের সঙ্গে অর্থসংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন। বীরেন দে নিয়ে এসেছেন দীন পিতার সারা দিনের উপার্জনলব্ধ মাত্র দুই টাকা। সারা দিনের অন্নসংস্থানের একমাত্র অবলম্বন। মাষ্টারদাকে দিতে সঙ্কোচ। অন্যান্য কর্মীদের সংগ্রহের তুলনায় খুবই নগণ্য। সঙ্কোচ-বিনত মস্তকে একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। মাষ্টারদার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বীরেন দের সঙ্কোচ ও দ্বিধা অগোচর রইল না। সস্নেহে তিনি বীরেন দেকে কাছে ডাকলেন। বললেন—"তোর দান টাকার সংখ্যা দিয়ে বিচার হবে না। বিচার হবে হৃদয় দিয়ে।" মহান্ ত্যাগের যে পরিচয় বীরেন দে সে দিন দিয়েছিলেন তা অতুলনীয়।

১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে আমার সঙ্গে বীরেনদার প্রথম পরিচয়। সুচিয়া গ্রামের একটি ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। আমি তখন বরমা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুল ছুটির পর বাড়ী ফিরবার পথে সেই ব্যায়ামাগার। দাঁড়িয়ে ছিলাম। উৎসাহ বোধ করলাম। পেশীবহুল দেহ। শরীরচর্চার বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলাম। আলাপ করবার অত্যুগ্র আগ্রহ। পরদিন পুনরায় সেই ব্যায়ামাগারে গিয়েছিলাম। তারিখ স্মরণ করতে পাচ্ছি না। সেদিন তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। ব্যায়াম

অভ্যাস করতে অনুপ্রাণিত করছিলেন। আলাপের দ্বিতীয় স্তরের একটি ঘটনা আমার স্মৃতির পাতায় এখনও অম্লান রয়েছে। হয়ত আমার সাহস, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা পরীক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সুচিয়া ও বরমা গ্রামের সংযোগস্থলে একটি পুকুর ছিল। পুকুরের পারটি ছিল জঙ্গলময়। এক পারে ছিল শ্মশান। অন্য পারে ছিল কবর স্থান। নির্দেশ পেলাম রাত্রি ১২টায় ঐ পুকুর পারের একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। যথাসময়ে পৌঁছলাম। নির্জন ও নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক সূচীভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা শব্দলহরী। ভয়ে সারা শরীর স্পন্দনহীন। আন্দাজ ১৫ মিঃ পর বীরেন দা এলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, ভয় পেয়েছি কিনা। বিভিন্ন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "পরাধীন ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে যোগ দিতে পারবে কিনা? পরহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করতে পারবে কিনা? দেশের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করতে গেলে অজেয় সাহসের প্রয়োজন। অনুশীলন করে সাহস বৃদ্ধি করতে হয়। সর্বস্ব ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আজকের পরীক্ষা তোমার জীবনের সোপান মাত্র। সংযম শিক্ষা কর। চরিত্র গঠন কর। অহেতুক কৌতুহল ও আত্মপ্রচার বিপ্লবী জীবনের অন্তরায়। তোমার সঙ্গে আমার খুব বেশীদিন দেখা হবে না। প্রয়োজন হলে খবর দেবো। এসো।" এইখানেই সেই দিনের আলোচনার সমাপ্তি হল। চলে এলাম একাকী। নিয়ে এলাম আজীবনের অমূল্য সম্পদ। আমার সারা জীবনের ক্ষয়হীন পাথেয়। আত্মপ্রচারবিমুখতার যে দীক্ষা সেদিন নিয়েছিলাম আমার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে তার প্রভাবমুক্ত হতে পারি নি।

বীরেনদার ব্যক্তিত্ব শুধু ছাত্রসমাজকে প্রভাবিত করেছিল তা' নয়। আমি দেখেছি সুচিয়া ও বরমা গ্রামের বহু কৃষকপরিবার তাঁর পলাতক জীবনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি অন্যের উপর আশ্রয়স্থল যোগাড় করবার জন্য নির্ভর করে থাকতেন না। নিজেই আশ্রয়স্থল যোগাড় করতেন। বহু কৃষকপরিবার বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য পুলিশদ্বারা নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। তখন থেকে শ্রেণীভিত্তিক সংগঠন তৈরীর একটি অপ্রকাশিত প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। যাঁদের সঙ্গে একবার তিনি কথা বলবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে তাঁদেরই তিনি আপন করে নিতে পারতেন।

গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করার সময় রোজই তাঁর মার সঙ্গে একবার দেখা করতেন। মা অঝোরে কাঁদতেন ছেলের বিপদ আশঙ্কায়। মাকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, "তোমার তো মা আরও তিনটি সন্তান আছে, আমাকে দেশমাতৃকার পবিত্র বেদীমূলে সমর্পণ করেছ মনে কর। তুমি কাঁদছ? এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, একটি মাত্র সন্তানের জননী তাঁর ছেলেকে দেশমাতৃকার বেদীমূলে সমর্পণ করে গর্ব বোধ করেছেন।"

পলাতক জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি পটিয়া থানার দক্ষিণাঞ্চলে অতিবাহিত করেছেন সংগঠনের কাজে। সুচিয়া ও বরমা গ্রামে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পুলিশশিবির স্থাপিত হয়েছিল। পুলিশের নিকট গোপন সংবাদ ছিল এই দু'টি গ্রামের মধ্যে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা রয়েছে। পল্লীর চারিদিক ঘিরে সুরু হয় তল্লাসী। গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে যাঁদের নাড়ীর সংযোগ, বাইরে থেকে পুলিশ আমদানী করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা যায় না। পুলিশ ব্যর্থ হল। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ বহু নিরপরাধ গ্রামবাসীকে নির্যাতন সুরু করল। নিগৃহীত হলেন বীরেনদার মা ও বাবা। তাঁর নাবালক ভাই-বোনেরা পর্যন্ত রেহাই পায় নি নির্যাতনের হাত থেকে। পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে আশ্রয়স্থল পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা ছিল। ৩০শে মার্চ ১৯৩১ সালে ভোর রাত্রে ফুটুদা (তারকেশ্বর দস্তিদার) ও বীরেনদাকে বরমার সংলগ্ন বৈলতলী গ্রামের আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। টহলরত পুলিশ সাবইন্সপেক্টার শশাঙ্ক ভট্টাচার্য তিনজন যুবকের গতিবিধি লক্ষ্য করে সন্দেহবশতঃ অনুসরণ করতে লাগলেন। অনুসরণ না করবার জন্য বীরেন দা তাঁকে সতর্ক করেছিলেন। শশাঙ্কবাবু শুনলেন না। রাস্তার পাশে গাছের অন্তরালে দাঁড়িয়ে শশাঙ্কবাবুর গতি রোধ করবার জন্য গুলী চালালেন তারকেশ্বর দস্তিদার। গুলীবিদ্ধ শশাঙ্কবাবুর দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। অবশ্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। তাঁরা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছলেন।

১৮ই এপ্রিল পুনরায় ফিরে এল ১৯৩১ সালে। অস্ত্রাগার আক্রমণ ও চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থান বার্ষিকী উৎযাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল হাসিমপুর রেল ষ্টেশনের পূর্ব প্রান্তে পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে। সেই অনুষ্ঠানে গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৫০। ৬০ জন বিপ্লবী ছাত্রকর্মী ও কৃষক শ্রেণীর সমর্থক সদস্য যোগদান

করেছিলেন। সেই বিপ্লববার্ষিকী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে বীরেনদাও উপস্থিত ছিলেন এবং বিপ্লববার্ষিকীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমাদের পথ দুর্গম। যতদিন আমরা শোষক ও শাসকশ্রেণীর হাত থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে না পারি, ততদিন আমাদের সংগ্রাম চলবে।" এই অমোঘ বাণী এখনো আমার কানে অনুরণিত হচ্ছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে কর্মতৎপরতা নিরাপদ নয় বলে রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপনকারী নেতাদের সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রাখা হত। নতুন কর্মী ও অর্থসংগ্রহ, নতুন পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রস্তুতি ও অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ প্রভৃতি রাত্রির নির্জনতার মধ্যে চলত। রাত্রে ২য় ও ৩য় সারির কর্মীদের লাঠি ও ছোরাচালনা শিক্ষা দেওয়া হত। সুচিয়া গ্রামের উত্তর প্রান্তসীমায় সুউচ্চ পারবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড দীঘিও মনোনীত ছিল অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য। ৪ঠা জুন ১৯৩১ সালে এক আশ্রয়কেন্দ্রে প্রশিক্ষা দানের সময় জনৈক পার্টি কর্মীর অনবধানতার জন্য রিভলবারের একটি গুলী বীরেনদার উরুদেশ বিদ্ধ করল। অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল বীরেনদার। যন্ত্রণায় কোন কাতরানি নেই। অবিরাম রক্তধারা। ডাক্তার ডাকা হল। রক্ত বন্ধ করা গেল না। চিকিৎসার জন্য চক্রশালা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হল; গ্যাংগ্রীন্ সুরু হল। তাঁর জীবনদীপ ক্ষীণ হয়ে এল। নিভে গেল একটি সম্ভাবনাময় মহাপ্রাণ বিপ্লবীর জীবনশিখা। চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকলে একটি অমূল্য জীবন রক্ষা পেত। পলাতক-জীবনে তা সম্ভব হল না।

বিপ্লবী দলের আত্মভোলা, উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরেনদার মৃত্যু বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করে গেল। নীরবে নিভৃতে যাঁরা আত্মদান করে শহীদ হয়েছেন, বীরেনদা তাঁদেরই অন্যতম। এই আত্মবিসর্জনকারী বিপ্লবীদের স্মৃতি দেশবাসীর নিকট তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের। তাঁদের আমরা ভুলি নি। সেই সব বীর শহীদদের অম্লান স্মৃতি আমাদের শক্তি, সাহস ও প্রেরণার অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবে।

আজ সমস্ত শহীদের প্রতি জানাই আমার অন্তরের অনবদ্য শ্রদ্ধা ও বীরেনদার স্মৃতির প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ফাঁসীর মঞ্চে হরেন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীশশধর ভট্টাচার্য

১৯৩৪ সাল। ২রা জানুয়ারী। বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে হত্যা করা হয়েছে। এরই বিশ্বাসঘাতকতায় যুববিদ্রোহের সর্বোচ্চ নেতা সূর্য সেন ধৃত হয়েছেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁসীর মঞ্চে মৃত্যুবরণের দিন প্রায় সমাগত। এই সময়ে দলের বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীদের মধ্যে কেউ মৃত, কেউ কেউ ধৃত হয়ে বিভিন্ন জেল ও বন্দীশিবিরে আবদ্ধ। তখন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পেলেও তার স্রোত ফল্গুধারার মতো প্রবহমান অনেক নবাগত তরুণ বিপ্লবীর অন্তরে অন্তরে। তারা সাম্রাজ্যবাদীর নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর। এই রকম একজন তরুণ বিপ্লবী হরেন্দ্র চক্রবর্তী।

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত বাগদণ্ডী গ্রাম। এই গ্রামের এক অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে হরেন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম হয় ১৯১৮ সালে। দেহের রঙ ফর্সা, অত্যন্ত সুদর্শন। তাই সবাই তাকে 'লাল টুকু' বলে ডাকত। সুবেশী ও পাতলা গঠন ছিল। সঙ্গী-সাথীদের এড়িয়ে চলত। স্বার্থপরতা ও বিলাসিতা—দুই-ই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এই হরেন্দ্র এবং লক্ষ্মণ দে-কে বিপ্লবী দলে নিয়ে আসার দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। দায়িত্ব দিলেন আমার বিপ্লবী গুরু সুরেন দে। সুরেন দা ছিলেন আমাদের গ্রামের এক সাধারণ চাষীর ছেলে। খুবই মেধাবী ছাত্র বলে তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর আকর্ষণে আমি ১৯২৫ সালে বিপ্লবী দলে যোগদান করি। পরে আমি রামকৃষ্ণদার (শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস) সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কার্যকলাপে আরো অনুপ্রেরণা পাই।

হরেন্দ্র ও লক্ষ্মণ-কে দলে আনার দায়িত্ব আমার পালন করতেই হবে। লক্ষ্মণের ব্যাপারে সহজ হল। সে ছিল সাদাসিধে। আমার কথায় সে সহজে আকৃষ্ট হয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। হরেন্দ্রকে দলে আনতে কিছু সময় লাগল। সে পিতামাতার কড়া শাসনে ও নির্দেশে আমাদের সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা করত না।

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি গ্রামে "জিমন্যাষ্টিক ক্লাব" স্থাপন করি। বিপ্লবী নায়ক শ্রীঅনন্ত সিংহের নেতৃত্বে তখন জেলার বিভিন্ন জায়গায় "জিমন্যাষ্টিক শো" বা ব্যায়াম-প্রদর্শনী ও ম্যাজিক ইত্যাদিতে যুবমনে ভীষণ আলোড়নের বন্যা এসেছিল। সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য শরীরচর্চা ও ব্যায়াম একান্ত দরকার। অনেক কষ্টে এটা হরেনকে বুঝান সম্ভব হওয়ায় সে ক্লাবে আসাযাওয়া শুরু করল। বাড়ী-থেকে-আনা যৎসামান্য পয়সা ক্লাবের অর্থসংগ্রহের উপায় ছিল। এতে সব সাজসরঞ্জাম কেনা সম্ভব হত না। প্যারালেল বার তৈরী করার জন্য হরেনসহ আমরা ৪ জন নিকটস্থ পাহাড থেকে অতিকষ্টে বিপন্মুক্ত হয়ে কাঠ নিয়ে ফিরে আসি। পথশ্রম ও অনভ্যস্ত কাজের জন্য আমি ও হরেন অসুস্থ হয়ে পড়ি অনেকদিনের জন্য। তা সত্ত্বেও সে আরো বেশী উৎসাহিত হল। তার ভিতরের সুপ্ত শক্তির খানিকটা বহিঃপ্রকাশ হল।

ব্যায়াম করার পর শ্রীসুরেন দে আমাদের সঙ্গে মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সুযোগ বুঝে দেশপ্রেমের কথা উল্লেখ করতেন। অনেক চেষ্টার পর হরেন কিছু কিছু বই পডতে রাজী হল। বলা বাহুল্য, যেহেতু আমি ও সুরেন দে লেখাপডায় ভাল ছিলাম এবং গ্রামে আমাদের সুনাম ছিল, সেহেতু আস্তে আস্তে আমাদের কথাগুলি সে শুনতে আরম্ভ করল। রামকৃষ্ণদা সারোয়াতলী স্কুলের সেরা ছাত্র ও খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর দেবতুল্য চরিত্র, সুমিষ্ট ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় বস্তু ছিল এবং তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়া গৌরবের বস্তু ছিল। একবার রামকৃষ্ণদা আমাদের ক্লাবে আসাতে আলোড়ন সৃষ্টি হল। সকলেই তাঁকে চিনত, যেহেতু আমাদের বাগদণ্ডী গ্রামের সকল মেধাবী ছাত্র সারোয়াতলী স্কুলে পডত। হরেনের ঔৎসুক্য বেডেই চলল। সে সুযোগ আমরা নিলাম।

শ্রীসুরেন দের নেতৃত্বে আমি, লক্ষ্মণ ও হরেন ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম সহরে ছাত্র ও যুবসম্মেলনে যোগদান করি। সেই সম্মেলনে সর্বশ্রী সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ প্রভৃতি পূজনীয় নেতারা যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে যাত্রামোহন সেন হলে জেলা কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনে দলীয় সংঘর্ষে মাষ্টারদা আহত হন। সুখেন্দু দত্তের উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণ হয়। ফলে সে গুরুতর আহত হয়ে কলিকাতায় অকালমৃত্যু বরণ করে। আমরা ঐ সম্মেলনে মাষ্টারদা, গণেশদা ও অনন্তদা প্রভৃতি নেতাদের স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়ে দেশজননীর মুক্তি-সংগ্রামে জীবন

উৎসর্গ করার অধিকতর উৎসাহ পাই। হরেনের মধ্যে সুপ্ত চেতনার উন্মেষ হল। আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে আমি তার পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার বাড়ীতে যাওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম।

অগ্রজ মণীন্দ্র ও অনুজ নীরেনের অকালমৃত্যুতে তার পিতামাতা তাকে নয়নের মণি হিসাবে দেখতেন। বাইরের ছেলেদের সাথে মেলামেশা বারণ করেছিলেন। দেশপ্রেম এমন এক জিনিষ, যার কাছে পিতামাতার স্নেহ ও বাধা, স্ত্রী, পুত্র ও সংসারের সব কিছুই মূল্যহীন। পরাধীন দেশের মুক্তিকামী বিদ্রোহীর কোন বাধাই চলার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। সুশৃঙ্খল, সুশিক্ষিত, চরিত্রবান ও সুস্বাস্থ্য না হলে মুক্তিসংগ্রামী হওয়া যায় না—এই মন্ত্রই নেতারা দিয়েছিলেন। আমাদের যোগ্যতা কতটুকু ছিল জানি না, কিন্তু আমাদের গ্রুপের সর্বকনিষ্ঠ যোদ্ধা হরেনের সব গুণই ছিল। কনিষ্ঠ হলেও সে আজ আমাদের প্রণম্য।

দলীয় শৃঙ্খলা ও গোপনীয়তা অটুট ছিল বলেই বৃহত্তর ভারতবর্ষের এক অখ্যাত জেলা চট্টগ্রামকে সহযোদ্ধা অম্বিকাদা, গণেশদা, নির্মলদা, অনন্তদা ও অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধুদের সহযোগিতায় কয়েকদিনের জন্য স্বাধীন রাখা সম্ভব করেছিলেন সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা সূর্য সেন।

তদানীন্তন জেলাশাসক উইলকিনসন সাহেবের মতে সারোয়াতলী স্কুল ছিল বিপ্লবী তৈরীর প্রতিষ্ঠান (Producer of Revolutionists)। এই স্কুলের বহু ছাত্র বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। তাঁদের অনেককেই ফাঁসী, দ্বীপান্তর, কারাবাস, গুলীতে মৃত্যু ও রাজবন্দিত্ব বরণ করতে হয়েছিল।

১৯৩০ ইং ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর তরুণদের মধ্যে ভীষণ আলোড়নের সাড়া জাগে। মাষ্টারদাসহ বহু মুক্তিযোদ্ধা আত্মগোপন করে ফেরারী ছিলেন। দলের দায়িত্ব ও কাজ বেড়েই চলল। পর পর নানাপ্রকারের ঘটনা (action) হতে লাগল। পুলিশ ও মিলিটারীর অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচার এবং দেশদ্রোহী ও বৃটিশের পদলেহীদের কড়া নজর এড়িয়ে সংগঠন আরো মজবুত হয়। যুবকদের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণের প্রবণতা বেড়েই চলল।

দুর্ধর্ষ অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার বড়ই বিব্রত ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। ধরপাকড় ও অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। হরেন চক্রবর্তীসহ আমরা ৪ জন "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" মামলা দেখতে গিয়ে

মিঃ ইউনির কোর্টে গণেশদা ও অনন্তদাদের সঙ্গে সন্তর্পণে কথাবার্তা বলি। এর কিছুদিন পর পুলিশ ডাকাতির অভিযোগে লক্ষ্মণ, হরেন ও আমাকে গ্রেপ্তার করে। পরে দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। সর্বশেষে মিঃ ইউনির বিচারে আমি খালাস পেয়ে যাই। হরেন এর মধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে। নিজ বাড়ীতে অবাধ্য ও অবাঞ্ছিত হয়ে গেছে। অভিভাবক উদাসীন ও হতাশ।

আসানুল্লা হত্যার পরদিন পুলিশ দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়, বহু হিন্দুবাড়ী ধূলিসাৎ করে এবং সারোয়াতলী স্কুলে গিয়ে লাঠি চালিয়ে বহু নিরীহ ছাত্র ও শিক্ষকদের ভীষণভাবে আহত করে। হরেনও আহত হল—এতে সে সব দুর্বলতা কাটিয়ে দুর্বার হয়ে উঠল, দলের কাছে আরো প্রিয় ও বিশ্বস্ত হল।

স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত করে আমরা এক ভয়াবহ কাজের পরিকল্পনা করি, কিন্তু যথাসময়ে পিতামাতার দৃষ্টি এড়িয়ে রাত্রিতে যথাসময়ে যথাস্থানে আসতে না পারায় আমাদের কাজ ব্যর্থ হয়ে যায়। এতে সে বড়ই দুঃখ পেল এবং নিজেকে অপরাধী মনে করত। কিছুদিন পর সরকার সুরেন দে ও লক্ষ্মণ দেকে রাজবন্দী করল এবং আমাকে করল গৃহবন্দী।

১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি পুলিশ একদিন আমাদের গ্রাম ঘেরাও করে। আমার ও হরেনের বাড়ীসহ প্রায় সব বাড়ী তল্লাসী করল। আপত্তিজনক কিছু না পাওয়া গেলেও আমাকে ও হরেনকে ধলঘাট মিলিটারী ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য বলে গেল। তখন কুখ্যাত ও বর্বর আই. বি. ইন্সপেক্টর মণি দাশগুপ্ত বিপ্লবীদের চরিত্র-হনন করার কাজের দায়িত্ব নিয়ে একনিষ্ঠভাবে বৃটিশ প্রভুর পদলেহন করে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে হত্যা করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। হরেন ফেরার হল। আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে আরম্ভ করল। দৈনিক ৫ বার পুলিশ ক্যাম্পে হাজিরা, যে কোন সময় ধরে নিয়ে গিয়ে অসভ্য ব্যবহার, উৎপীড়ন ও মারধর চালাত। আমি পুলিশের চোখে দাগী ও লালকার্ডধারী। পলাতক জীবনে হরেনের সঙ্গে অতিকষ্টে দু'বার মাত্র দেখা হয়েছিল। আমার ছোট ভাই উপেন পুলিশের খাতায় বিশেষভাবে উল্লিখিত ছিল না, তার সঙ্গে হরেনের যোগাযোগ ছিল।

হরেনের সহযোদ্ধাও পরবর্তীকালে মিলিটারীর গুলীতে নিহত হিমাংশু ভট্টাচার্য আমাদের ক্লাবে মাঝে মাঝে আসত। সে যে আমাদের দলের লোক, তা বিন্দুমাত্রও জানা ছিল না।

এই সময় দলের প্রখ্যাত বা অখ্যাত প্রায় সকলেই কারাগারে। সরকারী যন্ত্র ও পুলিশ যুবকদের মধ্যে বিভিন্নভাবে অনুপ্রবেশ করে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হল। সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থা তৈরী করে স্কুলের শিক্ষক, ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার ও গ্রাম্য মাতব্বরদের সাহায্যে M I.O., D.M., S.D.O., Circle Officer প্রভৃতি সরকারী অফিসাররা গ্রামে গ্রামে সভা সমিতি করে বিপ্লববিরোধী মনোভাব জাগাতে সফল হল। তিন রকমের কার্ড ইস্যু করে—সাদা, নীল ও লাল—যুবকদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। Challenge or Search করার ক্ষমতা গ্রাম্য চৌকিদারকে পর্যন্ত দেওয়া হল। যখন তখন যার তার বাড়ী ঘেরাও করে খানাতল্লাসী, অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন অতীব সাধারণ ব্যাপার হল; অধিকাংশ যুবকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করল কঠোরভাবে। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রায়ই কারফিউ আদেশ বলবৎ থাকত।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাষ্টারদার গ্রেপ্তারের পর বাইরে নৈরাশ্যের ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং দলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। অবিশ্বাস ও বঞ্চনার মাত্রা বাড়তে লাগল, কারণ পুলিসের লোক যখন তখন সন্দিগ্ধদের থানা বা ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যেত এবং প্রকাশ্যে মেলামেশার চেষ্টা করত। যুবকদিগকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করত। অভিভাবকদের কাছে গিয়ে ছেলেদের বিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করত। গৃহবন্দী করে মনোবল ভাঙ্গার চেষ্টা চালাত। নামকরা গ্রামগুলির উপর পিটুনীকর বসিয়ে জনসাধারণকে সন্ত্রস্থ করে তুলত। অত্যাচার ও উৎপীড়ন চরমে উঠল। বাকী ফেরারীদের ধরিয়ে দেবার জন্য প্রকাশ্যস্থানে পুরস্কার ঘোষণা, বিভিন্ন প্রকারের উৎকোচ দেওয়ার ব্যবস্থা, অভিভাবকদের রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করে দেওয়া এবং সর্বোপরি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার কোন ত্রুটি ছিল না। ফেরারীদের আশ্রয়দাতাদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা ও নানাপ্রকারের হুমকি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নিতে অনেকটা সফল হয়েছিল।

সংগঠন যখন প্রায় ধ্বংসের মুখে, সেই সময় বিপ্লবী নেতা বিনোদ দত্তের পরিকল্পনায় চট্টলা মায়ের ৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান হরেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৯৩৪ ইংরেজীর ৭ই জানুয়ারীর প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত গুপ্তচর, পুলিস এবং দেশীয় দালাল ও বিশ্বাসঘাতকদের চোখে ধূলি দিয়ে মিলিটারী

পরিবেষ্টিত ও অতীব সুরক্ষিত সার্কিট হাউসের সামনে ইউরোপিয়ানদের ক্রিকেট ক্লাব আক্রমণ করে বেশ কিছু বিদেশী দস্যুদের হতাহত করল। মিলিটারীর গুলীতে নিত্যগোপাল সেন ও হিমাংশু ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলে মারা গেল। হরেন চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী আহত অবস্থায় ধরা পড়ে যায়। এই ঘটনার ৪ দিন পরে ১২ই জানুয়ারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চট্টগ্রাম জেলে মাষ্টারদা ও ফুটুদাকে (তারকেশ্বর দস্তিদার) ফাঁসী দিয়ে হত্যা করল।

বর্বর বৃটিশ সরকার বিচারের প্রহসন করে সংশোধিত অস্ত্র আইনে বালক হরেন চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরীকে প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়। রাত্রির অন্ধকারে চট্টগ্রাম জেল থেকে স্থানান্তরিত করে ১৯৩৪ ইং ৫ই জুন মেদিনীপুর জেলে তাদের ফাঁসী দিয়ে হত্যা করে। এটাই চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের একরকম শেষ ঘটনা (action) বলা চলে। চট্টগ্রাম জেল থেকে নিয়ে যাবার দিন এদের সঙ্গে জেলে আমার শেষ কথোপকথন হয়।

এরা আজ আমাদের মধ্যে সশরীরে না থাকলেও দেশের মুক্তিসংগ্রামে এদের আত্মদান ভারতবাসীর মনে চিরজাগ্রত হয়ে থাকবে।

পরাধীন দেশের মুক্তিকামী হে রাজবিদ্রোহী, তোমাদিগকে শত সহস্র প্রণাম জানিয়ে তোমাদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার অনেক দিনের আকাশ চাওয়া
আসবে ছুটে দখিন হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল করে সুগন্ধ ধন লুটবে।
ফুটবে ফুল ফুটবে।

—রবীন্দ্রনাথ

অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা
গিরিজাশংকর চৌধুরী
ফণিভূষণ মজুমদার

বৃটিশ ভারতে ইংরাজ জাতির নিপীডনে ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের গৌরবময় অধ্যায়ের সূত্রপাত। ভারতের দিকে দিকে স্বাধীনতার মর্মভেদী আহ্বান; সেই আহ্বানে দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিবেদিত আত্মভোলা সন্তানদলের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস অতুলনীয় দেশপ্রেমে দীপ্যমান। ঐ মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার বিপ্লবীদের অভূতপূর্ব সাফল্য, অপূর্ব দেশপ্রেম, মহিমামণ্ডিত ত্যাগের আদর্শ, দুর্জয় আত্মশক্তি স্বাধীনতার ইতিহাসকে ভাস্বর করিয়াছে। আত্মনিষ্ঠ বিপ্লবী নেতা গিরিজাশংকর চৌধুরী এ হেন অতুলনীয় দেশপ্রেমে উদ্ভাসিত বাংলার বিপ্লবীদের অন্যতম।

গিরিজাশংকর চৌধুরী ১৮৯৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত আমিলাইশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকলের নিকট "শংকরদা" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ষষ্টিচরণ চৌধুরী ও মাতা মাতঙ্গিনী দেবী অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন।

শৈশব হইতে তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় প্রত্যেক স্তরে স্তরে তিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বৃত্তির টাকা দিয়া তিনি তাঁহার বিধবা মাতার ভরণপোষণ ও আপন শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতেন। পটিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক সূর্যকুমার সেন মহাশয় স্বীয় ছাত্র গিরিজাবাবুকে মেধার জন্য পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ১৯১৪ সালে তিনি পটিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও ১৯১৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ হইতে আই. এস. সি. পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ঢাকায় বি. এ. পড়িতে গেলে কর্তৃপক্ষের নানাবিধ জটিল প্রশ্নে জর্জরিত হওয়ায় তখনকার মত তাঁহার বি. এ. পড়া স্থগিত থাকে। পরে শিক্ষক জীবনে তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত বি. এ. এবং বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনে তিনি নানা বিতর্ক সভায় যোগদান করিয়া আপন প্রতিভার পরিচয় দিতেন।

আই. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ঢাকায় বি. এ. পড়িতে গেলে তখন হইতে তিনি প্রকৃত পক্ষে বিপ্লববাদের সংস্পর্শে আসেন এবং ইহাই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। তখন তিনি ঢাকায় অনুশীলন সমিতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যে সাংগঠনিক প্রতিভার জন্য অনুশীলন সমিতিতে বিশেষভাবে পরিচিত হন। প্রখ্যাত লাঠিয়াল ও বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস মহাশয়ের নিকট লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী হন। ১৯১৭ সালে ঢাকায় তিনি প্রথম রিভলবারসহ Reg. Act III আইনে ধরা পড়েন এবং রিভলবার রাখার জন্য বিচারে তাঁহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ধরা পড়ার সময় তাঁহার এক প্রিয় ছাত্র তাঁহার নিকট রক্ষিত দলের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল গিলিয়া ফেলিয়া তাঁহার এবং দলের প্রভূত সাহায্য করে। জেল হইতে মুক্তি লাভের পর পুলিনবাবু (বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস) এবং ঢাকার অনুশীলন দলের প্রস্তাব অনুযায়ী গিরিজাবাবু চট্টগ্রামে গিয়া নিজ নেতৃত্বে অনুশীলন দলের শাখা স্থাপন করেন।

চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন এক বিরাট জাতীয় আন্দোলন। ঐ আন্দোলনের সময় ভিন্নপন্থী অন্যান্য দলের কর্মীরাও গণ-আন্দোলনের বিরাট স্রোতে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ অসহযোগ আন্দোলনে গিরিজাবাবুকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছিল। তিনি ঐ সময় যুবকদের নিয়া 'স্বরাজ সঙ্ঘ' নামক এক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেন। আন্দোলনকালে ১৪৪ ধারা অমান্য করিবার সময় 'স্বরাজ সঙ্ঘের' অধিনায়ক গিরিজাবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁহার গ্রেপ্তারের পর জালাল আহমদ (জগলুল) অধিনায়ক হন। 'স্বরাজ সঙ্ঘ'ই চট্টগ্রামে পরবর্তী যুব-আন্দোলনের প্রেরণা এবং শক্তির উৎস। গান্ধীজীর চট্টগ্রাম গমনকালে এবং প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় গিরিজাবাবু স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর জি. ও. সি. নিযুক্ত হন। প্রতিটি কাজকর্মে সহকর্মী হিসাবে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এই মধুর সম্পর্ক উভয় পরিবারকে গভীর প্রীতিতে আবদ্ধ করিয়াছিল। দেশপ্রিয় প্রত্যেক কাজকর্মে গিরিজাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। দেশপ্রিয়-পরিচালিত চট্টগ্রাম রেল ধর্মঘটে গিরিজাবাবুর দায়িত্ব ও ভূমিকার কথা পুলিশ রিপোর্টে পাওয়া যায়। এক সময় দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা অনাথ আশ্রমের দায়িত্বভার গিরিজাবাবুর উপর ন্যস্ত হয় এবং তিনি তাহা সুপরিচালিত করেন।

এই অনাথ আশ্রমে সুভাষবাবুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। নানা কাজকর্মে উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁহাকে ১৯২৪ সালের রেগুলেশন ৩নং আইনে (Regulation III) গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে বন্দীজীবন অতিবাহিত করার পর ১৯২৮ সালে যারবেদা জেল হইতে গিরিজাবাবু মুক্তি পান। তারপর নানা বাধানিষেধ আরোপ করিয়া বাড়ীতে তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনা লইয়া তাঁহাকে পুলিশ যখন তখন বাড়ী হইতে পুলিশ ক্যাম্পে লইয়া যাইত। তাঁহাকে বার বার রাজবন্দীরূপে আটক করা হয় এবং তাঁহার দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হয়। তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর, দমদম, আলিপুর, যারবেদা প্রভৃতি জেলে কারাদণ্ড ভোগ করেন। তখন ঘানিটানা ইত্যাদি অমানুষিক অত্যাচারেও গিরিজাবাবুর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে ইংরেজ সক্ষম হয় নাই। চট্টগ্রামে যাঁহারাই দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে গিরিজাবাবুর অম্লান আদর্শ শক্তি যোগাইয়াছে। তাঁহার আদর্শ চরিত্র, তেজস্বিতা এবং তীব্র আকর্ষণী শক্তি দলমতনির্বিশেষে বয়স্ক বা যুবক সকলকেই মুগ্ধ করিত। সকলেই তাঁহার নিকট আপনারজন ছিল।

গিরিজাবাবুর চরিত্রের অপর একটি ধারা আত্মনিষ্ঠায় দৃঢ়তা। তাঁহার দলীয় কাজকর্মে বা চলাফেরায় এত নিখুঁত সতর্কতা ছিল যে জেলে একবার লোম্যান সাহেব তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "You are too clever. you are everywhere, but you are nowhere." যারবেদা জেলে জনৈক আই. বি.-র প্রশ্নপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "মহাত্মা গান্ধী যে সেলে ছিলেন সে সেলে থাকতে পেরে আমি গর্ব অনুভব করছি। গান্ধীজী হৃদয়ে যে প্রেরণা নিয়ে এত কষ্ট ভোগ করছেন, আমার কাজে তা এক চুলও ন্যূন হবে না। কোটি কোটি লোকের উপর তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে সত্যি, আমার একটি প্রাণীর উপরও প্রভাব নেই, তাই বলে আমি তাঁর চেয়ে ছোট অন্তত হৃদয়ের দিক দিয়ে ত নই—একথা জোর করে বলবার সাহস আমার আছে।"

মুক্তির পর তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে এবং সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দিয়া কাঞ্চনা ও আমিলাইশ গ্রামের দুইটি মধ্য ইংরেজী স্কুলের সমন্বয়ে একটি প্রথম

শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় A. K. B. C. Ghosh Institute বা কাঞ্চনা হাইস্কুল আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি পরে গাছবাড়িয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। আমরণ তিনি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির চট্টগ্রাম শাখার সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন।

গিরিজাবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় ইংরেজী বা বাংলায় ওজস্বিনী বক্তৃতা দান করিতে পারিতেন। সভায় তাঁহার ভাষণদানের সময় শ্রোতৃমণ্ডলী নির্বাক হইয়া তাঁহার আকর্ষণীয় বক্তৃতা শ্রবণ করিত। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ শিক্ষক সমিতির কনফারেন্সে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণ তাঁহার বাগ্মিতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

যে জীবন বহুজনহিতায়, মরণেও তাহা ঐ শাশ্বত সত্যের বেদীমূলে-নিবেদিত হয়। এই পরম সত্য অগ্নিযুগের আদর্শ বিপ্লবী, চির অভিঃ মন্ত্রের সাধক, দেশহিতব্রতী, আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী, কর্মবীর গিরিজাশংকর চৌধুরী মহাশয়ের জীবনবেদে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৯৫০ সালের ১০ই মার্চ গিরিজাবাবু দুইজন স্বীয় ছাত্র সহ শঙ্খ নদী পার হওয়ার জন্য খেয়ানৌকায় আরোহণ করিলেন। হায় মহামরণ! মাঝনদীতে প্রায় আশীজন আরোহীসহ খেয়ানৌকা ডুবিয়া যায়। বিপদ দেখিয়া গিরিজাবাবু সাঁতার কাটিয়া শিশুবৃদ্ধ অনেককে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু সেই আপন ছাত্র দুইটি কই? বারংবার সাঁতার কাটিয়া একজনকে উপরে তুলিলেন। এখন অপরটি? তাহাকে আর পাওয়া যায় না। পিতৃতুল্য শিক্ষক সাঁতার কাটিতে কাটিতে তাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। না, আর নয়, তাঁহার অবসন্নদেহ পরিধেয় ভিজা মোটা খদ্দরের ভার আর বহন করিতে পারিল না, নিমজ্জমান আপন-ছাত্রের প্রাণরক্ষাকালে গিরিজাবাবুর ক্লান্ত দেহ শীতল জলরাশির তলায় ডুবিয়া গেল। পরহিতব্রতে যে জীবনসাধনা আরম্ভ হইয়াছিল, আত্মদানের মধ্যে তাহা পূর্ণতা লাভ করিল।

অবিস্মরণীয়

প্রমীলা দাস [চৌধুরী]

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর চট্টগ্রামের তরুণ ও কিশোরদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চলছে। অত্যাচার যতই বাড়ছে দেশের লোকের চোখ ততই খুলছে। অত্যাচারী সরকারের হাত থেকে বিপ্লবীদের রক্ষা করার দায়িত্ব দেশের লোকের। তাই অনেক গুপ্ত সংগঠন গড়ে উঠল। সেই রকম একটি সংগঠনে কাজ করার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। তখন আমি চট্টগ্রাম খাস্তগীর স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। আজ ৪০ বছর পরে সেই স্মৃতি রোমন্থন করে একটি কাহিনী বিবৃত করছি। অগ্নিযুগে এরকম বহু ঘটনাই ঘটেছে। ঘটনাটি খুব সামান্য হলেও আমার জীবনে এর মূল্য অনেক। পরবর্তী জীবনে এই ঘটনাটি আমার কর্মক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে। তাই আজ বার্ধক্যের সীমানায় এসেও সে কাহিনী বিবৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না।

আমার বড়দি ছোট বয়সেই বিধবা। তাই বাবার কাছেই থাকতেন। বড়দির দুই মেয়ে ও এক ছেলে—অনিল রক্ষিত। সে আমারই বয়সী। বড়দির বড় মেয়ে জ্যোৎস্না চৌধুরী ও তার স্বামী গত বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মাদেশে নেতাজীকে সর্বস্ব দিয়ে পথের ভিখারী হয়ে আজ এই কলকাতায় অতি দীনভাবে জীবন কাটাচ্ছে। অনিল আর আমি একই সঙ্গে পড়াশুনা করতাম। ১৯৩০ সনে অস্ত্রাগার অধিকারের আসামী হিসাবে অনিল ধরা পড়ল। মামলা চলাকালে জামিনে খালাস হয়ে আবার চট্টগ্রাম ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় তার শাস্তি হল।

অনিলের ছোট বোন আরতি রক্ষিত আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও আমরা সব কাজ একসঙ্গেই করতাম। চিন্তাধারাও আমাদের এক ছিল। এই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে আমাদের মত ছোট মেয়েদের সাহায্য গ্রহণ খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পুলিশের কড়া নজর এড়িয়ে কিশোর ও তরুণদের সর্বত্র চলাফেরা করার উপায় ছিল না। ফেরারী বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের সর্বত্র লুকিয়ে আছেন। তাঁদের সাহায্য করা, তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে

দেওয়া, চিঠিপত্র পৌঁছে দেওয়া, ঔষধপত্র জামাকাপড় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো, বিপ্লবীদের পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ করা এবং তাঁদের লুকিয়ে রাখার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার দায়িত্ব কিছুটা আমি ও আমার বড়দির মেয়ে আরতি গ্রহণ করলাম। আমার সহপাঠী স্নেহ বিশ্বাস ছিল হাবিলাশদ্বীপ গ্রামের মেয়ে। সে চট্টগ্রাম খাস্তগীর স্কুল বোর্ডিং-এ থাকত। তার পক্ষে বাইরে যাতায়াত করার অসুবিধা ছিল; তাই সে আমাদের দু'জনকে একাজের ভার দিয়েছিল।

এভাবে গোপনে আমরা কাজ করছিলাম। নিজেদের বাড়ী থেকে বেশ কিছু সোনা ও অর্থ বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু এভাবে কাজ করতে পদে পদে বাধা আসতে লাগল। তাছাড়া এরকম কাজে আনন্দও পেলাম না। বিপ্লবী ভাইদের মারফৎ মাষ্টারদার নির্দেশ আসত; তার নির্দেশ ছাড়া কোন বিপ্লবীই প্রত্যক্ষ কাজে নামার অধিকার পেত না। তাই সুযোগের আশায় বসে রইলাম। স্নেহ আজ পৃথিবীতে থাকলে আজকের এই কাহিনী লেখার সময় তাকেও আমার পাশে বসিয়ে রাখতাম।

স্নেহ কথা দিল, ১৯৩২ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে গরমের ছুটিতে যখন গ্রামে যাবে, তখন মাষ্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে; এ বিষয়ে সাহায্য করবেন তারই দূর সম্পর্কের দুই দাদা—দ্বিজেন দাস ও ধীরেন দাস।

সুযোগ এল গরমের ছুটিতে। বড়দির বড় মেয়ে জ্যোৎস্নার শ্বশুরবাড়ী শাকপুরা গ্রামে—হাবিলাশদ্বীপের পাশেই এই গ্রাম। বড়দি আমাকে ও আরতিকে নিয়ে শাকপুরায় গেল। স্নেহকে আগেই খবর দিয়েছিলাম। সে লোক পাঠাল, দু'দিনের জন্য তার বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। অনেক কষ্টে বড়দিকে রাজী করিয়ে দু'দিনের জন্য হাবিলাশদ্বীপে স্নেহর কাছে এলাম। স্নেহ খবর দিল, মাষ্টারদার সঙ্গে ২।৩ দিনের মধ্যে দেখা হবার সুযোগ হবে না—অন্ততঃ চারদিন অপেক্ষা করতে হবে। দু'দিনের বেশী থাকার অনুমতি নেই। এখন কি করি? স্নেহের পরামর্শ মত পুকুর পাড়ে ঝিনুকভাঙ্গা দিয়ে পায়ের নীচে অনেকটা কেটে তাতে এরণ্ডার আঠা লাগিয়ে দিলাম। রাতের মধ্যেই পা ফুলে উঠল। সুযোগ এসে গেল। যিনি নিতে এলেন, তিনি বুঝলেন এই পা নিয়ে এখন হেঁটে যাওয়া যাবে না। কাজেই দু'দিন ছুটি মিলল।

ধীরেনদা এসে খবর দিলেন—৯ই জুন রাত ১০ টার পরে যাত্রা করব। কোথায় যাব, কিভাবে যাব সবই গোপন রইল। বিপ্লবীদের বাড়তি কৌতূহল থাকা উচিত নয়—এ উপদেশ আগেই শুনেছি। তাই আর জিগ্যেস করার সাহস হয় নি। ধীরেনদা ও দ্বিজেনদা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বিকেল থেকে প্রবল বৃষ্টি সুরু হল। মন ভেঙ্গে পড়ল—কি করে যাব। সুযোগ এল। দ্বিজেনদা এসে খবর দিলেন, তাঁর কাকীমার বাড়ীতে আমাদের তিনজনের নেমন্তন্ন। কাছাকাছি বাড়ী, তাই বাড়ীর লোকের আপত্তি হল না।

নেমন্তন্নের নাম করে একটা ছাতায় তিনজন—আমি, স্নেহ ও আরতি—বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে ঐ দুই দাদা। খালি পেটেই যাত্রা সুরু করলাম। পায়ে তখনও খুব ব্যথা। অন্ধকার রাত। জলে মাঠ ঘাট ভরে আছে। গ্রামে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়েই পথ। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে বড় বড় ধানক্ষেত পার হতে হয়। বৃষ্টিতে এঁটেল মাটি পিছল হয়ে গিয়েছে। অনভ্যাসে চলতে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছি ; কিন্তু যত কষ্টই হোক, যেতেই হবে। এ সুযোগ আর পাব না, তাই কোন কষ্টকেই গ্রাহ্য করলাম না। একটা ছাতায় তিন জন। বৃষ্টিতে সবাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। পায়ে কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও সেই দুই দাদাকে অনুসরণ করে চলেছি। হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতে যেটুকু পথ দেখা যাচ্ছে, তাতেই যথেষ্ট। তখনও জানি না কোথায় যাচ্ছি। বিপদের কথাও আর মনে নেই। মাথার ওপর বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কোথাও যেন প্রলয় হচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, ভালই হয়েছে—এত ঝড়-জলে পুলিশ অথবা গুপ্তচর কেউই ঘর থেকে বেরুবে না।

ঠিক মনে নেই কতক্ষণ হেঁটেছিলাম। বোধহয় দু'ঘণ্টা এভাবে পড়তে পড়তে চলেছি। পথে কি দেখেছি না দেখেছি লক্ষ্য করি নি। লক্ষ্য তখন একটাই—সেই মহানায়কের কাছে পৌঁছাতে হবে। যাঁদের সঙ্গে যাচ্ছি, তাঁদের কাছে জিগ্যেস করার সাহস ছিল না—এভাবে কতক্ষণ হাঁটতে হবে। একটা গাছের নীচে এসে একটা সমান জায়গায় ঘাসের উপর দাঁড়ালাম। লণ্ঠনটা তার আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে যেন আমাদের তিনজনের চোখ বেঁধে দিলেন। তখন হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেলাম। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম, গোপনীয়তা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা। পুলিশের হাতে যদি ধরা পড়ি, তবুও এই গোপন আস্তানার কথা প্রকাশ করতে পারব না।

তাই চোখবাঁধা অবস্থায় কিছুটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটি মাটির কোঠাবাড়ীর মেটে সিঁড়ি দিয়ে হাত ধরে ধরে কে যেন তুলছেন। প্রায় হামা দিতে দিতেই উঠলাম। একটা ঘরে এনে চোখ খুলে দিলেন। অন্ধকার—কিছুই দেখতে পেলাম না। একটা পাটির ওপর তিনজনে বসে আছি একটা কিছুর প্রতীক্ষায়। এই মুহূর্তে কত বিপদ আসতে পারে! চকিতে একবার মনে হল—যদি এই সময় ধরা পড়ি! সরকারের নির্মম অত্যাচারের কথা চট্টগ্রামবাসী কে না জানে! বুকটা কয়েকবার দুর দুর করে উঠল। মন স্থির করে শক্ত হয়ে বসে রইলাম।

কতক্ষণ এভাবে বসেছি ঠিক বলতে পারব না। হঠাৎ আমাদের সামনে ঘরের মেঝেতে আলো দেখতে পেলাম। একটা চৌকো জায়গা দিয়ে আলো আসছে। মই বেয়ে লণ্ঠন হাতে দু'জন মানুষ উঠে এলেন। দু'জনেই আমাদের সামনে এসে বসলেন। মাষ্টারদাকে ছোটবেলায় দু'তিনবার দেখেছি। আমাদের পাড়াতেই তাঁর শ্বশুরবাড়ী ছিল। কিন্তু সে চেহারা আমার মনে ছিল না, তাই সামনে দেখেও ঠিক চিনতে পারি নি। স্থির, উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কিছুক্ষণ দেখে নিলেন। দু'জনেই খুব গম্ভীর। আমরা মাথা নীচু করে বসেছিলাম। নির্মলদা প্রথম কথা আরম্ভ করলেন। তিনজনের পরিচয় ভাল করে জেনে নিলেন। আমাকে ও আরতিকে বিশেষভাবে চিনলেন। অনিল রক্ষিতের বোন আরতি আর আমি তাদের মাসিমা। তাছাড়া আমার বাবাকেও ভাল করে চিনতেন। আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি জিগ্যেস করলেন, অনেক ভয় দেখালেন। পুলিশ কি কি ভাবে অত্যাচার করতে পারে—সেই সব উদাহরণ বলে যেতে লাগলেন। আমরা সব রকম অত্যাচার সহ্য করতে পারব—এই কথা জেনে দু'জনেই নিজেদের পরিচয় দিলেন। আমরা পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ধন্য হলাম। সেই দিনের সে অনুভূতি আজ ৪০ বছর পরে কি করে প্রকাশ করব ভেবে পাচ্ছি না। বিচিত্র সে অনুভূতি! একাধারে মানুষ, দেবতা ও বিপ্লবী মহানায়কের সামনে বসে কিছুক্ষণ সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম।

এবার মাষ্টারদা কথা বললেন। আমাদের প্রাথমিক কর্তব্যগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সর্বাগ্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। সতর্কতা অবলম্বনের জন্য জেল-থেকে-ফেরা যে সব বন্দীর সঙ্গে পরিচয় ছিল, তাদের কাছেও যেন এসব কথা প্রকাশ না করি– সে সম্বন্ধে

বারবার বললেন। এমন কি আরতির দাদা অনিল রক্ষিতের কাছেও যেন কোন কথা প্রকাশ না করি—মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন জেলে দীর্ঘদিনের অত্যাচারের পর নাকি অনেকের মনের পরিবর্তন হয়। বিপদ কি ভাবে আসতে পারে, কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

মাষ্টারদার পকেটে কতগুলো ছবি ছিল। সেগুলো বার করে আমাদের দেখালেন। কাকে কাকে চিনি দেখিয়ে দিলাম। জালালাবাদের সংঘর্ষে মৃত শহীদদের অনেককেই চিনলাম। ছবি দেখাবার পর আমাদের তিনজনের হাতে একের পর এক রিভলবার দিলেন। সর্বশেষে আমার হাতে দিলেন এবং বললেন, আজ থেকে তোমরা প্রকৃত বিপ্লবী হলে। রিভলবারের কলগুলো নেড়েচেড়ে সব নাম বলে আমাদের কৌশল দেখিয়ে দিলেন। আমরাও বারবার টিপে টিপে দেখতে লাগলাম।

নির্মলদা তখন আরতির সঙ্গে কথা বলছিলেন। এই সময় মাষ্টারদা আমাকে আর স্নেহকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে উপদেশ দিলেন। সহ্যশক্তি বাড়াবার জন্য কতগুলি অভ্যাস দরকার। মা কালীর পূজা নিয়মিত করতে বললেন আর প্রতিদিন বুকের মাঝখানে চিরে ২।১ ফোঁটা রক্ত মা কালীকে উৎসর্গ করতে বললেন। আজ বুঝেছি যে, সহনশীলতা বাড়াবার জন্যই তিনি এই উপদেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই সহনশীলতার শিক্ষা আমার কাজে লেগেছিল। জীবন-সংগ্রামে এই শিক্ষা আমাকে যে মানসিক শক্তি দিয়েছিল, তারই জোরে আজও আমি সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা অর্জন করেছি।

নির্মলদা আরতির হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বলেছিলেন, যেন শহরে ফিরে গিয়ে প্রীতিদিকে (প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার) ঐ কাগজ দেখায়। কাগজে দুটা সংকেত-শব্দ (আজ তা মনে নেই) আর একটা ঘড়ি আঁকা ছিল। এই সাংকেতিক কাগজের টুকরো যত্ন করে বুকের মধ্যে রাখল আরতি। মাষ্টারদা জানিয়ে দিলেন, আর সময় নেই—এবার আমাদের যেতে হবে। আমাদের তিনজনের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। আমরা আবার তাঁদের পায়ের ধূলো মাথায় নিলাম। হ্যারিকেনটি হাতে নিয়ে ঠিক যে ভাবে ওপরে উঠেছিলেন সে ভাবেই নীচে নেমে গেলেন।

ঘর আবার অন্ধকার। কে যেন আমাদের আবার চোখ বেঁধে দিলেন। হাত ধরে সেই মাটির সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলেন। গাছতলায় এসে

চোখ খুলে দেখি দ্বিজেনদা, ধীরেনদা ছাতা হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

মাষ্টারদার কাছে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে শুনেছি। তাই বুঝলাম এই জন্য আমাদের চোখ বাঁধা হয়েছিল। কারা আমাদের ওপরে নিয়ে গেলেন আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তাঁদের পরিচয় আজও জানি না। বিপ্লবীদের গতিবিধি চিররহস্যময়।

ফেরার সময় কষ্ট হয় নি। মনের জোর দ্বিগুণ। গভীর প্রশান্তিতে বুক তখন ভরে উঠেছে। আজকের রাত কি মূল্যবান! মাষ্টারদার উপদেশগুলো মনে মনে চিন্তা করতে করতে যখন চলেছি, তখন বৃষ্টিও থেমে গিয়েছে। কতকটা এসেই একটা লেভেল ক্রশিং-এ 'ধলঘাট' নাম লেখা দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয় ধলঘাটে গিয়েছিলাম। দ্বিজেনদা, ধীরেনদাকে প্রশ্ন করলাম, 'আমরা কি ধলঘাট গিয়েছিলাম ?' তাঁরা বললেন, 'জানি না'। আর জিগ্যেস করার সাহস হল না। নিঃশব্দে ৪টা প্রাণী চলেছি জলকাদার মধ্যে আল ভেঙে ভেঙে। আমাদের পায়ের আওয়াজ আর ব্যাঙের ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই।

পূব আকাশে আলো দেখা যাচ্ছে। বোধ হয়, হাবিলাশ দ্বীপে এসে পড়েছি। সারাগায়ে কাদা। নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এত কাদা মেখে ফিরলে সকলে সন্দেহ করবে, তাই বাড়ীর কাছাকাছি একটা পুকুরে তিনজনে বেশ করে স্নান করে কাদা ধুয়ে বাড়ীর পিছনের বেড়ার ঝাঁপ খুলে ভিতরে গেলাম। কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে যখন দাঁড়ালাম, তখন পূব আকাশে সূর্য দেখা দিয়েছে। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না সারারাত আমরা কোথায় ছিলাম। ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম, গতরাত্রের অভিযানের কথা কেউ জানতে পারে নি বলে।

শাকপুরায় ফিরে আমি আর আরতি পূর্বরাত্রের অভিযানের কথা আলোচনা করছিলাম। আরতি বলল, আমরা নিশ্চয় ধলঘাট গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা আজও সঠিক জানি না, আমরা কোথায় গিয়েছিলাম। তবে প্রীতিদির কাছে পরে শুনেছিলাম, আমরা ধলঘাটে সাবিত্রী মাসিমার বাড়ীতেই সেদিন ঐ মহানায়কের দেখা পেয়েছিলাম।

নির্মলদার দেওয়া কাগজের টুকরোটা সযত্নে রেখে দিল আরতি। শহরে ফিরেই প্রীতিদির সঙ্গে দেখা করতে হবে। এবারে নিশ্চয় আমরা প্রত্যক্ষ

বিপ্লব করার অধিকার পাব। কৈশোরের আবেগ-উচ্ছ্বাস তখন আর ধরে রাখা যায় না।

আমরা তার পরদিন অর্থাৎ ১১ই জুন ফিরব ঠিক হল; কিন্তু আগের-দিনের রাতজাগা আর পথহাঁটার ফলে শরীর এত অবসন্ন যে দুজনেই আপত্তি করে আরো ২দিন শাকপুরায় থেকে ১৩ই জুন আমরা শহরে পৌঁছালাম।

প্রীতিদির সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের পরিচয়। প্রীতিদির ছোটবোন কনক আমার সহপাঠী। শান্তির সঙ্গে আমাদের খুব ভাব ছিল। বড়দা ওদের চার বোনকেই আমাদের মত স্নেহ করতেন। তাই মাঝে মাঝে আমরা ওদের বাসায় যেতাম আর ওরাও আমাদের বাসায় আসত। একদিন রাত্রে প্রীতিদি আমাদের বাসায় ছিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর প্রীতিদি প্ল্যান্‌চেট আনার কথা বললেন। একটা তিনপায়া টেবিলে তিনজনে বসে প্ল্যান্‌চেট আনা হল। প্রথমে জালালাবাদ যুদ্ধে নিহত শহীদ অর্ধেন্দু দস্তিদারের আত্মাকে আনা হল। তারপর আরো অনেক মৃত বিপ্লবীর আত্মাকে এনে অনেক প্রশ্নের জবাব নিয়ে প্রীতিদি সেদিন আমাদের কাছেই ঘুমিয়েছিলেন। আমি আর আরতি স্তম্ভিত হয়ে এই অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম।

প্রীতিদির কথাবার্তায় বুঝলাম, তিনি মনেপ্রাণে বিপ্লবী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ এল। নির্মলদার দেওয়া কাগজের টুকরো নিয়ে ১৫ই জুন প্রীতিদির বাসায় গেলাম। আরতির ওপরেই এই যোগা-যোগের ব্যবস্থা করার ভার পড়েছিল; কিন্তু ওকে একা ছাড়বে না বলে আমাকেও যেতে হল। কনক এগিয়ে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। প্রীতিদি তখন পর্দায় ঘেরা তাঁর শোবার ঘরে ছিলেন। আমরা যেতেই উঠে বসলেন। অনেক কাঁদলে যেমন চোখের মুখের চেহারা হয় ঠিক সেরকম মনে হল। প্রীতিদি কেন কাঁদছেন? কোন পারিবারিক কারণ হতে পারে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আরতি সেই কাগজের টুকরো প্রীতিদিকে দেখাল। প্রীতিদি কাগজখানা হাতে চেপে ফুপিয়ে কেঁদে বললেন, 'ওরে নির্মলদা তো আর নেই।' আমরা তখনও খবরের কাগজে কিছু দেখি নি। কি ঘটেছে, তাও জানি না। মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁকে স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কি করে এ সম্ভব? প্রীতিদি নিশ্চয় কোন ভুল খবর পেয়েছেন। আমরা সব কথা বললাম। তখন প্রীতিদি ধলঘাট সংঘর্ষে যা যা ঘটেছিল, একের পর এক বলে গেলেন। আমরা স্তম্ভিত বিস্মিত, এক মুহূর্তে যেন

পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। আমরা কি করব, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

আমরাই কি এই সংঘর্ষের জন্য দায়ী? কেউ কি আমাদের অভিযানের সংবাদ পেয়েছিল? কেউ আমাদের অনুসরণ করে নি ত? অনুশোচনায় মন ভরে উঠল—কেন আমরা দেখা করতে গেলাম! পুলিশ এবার হয়ত আমাদের কাছে আসবে; কিন্তু কই—পুলিশ ত আমাদের কিছু জানাল না! তা হলে আমাদের অভিযান এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নয়। প্রীতিদির কাছে এখন কিছুদিন যাওয়া উচিত হবে না—ভেবে চুপচাপ কাটালাম।

এইভাবে প্রায় ২।৩ মাস কেটে গেল। ১৯৩২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রীতিদি পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সেখানেই বিষ খেয়ে প্রাণ দেন। খবরের কাগজে এ খবর পড়ে বিস্মিত হলাম। ২।৩ বার ত দেখা হয়েছে প্রীতিদির সঙ্গে। এর মধ্যে সে রকম কিছু আভাস ত পাই নি।

এই ঘটনার পর আমাদের অভিভাবকেরা আর প্রীতিদির বাড়ীতে যেতে দিলেন না। বড়দা মাঝে মাঝে যেতেন আর প্রীতিদির বাড়ীর লোকের ওপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কথা এসে বলতেন।

এই ভাবে মন্থর গতিতে কিছু কিছু সংগঠনের কাজ করতাম—বড় কিছুই কখনও করতে পারি নি। ১৯৩৩ সনে আমি ও স্নেহ বিশ্বাস ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় বেথুন কলেজে পড়তে আসি। দুজনেই বোর্ডিং-এ থাকতাম। বিপ্লবী ভাইদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রইল না। তবে আরতি তখনও স্কুলে পড়ত: সে চাটগাঁয়ে তখনও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। ইতিমধ্যে মাষ্টারদাকে যে বিশ্বাসঘাতক ধরিয়ে দেয়, বিপ্লবী ভাইরা তাকেও হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে। এসব শুধু কাগজেই পড়তাম। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

আই-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী গেলাম। নন্দনকানন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিলাম; কিন্তু পুলিশ ছাড়ল না, আমাকে ও আরতিকে গৃহে অন্তরীণ করে রাখল। স্কুলের চাকরীও গেল, দুমাসের বেতনও বাজেয়াপ্ত হল।

বি. এ. পড়ার জন্য বাবা আবার আমাকে কলকাতায় পাঠালেন, কিন্তু ছুটিতে দেশে গেলেই আমাকে গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হত। এ ভাবে আমি বি. এ. পাশ করে এম. এ. পড়ার জন্য আবার কলকাতায় আসি। এর পরে আমার সঙ্গে বিপ্লবী ভাইদের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আজ ৪০ বছর পরে আমার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ নিয়ে লিখতে বসেছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের তালিকায় আমার নাম দেখে বুঝলাম কিছু করতে না পারলেও মাষ্টারদার আশীর্বাদ একেবারে ব্যর্থ হয় নি। দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের যে সংকল্প নিয়েছিলাম, নানা কারণে সে সংকল্প আমার কাজে পরিণত হয় নি। প্রীতিদির মত একটা মহৎ কাজে আত্মত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। মাষ্টারদার কাছে কয়েক মুহূর্তে যে উপদেশ পেয়েছিলাম, তাতে ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামে আমি প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলাম। আজও আমি সে শক্তি হারাই নি। আমার বিশ্বাস, মাষ্টারদার আশীর্বাদ আমরণ আমাকে পথ নির্দেশ করবে। আজ কাহিনী শেষ করবার আগে আবার সেই মহানায়ক মাষ্টারদা, নির্মলদা ও প্রীতিদিকে প্রণাম জানাই।

হয়তো আমাদের মধ্যে আজিকার অধিকাংশ কর্মীকে রণক্ষেত্রেই শয়ন করিতে হইবে; স্বাধীনতার বিজয়োৎসবে যোগদান করার সৌভাগ্য হয়তো জীবনে আসিবে না। কিন্তু আমরা সেই আশাতেই বাঁচিব এবং মৃত্যুকালেও সেই বিশ্বাস লইয়া মরিব যে, দুইখানি বাহু যখন নিস্তব্ধ হইবে, সহস্র বাহু অসমাপ্ত কার্যে পরদিনই প্রসারিত হইবে।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

বিপ্লবায়োজনে

তারিণী মাঝি এবং আরো অনেকে

প্রবোধরঞ্জন সেন

আমি সারা বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের পটভূমিকায় সর্বার্থসার্থক ক্ষেত্রভূমি চট্টলার বিপ্লব অভ্যুত্থানের কথাই বলব, যা সারা দেশকে সচকিত করে তুলেছিল অসীম শৌর্যবীর্যে, আর সেদিনকার ব্রিটিশ শাসকের বুকে এঁকে দিয়েছিল চরম ত্রাস ও হতাশার পদচিহ্ন। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল। সারা ভারত সেদিন উন্নতশিরে বলেছে, "ধন্য চট্টগ্রাম।" চট্টলার বুকে অবরুদ্ধ ইংরেজরা প্রমাদ গুণে কাতরকণ্ঠে বলেছে, 'বাঁচাও মোদের প্রাণ।'

চট্টগ্রামের এই বিপ্লব অভিযান-অভ্যুত্থানের সর্বাধিনায়ক বীর বিপ্লবী সূর্য সেন। সারা বাংলার, সারা ভারতের লক্ষ বীরের 'মাষ্টারদা'।

আজ এই পরিচিত প্রখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের, বীর শহীদদের বা দলের খ্যাতনামা কর্মীদের বীরত্বগাথা রচনা বা ইতিহাস পর্যালোচনা করব না। আজ মনে পড়ে তারিণী মাঝি, টুনু মিঞা, লুতা নামক হতচ্ছাড়া ছেলেটা, রামাচরণ পুরোহিত এবং আরো অনেকের কথা। এরা এসে গিয়েছিল কি করে ঠিক জানি না। এরা এসে লেগে গিয়েছিল বিপ্লব আন্দোলনের আত্মগোপন-পর্বে কর্মানুষ্ঠানযজ্ঞের সমিধ-সংগ্রহে, যার ফলে বিপ্লবীদের আত্মগোপন-পর্ব হয়ে উঠেছিল অনেকটা সহজ, অন্তরঙ্গ এবং মমতাময়। আজ বলব এমন দুজনের কথা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের পূর্বে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকাণ্ড ছিল বহুলাংশে শহরকেন্দ্রিক। গ্রামের অভ্যন্তরে ও আনাচে-কানাচে গোপন সংগঠন। সংগঠনের প্রস্তুতি হিসাবে পাহাড়-কন্দরে রাইফেল রিভলভারচালনা শিক্ষা ইত্যাদি চলত সন্দেহ নেই; কিন্তু সকলের মন পড়ে থাকত চট্টগ্রাম শহরের দিকে। সেখানেই ছিল দলের কেন্দ্রস্থল, কিন্তু অস্ত্রাগার অভিযান ও জালালাবাদ যুদ্ধের অনতিপরেই চট্টলার

গ্রামগুলিতে বিপ্লবী কর্মব্যস্ততা ও যাবতীয় বিপ্লবী কার্যধারা ছড়িয়ে পড়ে। এ এক অভূতপূর্ব গোপন প্রস্তুতি। যে গ্রামগুলিতে এতকাল ধরে সংগঠনের গোপন cell-গুলো প্রস্তুত করা হয়েছিল, যার পেছনে ছিলেন দলের নেতারা, আর যাদের অনলস কর্মগুণ ও প্রচেষ্টায় গোপন কর্মিবাহিনী প্রস্তুত হয়েছিল তার সিংহভাগে ছিল স্কুলের কিশোর ছাত্রদল, আর অনামা অবজ্ঞাত সাদাসিধে তরুণেরা। তখন এই গ্রামের বিপ্লবীবাহিনীর একমাত্র কোয়ালিফিকেশন ছিল,—তারা যথেষ্ট unmarked কিনা। বস্তুত: এই unmarked থাকাটাই ছিল সমগ্র গোপন প্রস্তুতির চাবিকাঠি।

এই গোপনবাহিনীই ছিল গেরিলা-সংগ্রামের হাতিয়ার। এইরূপ এক সামগ্রিক গোপন বিপ্লবায়োজন বোধ করি সারা ভারতে চট্টগ্রামেই প্রথম এবং অনন্য। এই গোপন আন্দোলন ও গেরিলা-প্রস্তুতির পর্বে দলের সংগঠনে এসে যোগ দিয়েছেন নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, নানা ক্ষেত্রের নানান জন। এঁদের মধ্যে আমরা একদিকে পাই জমিদার জোতদার মহাজন, অন্যদিকে গরীব চাষী মজুর হাটুরে দোকানী আর মাঝিমাল্লা। একদিকে উকিল আমলা শিক্ষক, অন্যদিকে ছাত্র পুরোহিত পটুয়া সাধু ফকির বৌদ্ধ শ্রমণ—অনেককে। এঁদের মধ্যে গ্রামের কুলবধূ কন্যা বৃদ্ধা সকলকেই আমরা দেখি বুকে এক বজ্রকঠোর সংকল্প নিয়ে বিপ্লবী ভাই-বোনদের আগলে রাখতে, স্নেহে-সাহায্যে অভিসিঞ্চিত করতে। এঁরা অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে এই সামগ্রিক প্রস্তুতিতে সামিল হয়েছেন। বিপ্লবী আত্মগোপন-কারীদের দিনের পর দিন সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন,—আশ্রয় দান, আহার যোগানো, পুলিশ গোয়েন্দার আগমন-সংবাদ আদান-প্রদান, আত্মগোপন-কারীদের এক আস্তানা থেকে অন্য আস্তানায় আনা-নেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে। এঁরা প্রত্যেকেই ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক। এই অনামা সৈনিকদলের অনেকেই 'মরমেই মরে গেল, মুকুলেই ঝরে গেল প্রাণভরা আশা সমাধি-পাশে'।

অবাক বিস্ময়ে ও বেদনায় ভাবি, আজ এই দেশব্যাপী প্রচার ও প্রকাশের মহাযজ্ঞে যে কলকণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সেখানে এই অতি 'আপন বিপ্লবী বন্ধুদের' কথা কে বলবে! এঁদের জন্যে কি কেউ এক বিন্দু অশ্রুও বিসর্জন করবে না? দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় কি এই অনামা অসম সাহসী বীর সৈনিকদের জন্য একটি অক্ষরও ফুটবে না? আজ বিশ্ব-বিস্ময়

তাজমহল প্রস্তুতকারক কারিগরদের মতো যারা ভারতের বিপ্লব-প্রস্তুতির এই কুশলী কারিগরেরাও বিস্মৃতির অতীত তীরে বিলীয়মান! এই লগ্নে আমি আমার দেশের এই অসংখ্য বীর সৈনিকদের, মা বোনদের উদ্দেশ্যে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

যে প্রসঙ্গে বলছিলাম, তাই বলি। অনামা বহু কর্মী বন্ধুদের মধ্যে কোয়েপাড়া গ্রামের দু'চার জনের কথাই বলব। এদের বহুদিন ধরে দেখেছি। শেষের দিকে এদের সঙ্গে নানা কর্মে জড়িয়েও পড়েছি।

এরা প্রত্যেকেই বিপ্লবীদের আত্মগোপনপর্বে নানাভাবে দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ ও অসম সাহসিক কাজে লিপ্ত হয়, যা এতটুকু প্রকাশ হলে সেদিন এই অতি দরিদ্র গ্রামবাসীরা স্ত্রী পুত্র পরিবারে একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। এদের অনেকেই অশিক্ষিত, বলতে গেলে 'আকাট মূর্খ'। অথচ প্রত্যেকের মধ্যে যে মহান্ হৃদয় ও দুর্মদ সাহসিকতার পরিচয় আমরা সেদিন পেয়েছি, তা ভাবতে গেলে অবাক-বিস্ময় জাগে। দলের সংস্পর্শে আনতে এদের বিপ্লবী বাণী, পরাধীনতার মর্মকথা বা জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনাতে হয় নি। আর তার উপায়ও ছিল না। কেননা, এইসব বোঝবার মতো জ্ঞান এদের ছিল কিনা সন্দেহ। তবে কিসের টানে এরা আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের বাঁচাতে সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে এল? মনে হয় তাদের এই ছিল প্রাণের ইসারা, এই ছিল বোধশক্তি যে, এই পালিয়ে-বেড়ানো ছেলেরা যে আগুন নিয়ে খেলছে, সে আগুনে পুড়েই তবে আসবে সকলের মুক্তি। এই বোধ মানুষের প্রাণের শিরায় শিরায় প্রবাহিত এক সনাতনবোধ। এতে শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, হয় না বিশেষ কোনো বোঝাবুঝির কচ্‌কচি। তারা ভেবেছে এবং সংকল্প নিয়েছে, আত্মগোপনকারী ছেলেদের বুক দিয়ে আড়াল করে রাখবে। এরা সবাই মনের এক সহজাত সত্তায় বুঝে নিয়েছিল, এসব ঘর-পালানো ছেলেদের

'পিছনে কাঁদিছে কত দিবসের কত স্মৃতিমাখা গেহ,
সমুখে অজানা অকূল জগৎ আপনার নাহি কেহ।'

তাই তাদের জন্য মমতা অন্তরঙ্গতায় এরা হয়ে উঠেছিল আকুল।

খেলাঘাটের তারিণী মাঝি। একটা আনকুৎ চেহারা, কালো ভুঁড়িসর্বস্ব গোলাকার শরীর। বারোমাস খালি গা। শরীরের নানা স্থানে স্থায়ী চাকা

চাকা দাদ। তাই আমরা তার অগোচরে তাকে দাউদ খাঁ বলতাম। জাতিতে বৌদ্ধ বলেই বোধ করি ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ। বয়স কত বোঝা মুস্কিল। ছোটবেলা থেকেই তারিণী তার খড়ি-ওঠা বিরাট বপুর জন্য বোধ করি, আমাদের কাছে কিছুটা এড়িয়ে-যাওয়া লোক ছিল। তার কথাবার্তাও ছিল ধমকানো গোছের। আর সাম্পানের মাঝি হিসাবে সে যে খুব জনপ্রিয় ছিল তাও নয়। বোধ করি তারিণীর তিরিক্ষি মেজাজই এর জন্য দায়ী।

এক রাত্রিতে আদেশ পেলাম—তারিণী মাঝির সাম্পান খেলাঘাটের অদূরে এক বটগাছের নীচে অপেক্ষা করছে। সেই সাম্পানে করে ওপারে যেতে হবে এবং ওপার থেকে দুজন A. B. C. (Absconder)-কে নিয়ে আসতে হবে। শুনে বেশ কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। রাত এগারোটা নাগাদ যথাস্থানে দেখা গেল সাম্পান তীরে বাঁধা, কিন্তু মাঝি কই? হঠাৎ পেছনে এক কালো দৈত্যছায়া অন্ধকারে যেন হুমড়ি খেয়ে সামনে এসে পড়ল। আমরা দুজন নীরবে সাম্পানে উঠলাম। মাঝিও নীরবে সাম্পান বেয়ে ওপারে পাড়ি দিল। শান্ত কর্ণফুলীর মাথার ওপর তারার চুমকি-জড়ানো আকাশের দিকে তাকাতেই শুনতে পেলাম, 'ব্যাটারা কথা বলবিনে কিন্তু।' তারিণী মাঝির খসখসে গলার চাপা সাবধান বাণী। বস্তুতঃ দুজনেই তখন নিশ্চুপ হয়ে গেছি। ওপারে সাম্পান এসে ভিড়ল। আমরা উঠে গেলাম সাম্পান থেকে। একটু পরেই চারজন ফিরে এসে বসলাম সাম্পানে। সাম্পান নীরবে চলে আসছে এপারে, তবে অনেকটা ভাঁটি পথে।

এই প্রথম পরিচয়। পরিচয় বলব না, প্রথম উপলব্ধি এবং অতি অকরুণ উপলব্ধি। কেবল গাঁয়ের ছেলেদের প্রতিই যে তারিণীর এই রকম ব্যবহার ছিল তা নয়, বস্তুতঃ অনেক আত্মগোপনকারী বিপ্লবী আরোহীও তারিণীর কাছে ধমক খেয়ে সাম্পানের ভেতর কথাবার্তা বন্ধ করেছেন, বা তার উপদেশ মতো একেবারে গেঁয়ো ভাষায় তাঁদের চাষ, আবাদ, বাজার ইত্যাদি বিষয়ে কথা চালাতে হয়েছে। তারিণী যে পুলিশ টিক্‌টিকি বা অন্যান্য সহকর্মীদের নিকট হতেও কতটা সজাগ ছিল, এতেই বোঝা যাবে।

তারিণীর কর্তব্যজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। সে দলের পুরোভাগের কর্মীদের চিনে নিয়েছিল কেবলমাত্র তার তীক্ষ্ণবুদ্ধির গুণে। মাষ্টারদা ও নির্মলদাকে একবার নাকি তারিণী নদীপার করে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। সঙ্গে সঙ্গেই নির্মলদা তারিণীকে হাত ধরে তুলে জড়িয়ে ধরেন।

তারিণী নাকি সেদিন গভীর নিশীথে নদীতীরে মাষ্টারদার সামনে মাথা নীচু করে বলেছিল, 'দয়া রেখো'। সে দিন বুঝতে পারি নি, আজও না। কিসের দয়া ভিক্ষা করেছিল সেদিন অতি দরিদ্র তারিণী মাঝি মহান্ বিপ্লবী প্রাণের নিকট? একি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গুহক চণ্ডালের স্নেহ করুণা ভিক্ষা?' জানি না।

তবে এটা অতি সত্য যে আমরা, অর্থাৎ গ্রামের অর্বাচীনেরা, তারিণীর কাছ থেকে ভ্রূকুটি ও ধমকানি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পাই নি।

আরেক রাত্রির কথা বলি। ঘোর বর্ষার রাত। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও বর্ষণ। আমরা তিনজন কর্ণফুলী পার হব তারিণীর সাম্পানে। বর্ষার রাতে জলকাদায় ডোবা পথ দিয়ে কোনক্রমেই এগোনো যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সকলেই ভিজে জব্জবে হয়ে নদীতীরে এসে দেখি একটি সাম্পান অশান্ত নদীতীরে বারবার আছড়ে পড়ছে। আমরা হুড়মুড় করে সেই সাম্পানে এসে শুনলাম তারিণীর চাপা গলার গর্জন। অশ্রাব্য সে ভাষা 'তোরাও মরবি, অন্য ব্যাটাদেরও মারবি। আর তোরা মরলে শেয়ালেও টান্‌বেনা' ইত্যাদি। আমাদের অপরাধ, রাত আর বিশেষ নেই। এত দেরী তার অসহ্য। লক্ষ্য করলাম মুহূর্তমাত্র দেরী না করে তারিণী সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে অশান্ত কর্ণফুলীর বুকে পাড়ি জমিয়েছে। এতটুকু দ্বিধা নেই, নেই এতটুকু অবহেলা। তার বুকে ছিল বজ্রের সাহস, শরীরে অসুরের শক্তি।

সেই সন্ধ্যার কথাও মনে পড়ে। কর্ণফুলীর ওপারে শ্রীপুর গ্রামের চড়ায় আচম্‌কা ধরা পড়েন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী মহেন্দ্র চৌধুরী। আনতে গিয়েছি তারিণীর সাম্পানে। গোয়েন্দা ও পুলিশ বাহিনী সেই চড়ার পূর্বদিকের এক ঘাটে ওঁত পেতে বসে আছে। ওপারে পৌঁছেই রাখাল ছেলেদের মুখে মহেন্দ্রদার ধরা পড়ার খবর শুনতে এবং একটা গাছের তলায় তোয়ালেবাঁধা কিছু জিনিষ পত্র দেখতে পেলাম। সেগুলো নিয়েই দৌড়ে উঠে এসেছি তারিণীর সাম্পানে। তারিণীও কাল বিলম্ব না করে দিয়েছে পাড়ি। তারই মুখে শুনলাম, ওদিক থেকেও কারা সাম্পান নিয়ে ছুটে আসছে আমাদের সাম্পান ধরতে। সেদিন যে অপূর্ব শারীরিক শক্তি ও কৌশলে তারিণী এপারে ভিড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এক সরুখালে সাম্পান ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তা ভাবলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আর সেদিনই বোধ করি সর্বপ্রথম তারিণীর কুত্‌কুতে চোখে হাসি দেখতে

পেয়েছিলাম। সাফল্যের হাসি। 'শালারা আমায় ধরবে? যা, এবার তোরা পালা।'

এরূপ অসংখ্য ছবি। অসংখ্য স্মৃতিতে তারিণী মাঝি আমাদের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল রত্ন হয়ে রইল! স্বল্পপরিসর এই প্রবন্ধে কতটুকুই বা তার সম্বন্ধে বলতে পারা যায়!

এইরূপে আমরা আর এক সাম্পান মাঝি টুনু মিঞাকে পাই। টুনু মিঞা ছিল তারিণীর একেবারে বিপরীত মেজাজের মানুষ। ওপারের চরদ্বীপে তার বাড়ী। ওপারের বিপ্লবী কর্মীদের অশেষ বিপদের কাণ্ডারী ছিল টুনু মিঞা। আমরা তার সাম্পানে সওয়ার হলেই তার মুখে শুনতাম স্বগতোক্তি, 'এদের কল্জে বড়ই বিরাট, এরাই পারবে।' কাদের সম্বন্ধে টুনু মিঞার এই প্রশস্তি, বুঝতে বাকী থাকত না। আমাদের দেখলেই টুনু মিঞা হাঁকত, 'ও ভালোমানুষের ছেলে, ওপারে যাবে?' কতই যেন আপন-করা আহ্বান!

কথায় কথায় প্রসঙ্গের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে গেল, অথচ কিছুই যেন বলা হল না। হল না উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত কতজনার 'বিরাট কল্জে'র কথা।

ওগো বাঙ্গলার যুবকসম্প্রদায়, স্বদেশসেবার পুণ্যযজ্ঞে আজ আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ কে পূর্ব গগনে ভারতের ভাগ্য-দেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

স্মৃতিতর্পণ

সুধীন দাশ (পটীয়া, চট্টগ্রাম)

গহিরা যুদ্ধ [১৯শে মে, ১৯৩৩]

অতীতের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত কাহিনী লিখতে বসে প্রথমে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি মাষ্টারদা ও নির্মলদাকে, যাঁদের অনুপ্রেরণায় ও নেতৃত্বে চট্টলার বীর বিপ্লবীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের সফল অস্ত্রাভিযানের মাধ্যমে দেশের বুকে তুলেছিল আলোড়ন—স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে গেয়ে করেছিল তুমুল সংগ্রাম, যার ফলে সেদিন বৃটিশ সিংহাসন কেঁপে উঠেছিল। জালালাবাদের পাহাড়ে, কালারপুলে, ধলঘাটে, গৈরলায় এবং গহিরায় বৃটিশ সেনার সাথে মুক্তিপাগল বীর বিপ্লবীরা লড়েছিল বীর বিক্রমে। সেই পুণ্যস্মৃতিময় বীরত্বগাথা ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখের সফল অস্ত্রাভিযানের পর চট্টলার বীর বিপ্লবীরা দেশকে স্বাধীন করার মানসে অসীম সাহস বুকে নিয়ে চট্টগ্রামের পাহাড়ে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সরকারী সুশিক্ষিত সৈন্যদের সাথে সম্মুখ সমরে হাসতে হাসতে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন—ফাঁসীর মঞ্চে দিয়েছেন আত্মাহুতি। সেই কীর্তিকাহিনী সবারই জানা আছে। এমন একটি কাহিনীতে ভরা গহিরা খণ্ডযুদ্ধ।

ত্রিশ সালের যুববিদ্রোহের পর থেকে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী চট্টগ্রামের বুকে এসে জড়ো হয়েছে। তারা সহরে-গ্রামে-গঞ্জে এসে ছাউনী ফেলেছে; দেশের বুকে চলছে নানা নির্যাতন। অনেক কর্মী ও নেতা কারারুদ্ধ হয়েছেন; শুরু হয়েছে চারিদিকে তল্লাসীর পালা। এরি ভেতর দিয়ে আত্মগোপনকারী বীর বিপ্লবীরা দলীয় কাজ ও সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন। গৈরলা সংঘর্ষে মাষ্টারদার গ্রেপ্তারের পর দলের নেতৃত্ব এসে পরে ফুটুদার (তারকেশ্বর দস্তিদার) উপর। আত্মগোপন অবস্থায় তিনি দলকে সুশৃঙ্খলভাবে চালিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি তখন আনোয়ারা থানার তুলাতলী-বারাসত এলাকায়

আত্মগোপন করে কাজ চালাচ্ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আমিও আত্মগোপনকারী জীবনযাপন করি ১৯৩৩ সালের প্রথম দিক থেকে। তখন আমাদের পটীয়া থানা এবং বোয়ালখালী থানার প্রতি গ্রামে পুলিশের দারুণ অত্যাচার চলছিল। কিছুদিন নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে কাটাবার পর ফুটুদার নির্দেশে আনোয়ারা থানার তুলাতলী গ্রামে গিয়ে ফুটুদার সাথে মিলিত হই। তুলাতলী গ্রামের সেই আশ্রয়ে ফুটুদা ও কল্পনাদি (ভুলুদা) ছিলেন। সেখানকার আমাদের দলের ব্রজেন দে, অবিনাশ দাশ, মনোরঞ্জন দাশ প্রমুখ বিশ্বস্ত কর্মিবৃন্দের সহায়তায় আনোয়ারার কয়েকটি আশ্রয়ে কাটাবার পর বাঁশখালী থানার সাধনপুর গ্রামে কিছুদিনের জন্য চলে আসি। সেদিকে পুলিশের উপদ্রব কিছুটা কম ছিল।

আমার পলাতকজীবনে দেখেছি আশ্রয়দাতাদের অদম্য মনোবল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পুরস্কার-ঘোষিত বিপ্লবী নেতাদের আশ্রয় দান করতে পেরে অনেক আশ্রয়দাতা গৌরব বোধ করতেন। এক আশ্রয়কেন্দ্রের গৃহস্বামী ছিলেন পুরোনো চোর। প্রথম জীবন থেকে চুরি করতে করতে তখন বৃদ্ধত্বে এসে পৌঁচেছেন। তখন চুরি করাব সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁর মানসিকতা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। তাঁকে আশ্রয়ের কথা বলতেই তিনি বললেন, 'জীবনে বহু অপকর্ম করেছি, এখন একটু দেবতার সেবা করার সুযোগ দিন।' যতদিন তাঁর বাড়ীতে মাষ্টারদা, নির্মলদা, ফুটুদা প্রমুখ নেতারা ছিলেন ততদিন তিনি কত যে ভালবাসা ও প্রীতি দেখিয়েছেন তা বলবার নয়। শত ভয় ভীতি লোভ লালসা উপেক্ষা করে প্রাণ দিয়ে তাঁদের সেবা করতেন।

আর এক আশ্রয়দাতার কথা বলছি। তিনি হচ্ছেন আনোয়ারা থানার এক গ্রামের মুসলমান কৃষক। সমস্ত জেনে শুনেই তিনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের বলতেন, 'আপনারা ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। যদিও আমাদের থানায় সৈন্যেরা ছাউনী ফেলেছে, তবুও আমি গ্রাহ্য করি না। আমাব প্রাণ থাকতে কেউ আপনাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।' গৃহস্বামী গরীব মুসলমান। টাকা-পয়সাও নিতে চাইতেন না। গরীব বটে, কিন্তু মনটি ছিল উদার। এহেন কত শত আশ্রয়দাতাদের কাহিনী আছে। তাঁদের প্রাণঢালা ভালবাসার কথা জীবনে ভুলবার নয়। তাঁদের সহযোগিতা না থাকলে চট্টগ্রামের বুকে

আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা ৩।৪ বছর অবধি পলাতকজীবন নিয়ে কাটাতে পারতেন না।

গহিরা গ্রামখানা হল আনোয়ারা থানার সর্বশেষ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে। সমুদ্রের জল-কল্লোলে গ্রামখানা সব সময় মুখরিত হয়ে থাকে। সেই গ্রামেরই বর্ধিষ্ণু পরিবারের লোক পূর্ণ তালুকদার ও তাঁর ছোট ভাই প্রসন্ন তালুকদার। তাঁদের বিরাট বসতবাটি। তাঁদের বাড়ীর পশ্চিমে পুকুর। তারপরই সমুদ্রের বিরাট চর। তাঁদের দুই ভাগিনা ছিল আমাদের দলের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের সাথে যোগাযোগে এবং আমাদের দলের কর্মিবৃন্দের সহায়তায় আমরা বাঁশখালী থানার সাধনপুর, কালীপুর গ্রামে কয়েকদিন কাটাবার পর গহিরার এই আশ্রয়ে চলে আসি ১৯৩৩ সালের ১৬ই মে। সেই দিনই বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত ছনদণ্ডী গ্রামের আত্মগোপনকারী বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত এসে আমাদের সাথে মিলিত হয়। বৃটিশ সৈন্য তখন আনোয়ারা থানার সর্বত্র ছেয়ে ফেলেছে। তারা কয়েকটি গ্রামে ছাউনী ফেলেছে ও তল্লাসী চালাচ্ছে। আত্মগোপনকারীদের পক্ষে চলাফেরা করা খুবই অসুবিধা হয়েছে। তবুও তার ভেতর দিয়ে আমাদের দলের ব্রজেন দে, অবিনাশ দাশ, মনোরঞ্জন দাশ প্রমুখ কর্মিবৃন্দ শত বিপদ উপেক্ষা করে সংবাদ আদানপ্রদান করত। আমরা সৈন্যদের গতিবিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতাম। তবুও দেখেছি আশ্রয়দাতা তালুকদার ভ্রাতৃবৃন্দের মনোবল কতই সুদৃঢ়! সমস্ত জেনে-শুনেই তাঁরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং খুবই আদর যত্ন করতেন। সেই আশ্রয় কেন্দ্রে ফুটুদা, কল্পনাদি, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আমি ছিলাম। আমরা দিনের বেলায় ঘরে আবদ্ধ থেকে বোমার পাউডার তৈরী করতাম এবং নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতাম। আমরা আলোচনা করে স্থির করেছিলাম কুমিরা-সীতাকুণ্ডের দিকে যাব। সেভাবেই আমরা তৈরী হচ্ছিলাম। সেদিককার আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত বিপ্লবী নেতা ছিলেন বিনোদ দা (বিনোদ দত্ত)। তাঁর সাথে আমাদের যোগাযোগ চলছিল সেদিকে যাবার।

সন্ধ্যা হলেই আমরা স্নান, খাওয়া ইত্যাদি সেরে সমুদ্রের চরে গিয়ে বসতাম। সেখানে দলের কর্মীরা খবরাখবর নিয়ে আসত। ১৬ই মে থেকে ১৮ই মে অবধি এভাবেই আমরা দিন কাটাই। ১৮ই মে সন্ধ্যার সময় তুলাতলী গ্রামের মনোরঞ্জন দাশ খবরাদি নিয়ে ফুটুদার সাথে দেখা করতে

আসে। অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর রাত বেশী হওয়াতে পথে টহলদার সৈন্যের সম্মুখে পড়ার আশঙ্কায় মনোরঞ্জনকে ভোরের দিকে যাবার কথা ফুটুদা বললেন। রাত প্রায় ৩।৩০ টার সময় আমরা সবাই আশ্রয়ে চলে আসি। আশ্রয়ে এসে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা সবাই শুয়ে পড়ি। রাত বেশি করে শোয়ার দরুণ আমরা সত্বর ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরের দিকে মনোরঞ্জনকে ফুটুদা জাগিয়ে দেন, যেন ভোরে ভোরে গহিরা গ্রামের বাইরে চলে যেতে পারে। যেই মনোরঞ্জন ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের উঠানে এসে দেবালয়ের পাশ দিয়ে বাড়ীর বাইরে যাবার জন্য উদ্যত, ঠিক সেই সময় সৈন্যেরা তাকে ধরে ফেলে এবং চুপচাপ থাকতে বলে। কিন্তু মনোরঞ্জন আমাদের জানিয়ে দেবার জন্য জোরে চিৎকার করে বলে উঠে, 'পুলিশ পুলিশ।' তখনই আমরা চারজন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে রিভলভার হাতে পর পর ঘর থেকে বের হই। প্রথমে আমি, তারপর মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও ফুটুদা এবং সবার পেছনে কল্পনাদি। উঠানে নামতেই দেখতে পাই সৈন্যদের দ্বারা বেষ্টিত আশ্রয়স্থল। তখন পুরো ভোর হতে আর আধঘণ্টা মাত্র বাকী। আমরা কর্ডন ভেদ করে সমুদ্রের দিকে চলে যাবার চেষ্টা করি এবং ফুটুদার নির্দেশ মত সেইদিকে সৈন্যদের প্রতি তাক করে গুলী বর্ষণ করি। দেখতে পেলাম ২।৩টি সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। তখনই সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য এসে গেল এবং তারা ডাকাডাকি করে আমাদের দিকে গুলী ছুঁড়তে লাগল। তখন ফুটুদা আমাদের আবার গৃহে প্রবেশ করতে আদেশ দিলেন। গৃহে ঢোকার পর তাড়াতাড়ি ঠিক করা হয়, আমরা শেষ গুলীটি থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আমাদের কাছে চারটি বোমা ছিল এবং একসের ওজনের সোনার অলঙ্কার ছিল। আমরা ঐ সমস্ত জিনিষ নিয়ে ঘর থেকে বের হলে সোনার অলঙ্কারগুলি প্রসন্ন তালুকদারের হাতে ফুটুদা দিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'যদি অলঙ্কারগুলি আমাদের কেউ নিতে আসে তাহলে দিয়ে দেবেন।' ফুটুদা আরও বললেন, 'যতক্ষণ অবধি সাহেবেরা দরজার কাছে এসে আপনাদের বের হতে বলবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা কেউ ঘর থেকে বের হবেন না।' তাঁদের এই নির্দেশ দিয়ে কোঠা ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন এবং আমরা দক্ষিণ দিকের ঘরে ঢুকে পড়লাম। সেই ঘরে ঢুকে শুনতে পেলাম বাইরের উঠান থেকে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে। ফুটুদা জোর গলায় বললেন, 'আত্মসমর্পণ নয়, আমরা শেষ গুলীটি পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

আমি ফুটুদাকে বললাম, 'রাতের আর বেশী দেরী নেই। আপনাকে এবং ভুলুদাকে (কল্পনাদি) বাঁচাতেই হবে। পার্টিকে সুসংগঠিত রাখার জন্য আপনাদের পালিয়ে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আমি আর মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে কর্ডন ভেদ করে চলে যাবার উদ্যোগ নিলে সৈন্যেরা মনে করবে আমরা সবাই সেদিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। এতে তাদের লক্ষ্য থাকবে সেদিকে। আর এরই সুযোগে আপনারা অন্যদিকে পালিয়ে যাবেন।' এই প্রস্তাব মত মনোরঞ্জন আর আমি বোমা ও রিভলভার নিয়ে দরজার কাছে এসে কোন্‌দিকে দৌড়ে যাব দেখছি, এমন সময়ে পশ্চিমদিক থেকে একটা গুলী মনোরঞ্জনের বুকে এসে বিঁধল। আমরা দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। গুলী লাগামাত্রই 'ভাই আমি চললাম—তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও' বলেই আমার গায়ে ঢলে পড়ল। তৎক্ষণাৎ তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলাম। অজস্র রক্ত ঝরতে লাগল, যেন বাঁধভাঙ্গা বন্যার জল কলকল শব্দে ছুটে চলেছে। রক্তের শেষ বিন্দু নিঃশেষ হবার পর তাকে দেখতে পেলাম যেন হাসি-হাসি মুখে মৃণ্ময় শয্যায় শায়িত এক দেবকুমার।

মিনিট কয়েক অতিবাহিত হবার পর আবার পরিকল্পনামত হাতে বোমা ও রিভলভার নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে উঠানের দিকে দৌড় দেব, এমন সময়ে ফুটুদা আমাকে ধরে ফেলে বললেন, 'একজনকে তো হারালাম, আর তোমাকে এভাবে হারাতে চাই না। পরিণামে যা হবে হোক, upto last bullet যুদ্ধ চালিয়ে যাব।' এই বলেই দরজা বন্ধ করে ঘরের তিনটি বড় জানালা খুলে দিয়ে গুলি ফায়ার করতে লাগলাম আমরা তিনজনে। তারই মধ্যে দরজা খুলে বোমা চারটি নিয়ে উঠানে নেমেই সৈন্যদের দিকে তাক করে চারটি বোমাই ছুঁড়ে দিই। ভীষণ শব্দে বোমাগুলি ফেটেছিল। সৈন্যরাও তাদের মধ্যে বলাবলি করে ভীষণ গুলীবর্ষণ করতে লাগল এবং আমরাও সমানে গুলী চালিয়ে যেতে লাগলাম। ভোর হবার পর অবধি এভাবেই গুলী বিনিময় হতে হতে আমাদের সমস্ত গুলী নিঃশেষ হয়ে গেল।

তখন প্রায় সকাল আটটা বাজে। বাড়ীর বাইরে থেকে ক্যাপটেন হাঁক দিতে থাকে, 'আত্মসমর্পণ কর এবং উলঙ্গ হয়ে হাত তুলে বের হও।' বাইর থেকে আমাদের বের হতে বলায় গৃহস্বামী ৭০।৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ পূর্ণ তালুকদার ওঁদের বের হয়ে যেতে বলেছে মনে করে আমরা যে ঘরে আছি সে ঘরের

সম্মুখ দিয়ে গিয়ে যেই উঠানে নেমেছেন সে সময় একটি গুলীর শব্দ শুনলাম এবং একটা ভারী জিনিষেরও পতনের শব্দ শুনলাম। সৈন্যরা যে ঐ বৃদ্ধকে গুলী করেছে তা আমরা বুঝতে পারি নি। কারণ সে সময় দরজাটি বন্ধ ছিল। তারপর ফুটুদা বললেন, 'যা হবার তা ত হবেই, আর দেরী করে লাভ নেই।' ওদিকে Captain, Majorরা ঘন ঘন হাঁক দিচ্ছে। এতে আমরা পর পর হাত তুলে বের হলাম। দরজা খুলে বাইরের উঠানে যাবার পথে পূর্ণ তালুকদার মহাশয়ের প্রাণহীন দেহ দেখতে পেলাম। সৈন্যরা সঙ্গীন উঁচিয়ে, পিস্তল তাক করে আমাদের কাছে এসে আমাদের পিছমোড়া করে বন্দী করল। এর পর বাড়ীর বাইরের রাস্তার পাশে মনোরঞ্জন দাশকে (যার চিৎকারে আমরা জানতে পারি পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলেছে) মাথায় বেটন দ্বারা আঘাত-প্রাপ্ত ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পাই। এক জাঠ মেজর তার হাতের বেটন দিয়ে আমার বুকে এক প্রচণ্ড আঘাত করল। সেই আঘাতে আমি প্রায় দশ মিনিট নিশ্বাস ফেলতে পারি নি। সেই বেটন মারার কাল দাগ শরীরের চামড়ার সাথে মিশে যেতে প্রায় ৩/৪ বছর লেগেছিল। তারপর আমাকে এবং ফুটুদাকে চৌকিদারেরা নীল পাগড়ির কাপড়ের দুদিক দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রাস্তার এক পাশে বসিয়ে রাখল এবং কল্পনাদিকে অন্য এক দড়ি দিয়ে বেঁধে আমাদের থেকে আলাদা করে বসিয়ে রাখল। ৫/৬ জন সৈন্য সঙ্গীন উঁচিয়ে পাহারা দিতে লাগল। সেই সময় দেখতে পেলাম দূর থেকে অনেক সৈন্য এসে সেই আশ্রয়ে জমা হচ্ছে।

দু'জন ইংরেজ অফিসার ফুটুদা ও আমার কাছে এসে আমাদের নাম জিজ্ঞেস করল এবং ফুটুদাকে বুট দিয়ে এমনভাবে লাথি মারল, যার ফলে তাঁর বাম চোখের ভ্রূর উপরে ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। এর পর আর আমাদের কারো উপর তেমন কোন শারীরিক নির্যাতন করে নি কারাগৃহে নেওয়া পর্যন্ত।

দেখতে পেলাম, আশেপাশের গ্রামের লোক এসে সেখানে জড়ো হয়েছে এবং আমাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের সময় নানা দুঃখ প্রকাশ করছে। সে সময় গ্রামবাসীর চেহারা দেখে আমরা অনুভব করেছি যে আমরা ধরা পড়াতে তারা কতই দুঃখিত। তাদের সহানুভূতিপূর্ণ চোখমুখ এখনো যেন আমার চোখে ভেসে উঠছে। পরে জানতে পেরেছি যে সৈন্যেরা এই আশ্রয়স্থানকে ঘিরে ফেলার সাথে সাথে সেই গ্রামের আর যত সব পথ

আছে সবগুলিতেই সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল, যাতে কোন রকমে গ্রাম থেকে কোন লোক বাইরে যেতে না পারে।

এর পর আমাদের গহিরা গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে তুলাতলী গ্রামের ছাউনীতে হাঁটিয়ে নিয়ে আসে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সারার পর আবার হাঁটিয়ে ৪।৫ মাইল উত্তরদিকে আনোয়ারা হাইস্কুলের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করার পর সকালবেলা আবার হাঁটিয়ে ৭।৮ মাইল উত্তরে কালারপুলে নিয়ে আসে। সেখানে তখন গুর্খা রেজিমেণ্টের বিরাট ক্যাম্প ছিল। তাদের মাঝখানে আমাদের বসিয়ে রাখার পর ইংরেজ ক্যাপটেনরা আমাদের নিয়ে কয়েকটি ফটো তুলে নিল। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম সহর থেকে একখানা লঞ্চ এসে পৌঁছে। এতে করে ফিরিঙ্গী বাজারের সন্নিকটে রায়বাহাদুর অভয় মিত্রের ঘাটে আমাদের অবতরণ করান হয়। সেখান থেকে হাঁটিয়ে কোতোয়ালী থানার সন্নিকটে ডি, আই, বি, অফিসে এনে হাজির করে। সেখানে আমাদের তিন জনের জবানবন্দী নেওয়ার পর ২০শে মে সন্ধ্যা ৭ টার সময় চট্টগ্রাম জেলে নিয়ে আসা হয়।

গহিরা যুদ্ধের পরে

এতদিন অবধি ফুটুদার সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু জেলে নিয়ে আসার পর আমাদের তিন জনকে তিন জায়গায় নিয়ে গেল। ফুটুদাকে মাষ্টারদার পাশের সেলে রাখা হল। কল্পনাদিকে মহিলা ওয়ার্ডে এবং আমাকে হাসপাতাল ওয়ার্ডে রাখা হল। দীর্ঘদিন পর ফুটুদার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে মন বড়ই খারাপ লাগছিল।

আমরা ধরা পড়ার আগে থেকেই মাষ্টারদার বিচার শুরু হয়েছিল। এস্তেকালী অফিসের এক কক্ষে (অধুনা ডি, আই, বি, অফিস) Special Tribunal-এ বিচার চলে। আমরা ধরা পড়ার পর আবার একসাথেই বিচার আরম্ভ হয়। আমাকে কিছু দিন তাঁদের সাথে case-এ রাখার পর—Harbouring, Arms act এবং Explosive act-এর ধারা দিয়ে আমার মামলা ভিন্ন করে ফেলে। মাস কয়েক অবধি মাষ্টারদা, ফুটুদা এবং কল্পনাদির বিচার চলে। বিচারে মাষ্টারদা ও ফুটুদার ফাঁসী এবং কল্পনাদি দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। চোদ্দ মাস হাজত বাসের পর তিনটি ধারায় আমার সাড়ে সাত বছর কারাদণ্ড হয়। বিভিন্ন জেলে চার বছর কাটাবার পর গান্ধীজীর

সাথে তদানীন্তন বাংলা গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সাথে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপার নিয়ে এক চুক্তি হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে কোলকাতার দমদম জেল থেকে মুক্তিলাভ করি। মুক্তি পাবার ৩।৪ মাস পর আবার আমাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। এক বছর অন্তরীণাবস্থায় থাকার পর ১৯৪০ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। তারই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তরীণ থেকে মুক্তিলাভ করি। তারপর ১৯৪২ সালেব গান্ধীজী: ভারত-ছাড় আন্দোলনে আবার বন্দী হয়ে ডেটিনিউ হিসাবে ঢাকা জেলে অবস্থান করি। তথায় দীর্ঘ চাব বছর আবার বন্দীজীবন যাপন করার পর ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থগিত হবাব ফলে মুক্তিলাভ করি।

মরণজয়ী বীরেন দে

চট্টগ্রাম জেলার পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচিযা গ্রামেব এক মধ্যবিত্ত পরিবাবে বীরেন্দ্রলাল দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল গ্রামে অতিবাহিত করার পর কৈশোর থেকেই পিতামাতার সঙ্গে চট্টগ্রাম সহরের ফিরিঙ্গী বাজার এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি আদর্শবান ছিলেন। লেখাপডা ও শিক্ষা-দীক্ষায় স্কুলে তাঁর সুনাম ছিল। স্কুলে পড়বার সময়েই তিনি বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, অটল সংকল্প, সাহসিকতা ও সাংগঠনিক শক্তি দেখে মাষ্টারদা তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন এবং পার্টিব মধ্যে তিনি সকলের স্নেহভাজন হয়ে উঠেন।

সে সময় বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। মাষ্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে গোপন পরামর্শ চলছে। মাষ্টারদা দৃঢভাবে বললেন, 'অর্থ-সংগ্রহেব জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করে দেশে বিপ্লবের পরিপন্থী পরিবেশ সৃষ্টি করা আমি পছন্দ ও সমর্থন করি না। পার্টির সক্ষম বিপ্লবী ভায়েরা নিজেদের বাড়ী থেকে টাকা, পয়সা, সোনা, বন্দুক ইত্যাদি সংগ্রহ করবে। এতে দলের সকলের মনের দৃঢ়তা এবং বিপ্লবের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনকেও উপলব্ধি করা যাবে।' মাষ্টারদার এই প্রস্তাবের যথার্থতা সকলেই অনুধাবন করলেন এবং অচিরেই পার্টির মধ্যে তা প্রচার করে দেওয়া হল। এর পরিপ্রেক্ষিতে দলের অনেকেই বাড়ী থেকে সোনার অলঙ্কার, টাকা-পয়সা ও বন্দুক ইত্যাদি সংগ্রহ করে

মাষ্টারদাকে দিতে লাগলেন। বীরেনদা দলের সদস্যদের এভাবে অর্থ-সংগ্রহের পদ্ধতি দেখে চিন্তা করতে লাগলেন, কী ভাবে তিনি নিজে বাড়ী থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মাষ্টারদার হাতে তুলে দেবেন। তাঁর পিতামাতা তো গরীব। তাঁর মায়ের তো কোনও সোনার গয়না নেই। সম্বল মাত্র দুখানি রূপোর বালা। কী করে তিনি বাড়ী থেকে অর্থ সংগ্রহ করবেন, এই চিন্তায় একেবারেই পাগলপ্রায় হয়ে উঠলেন। শেষে ঠিক করলেন, বাক্স থেকে ঐ দুটো বালাই গোপনে নিয়ে মাষ্টারদার হাতে দিয়ে দেবেন। এ চিন্তা করেই মাকে না জানিয়ে একদিন সেই বালা জোড়াটি কাগজে বেঁধে মাষ্টারদার হাতে দিয়ে দিলেন। মাষ্টারদা জানতেন, বীরেনদার পারিবারিক অবস্থা ভাল নয়। তাঁর পক্ষে টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও কাগজে-মোড়া জিনিষগুলো হাতে নিয়ে মাষ্টারদা বীরেনদাকে কাছে বসালেন এবং আদর করে নানা আলাপ করতে লাগলেন। শেষে কাগজে-মোড়া জিনিষটি খোলামাত্রই দেখলেন এক জোড়া রূপোর বালা। মাষ্টারদা জিগ্যেস করলেন, 'এগুলো কার কাছ থেকে এনেছ?' বীরেনদা বললেন, 'আমার মায়ের বাক্স থেকে এনেছি। মাষ্টারদা, আমার বন্ধুরা অনেকে তো অনেক টাকা এবং অলঙ্কারাদি এনে আপনাকে দিয়েছে। যদিও আমি গরীব, তবুও কিছু দেব না কেন? দেশের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছি। আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে অন্য বন্ধুদের মতো আমার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য আমার মনকে সজীবতায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।' এ বলেই বীরেনদা উদ্গত অশ্রু রোধ করবার জন্য মাষ্টারদার বুকে মুখ লুকালেন। মাষ্টারদা বীরেনদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলতে লাগলেন, 'ভাই বীরেন, তুমি বালা জোড়াটি তোমার মায়ের বাক্সে রেখে দাওগে। তোমার অন্তরের সৌন্দর্যটুকু দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার কাছ থেকে আমি আজ যা পেলাম, তার তুলনা কোন সময় হবে না। আমি সেটুকু আজ তোমার কাছ থেকে প্রাণভরে গ্রহণ করছি এবং তোমায় আশীর্বাদ করছি, তোমার জীবন ফুলের মত দেশের বুকে ফুটে উঠুক এবং দেশ হতে দেশান্তরে সৌরভ ছড়িয়ে দিক।'

তারপর ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের যুববিদ্রোহে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং ২২শে এপ্রিলের জালালাবাদ যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সহিত বৃটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে পৃথিবীর বুকে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। জালালাবাদ যুদ্ধের পর পরবর্তী সংগ্রামের জন্য মাষ্টারদা, নির্মলদা ও

অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে তিনিও আত্মগোপন করেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ৫০০, (পাঁচ শত) টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। গ্রেপ্তার এড়িয়ে দেশের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে দিনযাপন করছিলেন এবং পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

আমাদের গ্রামের বাড়ীর (পটীয়া থানার অন্তর্গত ভাটীখাইন গ্রাম) সংলগ্ন একটি খালি দোতলা ঘর ছিল। সেই ঘরটি আমাদের পটীয়া এলাকার বৃহত্তম আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। আত্মগোপনকারী নেতা ও কর্মীরা এদিকে এলেই আমাদের এই আশ্রয়কেন্দ্রে কিছুদিন থেকে যেতেন। আত্মগোপনকারীরা কোথাও বেশীদিন এক জায়গায় থাকতেন না। কিছুদিন থাকবার পর আশ্রয়স্থান বদলান হত। এই আশ্রয়কেন্দ্রে মাষ্টারদা, নির্মলদা, ফুটুদা, রামকৃষ্ণদা, বিনোদদা (দত্ত), প্রীতিদি অনেক বার আসা-যাওয়া করেছেন। এই আশ্রয়স্থানে একবার মাষ্টারদা, নির্মলদা ও বীরেনদা এলেন ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে। এখানে একদিন থাকার পর বীরেনদা সাংগঠনিক কাজে আমার জেঠতুতো ভাই আমাদের দলের বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ কর্মী পরেশ দাশের সাথে তাঁর নিজগ্রাম সুচিয়া যান। সেখানে এক বৃদ্ধার গৃহে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় এক কর্মীর সাথে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন এবং তাকে রিভলভার চালনা শিক্ষা দেন। গুলীভর্ত্তি রিভলভারটি বীরেনদার পাশেই রাখেন এবং বার বার কর্মীটিকে সাবধান করে দেন। তারপর আবার তাঁরা দুজনে বৈপ্লবিক আলোচনা সুরু করেন। কর্মীটির অসাবধানতাবশতঃ হঠাৎ ট্রিগারে হাত লেগে সশব্দে গুলী বের হয়ে বীরেনদার ডান উরু ভেদ করে যায়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় কর্মীটি চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু বীরেনদা ধৈর্যসহকারে দুহাত দিয়ে ক্ষতস্থানের দুদিকে চেপে ধরেন। তবুও ক্ষতস্থান থেকে তীব্র বেগে রক্ত ঝরতে থাকে। পরেশ বালতি ভরে ভরে রক্ত বাইরে ফেলে দিতে থাকে। গুলীর শব্দে সেই পাড়ায় কোন চঞ্চলতা এসেছে কিনা তা পরখ করে দেখার জন্য পরেশকে পাঠান হয় এবং গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধাকে অধৈর্য না হবার জন্য তিনি উপদেশ দেন। বৃদ্ধাকে বলা হয়, সন্ধ্যা হলেই এই বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া হবে।

এই দুর্ঘটনাটি ঘটে সকাল ৮।৯ টার সময়। বীরেনদাকে সেই বাড়ীতে সেখানকার কর্মীদের তত্ত্বাবধানে রেখে পরেশ দুপুর একটার মধ্যে আমাদের

গ্রামে (ভাটীখাইন) ফিরে আসে এবং আমাদের আশ্রয়বাসে এসে মাষ্টারদা, নির্মলদা ও ফুটুদাকে দুর্ঘটনার খবর জানায়। খবর শুনে তাঁরা খুবই মর্মাহত হলেন এবং সেখান থেকে পটীয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। পরেশকে আবার সুচিয়া গ্রামে পাঠান হল এবং সেই রাত্রেই বীরেনদাকে পাল্কী করে চক্রশালা আশ্রয়বাসে নিয়ে আসা হল। তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য ফুটুদাকে আমাদের বাড়ীর আশ্রয়বাস থেকে চক্রশালা আশ্রয়বাসে পাঠান হল। আমি প্রতি রাত্রে মাষ্টারদা ও নির্মলদাকে নিয়ে বীরেনদাকে দেখে আসতাম। চিকিৎসা ভাল চলছিল না। কারণ আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবার সুযোগ ছিল না।

চক্রশালা গ্রামের আমাদের এক সমর্থক এবং আশ্রয়দাতা কবিরাজ চিকিৎসা করছিলেন। যেখানে ইন্‌জেকশান এবং ভাল ডাক্তারী ঔষধের প্রয়োজন, সেখানে কবিরাজী ঔষধে কী হবে? রক্তঝরা বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু ঘা শুকোচ্ছিল না। কবিরাজী ঔষধ প্রয়োগে প্রথমে মনে হচ্ছিল ঘা বুঝি শুকোচ্ছে। এইভাবে প্রায় মাসেক অতিবাহিত হবার পর দেখা গেল ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে গেছে। মাষ্টারদা, নির্মলদা ও ফটুদা এতে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু পুলিশের সতর্কদৃষ্টির মাঝে আর কিছু করা সম্ভব হল না। ফটুদা অতি যত্নে তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা আর হয়ে উঠে না। সেদিন সকালবেলা থেকে অবস্থা বিশেষ খারাপের দিকে গেল। তিনি নিজেই বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছিলেন তাঁর অবস্থার কথা। তখন ফুটুদাকে বলছিলেন, 'ফুটুদা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এতে অবশ্য আমি খুশীই হয়েছি। আমাকে নিয়ে মাষ্টারদা, নির্মলদা এবং আপনাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। পলাতক-জীবনে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টির ভেতর দিয়ে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমার সেবা-শুশ্রূষা করতে হয়েছে। এতে মাঝে মাঝে মনে মনে ভাবতাম আপনাদের সকলকে এভাবে কষ্ট দেবার চেয়ে আত্মহত্যা করা শ্রেয়ঃ। মাঝে মাঝে বলেছিও আমার রিভলভারটি আমাকে দেবার জন্যে। একদিন দুপুর বেলা আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, আমি রিভলভারটি পেড়ে নেবার জন্যে আস্তে আস্তে উঠতে চেষ্টা করি, কিন্তু পা বসাতে পাচ্ছিলাম না বলে হঠাৎ পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ে যাই। এতে আপনি জেগে উঠেন এবং দেখতে

পান ক্ষতস্থান থেকে আবার রক্ত পড়ছে। আমি বুঝতে পাচ্ছি, আজ আমার ডাক এসেছে। ফুটুদা, মাষ্টারদাকে বলবেন যেন আমায় ক্ষমা করেন। আমি তাঁর অযোগ্য শিষ্য: কত আশা করেছিলুম, মাষ্টারদার আদেশে আবার সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ব, দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য হাসতে হাসতে এ-জীবন বিলিয়ে দেব। আমি অভাগা, আমার আর কিছুই করা সম্ভব হল না। মাষ্টারদা, নির্মলদার সাথে আর দেখা হল না। তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাবেন।' ফুটুদা তখন বীরেনদাকে কতভাবেই না সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন! মাষ্টারদা, নির্মলদা সন্ধ্যা হলেই এসে পড়বেন। এখন এই বিকাল বেলায় তাঁদের আসা ত সম্ভব নয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বীরেনদা আবার বলতে লাগলেন, 'ফুটুদা, আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, কত কটু কথা বলেছি, আমায় ক্ষমা করবেন। ফুটুদা, দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখন আমার সমাধির উপর স্মৃতি-ফলকে লিখে দেবেন:

'Here lies notorious Biren
With a bullet from his friend.'

তখন ফুটুদা বললেন, 'ভাই বীরেন, তুমি ত কিছুতেই notorious হতে পার না। ধন্য জীবন তোমার! তুমি যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছ—জালালাবাদ যুদ্ধে ব্রিটিশবাহিনীর সাথে সিংহবিক্রমে লড়াই করে জালালাবাদকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছ। তুমি notorious হতে পার না। তুমি famous—তুমি মহৎ—তুমি বিপ্লবী বীর—তুমি চট্টলামায়ের কৃতী সন্তান—তুমি চট্টলার গৌরব।' ফুটুদার কথাগুলো শোনার পর বীরেনদা নীরবে শির দোলালেন এবং চক্ষু বন্ধ করলেন। চোখ বন্ধ করার সাথে সাথেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ফুটুদা সকালবেলা ফুল এবং ফুলের মালা আনিয়ে রেখেছিলেন। তখন তিনি বীরেনদার প্রাণহীন দেহ শয্যার উপর ভাল করে শুইয়ে দিলেন এবং ফুল ও ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে মাষ্টারদা ও নির্মলদার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার পর মাষ্টারদা, নির্মলদা ও রামকৃষ্ণদাকে সেই আশ্রয়বাসে নিয়ে গেলাম। বীরেনদাকে দেখে মনে হচ্ছিল, স্বর্গীয় আভাযুক্ত এক দেবশিশু যেন শুভ্র শয্যায় নিদ্রামগ্ন। মাষ্টারদা, নির্মলদা ও রামকৃষ্ণদা—তাঁরা তিনজনেও তিনখানা ফুলের মালা মৃতদেহে পরিয়ে দিলেন। তারপর স্থানীয় কর্মী ও সমর্থকদের সহায়তায় নিকটস্থ শ্রীমাই পাহাড়ে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল

এবং শ্রীমতী মন্দিরের (চক্রশালা গ্রামে যেখানে শ্রীমতী স্নান উপলক্ষে মেলা হয়) পূর্বদিকে পাহাড়ের উপর তাঁর পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়।

এই ভাবে কত মহাপ্রাণ যে অকালে লোকচক্ষুর অন্তরালে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন, তার হিসাব কে রাখে ! দেশের তরে উৎসর্গীকৃত মহৎপ্রাণ বিপ্লবী বীরেনদাও এইভাবে অকালে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আজ সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের স্মৃতিতর্পণ শেষে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি চট্টলার কৃতী সন্তান, অগ্নিপুরুষ মহাপ্রাণ বিপ্লবী বীর মাষ্টারদা, নির্মলদা, ফুটুদা, ও অন্যান্য বিপ্লবী বীর ও শহীদদের। তাঁদের কীর্তিকাহিনী যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং তাতে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা অনুপ্রেরণা পাবে। ত্রিশ সালে মাষ্টারদা স্বাধীনতার যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় উনিশো একাত্তর সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লাখো শহীদের রক্তদানের ভেতর দিয়ে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে উজ্জ্বল আভায় প্রকাশমান।

"জয় বাংলা—জয় ভারত।"

"ভারত-বাংলা মৈত্রী দীর্ঘস্থায়ী হোক।"

বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করিবার একটি মাত্র পন্থা রহিয়াছে এবং তাহাকে লোকে চলতি ভাষায় Revolution কিম্বা বিপ্লব বলে। আমি বিশ্বাস করি যে, আমার পরাধীন জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার আমার যদি Divine Right থাকে তবে Revolution-এর সাহায্যে তাহা কার্যে পরিণত করিবারও আমার Divine Right রহিয়াছে।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

অতীত দিনের গোপন স্মৃতি

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

১৯২৮ সালে ময়মনসিংহ হইতে চট্টগ্রাম আসি। তখন আমার বয়স ১৩ কি ১৪ বৎসর। কানুনগোপাড়া গ্রামের বাড়ীতে আসার পর বাবা বাড়ীর সকলের ইচ্ছানুযায়ী আমাকে গ্রামের টোলে ভর্তি করিয়া দেন। দুই এক মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে গ্রামের কিছু কিছু ছেলের আলাপ-পরিচয় হয়। হঠাৎ একদিন আমাদের গ্রামের শিশিরদা (শিশিরবিন্দু দত্ত) আমাদের বাড়ীতে গিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে গেলেন। পথে তিনি আমাকে নানারকম কথা বলিলেন। তাঁহার কথাবার্তার মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিল। আমি তাঁহার প্রত্যেকটি কথা শুনিযা মুগ্ধ হইলাম। এই শিশিরদার প্রভাবেই আমি প্রথম বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসি। তাঁহার নিকট হইতেই কানাইলাল ক্ষুদিরাম প্রমুখ বিপ্লবীদের জীবন-কাহিনী পড়িয়া গুপ্ত সমিতির বা বিপ্লবের কথা বুঝিতে পারি। কয়েকদিন পরে রামকৃষ্ণদার (শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস) সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁহার কাছ হইতে অনেক কিছু জানিতে পারি। তাঁহার কাছেই আমি প্রথম পিস্তল ও রিভলভার দেখি এবং হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করি। নানাভাবে নানাস্থানে গোপনে গ্রামের বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত হই।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর আমাদের গ্রামের শচীনদা (শচীন্দ্রনাথ গুহ) একদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,'ভাই, এই সুটকেসটি রেখো। খুব সাবধানে রেখো'। ভিতরে কি আছে জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইল; কিন্তু গুপ্ত সমিতির নিয়মানুযায়ী জানিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে শচীনদা বলিলেন, 'এর ভিতর চারটি বোমা আছে। মাষ্টারদা যখন চাইবেন, তখনই পাঠিয়ে দিতে হবে।' জীবনে এই প্রথম বোমা দেখিলাম। দুঃখের বিষয়, শচীনদা যেদিন মাষ্টারদার নির্দেশমত আমার কাছ হইতে বোমাগুলি আনিতে গিয়াছিলেন, সেদিন

আমি পারিবারিক কাজে কেলিসহর গ্রামে ছিলাম। তিনি বুদ্ধি করিয়া আমার এক দাদার (নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি বোমার ব্যাপার কিছুই জানিতেন না) দ্বারা আমাদের বাড়ীর গুপ্তস্থান হইতে সুটকেসটি উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। পরে শুনিয়াছি, চাঁদপুর ষ্টেশনে তারিণী মুখার্জী হত্যার পর রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর কাছে এই বোমাগুলিই পাওয়া গিয়াছিল।

আমার এই ক্ষুদ্র বিপ্লবী জীবনে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারিব না। একদিন অমরদা (অমরেন্দ্রনাথ কানুনগো) আমাকে রাইফেল, রিভলভার ও পিস্তলের গুলিতে ভর্তি আর একটি সুটকেস দিয়াছিলেন। সুটকেসটি তালাবদ্ধ ছিল না—দড়িদ্বারা বাঁধা ছিল। আমি সন্ধ্যার পর সুটকেসটি ছাদের উপর আমার বিছানাতে রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য নীচে নামিয়াছিলাম। এমন সময় বিছানার উপর সুটকেস দেখিয়া বাবার সন্দেহ জাগিল। সুটকেস খুলিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির; মা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলকে আমার এই অপকর্মের কথা বলিতে লাগিলেন। আমাকে অনেক ভৎর্সনা ও মারধর করিলেন। অবশেষে সুটকেসটি পুকুরে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলে আমি বলিলাম, 'একটি গুলীও যদি নষ্ট হয়, তবে এ বাড়ী ধ্বংস হবে। এগুলি মাষ্টারদার জিনিষ।' বাবা ভয় পাইয়া নিরস্ত হইলেন। পরদিন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া অমরদাকে জিনিষগুলি প্রত্যর্পণ করিলাম।

গুপ্ত সমিতির কাজ করা কতই যে অসুবিধাজনক, তাহা বলাই বাহুল্য। নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া লোককে বিশ্বাস করিতে হয়। তখন চট্টগ্রামের অবস্থা ভয়াবহ। দিবারাত্র পুলিশ, মিলিটারী ও গোয়েন্দারা গ্রামে ও সহরে টহল দিয়া বেড়াইতেছে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের জন্য, কিন্তু তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।

একদিন জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামের হরিপদ দের সঙ্গে দেখা করি। তিনি দাঙ্গাবাজ এবং মামলা-মোকর্দমা প্রভৃতি অসামাজিক কাজে পটু। তাঁহাকে আমি বিপ্লবীদের আশ্রয়দান সম্পর্কে মনের কথাগুলি বলি। তিনি আমাকে কথা দিলেন, বিপ্লবীদের রক্ষা করার জন্য তিনি যে-কোন রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। হরিপদ একজন চাষী গৃহস্থ। তখনকার দিনে সাধারণত কোন

শিক্ষিত গৃহস্থ বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে সাহস করিত না; কিন্তু হরিপদ বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়া যে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও মানবতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহা বিরল। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না।

একদিনের একটি ঘটনা বলি। মাষ্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটুদা), কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন বিপ্লবী তখন হরিপদ দেব আস্তানায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানিবার জন্য আমি সকালবেলা সারোয়াতলী গ্রামের দিকে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে আমাদের বিপ্লবী বন্ধু পরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। তাহার কাছে শুনিলাম, বহু মিলিটারী ও পুলিশ আসিয়া নানাদিকে তল্লাসী সুরু করিয়াছে। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আমি হরিপদকে এই খবর জানাইলাম। তখন সকাল ৮টা। আশ্রয়স্থলে গিয়া আমিও মাষ্টারদার সঙ্গে দিনের বেলায় সাক্ষাৎ করিয়া এই খবর জানাই। আমি হরিপদ দের পরামর্শ মত মাষ্টারদা প্রমুখ সকলকেই নানারূপ ছদ্মবেশ লইয়া ঘাস রাখার ঝুড়ি, কাঁচি ও গরু প্রভৃতি সহ নিকটবর্তী পাহাড়ের দিকে চলিয়া যাইতে বলিলাম। মাষ্টারদা প্রমুখ চলিয়া যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরেই সৈন্যবাহিনী হরিপদ দের বাড়ী ও ঐ পাড়া ঘিরিয়া তল্লাসী করিল। ততক্ষণে বিপ্লবীরা পাহাড়ের ভিতর চলিয়া গিয়াছেন। হরিপদর উপস্থিত বুদ্ধি মাষ্টারদাদের রক্ষা করিয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে পোপাদিয়া ক্যাম্পের পুলিশ আসিয়া হরিপদকে একদিন পোপাদিয়া ক্যাম্পে হাজিরা দিতে বলিল। হরিপদ আমাকে এই সংবাদ দিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওখানে গিয়ে কি বলবেন?' উত্তরে হরিপদ বলিলেন, 'আমাকে মণি দাশগুপ্ত বা পুলিশের অন্যান্য লোকেরা কিছুই করতে পারবে না। আমি প্রায় হাজারটা ফৌজদারী মোকর্দমা করেছি। মিথ্যা কথা বা সুবিধামত কথা কি করে বলতে হয়, তা আমি জানি। আমি পুলিশ আর সি. আই. ডি.-দের ঘোল খাইয়ে ছাড়ব।'

পরদিন হরিপদ ছেঁড়া-ময়লা জামা ও ছোট কাপড় পরিয়া উস্কো-খুস্কো চুলে এবং গায়ে ও হাতে-পায়ে ধুলা-কাদা মাখিয়া পাগলের রূপ ধরিয়া পোপাদিয়া ক্যাম্পে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হাতে বাঁশের একটি কঞ্চিও ছিল। জমিদার সারদা লালার বাড়ীটি ছিল মিলিটারী ক্যাম্প, বাড়ীর সামনেই দুইজন বন্দুকধারী সৈনিক পাহারা দিত। হরিপদ একবার আগাইয়া যান

এবং একবার পিছাইয়া পড়েন। দুই তিন বার এইরূপ করিয়া এক সময় রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন। তিনি উদাস নয়নে একবার এইদিক-ঐদিক তাকান আবার হঠাৎ হাসিয়া ফেলেন। সৈনিক দুইটি হরিপদর এই হাবভাব লক্ষ্য করিল। একজন হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'পাগলা, তুই কী চাস্?' হরিপদ যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই—এই ভাব দেখাইলেন। সৈনিকটি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলার পর হরিপদ হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'পুলিশবাবু গরু চায়। কৈ, এখানে গরু কৈ? কোন গরুই ত এখানে নেই। গরু রাখার জায়গা কৈ?'

একটি সৈনিক পাগল আসার খবর মণীন্দ্র দাশগুপ্তকে দিল। তিনি হরিপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর নাম কি?' হরিপদ কানে যেন কম শুনেন—এই ভাব দেখাইলেন। হরিপদকে বারবার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, 'বাবু কৈ? গরু রাখবার জায়গা কোথায়?' মণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর নাম কি বল?' হরিপদ শুনিয়াছেন ভাব দেখাইয়া উত্তর করিলেন, 'বাবু, আমার নাম? আমার নাম হরিপদ দে। বাড়ী জ্যৈষ্ঠপুরা। আপনি নাকি সেদিন আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন গরু কিনতে? সেদিন আমি বাড়ী ছিলাম না, তাই দেখা হয় নি। গরু আমাদের বাড়ীতে আছে। তবে সেগুলি আমি বিক্রী করব না। আপনি কি রকম গরু চান? গাই গরু না বলদ গরু? আপনি যদি বলেন, তবে আমি গরু দু' চারটা কিনে দিতে পারি। কত সের দুধের গরু চান এবং কত টাকার মধ্যে? গাই গরু তো চান। বলদ নিয়ে কী করবেন?'

এই সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়া ও হরিপদর চেহারা দেখিয়া মণীন্দ্রবাবু খুবই বিরক্তি বোধ করিলেন এবং প্রকাশ্যেই বলিলেন, 'কোন উল্লুক রিপোর্টার এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে যে, সূর্য সেন এদের বাড়ীতে থাকে? আহাম্মক কোথাকার!'

মণীন্দ্রবাবু হরিপদকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সূর্য সেন কোথায় জানিস? সূর্য সেনকে চিনিস?' হরিপদ উত্তর করিলেন, 'সূর্য সেন? আমাদের বাড়ীর পাশে মণীন্দ্র সেন, দেবেন্দ্র সেন, উপেন্দ্র সেন ও নীরেন্দ্র সেন থাকে। সূর্য সেন তো নেই।' মণীন্দ্রবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'কল্পনা দত্তকে দেখেছিস? কল্পনা দত্ত কোথায়?' হরিপদ উত্তর করিলেন, 'আমাদের গ্রামে কোন দত্ত টত্ত নেই। ঐদিকে ভূপতি দত্ত, বিধু দত্ত, খোকা দত্ত আরো

অনেক দত্ত আছে। আমি ওদের ঠিক ঠিক চিনি না। ওখানে গরু-টরু কিছু পাওয়া যাবে না। গরু কিনতে হলে রাঙ্গুনিয়া বা রাউজান যেতে হবে।'

এই সমস্ত শুনিয়া মণীন্দ্র দাশগুপ্ত খুব রাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কোথাকার এক পাগল ছাগলের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে! সূর্য সেন আর লোক পায় নি, থাকবার আর জায়গা পায় নি!' এই বলিয়া হাতের হাণ্টার ষ্টিকটি দিয়া হরিপদকে এক ঘা দিয়া বলিল, 'যা, বেরিয়ে যা।' হরিপদ তখন উদ্‌ভ্রান্তভাবে এইদিক-ঐদিক তাকাইয়া ধীরে ধীরে মিলিটারী শিবির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হরিপদর ভাই কালীপদ দে এবং রামকালী দে-ও পুলিশের হাতে অনেক লাঞ্ছনা পাইয়াছেন। উভয়েই পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিতেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার ফলে তাঁহাদের চাকুরী চলিয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামের আর একজন আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁর নাম অশ্বিনীকুমার দে (কবিরাজ)। প্রধানত ঐ গ্রামের অল্পবয়স্ক অথচ অত্যন্ত দায়িত্বশীল বিপ্লবী কর্মী সুধীর কানুনগো চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কিছুদিন পরে অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করে। বিপ্লবীদের দেওয়া এই আশ্রয়স্থলের নাম 'কুটির'। বিপ্লবী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার আত্মগোপনকালে টাইফয়েডে আক্রান্ত হইলে এই স্থানে প্রায় দুইমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হন। অশ্বিনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা, দায়িত্বজ্ঞান ও স্নেহ-মমতার জন্য আমাদের সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

আমি একদিন রাত্রি প্রায় ৯টার পর মাষ্টারদা, ফুটুদা ও কল্পনা দত্ত প্রমুখ কয়েকজন বিপ্লবীকে ঐ বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ-বাহিনী ঐ আস্তানা ঘিরিয়া ফেলিল। বিপ্লবীরা ছিলেন ছাদের উপরে। শেষ লড়াই করিতে হইবে মনে করিয়া মাষ্টারদাসহ সকলেই সিঁড়ির মুখে রিভলভার হাতে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। এদিকে পুলিশ নীচের ঘরে তল্লাসী করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া নিকটস্থ এক খালি বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। এই সুযোগে মাষ্টারদা ও অন্যান্য সকলেই ছাদ হইতে নামিয়া মুহূর্ত মধ্যেই দক্ষিণ দিক দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অশ্বিনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সকলের বিছানা

গুটাইয়া রাখিলেন। ১০।১৫ মিনিট পরে পুনরায় পুলিশবাহিনী আসিয়া দ্রুত ছাদে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু দেখিল, সেখানে কেহ নাই।

মাষ্টারদাদের ঐ আশ্রয়স্থলে রাখিয়া আসিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। 'কুটির' আমার বাড়ীর অতি নিকটে, আমার বাড়ী হইতে স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু এই সব ব্যাপার আমরা কেহ জানিতে পারি নাই। আমি ঘুমে অচেতন। একটি ধাক্কায় আমি জাগিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাদের দলের আর এক নির্ভীক ও অক্লান্ত কর্মী ধোরলা গ্রামের মাধব ভট্টাচার্য (আমার দূরসম্পর্কীয় মামা) আমার বিছানার পাশে বসিয়া আছে। সে বলিল, 'মামা, শীগগির ওঠো। রাত্রে মাষ্টারদারা 'কুটির' থেকে কোন রকমে পালিয়ে গেছেন।' সেই রাত্রে মাষ্টারদা প্রমুখ সকলে 'কুটির' হইতে পলায়ন করিয়া মাধবের জানা একটি আশ্রয়স্থলে উঠিয়াছিলেন। মাধব তাঁহাদের পলায়নের বিস্তৃত বিবরণ আমাকে দিল। মাধব বলিল, 'একটি রিভলভার কুটিরে আছে। তুমি নিয়ে এসো।' আমি যথাসময়ে কুটিরের গোপন একটি স্থান হইতে রিভলভারটি আনিয়া মাষ্টারদাকে দিয়াছিলাম।

আজ ঐ অখ্যাত, অজ্ঞাত ও অক্লান্ত কর্মী মাধব ভট্টাচার্যের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। সে আজ আর পৃথিবীতে নাই। সে দেশপ্রেমের যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল, বিপ্লব-সাধনায় কত দুঃখযন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করিয়াছিল—তাহা আমরা কয়েকজন ছাড়া আর কেই বা জানে! যে কোন সময়, যে স্থানে ধোরলা গ্রামের মাধব ভট্টাচার্য বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া গিয়া দায়িত্বপূর্ণ সব কাজই সুসম্পন্ন করিয়া আসিত; কিন্তু সে আজ অনেকের কাছেই অখ্যাত ও অজ্ঞাত থাকিয়া গেল!

সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা আমাদের কানুনগোপাড়া গ্রামের যতীন্দ্র রক্ষিত, শিশির দত্ত, জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক অশ্বিনী চৌধুরী, ব্রজেন্দ্র চৌধুরী, নীরেন্দ্র রক্ষিত, শরৎ দে, সুকুমার কানুনগো, দেবেন্দ্র শর্মা প্রমুখ একনিষ্ঠ কর্মীরা স্বাধীনতার সাধনায় কতই না নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন! এই সব একনিষ্ঠ ও অক্লান্ত কর্মী এই সুন্দর পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের কথা ভুলিয়া গিয়া, স্বার্থান্বেষী লোকদের কাছেও কত নিপীড়ন-নিগ্রহ সহ্য করিয়া, দেশের মুক্তি-সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার খবর কয়জন রাখে!

তরুণ বিপ্লবী সুকুমার কানুনগোর শোচনীয়ভাবে জীবনাবসান হয় ১৯৩১ সালের ৩রা আগষ্ট। সহ-বিপ্লবী বন্ধু জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর সহিত একটি পিস্তল লইয়া নাড়াচাড়া করার সময় অকস্মাৎ মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়।

মনে পড়ে, ধোরলা গ্রামের তরুণ বিপ্লবী নীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা। বহরমপুর বন্দিশিবিরে আত্মহত্যা করিয়াছিল ব্রজেন্দ্র চৌধুরী এবং নীরেন্দ্র আত্মহত্যা করিয়াছিল হিজলী বন্দিশিবিরে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। পথ, ঘাট, মাঠ সব জলে ভরা। এই দুর্যোগের মধ্যে নীরেন্দ্র ভট্টাচার্য আসিয়া খবর দিল, রাত্রিতে উত্তরভূর্ষি গ্রামে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। ব্যবস্থামত সন্ধ্যার পরে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পথপ্রদর্শক সে। অন্ধকার রাত্রি। টর্চ জ্বালানো বিপজ্জনক। চারিদিক জলময়। দুইজন নিশাচর চলিয়াছি বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের নির্দেশে। অবশেষে উপস্থিত হইলাম 'কলসীনাচন' নামক আশ্রয়স্থানে। সেখানে মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

১৯৩১ সালের ৩০শে আগষ্ট যখন শবিপদ ভট্টাচার্য (আমার দূরসম্পর্কের মামা) অত্যাচারী ও হিন্দুসম্প্রদায়-ধ্বংসকারী আশানুল্লাকে গুলীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল এবং অবশেষে ধৃত হইয়া অকথ্য নির্যাতন ভোগ করিতে লাগিল, তখন চট্টগ্রাম জেলার অনেক গ্রামের বিপ্লবী কর্মীরাও ঐ অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। আমাদের কানুনগোপাড়া গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী ধোরলা, সারোয়াতলী, শ্রীপুর, খরন্দীপ, পোপাদিয়া প্রভৃতি গ্রামেও অত্যাচারী ইংরেজ শাসক বহু ঘর-বাড়ী লুটপাট করার পর আগুন জ্বালাইয়া দিয়া[illegible]। চট্টগ্রাম সহরে অত্যাচারীর এই তাণ্ডব ৩০শে আগষ্ট রাত্রি হইতে সুরু হইয়াছিল। অনেক দোকান লুণ্ঠিত এবং ভস্মীভূত হয়। "পাঞ্চজন্য" পত্রিকার প্রেস তছনছ করা হয়। ঐ পত্রিকার অন্যতম সহ-সম্পাদক হীরেন্দ্রলাল চৌধুরী নির্মমভাবে প্রহৃত হওয়ার ফলে তাঁহার মাথা ফাটিয়া যায় এবং সাময়িকভাবে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে।

চট্টগ্রামের এই বীভৎস ও নারকীয় ঘটনার সংবাদ পাইয়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন নেতা সহর ও গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়া ইংরেজ শাসকের অত্যাচার ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহারা কলিকাতার বিশাল জনসভায় এই

ধ্বংসলীলার বিবরণ উপস্থাপিত করেন। দেশপ্রিয় লণ্ডনে তাঁহার অগ্নিবর্ষী ভাষণে এই ঘটনার যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে জগতের সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। দেশপ্রিয় প্রমুখের ভাষণের পর এই বীভৎস অত্যাচার কিছুটা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে খবর আসিতে লাগিল যে, স্কুল কলেজের ছাত্র ও যুবকদের অর্ডিন্যান্স দ্বারা গ্রেপ্তার করা হইতেছে। এই অবস্থার হাত হইতে আমাদের গ্রামও রক্ষা পায় নাই। আমাদের অঞ্চলের শচীন্দ্রনাথ গুহ, অমরেন্দ্রনাথ কানুনগো, হরেন্দ্রলাল সেন, শিশিরবিন্দু দত্ত, ননীগোপাল সেন ও নিকুঞ্জ বল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় অনেকেই গ্রেপ্তার হইয়াছেন। অন্যান্য গ্রামেরও অনেকেই গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সাময়িক ভাবে বিপর্যস্ত হয়। মতিলাল চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কানুনগো, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রলাল শর্মা, ব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী, নীরেন্দ্র রক্ষিত ও আমি এক মাসের মধ্যে নিজ নিজ গৃহে অন্তরীণ হইলাম। রাত্রির অন্ধকারে আমরা গোয়েন্দা, থানার পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে ফাঁকি দিয়া পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম।

ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসক যুবকদের জন্য সাদা, নীল ও লাল কার্ডের প্রচলন করিল। যাহাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কাজকর্মের রিপোর্ট ছিল তাহাদের লাল কার্ড; বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত বলিয়া যাহাদের সন্দেহ করা হইত, তাহাদের নীল কার্ড এবং একেবারে নির্দোষদের সাদা কার্ড দেওয়া হইত। কিছুদিন পরে অন্তরীণ অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার পর [illegible]ও কার্ড পাইলাম। এই কার্ড ছিল বলিয়া আমরা অনেক সময় পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম।

একদিন হঠাৎ আমার বাড়ী এবং আশেপাশের কয়েকটি বাড়ী ২।৩ জন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট, বোয়ালখালী থানার দারোগা, ৫০।৬০ জন সৈন্য, ২ জন সি. আই. ডি এবং গ্রামের চৌকিদার ঘিরিয়া তল্লাশী সুরু করিল। কোন আত্মগোপনকারী বা অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান মিলিল না। আমার জামার পকেটে কয়েকটা বিড়ি ও ম্যাচবাক্স পাওয়ায় বাড়ীর ও পুলিশের লোকেরা অবাক হইয়া গেল। পুলিশের লোকজন চলিয়া যাওয়ার পর মা রাগ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তুই এখন থেকে বিড়ি খেতে শিখেছিস্?' আমি তাঁহাকে

বলিলাম, 'না মা, বিড়ি খাই না। পুলিশ বা গোয়েন্দা দেখলে বিড়ি ধরাই মাত্র। কিন্তু পরে ফেলে দিই।' এইভাবে আমরা যথাসম্ভব আমাদের শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করিয়া বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালাইতাম।

গ্রামে গ্রামে মিলিটারী ক্যাম্প বসিবার আগে ও পরে মাষ্টারদা ও অন্যান্য আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ সাধন করিয়া তাঁহাদের নির্দেশে কাজকর্ম করিতাম। একদিন ২।৩ জন সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া আমাকে বলিল যে, ভাণ্ডাল জুড়ি ঘাটে লঞ্চে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে দেখিলাম, অন্য একদল পুলিশ মতিলাল চক্রবর্তী এবং দেবেন্দ্র শর্মাকেও লইয়া যাইতেছে। সাহেবের কাছে উপস্থিত হইলে তিনি আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের খোঁজখবর জানিতে চাহিলেন। আমরা কিছু জানি না বলাতে ২।৩ দিন পরে আমাদিগকে সহরে ডি. আই. বি. অফিসে যাইতে বলিলেন। আমরা যাইবার প্রতিশ্রুতি দিলে আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মাষ্টারদা ছিলেন জ্যেষ্ঠপুরা গ্রামের আশ্রয়স্থলে। মাষ্টারদাকে সব বলার পর তিনি আমাদিগকে ডি. আই. বি. অফিসে যাইবার পরামর্শ দিলেন এবং পুলিশের কথার উত্তর কিভাবে দিতে হইবে, তাহাও শিখাইয়া দিলেন।

দুই তিন দিন পরে আমি ডি. আই. বি. অফিসে গেলাম, তখন আমার বয়স ১৬ কি ১৭ বৎসর। কিছুক্ষণ পর পর ৩।৪ জন লোক আমার নাম ধাম লিখিয়া লইল। যাইবার সময় প্রত্যেকেই শাসাইয়া বলিল, 'যদি ভাল চাও তো সব বলে দেবে। না বললে আজ রক্ষা নেই। তোমাদের মত দু'চারটি ছেলে মেরে ফেললে কিছু এসে যাবে না'। কিছুক্ষণ পরে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টার শচীন্ ভৌমিক, পঞ্চানন শিকদার ও সুরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি মাষ্টারদা, নির্মলদা, তারকেশ্বর দস্তিদার, বিনোদ দত্ত, কল্পনা দত্ত, সুশীল দে, শান্তি চক্রবর্তী ও মহেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি কোথায় আছেন জানাইতে বলিলেন। আমি জানি না বলতে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, 'আমরা রিপোর্ট পেয়েছি, তোমার shelter-এ এরা আছে। তুমিই এদের দেখাশুনা ইত্যাদি সব ব্যবস্থা কর'। আমি কেবলই 'না না' বলিতে লাগিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'বুঝতে পাচ্ছি, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না।' তিনি একজন পুলিশকে নির্দেশ দিলেন, 'একে ঐ ঘরে নিয়ে যাও।' ঘরে লইয়া যাইবার পর একজন জোর করিয়া আমার জামা খুলিয়া জলে ভিজানো দড়িপাকানো গামছার

দ্বারা পিঠের উপর আঘাত করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে চড়, কীল, ঘুষি ও লাথি প্রভৃতির দ্বারাও আপ্যায়ন করিল এবং বার বার বলিল, 'বল্, শালা বল্——কে কোথায় আছে। না বললে আজ মেরেই ফেলব।' বেলা ১১টা হইতে প্রায় ৩টা পর্যন্ত আমার উপর এই রকম নির্যাতন চলিল।

আই. বি. অফিস হইতে ছাড়া পাওয়ার পর রাগে, ক্ষোভে ও দুঃখে খুবই মনমরা ছিলাম। কিভাবে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নানাদিকে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার দিকে ফিরিঙ্গিবাজারে ছোট বোনের বাড়ী গেলাম। সে আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, পুলিশ আমাকে মারধর করিয়াছে। খাওয়া-দাওয়ার পর সে ও তাহার শাশুড়ী আমার সারা গায়ে সরিষার তেল গরম করিয়া মালিশ করাতে আমি কিছু স্বস্তি বোধ করিলাম।

আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর আমার বোনের ভাসুর শ্রীরমণীরঞ্জন চক্রবর্তী (চট্টগ্রামের নামকরা এডভোকেট) আমাকে বলিলেন, 'পুলিশ অফিসার যোগেন্দ্র গুপ্ত তোমাকে তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছেন। তুমি একবার ঘুরে এস।' উপায়ান্তর না দেখিয়া যোগেন্দ্র গুপ্তের বাসায় যাইতে হইল। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি সামনের ঘরের বারান্দায় টেবিল সামনে রাখিয়া বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর মদের বোতল। গ্লাসে ঢালিয়া মাঝে মাঝে মদ খাইতেছেন। কথাবার্তা বলার সময় মদের দুর্গন্ধে আমার যেন শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম।

যোগেনবাবু বলিতে লাগিলেন, 'ভাই, আজ তোমার উপর খুব অত্যাচার হয়েছে শুনলাম। আমি যদি থাকতাম, তা হলে হতে পারত না। সূর্য সেন প্রভৃতি কোথায় আছে বল। তোমার কোন ভয় নেই। তুমি যত টাকা চাও, পাবে। যদি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকায় যেতে চাও, তা হলে আমরা পাঠাবার ব্যবস্থা করব। আমরা জানি, তুমি সব খবর রাখ, তোমার shelter-এ এরা সব আছে।' এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের পাশ হইতে একটি সুটকেশ খুলিয়া কয়েকটি নোটের তোড়া বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। তারপর আমার দিকে তাকাইয়া আবার বলিলেন, 'দেরী করো না, বলে দাও।' 'আমি কিছুই জানি না' বলাতে তিনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, 'শালা, শূয়োরের বাচ্চা, লাঠিপেটা করে জুতো মেরে তোকে সায়েস্তা

করব। তোকে যে আজ পিটিয়েছে, ঠিকই করেছে। মনে করেছিস, আমাকে shot dead করবি? আমাকে কেউ মারতে পারবে না। এই বাড়ীর কোন্ রুমে থাকি, তা আমার স্ত্রী পর্যন্ত জানে না।'

কিছুক্ষণ এইরূপ বকাবকির পর চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তাঁহার একটি মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, 'লীলা, তোর হারমনিয়ামটা একটু নিয়ে আয়।' মেয়ে হারমনিয়াম লইয়া আসিয়া আমাকে গান করিতে অনুরোধ করিল। আমি গান জানি না বলাতে সে আবার অভিমানের সুরে বলিল, 'আপনাকে গাইতেই হবে।' আমি আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। লীলা একটি গান ধরিল, 'সন্ধ্যারাণী! সন্ধ্যারাণী! এই যে মোদের গোপন মিলন কেউ জানে না আমরা জানি।……' আমি চুপ করিয়া বসিয়া গান শুনিলাম।

আমাকে ভয় এবং প্রলোভন দেখাইয়াও পুলিশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি বোনের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম।

১৯৩৩ সাল। মাষ্টারদা, ফুটুদা ও কল্পনা দত্ত প্রমুখ অনেক নেতা ও কর্মী ধরা পড়িয়াছেন। আমাদের মন তখন বিপর্যস্ত। একদিন পুলিশ আসিয়া আমাকে ধলঘাট ক্যাম্পে লইয়া গেল। আমাকে দেখামাত্রই কমানড্যাণ্ট ষ্টিফেনসন ও মণি দাশগুপ্ত উভয়ে একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুশীল দে কোথায়?' 'আমি তাঁকে চিনি না' বলার সঙ্গে সঙ্গেই মণিবাবু আমাকে দুই থাপ্পড় দিলেন এবং হাণ্টার ষ্টিক দিয়া আঘাত করিলেন। তিনি বলিলেন, 'তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।' এই বলিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য একজন হাবিলদারকে আদেশ করিলেন। তখন আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম, কারণ সুশীলদা আমাদের বাড়ীর কাছে জগদ্বন্ধু দের বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া আছেন। এইদিনই তিনি অন্য আশ্রয়স্থানে চলিয়া যাইবেন এবং সেখানে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে।

বন্দী অবস্থায় আমার মন যখন এইরূপ ভারাক্রান্ত, তখন আমার ছোট ভাই অমরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছিল। সে তখন খুবই অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও আমার নানা বৈপ্লবিক কার্যের সহায়তায় ইতিপূর্বে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে।

আমাকে ধলঘাট ক্যাম্পে লইয়া যাইবার পূর্বেই অমরেশ স্কুলে গিয়াছিল। দুপুরের দিকে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে আটক করার সংবাদ পাইল। ইতিমধ্যে জগদ্বন্ধুর মা অমরেশের খোঁজ করিয়াছে। অমরেশ কালবিলম্ব না করিয়া অতি সন্তর্পণে লোকচক্ষুর অন্তরালে সুশীলদার গোপন আস্তানায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিল। সে সুশীলদার নির্দেশমত একটি নির্দিষ্ট গোপন পরিচয়সূচক চিহ্ন বুক পকেটে লইয়া কর্ণফুলী নদীর ভাণ্ডালজুরী ঘাটে বিকাল ৫ টার পূর্বেই উপস্থিত হইল। সে উদ্বেগের সঙ্গে ঐ স্থানে পায়চারী করিতেছে—এমন সময় এক মধ্যবয়স্ক সুঠামদেহ মুসলমান মাঝি অমরেশের বুকপকেটে আঁটা ঐ পরিচয়চিহ্নটি দেখিয়া তাহার কাছে আগাইয়া আসিল। ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই অমরেশ মাঝির সঙ্গে সুশীলদাকে অন্য আশ্রয়স্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া তাঁহাকে নিরাপদে যথাসময়ে পৌঁছাইয়া দিবার অনুরোধ করিল। মাঝি উত্তরে বলিল, 'আমার জীবন থাকতে দাদার গায়ে একটি আঁচড়ও পড়বে না।'

অমরেশ সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া শুনিল যে, আমি তখনও বাড়ী আসি নাই। সে স্বাভাবিক উদ্বেগের সহিত আমাদের বাড়ীর পিছনের ছোট খাল পার হইয়া পুকুরের পার দিয়া সুশীলদার আস্তানায় যাওয়ার জন্য অগ্রসর হইতেই হঠাৎ শুনিল—Halt. সঙ্গে সঙ্গে দুইজন সৈনিক তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে উপস্থিতবুদ্ধি খাটাইয়া বাহ্য করিবার ভাণ করিয়া বসিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে আমার প্রতিবেশী কাকা (শ্রীকুমুদবন্ধু চক্রবর্তী) তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া মাকে বলিলেন, 'মিলিটারী চারদিক ঘিরে ফেলেছে। ছেলেদের আমার কাছে পড়তে বসতে বলুন।' মা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, অমরেশ পিছনের পুকুরের দিকে গিয়াছে। কাকার মুখে মিলিটারীর কথা শুনিয়াই মা অমরেশকে আনিতে ছুটিলেন। অমরেশ মাকে বলিল, 'আমি বাহ্য করতে এসেছি। আমাকে এরা ধরেছে।' মা মিলিটারীকে গালিগালাজ করিয়া অমরেশকে প্রায় কাড়িয়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

ভাণ্ডালজুরী ঘাটের পাকা বন্দোবস্তের কথা সুশীলদার নিকট পৌঁছিল না। ইতিমধ্যে মিলিটারী আসার সংবাদ পাইয়া সুশীলদা আস্তানা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন সশস্ত্র অবস্থায়। তিনি আমাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ ধানক্ষেতে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু পুলিশ রাত্রি প্রায় পৌনে আটটার সময়

তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। এদিকে ধলঘাট ক্যাম্পে পুলিশ আমাকে জানাইল যে, আমার বাড়ীর কাছেই সুশীল দে ধরা পড়িয়াছেন। আমি তাঁহার অবস্থানের কথা জানিয়াও পুলিশকে জানাই নাই—এই বলিয়া হাণ্টারষ্টিক্ দিয়া আমাকে বারবার আঘাত করিতে লাগিল। পরদিন আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কয়েকদিন পরে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া দীর্ঘকাল বিভিন্ন জেল ও বন্দিশিবিরে রাজবন্দী হিসাবে আটক করিয়া রাখিল।

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না ক' কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর—
চির— উন্নত মম শির।

নজরুল ইসলাম

স্মৃতির আলোকে অগ্নিযুগ

শ্রীমণীন্দ্রলাল মজুমদার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সারা ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় ভারতীয় বিপ্লবীরা যখন সবাই অকৃতকার্য হলেন, তখন বাংলার বিপ্লবীরা 'যুগান্তর' দলের নির্দেশে বড বড হাইস্কুলে গিয়ে চাকুরী নিলেন এবং ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচার করিতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের সারোয়াতলী হাইস্কুলে এলেন ঢাকার বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। তাঁরই প্রচেষ্টায় পোপাদিয়া গ্রামের নিকুঞ্জ বৈদ্য প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরে ধীরেনবাবু চট্টগ্রামের মহামুনি হাইস্কুলে চাকুরী নিলেন। সেই স্কুলে অম্বিকাদা [অম্বিকা চক্রবর্তী] প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র তাঁর বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

১৯২১ সাল। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তাঁর আহ্বানে বাংলার সমস্ত স্কুলকলেজের ছাত্ররা পড়াশুনা ত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দেয়। সেই সময় সারোয়াতলী স্কুলের ছাত্র পোপাদিয়ার নিকুঞ্জ বৈদ্য ও ব্রজেন পাল, বিদগ্রামের মধুসূদন দত্ত, দক্ষিণ সারোয়াতলীর যতীন দাস, শ্রীপুরের দ্বিজেন পাল ও মণীন্দ্র মজুমদার এবং কানুনগোপাড়ার যতীন রক্ষিত প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র স্কুল ত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দেয়। এদিকে চট্টগ্রাম সহরেও মাষ্টারদা [সূর্য সেন] ও অন্যান্য বয়স্ক লোকেরা শিক্ষকতা ছেড়ে আন্দোলনে নামলেন।

আমরা গ্রাম থেকে সহরে এসে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে মাষ্টারদা, [সূর্য সেন], চারুদা [চারুবিকাশ দত্ত] এবং শঙ্করদা [গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী] প্রমুখের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে আন্দোলন চালাচ্ছিলাম। প্রায় ৮।১০ মাস আন্দোলন চলার পর গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর মাষ্টারদা পুনরায় উমাতারা হাইস্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সারোয়াতলী স্কুল থেকে যারা বের হয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে ব্রজেন পাল ও মধু দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন পুনরায় স্কুলে ফিরে গিয়ে পড়াশুনা সুরু করল। যতীন রক্ষিত, দ্বিজেন পাল ও আমি স্কুলে যোগ দিলাম না। যতীন রক্ষিত ও দ্বিজেন

পাল জগৎপুরে পূর্ণানন্দ আশ্রমে সংস্কৃত পড়তে গেল। এজন্য দ্বিজেন পালকে 'পণ্ডিতদা' বলা হত। পরে যতীন রক্ষিত দিল্লীর টিব্বিয়া আয়ুর্বেদ কলেজে অধ্যয়নের জন্য চলে যায়। কিছুদিন পর দ্বিজেন পাল গেল আকিয়াবে ব্যবসা করতে। মধুসূদন দত্ত ও আমি নানা স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচার করতে লাগলাম।

১৯২৩ সালে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ১৭ হাজার টাকা ডাকাতি করে ছিনিয়ে নেয়। এর পর বিপ্লবীরা প্রায় সবাই সুলকবহর নামক জায়গায় এক বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন। পাঁচালাইশ থানার দারোগা আব্দুল মজিদ খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী সহ তাঁদের বন্দী করতে আসে। এই খবর পেয়ে মাষ্টারদা, অম্বিকাদা, উপেনদা (উপেন্দ্র ভট্টাচার্য), দেবেন দে ও অনন্ত সিংহ ঘর থেকে বের হয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে Smoking Bomb ছুঁড়েন, যাতে পুলিশ তাঁদের ধরতে না পারে। এদিকে আব্দুল মজিদ তাঁদের পেছনে পেছনে পুলিশবাহিনী নিয়ে ছুটতে থাকে। বিপ্লবীরা বায়েজিৎ বস্তান পাহাড়ের দিকে ঢুকে পড়লেন। যখন বিপ্লবীরা বুঝলেন যে, পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না, তখন মাষ্টারদা অনন্ত সিংহ প্রভৃতিকে বললেন, 'তোমরা পালিয়ে যাও, অম্বিকাবাবু ও আমি এখানে বসি।'

মাষ্টারদা ও অম্বিকাদা বুঝলেন, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে পুলিশ নানারকম নির্যাতন করবে। সেই নির্যাতন হয়তো সহ্য করতে না পেরে তাঁরা পার্টির গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করে দিতে পারেন। সেজন্য তাঁরা দুজনে বিষ পান করলেন এবং অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়ে রইলেন। সেই অবস্থায় পুলিশ এসে তাঁদের খুব মারধর করল এবং পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে লাগল। পুলিশের মার খেয়ে তাঁরা কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। সারাদিন ছোটাছুটির পর প্রচণ্ড মার খেয়ে তাঁরা খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন এবং পুলিশের কাছে জল চাইলেন। পুলিশ জল দেওয়ার পরিবর্তে পুনরায় মারধর করতে লাগল। যখন দেখল যে, তাঁরা প্রায় মৃত, তখন একটি পচা পুকুরে ফেলে দিল। সেখানে জল কাদা খেয়ে উভয়ের খুব বমি হল। বমির সঙ্গে বিষ বের হয়ে যাওয়াতে তাঁরা সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। এর পর তাঁদের নিয়ে আসা হল চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানায়। সেখানেও আবার তাঁদের মারধর করে জেলখানায়

পাঠিয়ে দেওয়া হল। সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল; কিন্তু তাঁরা খালাস পেলেন। এর পর বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে চট্টগ্রামের রেলওয়ে ডাকাতির মত পোষ্ট অফিস প্রভৃতিতে ডাকাতি সুরু হল।

রাজনৈতিক ডাকাতিতে সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ল। বিপ্লবীদের বন্দী করবার জন্য সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নামে একটি আইন জারি করলেন। সেই অর্ডিন্যান্সের বলে একই দিনে অবিভক্ত বাংলা দেশের বহু বিপ্লবীকে বন্দী করে রাখা হল; কিন্তু মাষ্টারদাকে গ্রেপ্তার করতে পারল না। নির্মলদাকে ও দেবেন দেকে (খোকাদা) পুলিশ খুঁজছে দেখে তাঁরা বার্মায় চলে গেলেন। দেবেন দে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বার্মা থেকে চলে গেলেন সিঙ্গাপুর। নির্মলদা বার্মায় থেকে দেবেন দে-র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র আনা যায় এবং চট্টগ্রামে পাঠানো যায়, তার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা কিছু অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করলেন। নির্মলদা বার্মা পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য রেঙ্গুনে লুইস স্ট্রীটে সরষের তেলের ব্যবসা সুরু করলেন। নির্মলদার অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করবার জন্য মাষ্টারদা আমাকে রেঙ্গুনে পাঠালেন। আমিও পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নির্মলদার সঙ্গে তেলের ব্যবসা করতাম। নির্মলদা আত্মগোপনকারী মাষ্টারদার সঙ্গে লোক মারফৎ যোগাযোগ রাখতেন।

কিছুদিন পরে নির্মলদার পিতৃবিয়োগ হলে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করবার জন্য চট্টগ্রাম আসেন। শ্রাদ্ধের পর নির্মলদা, লোকনাথ বল ও রাজেন দে-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

নির্মলদা, চট্টগ্রামস্থ শিকারপুর গ্রামের শশীমোহন বিশ্বাস ও আমি রেঙ্গুনে এক ডাক্তারের বাসায় থাকতাম। চট্টগ্রামে নির্মলদা বন্দী হওয়ার পর বাংলা পুলিশের অনুরোধে বার্মা পুলিশ এই ডাক্তারের বাড়ী তল্লাসী করে এবং নির্মলদার ব্যবসা সম্পর্কে তাঁকে নানা রকম প্রশ্ন করে। ডাক্তার উত্তরে বললেন যে, এই তিনজন লোক তাঁর বাড়ীতে ভাড়াটে হিসাবে থাকেন এবং তাঁদের ব্যবসা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। এই সম্পর্কে কিছু জানতে হলে তাঁরা মণীন্দ্র মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তল্লাসীর সময় আমি বাড়ী ছিলাম না, ব্যবসার টাকা-পয়সা আদায় করতে বাইরে গিয়েছিলাম। আমি বাসায় ফিরে এলে ডাক্তার আমাকে তল্লাসীর কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে দিলেন যে, আমাদের আর তাঁর বাড়ীতে থাকা চলবে না—কারণ আমাদের স্থান না দিতে পুলিশ তাঁকে বলে গেছে।

বাধ্য হয়ে আমি ব্যবসা বন্ধ করে দিলাম। মাথা গোঁজার স্থানের জন্য রেঙ্গুনের নানা স্থানে ঘুরতে লাগলাম। অগত্যা একজন গোয়ালার বাসায় আশ্রয় নিলাম। বার্মা পুলিশের যন্ত্রণায় সেখানেও থাকতে না পেরে ১৯২৬-সালের শেষের দিকে চট্টগ্রামে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে বহু বিপ্লবী নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। মাষ্টারদা বহু দিন আত্মগোপন করে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম ও অবিভক্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। অবশেষে ১৯২৬ সালে কলকাতায় গ্রেপ্তার হন।

১৯২৮ সালের মধ্যে সমস্ত বিপ্লবী মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পর পুনরায় নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সকলে বিপ্লবী দলকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হলেন। মাষ্টারদা, নির্মলদা প্রমুখ নেতারা স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে গোপনে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচার করতে লাগলেন। অম্বিকাদা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে জনসাধারণকে আন্দোলনমুখী করতে সচেষ্ট হলেন। এজন্য অম্বিকাদা সুভাষচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও খুলনার সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন।

মাষ্টারদার সুনিপুণ নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সুকঠিন আঘাত করার সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে যুবসম্মেলন করে বিপ্লবী দলকে অধিকতর সংহত করা হল।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করল। অস্ত্রাগার দখল হল। কয়েকদিনের জন্য চট্টগ্রামে বৃটিশ শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল। এর পর কয়েক বৎসর ধরে চলল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গেরিলাপদ্ধতিতে সংগ্রাম।

আত্মগোপন অবস্থায় মাষ্টারদা ও অম্বিকাদা আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'মণীন্দ্র, সবাই বন্দী হোক, তাতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। সব সময় মনে রাখবে, তুমি যেন ধরা না পড। তুমি থাকলে তোমার বাড়ীতে এসে আমরা মাঝে মাঝে সবাই মিলে একটু আনন্দ করতে পারব, কর্ণফুলীতে স্নান করতে পারব।'

আত্মগোপনের সময় মাষ্টারদা ও নির্মলদা যখন আমাদের বাড়ীতে আসতেন, তখন সুযোগ পেলে জোয়ারের সময় কর্ণফুলী নদীতে সাম্পানে করে বেড়াতে বের হতেন। দলের বিপ্লবীদের মধ্যে যারা গান জানত, সম্ভব হলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নদীর বুকে সাম্পানের মধ্যে গান গাইত। তাদের মধ্যে দুজনের নাম আজ বিশেষ করে মনে পড়ে। একজন কোয়েপাড়া গ্রামের কৃষ্ণ চক্রবর্তী [সাংকেতিক নাম সন্ধ্যারাণী], অপরজন কানুনগোপাড়া গ্রামের নরেন্দ্র দত্ত [সাংকেতিক নাম নূপুর]। তাদের অনেক গানের মধ্যে দুটি গানের কিছু কিছু অংশ এখনো মনে আছে। নূপুর প্রায়ই গাইত—'নূপুর বাজিল মনোমন্দিরে।' সন্ধ্যারাণী প্রায়ই গাইত—'সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যারাণী, এলে তুমি সংগোপনে।'

আমার বাড়ী ছিল রাউজান, রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী থানার কেন্দ্রস্থলে। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিপ্লবী কাজকর্ম চালানো খুবই সুবিধাজনক ছিল। ১৮ই এপ্রিলের পর আমার বাড়ীতে বসেই মাষ্টারদা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অনেক বিপ্লবী কাজকর্মের পরিকল্পনা করেছেন। এই কারণে সব নেতা ও বিভিন্ন অঞ্চলের বহু কর্মীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট পরিচয় হয়।

নির্মলদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এখনো আমার মনে স্পষ্ট রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশী মেলামেশা করতাম তাঁর সঙ্গে। তিনি বিপ্লবী দলের সকলকে মায়ের মত স্নেহযত্ন করতেন ও ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন একজন অদ্ভূত প্রকৃতির আত্মভোলা লোক। তিনি ছিলেন ভাবুক ও গম্ভীরপ্রকৃতি। আমি দেখেছি, তিনি দু'তিন দিন খাওয়াদাওয়া না করে শুয়ে থাকতেন। মাষ্টারদা তাঁকে খাবার জন্য ডাকলে তিনি শুধু চোখ খুলে তাকাতেন, কিন্তু কিছুই বলতেন না। আমি তাঁকে ডাকতাম না, কারণ আমি জানতাম—তিনি খাবেন না। দু'তিন দিন পর তিনি বিছানা থেকে উঠতেন। তখন আমাদের মনে হত, যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেছে। উঠেই তিনি বলতেন, 'মন্নাদা, দু'সের রসগোল্লা ও এক সের গোলজা বিস্কুট নিয়ে এস, আজ খাব।'

তখন মাষ্টারদা হেসে বলতেন, 'মণীন্দ্র, অর্ডার হয়েছে। এবার নিয়ে এস। কুম্ভকর্ণের খাওয়া হবে। তা কি কি আনতে বললেন? দু'সের রসগোল্লা ও

এক সের গোলজা বিস্কুট ? আচ্ছা, এ সব তো আনলে, কিন্তু আমি তুমি পাব একটা করে। বাকীগুলো নির্মলবাবু বানরের পিঠা ভাগের মতই করবেন। বাকী সব তিনিই তো টুক্‌টুক্ করে খাবেন। যাহোক, একটা করে খেলেও আমাদের লাভ! যাও, নিয়ে এস।"

এই রকম হাস্য-পরিহাসের মধ্যে অনেক সময় নিমগ্ন থাকতে দেখেছি এই দুজন বিপ্লবী নেতাকে। কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখেছি এই দুজন নেতার মধ্যে।

অনেকের ধারণা, আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের শুধু হিন্দুরাই আশ্রয় দিয়েছেন। এই ধারণা সঠিক নয়। জালালাবাদ যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে অম্বিকাদা যখন দেওয়ানপুর গ্রামে নিজ বাড়ীতে যান, তখন তাঁর কাকা নবীন চক্রবর্তী তাঁকে এক মুসলমান প্রজার বাড়ীতে রাখলেন। পরদিন অম্বিকাদার ফিরে আসার সংবাদ আমাকে জানাবার জন্য তিনি তাঁর কাকা নবীনবাবুকে আমার বাড়ীতে পাঠান। নবীনবাবু আমাকে বললেন, আমি যেন রাত ১১।১২ টার সময় তাঁর বাড়ী যাই, তিনি আমার জন্য ঘরের বাইরে অপেক্ষা করবেন।

অম্বিকাদা বেঁচে আছেন শুনে আমি যে কত আনন্দ লাভ করেছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমাদের সকলের ধারণা ছিল, অম্বিকাদা জালালাবাদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। যাহোক, আমি তাঁর কাকার নির্দেশমত যথাসময়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন এক মুসলমানের বাড়ীতে। অম্বিকাদা সেই বাড়ীর ঢেঁকিঘরে বসে খুব আস্তে আস্তে কাশছেন, যেন বাইরের কোন লোক শুনতে না পায়। অম্বিকাদার আগেও টি. বি. রোগ ছিল, এখন অনাহার ও অনিদ্রায় তা বেড়ে গেছে। তিনি আমাকে দেখে খুবই খুসী হয়ে বললেন, 'তুমি মাষ্টার মহাশয়কে এখানে নিয়ে এস, তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলোচনা করার আছে।'

এই সময় মাষ্টারদা পোপাদিয়া গ্রামের তরুণ বিপ্লবী বসন্ত ভট্টাচার্যের বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছেন। তিনি আমার কাছে অম্বিকাদার বেঁচে থাকার সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। আনন্দে তাঁর চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একদিন রাত প্রায় ১১টা নাগাদ আমি মাষ্টারদাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি এবং ফকির আহমদ নামক আমাদের একজন বিশেষ

পরিচিত এবং আমাদের বিপ্লবী কর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল সাম্পানওয়ালার সাম্পানে করে রওনা হলাম। আমরা লাম্বুরহাটের নিকটস্থ ওয়ালং নদীর ভিতর দিয়ে প্রায় দু' মাইল যাওয়ার পর ঐ মুসলমান আশ্রয়দাতার বাড়ীর কাছে পৌঁছাই। মাষ্টারদা ও আমি সাম্পান থেকে নেমে একটু দূরে ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হই। ঐ আশ্রয়দাতার ছেলে তার বাড়ীর সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের অম্বিকাদার কাছে নিয়ে গেল। উভয় নেতার মিলনদৃশ্য কতই মধুর! আমি ঐ সাম্পানে করে বাড়ী ফিরে এলাম।

অম্বিকাদা ঐ আশ্রয়স্থানে আর বেশীদিন থাকা সমুচিত নয় বিবেচনা করে পাচ সাত দিন পরে তাঁর কাকাকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। অম্বিকাদার অসুখও বেড়ে গেছে। পরের দিন আমি মাষ্টারদা ও অম্বিকাদাকে আমার বাড়ী নিয়ে এলাম।

এই আশ্রয়দাতার সহৃদয়তা আমাদের খুবই মুগ্ধ করেছিল। আমি যখন মাষ্টারদা ও অম্বিকাদাকে তাঁর বাড়ী থেকে আনতে যাই, তখন দেখি তাঁরা খেতে বসেছেন। আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ মুসলমান আমাকে দেখে বললেন, 'বাবু এসেছেন? বসুন, বসুন।' সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্যও খাবার আনতে আদেশ দিলেন। আমি কিছুতেই খেতে রাজী হচ্ছিলাম না বলে বৃদ্ধ বললেন, 'কেন খাবেন না বাবু? আপনাদের পেয়েছি এটাই আমার সৌভাগ্য। আপনারা তো আমার জন্য আসেন নি। আপনারা করছেন দেশের কাজ, দশের কাজ।' তখন মাষ্টারদা বললেন, 'মণীন্দ্র, দুটো খেয়ে নাও। উনি না খাইয়ে ছাড়বেন না।' তখন আমি খেতে বসলাম। দেখলাম, লাল চালের ভাত ও খুব বড় বড় দুটুকরো মাছ দিয়েছে। মাছের এত বড় টুকরো এর আগে কোথাও খাই নি। সত্যিই আমি অবাক হয়ে গেলাম এই বৃদ্ধ মানুষটির আতিথেয়তা ও স্নেহ-মমতার পরিচয় পেয়ে। দুঃখের বিষয়, আজ সুদীর্ঘকাল পরে এই সহৃদয় মানুষটির নাম স্মরণ করতে পাচ্ছি না।

একদিন পরে পোপাদিয়া গ্রামের হরিপদ ভট্টাচার্য ও বসন্ত ভট্টাচার্য মাষ্টারদাকে অন্য আশ্রয়স্থানে নিয়ে গেল। অম্বিকাদা আমার বাড়ীতে থেকে গেলেন। কিছুদিন পরে একটু সুস্থ হলে তিনি পটীয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মনসা পূজার কয়েক দিন আগে আমার বাড়ী থেকে পটীয়ায়

উদ্দেশ্যে রওনা হন। যাবার সময় আমাকে বললেন, 'মনসা পূজার সময় একটি বড় পাঁঠা নিয়ে আসবে। মাংস খেতে হবে।'

আমার বাড়ী থেকে কয়েক মাইল দূরে ধলঘাট গ্রামে উপস্থিত হলে প্রবল বৃষ্টি নামে। অগত্যা বাধ্য হয়ে ঐ গ্রামে এক বন্ধুর বাড়ীতে তাঁকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সেখানে তাঁর অসুখ আবার বাড়ল। কয়েকদিন পরে একটু সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে হাবিলাশদ্বীপ গ্রামের প্রফুল্ল দত্ত চক্রশালা গ্রামের হরিশ হোড়ের বাড়ীতে নিয়ে যান। এই হরিশ হোড় টাকার লোভে অম্বিকাদাকে ধরিয়ে দেয়। পরে সে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেনারস চলে যায়। গ্রেপ্তারের পর চট্টগ্রাম সহরে নিয়ে যাওয়ার সময় ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টার আসানুল্লা ও শচীন ভৌমিক অম্বিকাদাকে রাস্তায় শিয়াল-কুকুরের মত মারধর করে।

প্রফুল্ল দত্ত পরদিন সাইকেলে করে পটীয়া থানায় অম্বিকাদাকে দেখতে গেল। শচীন ভৌমিক তাকেও গ্রেপ্তার করে তার কাঁধের উপর সাইকেলটি চাপিয়ে নদীর পার অবধি নিয়ে গেল। সহরে পৌঁছার পর অম্বিকাদাকে চট্টগ্রাম জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং প্রফুল্ল দত্তকে বন্দী করে রাখা হল কোতোয়ালীতে। সেখানে কয়েকদিন তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্য ১৯৩১ ইং ৩০শে আগষ্ট সহরে এক খেলার মাঠে এই অত্যাচারী আসানুল্লাকে হত্যা করে।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সহরে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের সময় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আহত হলে তাকে গ্রামের একটি কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে সে কিছু সুস্থ হয়ে উঠে।

চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের অল্প কয়েকদিন পূর্বে চট্টগ্রামের কংগ্রেস অফিসে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের সময় তারকেশ্বর দস্তিদার গুরুতররূপে আহত হয়। এই অবস্থায় গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ তাকে একটি মোটরে করে সহরের বিভিন্ন রাস্তায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান। এই সময়ের মধ্যে তারকেশ্বরকে গ্রামের কোন আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য আমার কাছে খবর দেওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যার পরে আমি একটি সাম্পানে করে আস্তিমোদীর ঘাটে উপস্থিত হই। মহিরা গ্রামের যতীন দাস, পোরলা গ্রামের

সুশীল দে, মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র বিধু ভট্টাচার্য ও নরেশ রায় তারকেশ্বরকে সাম্পানে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য খেয়াঘাটে আনার সময় স্থানীয় একদল লোক রাস্তায় আটকে রাখে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় তাকে দেখে এই লোকদের সন্দেহ হয়। ঐ ঘাটে প্রতীক্ষারত সাম্পানে আহত বিপ্লবীকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেতে দেরী হচ্ছে দেখে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ সামরিক পোষাক পরিহিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁরা এই বিপদ দেখে চীৎকার করে উঠেন, 'কোন্ হ্যায়?' সঙ্গে সঙ্গে পথরোধকারী সমস্ত লোক ভয়ে পালিয়ে যায়। তারকেশ্বরকে সাম্পানে উঠানো হল।

তারকেশ্বরকে নিয়ে সাম্পান রওনা হল। তাকে গ্রামে নিয়ে নিরাপদে রাখা ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। আহতকে দেখে সাম্পানের মাঝির সন্দেহ হল। সে বারবার তামাক খাচ্ছে। বুঝলাম, তার কুমতলব। তাই আমি নিজে সাম্পানের দাঁড় টানি; কিন্তু পূর্ব দিক থেকে বাতাস সুরু হওয়াতে দাঁড় টানতে খুবই পরিশ্রম হচ্ছে। গায়ের জোরে সাম্পান টেনে লাম্বুর হাটের পূর্ব দিকে খানিকটা যাওয়ার পর দেখি, ভোর হচ্ছে। গ্রামবাসীরা জেগে উঠার আগেই তারকেশ্বরকে নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতেই হবে। সুশীল দে ও আমি তাকে নিয়ে যাই কোয়েপাড়া গ্রামের বিনয় সেনের বাড়ীতে।

বিনয় সেনের বাড়ীতে কয়েকদিন রাখার পর নানা অসুবিধা দেখা দিল। সেখানে রোগীকে যথাযথ সেবাশুশ্রূষার লোক নেই। বাড়ীতে টিনের ছাউনী। ভীষণ গরম। তাই কিছুদিন পর তাকে কর্ণফুলী নদীর অপর পারে আমার বাড়ীতে (শ্রীপুর গ্রামে) নিয়ে এলাম। ব্যাণ্ডেজবাঁধা অবস্থায় তাকে ঘরের বাইরে প্রতিবেশীরা দেখলে সন্দেহ করবে, এজন্য তাকে সব সময় ঘরের ভিতর থাকতে হত। এই অবস্থায় তার মলমূত্র পরিষ্কার করা থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা আমি করতাম। প্রায় একমাস পরে সে সুস্থ হল।

তারকেশ্বর আমার বাড়ীতে অবস্থান করছে শুনে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস কাঞ্চনগোপাড়া গ্রাম থেকে কিছু সুস্থ হয়ে আমার বাড়ীতে আসে।

চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কয়েকদিন আগে মাষ্টারদা, নির্মলদা ও অম্বিকাদা আমার বাড়ীতে এলেন তারকেশ্বর ও রামকৃষ্ণকে দেখতে। তাঁরা ফিরে যাওয়ার সময় তারকেশ্বর ও রামকৃষ্ণকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন এবং আমাকে বললেন, 'তারকেশ্বর ও রামকৃষ্ণকে অন্য আশ্রয়স্থানে রেখে তুমি, রাখাল দত্ত ও

কোয়েপাড়া গ্রামের রামকৃষ্ণ সেন ১৮ই এপ্রিল বিকেল ৫টা নাগাদ সহরে কংগ্রেস অফিসে চলে যাবে।' আমি নেতাদের নির্দেশমত তারকেশ্বর ও রামকৃষ্ণকে অভ্যুত্থানের ২ দিন আগে কোয়েপাড়া গ্রামের বিনয়বাবুর বাড়ীতে রেখে আসি।

বিনয়বাবু তখনও আমাদের বিপ্লবী দলে পুরোপুরিভাবে যোগ দেন নি। তিনি ছিলেন অনুশীলন দলের কর্মী। তিনি ও ব্রহ্মদাস পাড়ার অশ্বিনী গুহ অস্ত্রাগার দখলের পরে আমাদের দলে পুরোপুরিভাবে যোগ দিয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

১৭ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, রাত্রি প্রায় ২টার সময় বিনয়বাবু তারকেশ্বর ও রামকৃষ্ণকে আমার বাড়ী নিয়ে আসেন; কারণ কোয়েপাড়ায় আহত বিপ্লবীদ্বয়কে নিরাপদে রাখার মত কোন আশ্রয়স্থান সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে তখনো সম্ভব হয় নি।

মাষ্টারদা প্রমুখ নেতাদের নিদেশমত আমাকে ১৮ই এপ্রিল ৫টা নাগাদ সহরে যেতে হবে। তারকেশ্বর ও রামকৃষ্ণকে কোথায় রাখা যায়? পরদিন অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল রাত্রি প্রায় ১১টায় তাদের আমি কোয়েপাড়ার যামিনী দের বাড়ীতে রেখে এলাম। ভোররাত্রে রাখাল দত্ত, রামকৃষ্ণ সেন ও আমি সহরে গিয়ে আমাদের দলের কর্মীদের কাছে খবর পেলাম যে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছে। তারা আমাদের গ্রামে ফিরে যেতে বলল। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যোগদানের সৌভাগ্য আমাদের হল না!

অত্যাচারী পুলিশ অফিসার খান বাহাদুর আসানুল্লাহ্-হত্যাকারী বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সে প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসত। পুলিশের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য সে যেন পাগল হয়ে উঠল। সে আমাকে প্রায়ই বলত, 'মাষ্টারদা ও নির্মলদাকে অনুরোধ করুন, তাঁরা যেন এই প্রতিশোধ নেবার অনুমতি আমাকে দেন। পতুয়া হাটে বাবার ঔষধালয়। তার একজন চাকমা রোগীর কাছে কার্টিজ গান আছে। আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি সেখানে গিয়ে গুলীচালনা শিখব।' হরিপদের এই অভিপ্রায়ের কথা মাষ্টারদাকে জানালে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে গুলীচালনা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। সে আমার কাছ থেকে গুলী নিয়ে পতুয়ার পাহাড়ে গুলীচালনা শিক্ষা করত।

একদিন রাত্রি প্রায় ১১টার সময় হরিপদ আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। সে আমাকে ৬টা কার্তুজের খোল দিল। তার উদ্দেশ্য, আমি যেন বিশ্বাস করি যে সে গুলীচালনা শিখেছে। সেদিন ঘটনাচক্রে মাষ্টারদা ও নির্মলদা আমার বাড়ীতে ছিলেন। রাত্রে মহেন্দ্র চৌধুরীও আমার বাড়ীতে আসে।

আমার ঘরে একটি ভাঙা কাঠের বাক্স ছিল। বিপ্লবীদের বিভলভার ও পিস্তল তাতে রাখা হত। হরিপদ কার্তুজের খোলগুলি ঐ বাক্সের উপর রাখল। মাষ্টারদা, নির্মলদা ও মহেন্দ্র চৌধুরী অন্য আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যান। যাওয়ার সময় মহেন্দ্র চৌধুরী আমাদের অগোচরে ঐ কার্তুজের খোলগুলি নিয়ে যায়। হরিপদ আমাদের বাড়ীতে রইল।

পরদিন ভোরবেলা সহর থেকে অনেক পুলিশ চরণদ্বীপ গ্রামের চৌকিদার নূর মিঞাকে আমার বাড়ী দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে এল। পাড়ার লোকদের কাছ থেকে পুলিশ আসার খবর পেয়ে আমার কাকীমা এই খবরটি আমাকে ও হরিপদকে জানালেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পশ্চিম দিকের অরহর ক্ষেতের ধারে ধারে গিয়ে কল্পনা দত্তদের বাড়ীর সামনের পুকুরপারে শিবমন্দিরে পৌঁছলাম। হরিপদ পূর্ব দিক দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তাকে ধরে ফেলল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে কেন নদীর পারে এসেছে। সে বলল, 'মা সহরে যাবেন। হরচন্দ্র মুন্সীর ঘাটে সাম্পান না পেয়ে ভারম্বা খালের দিকে যাচ্ছি। বিশ্বাস না করলে আমার বাড়ী চলুন।' হরিপদ ছাড়া পেয়ে চলে গেল।

শিবমন্দিরে বসে আমি ভাবছিলাম, পুলিশ নিশ্চয়ই ঐ কার্তুজের খোলগুলি পাবেনা; কারণ আমার কাকীমার সতর্কতার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কাকীমার অভ্যাস ছিল, রোজ ভোরে উঠে ঐ বাক্সটি খুঁজে দেখা। কাজেই পুলিশ আসার আগে নিশ্চয়ই তিনি ঐ খোলগুলি সরিয়ে রেখেছেন। এদিনও তিনি অন্যান্য দিনের মত বাক্সটির উপরে ও ভিতরে দেখেছিলেন; কিন্তু কিছুই পান নি। আগেই বলেছি, আমাদের না জানিয়ে মহেন্দ্র চৌধুরী খোলগুলি নিয়ে গিয়েছিল।

নির্মলদা মাঝে মাঝে মাষ্টারদাকে বলতেন, 'মাষ্টারদা, আমি কখনো ফাঁসীতে মরব না, জেলেও যাব না—আমি যুদ্ধ করে মরব।'

মাষ্টারদা বলতেন, 'আপনি কী করে জানেন?'

নির্মলদা উত্তর দিতেন, 'দেখবেন।'

তখন কে জানত, ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন ধলঘাট যুদ্ধে নির্মলদার এই ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হবে!

দ্বিজেন্দ্রকুমার পাল আমাদের দলের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী। ১৯২৪ সালে প্রায় সব বিপ্লবী নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পর দলের সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত হয়, দ্বিজেন্দ্রকুমার তাঁদের অন্যতম। সে প্রতি মাসে দলকে ১০০.০০ টাকা করে দিত।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত রাখাল দে একবার তাদের চৈতন্য কেরাণীর বাজারের দোকান থেকে ২৮০.০ টাকা চুরি করে এনে মাষ্টারদার হাতে দেয়। ঐ টাকা পূজোর বাজারের জন্য রাখা হয়েছিল। এই ব্যাপারে অভিভাবকদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াতে সে আত্মগোপন করে সহরে মাষ্টারদার কাছে থাকে। তখন তার টাইফয়েড হয়। আমি সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করি। কিছুদিন পরে রাখালের অভিভাবকদের মত পরিবর্তন হয়। আমি তার দাদার অনুরোধে তাকে গ্রামে [শ্রীপুর] তার নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাই।

আজ লিখতে বসে সেই রক্তরাঙা দিনের অজস্র কথা মানসপটে ভেসে উঠে।

চট্টগ্রামের সেই ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের পর প্রায় এক বছর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ করেছিলাম। অবশেষে আমি ১৯৩১ সালের ১৩ই মার্চ গ্রেপ্তার হই এবং বিভিন্ন জেল ও বন্দিশিবিরে রাজবন্দী থাকার পর ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে মুক্তিলাভ করি।

সেই আগুনঝরা দিনগুলি

অনিলকুমার দত্ত

চট্টগ্রামের অন্তর্গত বিদগ্রাম আমার জন্মভূমি। আমাদের বাড়ীর পাশেই জালালাবাদ যুদ্ধের বীর সৈনিক মধুসূদন দত্তের বাড়ী। তিনি প্রায় আমাদের বাড়ীতে এসে আমার দাদা শ্রীসুশীলকুমার দত্তকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লব আন্দোলন ও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে নানা গল্প বলতেন। আমি মাঝে মাঝে সেই গল্প শুনতাম। শুনে ভাল লাগত; কিন্তু সব কথার তাৎপর্য বোঝার বয়স তখনো আমার হয় নি।

আমি সারোয়াতলী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় কানুনগোপাড়া গ্রামে দিদির বাড়ীতে চলে যাই। এই সময় সর্বশ্রী শচীন গুহ, হরেন সেন, ননী সেন ও দেবেন্দ্র শর্মা প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীদের সংস্পর্শে আসি। শচীনদা আমাকে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, আনন্দমঠ ও তরুণের স্বপ্ন প্রভৃতি নানারকম বই পড়তে দিতেন এবং আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তিবিকাশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। শচীনদা রেঙ্গুন চলে যাওয়ার পর আমি দেবেন্দ্র শর্মার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। তিনি আমাকে বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের বিচিত্র ঘটনাবলী বলতেন এবং ভারতকে স্বাধীন করার জন্য গুপ্ত বিপ্লবী দলের ভূমিকার কথা বুঝিয়ে দিতেন। এই সময় কানুনগোপাড়া নাইট্ স্কুল প্রাঙ্গণস্থ শরীরচর্চা ক্লাবটি ছিল বিপ্লবী দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ঐ বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় আমি বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় সদস্যরূপে গড়ে উঠি।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর আমি নেতাদের সংস্পর্শে আসার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠি। শচীনদা রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসার পর কানুনগোপাড়া গ্রামের মণীন্দ্র দত্তের বৈঠকখানায় জালালাবাদ যুদ্ধের বীর যোদ্ধা শ্রীবিনোদ দত্তের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর কাছে জালালাবাদ যুদ্ধের বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের বীরত্বের কাহিনী শুনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিপ্লব আন্দোলনে সমর্পণ করার প্রেরণা লাভ করি।

আমার বিপ্লবী দলে যোগদানের কিছু আভাস বাবা পেয়েছিলেন। তাই তিনি আমাকে দিদির বাড়ী থেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমাকে

বিপ্লবী দলের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে আনার জন্য বাবার এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তখন বিভিন্ন গ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। নিজ গ্রামে এসে আমি ঐ অঞ্চলের বিপ্লবী সংগঠনের ভার প্রাপ্ত হই। এই সময় একদিন বিপ্লবী নেতা নির্মলদার (নির্মল সেন) সঙ্গে দেখা করার আদেশ পাই। গভীর রাত্রে বৃষ্টিবাদলে কানুনগোপাড়ার পূর্বদিকের নাঘাটা বিলের মধ্যে অবস্থিত মগধেশ্বরী মন্দিরে (জনসাধারণ 'মায়ের বাড়ী' বলে) তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে আমার দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছুটা পূর্ণ হল। সেই গাঢ় অন্ধকারে সেদিন শুধু তাঁর বিশাল দেহ দেখেছি আর শুনেছি তাঁর নানা উপদেশ। তাঁর চোখ-মুখের ভাব দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তাঁর সেদিনকার উপদেশ আমার চলার পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় হল। আমি এগিয়ে চললাম বিপ্লবের পথে আরো দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে।

এর পর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের গুপ্ত সমিতির নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে পোপাদিয়া গ্রামের হরিপদ ভট্টাচার্য ও বসন্ত ভট্টাচার্য, বাগদণ্ডীর হরেন্দ্র চক্রবর্তী ও লক্ষ্মণ দে, ছনদণ্ডীর মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, সারোয়াতলীর দীনবন্ধু পারিয়াল, কৃষ্ণ পারিয়াল, হরিনারায়ণ অধিকারী (লেবু), ইন্দুভূষণ দস্তিদার, ননীগোপাল দস্তিদার, নেপাল দস্তিদার ও সুনীতি সেন এবং কোয়েপাড়ার হরেন্দ্র সেন ও মণীন্দ্র সেনের নাম বিশেষ করে মনে পড়ে। ধলঘাট যুদ্ধের পর অনেককেই Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act 12 of 1932-এ গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হয়। কেউ কেউ মাষ্টারদার অনুমতি নিয়ে আত্মগোপন করেন।

একদিন ফুটুদার (শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদার) বাড়ীতে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়। সেই ভোজে উপস্থিত থাকার জন্য আমারও ডাক পড়ে। আমি সেখানে গিয়ে দেখি, ফুটুদা, ভুলুদা (কল্পনা দত্ত), মণি দত্ত (লেক্চারার), মহেন্দ্র চৌধুরী (জমিদার) ও মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ আছেন। সর্বশ্রী সতীশ দস্তিদার, বিষ্ণু বিশ্বাস ও বিলাস দত্ত (বার লাইব্রেরীর কেরাণী) ব্যবস্থাদি করছেন। ঐ বাড়ী থেকে কিছু দূরে নেপাল দস্তিদার, কৃষ্ণ পারিয়াল ও লেবু অধিকারী পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করার দায়িত্ব নিয়ে অবস্থান করছেন। মাষ্টারদা আমাকে ডেকে দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। ঠিক এই সময় ঘরের বাইরে কে গম্ভীর চীৎকার করে বলল, 'কোন্ হায়?' সঙ্গে সঙ্গে

দরজায়ও ভীষণ একটি শব্দ। শব্দ শোনামাত্র সকলেই ভিতরের দরজা দিয়ে বের হয়ে পুকুরের পাশের মাঠে উপস্থিত হলেন। মাষ্টারদা, বুগ্‌গাদা (সতীশ দস্তিদার) ও আমি পুকুরের পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চারিদিকে লক্ষ্য করতে আরম্ভ করি। হঠাৎ নেপালের কাছ থেকে আমাদের পরিচিত একটি শিস্ শুনতে পাই। নেপাল এসে মাষ্টারদাকে বলল, 'আমি তলোয়ারকরকে (সুশীল দে) ভিতরে আসার অনুমতি দেওয়ার পরই একটা আওয়াজ আমার কানে আসে। কোন পুলিশ আসে নি, এই কাজটা তলোয়ারকরের।' মাষ্টারদা শুনে আমাদের বললেন, 'সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো।' আমরা চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করে সবাইকে ডেকে আনলাম; কিন্তু ভুলুদাকে আর পাই না। মণি দত্ত বলে উঠলেন, 'মনোরঞ্জনও নেই। ভুলুদা গ্রামের রাস্তা মোটেই চেনেন না, মনোরঞ্জন তাঁকে নিশ্চয়ই দূরের কোন আশ্রয়স্থানে নিয়ে গেছে।' প্রায় ২ ঘণ্টা পরে মনোরঞ্জন ফিরে আসেন। তিনি ভুলুদাকে আমাদের গ্রামের এক আশ্রয়দাতার পুকুরপাড়ের ভিতরের দিকে বসিয়ে রেখেছেন। মনোরঞ্জন এখানকার সমস্ত ব্যাপার বুগ্‌গাদার কাছ থেকে জেনে ভুলুদাকে ফুটুদার বাড়ীতে নিয়ে আসেন।

আমি যতদূর জানি, এই প্রীতিভোজের উদ্দেশ্য ছিল—মাষ্টারদা সমবেত বিপ্লবী কর্মীদের নানা ব্যাপারে নির্দেশ দেবেন। কিন্তু এই ঘটনার ফলে তাঁর মনোভাব কী রকম হয়েছিল, তা আমাদের পক্ষে বোঝাব উপায় ছিল না। তিনি আমাদের প্রায় প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ডেকে কথাবার্তা বলেছিলেন। হয়তো তিনি সেই সময় কারো কারো কাছে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

কিছুদিন পরে বাবা ও দাদা আমাকে সারোয়াতলী স্কুল থেকে চট্টগ্রাম সহরের কোন স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প করলেন। Transfer Certificate-ও নেওয়া হল। খবরটা সুশীলদাকে (সুশীল দে) দিলাম। তিনি তখন ধোরলা গ্রামের শশী অধিকারীর বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছেন। আমাকেও তিনি আত্মগোপন করার আদেশ দিলেন। ধোরলা গ্রামের সেই আশ্রয়কেন্দ্রে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা আমাকে পেয়ে আনন্দিত হলেন। প্রায় পনেরো দিন পর খোকাদা (মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে, বাবা ও দাদা আমাকে গ্রামের স্কুলেই রাখবেন। সুশীলদা এই খবর পেয়ে

আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। অবশ্য আমাকে সারোয়াতলী স্কুল থেকে এনে কানুনগোপাড়া স্কুলে দশম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহে আমার মামার বাড়ীর অবদানও স্মরণীয়। এই বাড়ী ছিল আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের একটি প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র। মামীমা, খোকাদা ও মামাতো বোন খুকু তাঁদের বিশেষ যত্ন করতেন। খোকাদা গহিরায় পূর্ণ তালুকদারের বাড়ীতে পুলিশের গুলীতে পূর্ণ তালুকদার সহ শহীদ হন। ফুটুদা, ভুলুদা ও সুধীন দাশ গ্রেপ্তার হন।

একদিন ভোররাত্রে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় শান্তি চক্রবর্তী (দূরদেশীদা) আমাদের গ্রামের আশ্রয় স্থানে উপস্থিত হন। সেই রাত্রেই মাষ্টারদার গৈরলা গ্রামে গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ তাঁর কাছ থেকে পেয়ে আমরা সকলে মর্মাহত হয়ে পড়ি। শান্তিদা কোন রকমে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে চলে এসেছেন। আমি ও বন্ধু নীলকৃষ্ণ চৌধুরী তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আমার মামাতো বোনের উপর তাঁর সেবা-শুশ্রূষার ভার অর্পণ করি। শাকপুরা গ্রাম থেকে ডাক্তার এসে প্রায় প্রত্যহ তাঁকে দেখে যেতেন। শান্তিদা সুস্থ হয়ে কয়েকদিন পরে অন্য আশ্রয়স্থানে চলে যান।

মাষ্টারদার গ্রেপ্তারের সংবাদ ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ লোকও এই মহান্ নেতার গ্রেপ্তারে অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল। তাঁকে যখন পটীয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে তাদের প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

মাষ্টারদার গ্রেপ্তারের পর ফুটুদার নেতৃত্বে আমরা বিপ্লব আন্দোলন চালিয়ে যাই। পুলিশী অত্যাচার চলছে। একদিন রাত্রিবেলা আমাদের গ্রাম ও সারোয়াতলী গ্রাম পুলিশবাহিনী ঘিরে ফেলে এবং আমাদের গ্রামের ও আশেপাশের সমস্ত বাড়ির বুড়ো-বুড়ী, তরুণ ছেলে, তরুণী মেয়ে সবাইকে গ্রামের দীঘির পারে আসতে বাধ্য করে। তাদের সবাইকে সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হয়। এই সময়ের মধ্যে পুলিশ প্রত্যেকটি বাড়ী তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করে ; কিন্তু কোন বিপ্লবীর সন্ধান পায় নি।

তখন পোপাদিয়া গ্রামে মণীন্দ্র লালার (সারদা লালার পুত্র) বাড়ীতে পুলিশের ক্যাম্প ছিল। পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগের লোক জেলার প্রায় সর্বত্র ছদ্মবেশে সাদা পোষাকে ঘুরে বেড়াত। ফুটুদার নির্দেশে আমি দিনের বেলা বাড়ীতে থাকতাম। রাত্রিবেলা বাড়ী থেকে বের হয়ে ভোর হওয়ার আগেই ফিরে আসতাম। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের একদিন রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় আমি সারোয়াতলী গ্রাম থেকে ফিরছি, এমন সময় সুরেশ দত্ত (বোধ হয় ডি. আই. বি. সাব-ইন্সপেক্টার) ও হিন্দুস্থানী সিপাই বৃন্দাচল আমাকে দেখতে পেয়ে আমার বুকের কাছে রিভলভার ধরে। তারপর তারা আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার দেহ তল্লাসী করে মাষ্টারদা-লিখিত প্রীতিদির (প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার) জীবনকাহিনীর একটি অনুলিপি আমার কাছে পায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মাষ্টারদার হাতে-লেখা প্রীতিদিব জীবন-কাহিনীর কয়েকটি অনুলিপি করে আমি আমাদেব বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রে পাঠাই। আমি কারামুক্ত হয়ে এই পুস্তিকাটির একটি অনুলিপিরও সন্ধান পাই নি। এই অনুলিপি কারো কাছে থাকলে তা যদি প্রকাশ করেন, তাহলে প্রীতিদির জীবন সম্পর্কে নতুন আলোকপাত হবে এবং তা থেকে বর্তমান যুগের মেয়েরা বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করবেন।

যাহোক, আমাকে গ্রেপ্তার করে মণীন্দ্র লালার বাড়ীর পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ গোপন তথ্য প্রকাশ করার জন্য আমাকে বেদম প্রহার করে। মাঝে মাঝে অশ্রাব্য গালিগালাজও শুনতে পাই। আমার দু' হাতের আঙ্গুলের কব্জা ধরে টেবিলের উপর আঘাত দিতে থাকে। এইভাবে প্রায় দু' ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর কুখ্যাত ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টার মণি দাশগুপ্ত এসে হাজির। সে আমাকে প্রলুব্ধ করার জন্য নানা ছলচাতুরী আরম্ভ করে; কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনও কথা বের করতে না পেরে আমাকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখে।

এত নির্যাতনের মধ্যেও মণীন্দ্রবাবুর মানবিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আজ ইহলোকে নেই। দীর্ঘ দিন পরেও তাঁর মায়া-মমতার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। পুলিশের অকথ্য অত্যাচারের পর ঐ ঘরেই আমার খাবার আসে। অতি উপাদেয় খাবার। এই খাবার পরিবেশনে মণীন্দ্রবাবুর হাত ছিল। মণীন্দ্রবাবু জমিদার

মানুষ, গৃহস্থ মানুষ। তবুও তাঁর অন্তরে বিপ্লবীদের প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতার ফল্গুধারা প্রবহমান ছিল।

পরদিন মা আমাকে দেখতে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন; কিন্তু বৃটিশ শাসকের নরপিশাচগুলো মাকে নিরাশ করল। ১৯৩৫ সালে আমি যখন বাঁকুড়া জেলে, তখন মায়ের মৃত্যু হয়। আমার গ্রেপ্তার হওয়ার পর মায়ের সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

এইদিন বিকেল বেলা পুলিশ আমাকে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে সহরে এনে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। এখানে ব্রজেন সেন ও দীপ্তিমেধা চৌধুরী প্রমুখ বহু বিপ্লবী বন্ধুর সাক্ষাৎ পাই। এই সময় আমরা জেলের মেথরের মাধ্যমে মাষ্টারদার সঙ্গে পত্রালাপ করি।

সাবডিভিসনাল অফিসার এস. এন. রায়ের কোর্টে আমার বিচার হয়। বিপ্লবী দলের সঙ্গে আমার যোগাযোগের একমাত্র প্রমাণ ছিল আমার কাছে পাওয়া প্রীতিদির জীবনকাহিনী। আমার ৩ বছর কারাদণ্ড হয়। আমার বয়স কম বলে আমাকে বাঁকুড়ার বোরেষ্টাল রিফরমেটারী স্কুলে পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে আমি নেপাল দস্তিদার, সুকুমার বড়ুয়া, সুধীর কানুনগো, অজিত সেন, হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য, সুখেন্দু দাশ, দীনরঞ্জন চৌধুরী, বীরেন বোস, শশাঙ্ক আইচ, অমৃত ভৌমিক, প্রণব কানুনগো, অনিলবন্ধু দাশ ও কৃষ্ণমোহন পরিয়াল প্রমুখ বিপ্লবী সহকর্মীদের সাক্ষাৎ পাই। এদের সাহচর্যে এখানে আমার বন্দীজীবন সুরু হয়।

বোরেষ্টালে থাকার সময় একদিন সিডিসন কমিটির রিপোর্টটি আমার হস্তগত হয়। আমরা সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে বইটি পড়তে থাকি। কিছুদিন পর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কামরা তল্লাসী করে বইটি পায়। ফলে আমাকে দু'মাস একাকী সেলে থাকতে হয়। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে আমি জেল থেকে মুক্তি পাই।

গ্রামে আসার পর অমূল্য আচার্য, ধীরেন আচার্য ও নির্মলা চক্রবর্তী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তাঁদের কাছে জালালাবাদ দিবস পালন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের প্রস্তাব করি। এই উপলক্ষে রাত্রিবেলা আমার বাড়ীতে আমরা প্রায় পনেরো জন মিলিত হই। আমার

বৌদি সবার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েক বছর আমার বাড়ীতে বহুবার পুলিশী উৎপাত হয়েছে, তা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও স্নেহ অটুট ছিল। তাই তাঁর সেদিনের আদর-আপ্যায়নে সবাই মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীপুর গ্রামের একটি ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ আমাকে চট্টগ্রাম সহরের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রাম জেল হাজতে গিয়ে দেখলাম, এই সম্পর্কে গুজরা-নয়াপাড়া গ্রামের তেজেন দত্ত, দেওয়ানপুর গ্রামের নওয়াব মিঞা, পোপাদিয়া গ্রামের অমূল্য আচার্য, কধুরখিল গ্রামের অবিনাশ দত্ত ও হরিপদ বিশ্বাস প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুকেও গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। এই মামলায় অমূল্য আচার্যের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আমরা কয়েকজন মুক্তি পাই।

এবার বিনোদদার (বিনোদ দত্ত) সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করি। এজন্য আমি বাঁশবাড়িয়া গ্রামের প্রখ্যাত বিপ্লবী সুরেশদার (সুরেশ বণিক) সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে মুরাদপুরের হরেন ভৌমিক ও খগেন ভৌমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এই সময় একদিন কাটলী গ্রামে আত্মগোপনকারী শান্তি চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনিও বিনোদদার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব।

তখন আমি চট্টগ্রাম সহরে গৃহশিক্ষকতা করে দিন কাটাচ্ছি। একদিন একজন উকিল মোহরার সঙ্গে কথা বলার সময় হরেন ভৌমিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। নানা কথার পর হরেনবাবু বললেন, তিনি যদি বিনোদদার খবর পান, তাহলে আমাকে জানাবেন। কিছুদিন পরে এক শনিবার এক ভদ্রলোক হরেনবাবুর চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর নির্দেশ মত আমি রাত্রির ট্রেনে মিরেশ্বরী ষ্টেশনে পৌঁছাই। তিনি মিরেশ্বরী ষ্টেশন থেকে আমাকে গড়িয়াইস গ্রামের নবীন চৌধুরীর বাড়ীতে নিয়ে যান। সেই বাড়ী থেকে কিছু দূরে রাত প্রায় ৩টার সময় বিনোদদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের অঞ্চলের কাজকর্মের খোঁজখবর নেন। শচীনদা (গুহ) জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিনোদদার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। বিনোদদার সঙ্গে শান্তিদা (চক্রবর্তী) ও নেপাল দস্তিদারের যোগাযোগের ব্যবস্থাও আমি করি।

সেই আগুনঝরা দিনের এমন অনেক কথা আজ লিখতে বসে মনে পড়ছে ; কিন্তু স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে সব লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

বিপ্লবী জীবনের নকসা

শ্রীসুবোধ চৌধুরী

অনুলিপি : শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী

[মাষ্টারদা সূর্য সেনের অন্যতম সহকর্মী শ্রীসুবোধ চৌধুরী আজ দৃষ্টিশক্তিহীন। আমার অনুরোধে তিনি তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন এবং তাব অনুলিপি করেছেন চট্টগ্রাম পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতি শ্রীনিকুঞ্জবিহাবী চৌধুরী।—সম্পাদক।]

বিগত ১১ই মার্চ ১৯৭৩ রবিবার অপরাহ্নে নিভৃতে নিরালায় বসে আনমনা হয়ে ভাবছিলাম আমি আজ অন্ধ ভিখারী কেন? ভগবানের এ কি নিদারুণ পরিহাস! মনপ্রাণ বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল—একটা অব্যক্ত বেদনায় অন্তর বিক্ষুব্ধ, একটা চাপা কান্নার সুর হৃদয়ে ধ্বনিত হচ্ছিল। তা সামলাতে চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ কে যেন বলে উঠল আমার বন্ধু শচীনবাবু [শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ] ও নিকুঞ্জবাবু, [শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী] এসেছেন। তাঁদের আওয়াজ পেয়ে লাফিয়ে উঠলাম। সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের অধিককাল পরে বন্ধুদের সাথে দেখা। অন্তরে সে যে কি বিপুল আনন্দ! বিষাদের কালোরেখা নিমিষে বিলীন হয়ে গেল, মেতে উঠলাম এক অপার আনন্দে। পূর্বস্মৃতি নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের সাথে আলাপ হল। যাবার সময় বন্ধু শচীনবাবু বলে গেলেন, 'আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রামের অবদান সম্পর্কে একটি ইতিহাস প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছি, তাতে প্রকাশের জন্য আপনার বিপ্লবী জীবনের কর্মধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা লেখা চাই।' আমিও সম্মতি দিলাম। কিন্তু হায়! আমার অদৃষ্ট! আমি আজ চক্ষু হারিয়ে অন্ধত্বের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত ও পঙ্গু। স্মরণশক্তি লুপ্তপ্রায়, তবুও বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করতে প্রয়াসী হলাম।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মহাত্মা গান্ধী প্রমূখ নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে যখন চট্টগ্রাম পদার্পণ করেন, তখন চট্টগ্রামে মহা আলোড়ন

সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে দেখবার জন্য গ্রাম ছেড়ে সহরের দিকে দুর্বার স্রোতে ছুটে চলেছিল। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺অনুকূলচন্দ্র চৌধুরী সেই বিপুল জনসমাবেশকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্য জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। আমার প্রাণেও মহাত্মাজীকে দেখবার জন্য প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাবার কাছে বায়না ধরলাম মহাত্মাজীকে দেখবার মানসে। চট্টগ্রাম বন্দরের ৪নং জেটীর সামনে (ডবলমুড়িং এলাকায়) আমার মামার বাড়ী। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে আমার পিতৃদেবের সাথে মামার বাড়ী পৌঁছলাম। পরদিন বাবা আমাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের বিরাট দায়িত্ব নিয়ে নিজের কাজে ব্রতী হলেন। এরকম বিরাট সমাবেশ দেখার সুযোগ জীবনে এই প্রথম। মহাত্মাজীকে দেখতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। তখন থেকে জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সুরু হল।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ। দীর্ঘ সাত বছর অতীত হল। আমি নয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র। একদিন স্কুল ছুটির পর আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মোক্ষদারঞ্জন রায় মহাশয়ের সাথে দেখা করার মানসে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম। ফিরবার পথে একটি দীঘির পাড়ে আমার কয়েকজন সহপাঠীর সাথে দেখা হয়, তাদের কারো হাতে পত্রিকা এবং কারো হাতে দু'একখানি বই। সবাই গল্পের আসর জমিয়েছিল। আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম। এ সময় দু জন অপরিচিত ভদ্রলোক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা আমাদের দেখে খানিক দাঁড়ালেন এবং জানতে চাইলেন, আমরা কে এবং এখানে বসে কি করছি। তাঁদের একজন আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বললেন, 'এটা পড় এবং পরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।' এই বলে তাঁরা চলে গেলেন। বাসায় গিয়ে বইটা পড়তে গিয়ে দেখলাম কানাইলাল দত্তের জীবনী। যিনি আমাকে বইখানি দিয়েছিলেন, তাঁর নাম ও ঠিকানা বইখানির ভিতরে এক টুকরো কাগজে লেখা আছে। তাঁর নাম অম্বিকা চক্রবর্তী। বইখানি বারবার পড়ে অত্যন্ত প্রেরণা পেলাম। প্রায় একমাস পরে ঠিকানা নিয়ে অম্বিকাদার সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁর সাথে অনেক আলাপ হল। তিনি আমাকে নানারকম ভাবে বহু প্রশ্ন করলেন। আমিও যথাযথভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার আভাস পেলাম না। ফিরবার সময় শুধু এটুকুই বললেন, 'মাঝে মাঝে

এসো, দেখা করো।' কয়েকমাস পরেই আমি নয়াপাড়া ছেড়ে আমার নিজগ্রাম কধুরখীল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তারপর মাঝে মাঝে অম্বিকাদার সাথে দেখা করতে যেতাম এবং তাঁর উপদেশানুযায়ী চলতে সুরু করলাম।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে একদিন অম্বিকাদা মাষ্টারদার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর থেকে প্রায়ই তাঁদের সাথে দেখা করার জন্য ছুটে যেতাম। তাঁদের সাহচর্য, স্নেহ, আদর আমাকে এতই বিমুগ্ধ করেছিল যে আমি তাঁদের না দেখে কিছুতেই থাকতে পারতাম না। একদিন অম্বিকাদা আমাকে আদেশ দিলেন, 'গ্রামে গিয়ে শরীরচর্চার একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল। স্কুলের ছাত্রদেব সাথে স্নেহ, আদর, ভালবাসা দিয়ে মিশতে চেষ্টা কর এবং দেশবাসীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হও।'

কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন আমার ডাক পড়ল মাষ্টারদার কাছে। অনেক আলাপ-আলোচনার পর তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার খানিকটা ইঙ্গিত দিলেন। তিনি বললেন, 'আমরা কংগ্রেস কর্মী—দেশবাসী এবং বৃটিশ সরকারের কাছে আমাদের একমাত্র পরিচয়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে আমরা বিশ্বাসী নই। সশস্ত্র বিপ্লবই আমাদের একমাত্র কর্মপন্থা। আমাদের এখন প্রয়োজন উপযুক্ত সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক তৈরী করা।' আমার উপর ছাত্রসমাজ থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রকৃত কর্মীর সন্ধান করার ভার দিলেন। এইভাবে আরম্ভ হল আমাদের ট্রেনিং। তিনি মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন এবং প্রয়োজনমত নানাপ্রকার উপদেশ এবং কাজের ভার দিতেন।

১৯২৮ খৃঃ হতে ১৯২৯ খৃঃ পর্যন্ত গ্রামে জিম্ন্যাস্টিক ক্লাব এবং হেল্থ সেণ্টার স্থাপন করে মাষ্টারদার আদেশমত প্রকৃত কর্মী নির্বাচন আমার জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে দাঁড়াল এবং আমিই আমার অঞ্চলের মাষ্টারদার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মীরূপে পরিণত হলাম। গ্রামে মুসলমানদের মধ্যেও আমার পরিবারের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তারাও সর্বতোভাবে আমাকে এবং আমার দলের লোককে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হত না।

১৯৩০ খৃঃ ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টার সময় কংগ্রেস অফিসে বসে আছি। হঠাৎ মাষ্টারদা আমাকে বললেন, 'এখনি গ্রামে যাও' এবং শ্রীপুর, কানুনগোপাড়া ও সারোয়াতলী গ্রামের কয়েকটি ছেলের নাম করে বললেন, 'তাদের সংগে করে কাল বেলা ৮ টার মধ্যে কংগ্রেস অফিসে হাজির হবে।' কালবিলম্ব না

করে গ্রামের দিকে রওনা হলাম। বাড়ী এসে পৌঁছলাম রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিনিটে।

সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই মনে হল রাত্রি ভোর হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি শ্রীপুরের দিকে রওনা হলাম। পরে জ্যোৎস্না দেখে মনে হল, রাত বেশী হবে না। শ্রীপুর গ্রামে গিয়ে বন্ধু অনন্তবাবুর (অনন্ত দাস) পূজামণ্ডপে—যেখানে তিনি ঘুমাতেন সে ঘরে—প্রবেশ করে তাঁকে ডাকতে সুরু করলাম এবং ঘরে ঢুকেই বিছানায় গিয়ে যাঁকে নাড়া দিতে গেলাম তিনি অনন্তবাবুর পিতৃদেব। এত রাত্রে আমাকে দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন এবং তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে অনন্তবাবুকে ডেকে দিলেন। অনন্তবাবু আসামাত্রই তাকে মাষ্টারদার আদেশ জানিয়ে অনতিবিলম্বে দুজনেই বেড়িয়ে পড়লাম এবং অন্যান্যদেরও মাষ্টারদার আদেশ জানিয়ে দিয়ে সহরের দিকে রওনা হলাম।

১২ই এপ্রিল বেলা ৮টা। মাষ্টারদার ঘরে ঢুকে দেখি, মাষ্টারদা একলা বসে আছেন, যেন যোগাসনে ধ্যানমগ্ন ঋষি। তাঁর সেই অনিন্দ্যসুন্দর সৌম্যমূর্তির পানে অপলকনেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ক্রমে দেখতে পেলাম, প্রভাতের নবোদিত সূর্যের মত তাঁর চোখ দু'টি রক্তিমাভ, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারদিকে ঠিকরে পড়ছে। আমাদের দেখে তিনি ইঙ্গিতে বসতে বললেন। পরে আমাদের সাথে কথা সুরু করলেন। প্রত্যেককে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গোপন আলোচনা। আলোচনাশেষে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমার সাথে আলোচনায় বুঝতে পারলাম—তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের একটা বিরাট প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমাদের সর্বদা সতর্ক এবং আদেশের অপেক্ষায় থাকতে বললেন।

তারপর ১৯৩০ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল। এই দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় এবং বরণীয় দিন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বৃটিশের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান। দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য মুষ্টিমেয় তরুণ দেশসেবক বীর বিপ্লবীর ব্রিটিশের কামান ও অগ্নিগোলার বিরুদ্ধে দুর্বার শক্তি নিয়ে মৃত্যুবরণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অভিযান। সে কি এক অভূতপূর্ব ঘটনা! সমস্ত বিশ্ব অবাক নেত্রে তাকিয়ে রইল চট্টগ্রামের দিকে, একদল তরুণ দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর দিকে। সেদিন আমাদের মহান্ নেতা মাষ্টারদার মুখনিঃসৃত

"বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে মুখরিত হল চট্টগ্রাম তথা সমগ্র ভারত। আমরা সগৌরবে বিজয়ের নিশান উড়াতে সক্ষম হলাম।

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধের পর বিপ্লবীরা গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মাষ্টারদা পরিকল্পনা নিলেন গেরিলা যুদ্ধের। অসংখ্য ব্রিটিশ সৈন্য চট্টগ্রাম সহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। মাষ্টারদা তাঁর সহকর্মীদের দলে দলে বিভক্ত করে আত্মগোপন করে রইলেন। আরম্ভ হল গেরিলা যুদ্ধ।

আমার বাড়ীর অনতিদূরে মাত্র ৩।৪ শত গজের মধ্যে আমার বন্ধু দ্বারিকামোহন চৌধুরীর বাড়ী। এই বাড়ীটির পরিধি প্রায় ৪০ বিঘা জমি নিয়ে। সুপারী, আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য গাছগাছড়ায় ভরা এটা বিরাট এক বাগান। এমনকি বিরাট জঙ্গল বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাতে দিনে দু' চারটা খুন হলেও ধরবার সুযোগ নেই। এটাই হল চট্টগ্রামে মাষ্টারদার অন্যতম আশ্রয়স্থল। মাষ্টারদা, নির্মলদা, তারকেশ্বর দস্তিদার, বিনোদ দত্ত, প্রমুখ কয়েকজন এখানে থাকতেন। এটাকে কেন্দ্র করে তিনি অন্যান্য সহকর্মীদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর আমার বন্ধু শ্রীপুরের মণীন্দ্র মজুমদার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে দেখি, তাঁর বাড়ীতে অম্বিকাদা অসুস্থ। সে বাড়ী নিরাপদ স্থান নয় বলে তাঁকে পটীয়া নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দারোগা আসামুল্লা খবর পেয়ে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং অমানুষিক অত্যাচার করে। আসামুল্লাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য পোপাদিয়া গ্রামের হরিপদ ভট্টাচার্যকে মনোনীত করা হল। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে হরিপদ আমার বাড়ীতে আসে। আমি থাকতাম প্রায় সবসময় মাষ্টারদার সাথে। আমার মাতৃদেবী কিশোরীবালা চৌধুরী হরিপদকে আশ্রয়ে রেখে অতি সংগোপনে আমাকে খবর দিলেন। সেইরাত্রে মাষ্টারদার সাথে তার যোগাযোগ করার ব্যবস্থা হল। সে রাত্রি কাটল প্রস্তুতিতে। রাত তিনটায় দ্বারিকাবাবুর স্ত্রী রান্নার কাজ সেরে নিলেন এবং একটা টিফিন-ক্যারিয়ারে ভাত ও তরকারী দিলেন। রাত্রি ভোর হবার পূর্বেই তাকে অস্ত্রে সুসজ্জিত করে মাষ্টারদা ও আমি দুজনে রাস্তা পর্যন্ত এসে বিদায় অভিনন্দন জানালাম। সম্ভবত পর দিনেই আসামুল্লাকে গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করা হল।

এই ঘটনার পর আমি চট্টগ্রাম সহরে যাবার জন্য রোজই মাষ্টারদাকে বিরক্ত করতে সুরু করলাম। আমার উদ্দেশ্য—তাঁর মত নিয়ে শত্রুর উপর

আক্রমণ করার সুযোগের অন্বেষণ। এদিকে আমাদের বিপ্লবী নেতা লোকনাথ বলকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লাম, কারণ জালালাবাদ যুদ্ধের সেনানায়ক হিসাবে তিনি সবার কাছে সুপরিচিত। তাঁকে রক্ষা করার জন্য যথোপযুক্ত উপায় অন্বেষণ করে সদাই সতর্ক থাকতে হত। তাঁর জন্য কোথাও আশ্রয় মিলে না। তাঁর গতিবিধি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকছে না। মিলিটারীকে এড়িয়ে চলা যেত, কিন্তু জনসাধারণকে এড়ান যেত না। যে পথ দিয়ে তিনি যেতেন, পরদিন ভোর হতে না হতেই রব উঠত এই পথ দিয়ে লোকনাথ বল গেছেন। সংগে সংগেই মিলিটারীর তৎপরতা বেড়ে যেত এবং আমাদের চলাফেরার পথও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠত। একজন্য তাঁকে চট্টগ্রামে রাখা আর সমীচীন নয় ভেবে মাষ্টারদার আদেশে তাঁকে কলিকাতা পাঠিয়ে দেবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার প্রয়াসী হলাম।

সাময়িকভাবে লোকাদাকে আমাদের গ্রামের এক বাড়ীতে আশ্রয় দেবার জন্য গেলাম। সে বাড়ীর সংগে পূর্ব-পরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা ছিল না। সে বাড়ীতে গৃহশিক্ষক হিসাবে আমার বন্ধু রটন্তী ধর থাকতেন। একটি ঘরের দ্বিতলে যেখানে রটন্তী ধর থাকতেন আমি লোকনাথদাকে আড়ালে রেখে সেখানে গেলাম। দ্বিতলে উঠে দেখি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। দরজাখানি ছিল ঐ রুমের পশ্চিম দিকে। চীৎকার করে ডাকা সমীচীন নয় ভেবে ২।১ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম, ঐ রুমের উত্তর দিকের জানালা খোলা আছে। যেতে হলে টিনের ছাউনীর কাঠ বেয়ে জানালায় যেতে হবে। অনন্যোপায় হয়ে সাহসে নির্ভর করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে লাফিয়ে ধরলাম ছাউনীর কাঠ। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলাম জানালার দিকে। ওখানে নেমে ঘরে ঢুকে দেখি রটন্তী নেই—আছেন বাড়ীর মালিক সারদাবাবু (কবিরাজ)। তিনি প্রথমেই আমাকে দেখে শিউরে উঠলেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। সেদিন কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত। পরক্ষণেই দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঢুকলে কি করে?' তখন আমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে বললাম, 'আপনার দরজা খোলা ছিল। আমি ঢুকেই বন্ধ করেছি বিশেষ গোপনীয় কথা আছে বলে।' তিনি প্রথমতঃ আমার কথা বিশ্বাস করেন নি। পরে কিছুক্ষণ আলাপের পর বললেন, 'হয়ত ভুলও হতে পারে।' আমিও বললাম, 'আপনি বুড়োলোক, হয়ত তখন ভাল

করে দেখেন নি।' তারপর এই গভীর রাতে আমাদের উপস্থিতির কথা বললাম এবং তিনি দু' একদিনের জন্য থাকবার অনুমতি দিলেন।

এই সময়টা আমাদের কাছে একটা মহা দুর্যোগের দিন হয়ে দাঁড়াল। মিলিটারীর উৎপাত খুবই বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে লোকাদার জন্য নিরাপদ সেল্টার পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। এমন সময় আমি স্মরণ করলাম আমাদের গ্রামের আমার চলার পথের সতর্ককারী দাদাকে। তিনি হলেন আমাদেরই গ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ৺তারাচরণ দত্ত মহাশয়।

শিশুসুলভ চঞ্চলতা, কর্তব্য কর্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, পরার্থপরতা,—এই-ই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পাড়া-প্রতিবেশী, জনসমাজের এবং দেশবাসীর আপদে-বিপদে সাহায্যার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি অসীম সাহসের সহিত ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

একদিন রাত্রিবেলা সারদাবাবুর বাড়ী হতে লোকাদাকে নিয়ে তারাচরণবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। তারাচরণবাবু অত্যন্ত আনন্দের সহিত অভিনন্দন জানালেন। দু' একদিন পর তাঁর বাডীতে ভবতোষ, হরিপদ মহাজন প্রভৃতি আরো তিন চার জনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলাম। তারাচরণবাবু আমাদের বন্ধুদের অতি যত্নের সহিত খাওয়া-পরা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। জানতে পারলাম, আমি ধৃত হওয়ার পরেও তিনি মাষ্টারদা এবং অন্যান্য বন্ধুদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমাদের গ্রামের পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী মনোরঞ্জন চৌধুরীর কাছে জানতে পেরেছি শুধু আশ্রয়দাতা নন, তিনি পার্টির কর্মীদের পুলিশ ও মিলিটারীর কবল থেকে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও রক্ষা করেছিলেন। এভাবে কয়েকদিন এবাড়ী ওবাড়ী করে লোকাদাকে রাখা হল।

ইতিমধ্যে লোকাদার কলিকাতা যাবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একদিন মাষ্টারদার আদেশে তাঁকে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত চৌধুরী ঘাটে নিয়ে গেলাম। তখন রাত ১০ টা। আমার প্রতিবেশী একজন মুসলমান মাঝিকে ডেকে বললাম, 'ডাক্তারবাবুকে এনায়েত আলীর ঘাটে পৌঁছে দিও।' এই বলে তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। ফিরবার পথে যখন বাজারে এসে পৌঁছি, তখন বাজারের একজন মুসলমান দোকানদার দোকান থেকে বের হয়ে এল। আমি একটুখানি অন্যমনা ছিলাম। দোকানদারই প্রথমে দেখতে পেল এক ব্যাটেলিয়ান মিলিটারী মার্চ করে আসছে। দোকানদারটি আমাকে ইঙ্গিত

দিল। সেখানে পালাবার কোন রাস্তা ছিল না। আমি ঐ দোকানের পিছনে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিলিটারী এসে পড়ল এবং দোকানদারকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলল। আমি পেছন থেকে সব শুনতে পেলাম। বেশ বাহাদুর বটে দোকানদারটি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার একই উত্তর—'আমি কাকেও চিনি না এবং ঐ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।' প্রায় ১৫।২০ মিনিট কাল বাজার ও নদীর ঘাটে ঘোরাফেরা করে মিলিটারী চলে গেল। আমিও গ্রামের গলিপথ ধরে চলে গেলাম।

বেশ কিছুদিন ধরে চট্টগ্রাম সহরে যাবার জন্য মাষ্টারদাকে বিরক্ত করছিলাম। তিনিও সহরের কোন খবরাখবর না পেয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই আমাকে সহরে যাবার জন্য অনুমতি দিলেন এবং একটি ওয়েবলি রিভলভার হাতে দিয়ে বললেন, 'লক্ষ্য সুনিশ্চিত না হলে লাফ দিও না—সাহেবদের অবস্থিতির যথাযথ খবর নিয়ে আসতে চেষ্টা কর।' আমি তাঁর আদেশমত সহরে পৌঁছে সদরঘাট রোড হয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলাম। যখন ৪নং জেটীর সামনে উপস্থিত হই, তখন রাত ১০টা। ইতিমধ্যে কোন খবর পেলাম না। রাস্তাঘাট জনমানবহীন। হঠাৎ আওয়াজ পেলাম ১নং জেটীর দিক থেকে একখানি গাড়ী আসছে। ৪নং জেটীর রাস্তার পাশে মসজিদের পেছনে নিজেকে আড়াল করে লক্ষ্য করছিলাম। তখনই সাথে সাথে দু' তিনখানি সৈন্যবাহী গাড়ী এল এবং চলে গেল। বুঝতে পারলাম, তারা টহলে বেড়িয়েছে। তাদের প্রধান ঘাঁটি ১নং জেটীর কাছাকাছি কোন এক জায়গায়। আমি সেই ঘাঁটির ঠিক অবস্থান (position) জানবার জন্য এগিয়ে গেলাম। সৈন্যদের গতিবিধি এতই চঞ্চল ও তৎপর ছিল যে, আমি আর বেশী দূরে এগিয়ে যেতে পারলাম না। ওখান থেকে ফিরে সদরঘাট পুলের নিকট সাম্পানে উঠে কালারপোল অভিমুখে রওনা হলাম।

আমি যখন পূর্বনির্দিষ্ট বাড়ীতে এসে পৌঁছি, তখন রাত তিনটা। দুটি ছেলে একটা সাইকেল নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রায় ৪টার সময় আমি সাইকেল নিয়ে রওনা হলাম। ইন্দ্রপোল পার হয়ে মুনসেফ বাজারের ভিতর দিয়ে গলিপথ ধরে চলতে সুরু করলাম। তখন শীতকাল—তীব্র ঠাণ্ডাও পড়েছিল এবং পথশ্রমে শরীরটা অবশ হয়ে গেছে। আমি থানা ও মিলিটারী ক্যাম্প এড়িয়ে গিয়ে প্রায় মাইল খানেক পথ অতিক্রম করে দোহাজারী রেল লাইনের নিকট একটা কাঠের পুলের উপর উঠতে গিয়ে শরীর

একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল। সংগে সংগে হাত দুটো অবশ হয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল থেকে সরে যাওয়াতে সাইকেল সহ খালের ভিতর পড়ে যাই। একটুখানি এলোমেলো ভাবে পড়লেই সেখানেই আমার জীবনের শেষ হয়ে যেত। পড়ার সাথে সাথেই যেন পুনঃ দশঘোড়ার শক্তি ফিরে এল। সাইকেলখানা নিয়ে উপরে উঠে পড়লাম এবং নিকটে একটা পুকুরে গিয়ে সাইকেল ও জামাকাপড় পরিষ্কার করার পর দেখলাম, সাইকেলের একটি চাকায় হাওয়া নেই। চিন্তা করে দেখলাম, এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা সমীচীন নয়; কারণ সামনে সারোয়াতলী হাইস্কুলের কাছে এবং পেছনে পটীয়া থানার মিলিটারী ক্যাম্প রয়েছে এবং সৈন্যবাহিনী প্রায় সবসময় টহলে বের হয়। তাই কালবিলম্ব না করে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। ধলঘাটের মাঝামাঝি এসে মাঠের মধ্য দিয়ে ঘণ্টাখানেক যাবার পর সারোয়াতলীর এক বন্ধুর (সুখেন্দু দস্তিদারের) বাড়ীতে উঠলাম। সেখানে আমার বন্ধুর মা (তাঁকে আমি জেঠাইমা বলে ডাকতাম) আমার অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন এবং আমাকে শুকনা জামাকাপড় ইত্যাদি দিলেন। সাথে সাথে পাশের বাড়ীর একটা ছেলেকে ডেকে আমার সাইকেলটি হাওয়া দিয়ে আনালেন। জেঠাইমা তাড়াতাড়ি রান্না করে খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। খাবার অব্যবহিত পরেই পুনঃ রওনা হলাম।

কিছু রাস্তা চলার পর ওখানে আর সাইকেল চলে না। তাই হেঁটেই চলতে হল। কিছুদূর পর মোড় নিতেই দেখি সামনে ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টার শচীন ভৌমিক। সাথে ২৫।৩০ জন মিলিটারী। সবার পরনে সাদা পোষাক। কারো কাছে রাইফেল ছিল না। ২০।২৫ হাত এগুতেই তাদের মুখোমুখি হলাম। মুহূর্তেই ঠিক করলাম, এ অবস্থায় পলায়নের চেষ্টা বৃথা। সাহসের সহিত তাদের দিকে এগিয়ে চললাম এবং মুখোমুখি হতে শচীনবাবু আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে সুবোধবাবু যে! কোথা থেকে আসছেন? আমিও তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করে বললাম, 'শচীনবাবু যে! কেমন আছেন? কোথায় চললেন?' এভাবে উভয়ে উভয়কে প্রশ্ন করে এগিয়ে চললাম। ২।৩ মিনিটের মধ্যে তাদের অতিক্রম করে সাইকেলে উঠে বেগে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। তখনই দূর থেকে তাদের শব্দ শুনতে পেলাম, 'ধর ধর' ইত্যাদি; কিন্তু তখন আমি তাদের রিভলভার এবং পিস্তলের পাল্লার বাইরে চলে গেছি। ঘণ্টা দুই পরে শচীনবাবু এক দল মিলিটারী সহ আমার বাড়ী

[illegible] দ্বারকাবাবুর বাড়ী থেকে সমস্ত খবরা-খবর নিলাম এবং প্রস্তুতও হয়ে রইলাম। আমাকে না পেয়ে আমার বাডী সার্চ করে তারা চলে গেল।

পরদিন বিকেল বেলা আমি ও মাষ্টারদা দু'একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম। আলাপের শেষের দিকে গত দিনের দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তখন আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ। দুদিন পর তাঁদের নিরাপদ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে কাকেও কিছু না বলে বেরিয়ে পডলাম। ইন্দ্রপোলের পাশে হাওলাপাড়ায় গিয়ে এক বাডীতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে থাকার সময় শুনতে পেলাম গ্রামে মিলিটারী তৎপরতা খুবই বেডে চলেছে। মন চঞ্চল হয়ে উঠল। মাষ্টারদার আশ্রয়স্থানের কোন সংবাদ পাচ্ছিলাম না। নিজের পরিকল্পিত প্রোগ্রাম স্থগিত রেখে পুনঃ নিজের গ্রামে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম এবং শেষরাতে এক বন্ধুকে নিয়ে রওনা হলাম। মুনসেফ বাজারের রাস্তা অতিক্রম করার পর পড়ে গেলাম মিলিটারীর সামনে। স্টার সাহেব সেখানে মিলিটারী নিয়ে আত্মগোপন করেছিল। বন্ধুটি আডালে ছিল বলে গা ঢাকা দিয়ে সরে পডল। স্টার সাহেব আমাকে প্রথমতঃ বুটজুতো দিয়ে লাথি মারতে মারতে রাস্তায় শুইয়ে দিল। আমিও রাস্তার উপর উপুড হয়ে পডে রইলাম। পরে বেত্রাঘাতে আমার শরীরে প্রবল রক্তক্ষরণ আরম্ভ হল। জামাকাপড সব রক্তে ভিজে গেল। আমাকে মৃতপ্রায় রেখে স্টার চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমার বন্ধু ফিরে এসে অতিকষ্টে আমাকে নিকটবর্তী একটি বাডীতে নিয়ে গেল। সেখানে বাডীর মালিক অতি যত্নের সহিত আমার থাকার এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন। দিন পনের এ বাডীতে অপেক্ষা করতে হল। এখান থেকে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে প্রয়াসী হলাম। একটু সুস্থ হবার পর গ্রামে গেলাম। মাষ্টারদাকে আমার এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা কিছু বললাম না। তিনি নিরাপদে আছেন দেখে আনন্দিত হলাম।

পাঁচ সাত দিন পর একদিন বিকেল বেলা মাষ্টারদা বলে উঠলেন, 'আজই একটা কাজে আমাদের যেতে হবে।' তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। দিনের আলোতে বের হওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু তাঁর আদেশের বিরুদ্ধেও কোন মন্তব্য করা বিধেয় নয়। গত্যন্তর না দেখে বেরিয়ে পডলাম। ক্ষণকাল পরে শুনতে

পেলাম ঐ রাস্তার ধারে দোকানে বসে কয়েকজন লোক সূর্য সেনের গল্প করছে। ফিরে দেখলাম, আমার উপর নজর রাখার জন্য নিযুক্ত ইনফরমারটিও ওখানে বসে। আমাকে সকলে চেনে, কিন্তু মাষ্টারদাকে কেউ চেনে না। আমরা নিঃশব্দে ওখান থেকে চলে গিয়ে শ্রীপুর গ্রামে গিয়ে একটা কাজের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম এবং ও কাজটি সেরে আমার বন্ধু অনন্তবাবুর বাড়ী পৌঁছুলাম। অনন্তবাবু বাড়ী ছিলেন না। আমি ও মাষ্টারদা তাঁদের ঠাকুরঘরে অন্য একজন বন্ধুর প্রতীক্ষায় রইলাম। ঠাকুরঘরখানি বড রাস্তার ২০।২৫ হাতের মধ্যে অবস্থিত। হঠাৎ একদল মিলিটারী সে রাস্তায় এসে পড়ল; আমরা ঘর থেকে বাইরে যাবার সুযোগ পেলাম না। ঘরের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। দেখলাম, মিলিটারীরা মার্চ করে কর্ণফুলী নদীর দিকে এগিয়ে গেল। আমরা আর কালবিলম্ব না করে রাস্তা পার হয়ে ছোট একটা গলিপথ ধরে চলতে সুরু করলাম। কিছুদূর যাবার পর দেখি, তারা আবার কেরাণী বাজারের পথ ধরে ফিরছে। তখন আমরা গা ঢাকা দিয়ে ঐ গলির মধ্যে রইলাম।

মিলিটারী চলে গেলে পর কেরাণী বাজারের রাস্তা পার হয়ে সোজা আমাদের কধুরখীল গ্রামের দিকে রওনা হলাম। কিছুদূর আসার পর দেখি, রাস্তার পার্শ্বে একটা মুদীর দোকানে বসে ৭।৮ জন মুসলমান গুণ্ডা আড্ডা দিচ্ছিল। তারা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কে?' আমি বলে উঠলাম, 'আমরা পথিক।' তারা বলে উঠল, 'নাম বল, এত রাত্রে কোথা যাচ্ছ তোমরা?' ইত্যাদি। আমার রাগ হল এবং প্রত্যুত্তরে বলে উঠলাম, 'তোমাদের দরকার কি?' তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'ওদের ধর।' তারপর সকলেই লণ্ঠন লাঠি নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে বের হল। আমিও রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মাষ্টারদা আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলে উঠলেন, 'দৌড়াও।' রাগে আমার শরীর কাঁপছিল, কিন্তু মাষ্টারদার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা বিপ্লবীদের ছিল না। আমরা দৌড়াতে আরম্ভ করলাম। গুণ্ডারাও আমাদের পেছনে পেছনে কিছুক্ষণ তাড়া করে থেমে গেল। কিছুদূর আসার পর আমার রাগ দেখে মাষ্টারদা আমাকে বুঝিয়ে বললেন, 'দেখ সুবোধ, এরূপ ৫০০ জন গুণ্ডাকে আমরা ভয় করি না। কিন্তু আজ এখানে গুলির আওয়াজ শুনলে ভোর হতে না হতেই গভর্ণমেণ্ট এ সংবাদ পাবে এবং এ রাস্তা দিয়ে আমাদের চলাফেরার নিরাপত্তা নষ্ট হবে।' ধীরে ধীরে

আমাদের গ্রামে এসে পড়লাম। আমার এক প্রতিবেশী আমাকে বলে দিল, সামনে একটি নতুন মিলিটারী ক্যাম্প বসিয়েছে। আমরা তখন অন্যদিকে মোড় নিয়ে আমাদের গন্তব্যস্থলে চলে গেলাম।

পরদিন মাষ্টারদা চিন্তায় বিভোর। তখন আমাদের গ্রামের পরিস্থিতিও খুব খারাপ হয়ে উঠেছিল। আমাদের গ্রামের সামনে ও পেছনে খুবই অল্প ব্যবধানের মধ্যে দুটো মিলিটারী ক্যাম্প বসেছিল। তাঁরা সারা দিনরাত সমস্ত গ্রাম টহল দিয়ে বেড়াত। মাষ্টারদা আমাকে কয়েকখানি পুরানো স্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকা আনতে বললেন। আমিও আনিয়ে দিলাম। তিনি পত্রিকায় মনোনিবেশ করলেন। কয়েকদিন চট্টগ্রাম সহরের কোন সংবাদ না পেয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। দু' একদিন পর দুই সহকর্মীর নিকট সংবাদ দিতে বললেন, কিন্তু সেদিন মা আমাকে বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। আমিও বাড়ী গেলাম। তিনি আমার জন্য বাড়ীতে খাবার বন্দোবস্ত করলেন। খাওয়ার পর আমাদের ঠাকুরঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিলাম এবং তন্দ্রাভিভূত হলাম। তখন স্বপ্ন দেখছিলাম, মিলিটারী আমাদের বাড়ী ঘেরাও করেছে। সাথে সাথেই সুবেদারের ডাক শুনতে পেলাম, 'সুবোধবাবু আছেন? বেরিয়ে আসুন।' তার ডাকে আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল এবং সত্যি সত্যিই তখন আমার বাড়ী ঘেরাও করেছে। দরজা খুলে বের হয়ে দেখলাম, সুবেদার তার রিভলভার বের করে দাঁড়িয়ে। আমাকে বলল, 'তোমাকে এ্যারেস্ট্ করলাম।' তখন আমার বাড়ী তন্নতন্ন করে তল্লাসী করতে লাগল। কিন্তু আমার লক্ষ্য সেদিকে নেই—আমার লক্ষ্য রয়েছে মাষ্টারদা এবং অন্যান্যদের দিকে। একটা মহা-বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলাম। কারণ তাঁরা রয়েছেন অতি নিকটে একটি আশ্রয়স্থানে। আমার কানদুটো ওদিকে নিবিষ্ট। ওদিক থেকে কোন গোলাগুলির শব্দ আসছে কিনা। তারপর আমাকে নিয়ে মিলিটারীরা পূর্বমুখী রওনা হল। তখন আমি একটুখানি নিশ্চিন্ত হলাম এবং বুঝলাম, আমাকে ধরার জন্য তারা গিয়েছিল। মাষ্টারদার খবর তারা পায় নি। কারণ মাষ্টারদা প্রমুখ ছিলেন পশ্চিমদিকে। তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে বলছি, 'হে ভগবান, আমার জন্য দুঃখ করি না। তুমি আমাদের মহান্ নেতা মাষ্টারদা ও তাঁর সাথীদের নিরাপদে রাখ।' তারপর আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম সহরের কোতোয়ালী থানায় হাজির হল। সেখান থেকে ডি. আই. বি. অফিসার রমণী মজুমদার আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন এবং আমাকে

ঘণ্টাখানেক নানা রকম প্রশ্ন করলেন। মাষ্টারদা ও অন্যান্যদের সংবাদ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হলেন।

তারপর আরম্ভ হল তাঁদের স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া। কারণ তখন বেলা হয়েছে অনেক। আমাকে খেতে দিতে হবে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'দুটো ডালভাত এঁকে দাও।' কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে আমি এভাবে ভাত দিতে পারব না। তুমি বাজারে গিয়ে মাছ ডিম যা হয় কিছু নিয়ে এস'। রমণীবাবু কিন্তু তাতে নারাজ। শেষ কিছুক্ষণ তাদের ঝগড়ার পর বাধ্য হয়ে রমণীবাবুকে বাজারে যেতে হল। সেবেলা ওখানে আমার আহার সম্পন্ন হল এবং বিকেলবেলা আমাকে চট্টগ্রাম জেলে পাঠিয়ে দিলেন। চটগ্রাম জেলে একমাস থাকার পর ইংরেজী'র ১৯৩২ সালে জানুয়ারী মাসে আমাকে বহরমপুর ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

ইংরেজী'র ১৯৩৫ সালে প্রথমভাগে বহরমপুর ক্যাম্প থেকে হিজলী ক্যাম্পে বদলী'র সময় মুর্শিদাবাদ স্টেশনে ভোরে আমি হাবিলদারকে একটা 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' নেবার জন্য বলি। ডি. আই. বি-র একজন অফিসার তাকে বাধা দেওয়ায় উভয়ের মধ্যে ভীষণ তর্কবিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত তা মারামারিতে পরিণত হল। হাবিলদার ডি. আই. বি. অফিসারের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানল। আমি কিছুক্ষণ নীরব-দর্শকের ভূমিকা নিয়ে পরে ডি. আই. বি. অফিসারের নিকট গিয়ে তা থামিয়ে দিয়ে তাকে বললাম, 'আপনি আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারেন, কিন্তু বাধা দেওয়ার তো কোন অধিকার আপনার আছে বলে মনে হয় না। কেন মিছিমিছি এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে গেলেন?' কয়েক ঘণ্টা পরে আমাদের ট্রেন শিয়ালদহ এসে পৌঁছল।

শিয়ালদহ থেকে হাওড়া স্টেশনে আসার পর প্ল্যাটফর্মে যখন কয়েকজন লোকের সাথে আলাপ করছিলাম, তখন ডি. আই. বি. এবং হাবিলদার ট্রেনের ইনটার ক্লাশ কামরায় আমার জন্য একটা বেঞ্চে পুরোপুরি বিছানা পেতে রাখে। তখন জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে জায়গা না পেয়ে আমার বিছানাটা কিছু গুটিয়ে বসতে চেষ্টা করেন। ডি. আই. বি. অফিসার আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঐ ভদ্রলোককে গলাধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দিলেন। তখন ভদ্রলোক অপমানে ও ক্ষোভে দাঁড়িয়ে থেকে ছলছল নয়নে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে আমি গাড়ীতে

উঠতে গিয়ে প্রথমত ঐ ভদ্রলোকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কি আমাকে খুলে বলুন।' তিনি প্রথমত বলতে চাইলেন না। পরে ডি. আই. বি. অফিসার যখন আমাকে সম্পূর্ণ বেঞ্চে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়তে বললেন, আমি তখন ঐ ভদ্রলোকটির নিকট থেকে রেলওয়ে টাইম্ টেবিল নেওয়ার অজুহাতে টেনে নিয়ে তাকে আমার পার্শ্বে বসালাম এবং অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বলতে অনুরোধ করলাম। ঘটনা শুনে আমি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পেলাম এবং ডি. আই. বি. অফিসারকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে বললাম, 'কেন আপনি এরূপ অন্যায় কাজ করতে গেলেন? টিকেট হিসাবে আমার মাত্র একটা সীটে বসবার অধিকার আছে। আমি একটা বেঞ্চ অধিকার করতে পারি না। এই বেঞ্চে ঐ ভদ্রলোকও বসবার দাবী নিশ্চয় রাখেন। তাতে আপনার বাধা দেওয়ার কোন্ অধিকার আছে? আপনার ঐ ভদ্রলোকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে এই জঘন্য কাজের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেওয়া উচিত।' ট্রেনের কামরায় যাত্রিগণ আমার কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমি তাঁদের কাছে এ ব্যাপারে আমার আন্তরিক দুঃখ ও সমবেদনার কথা জানালাম এবং ডি. আই. বি. অফিসারকে খড়গপুর না পৌছান পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম এবং আরো বললাম, এই তাঁর প্রকৃষ্টতম শাস্তি হিসাবে যেন তিনি মেনে নেন। যথাসময়ে আমাদের ট্রেন খড়গপুর স্টেশনে পৌঁছল। পুলিশ আমাকে নিয়ে হিজলী ক্যাম্প অভিমুখে রওনা হল।

সংকল্পে দৃঢ় হও। স্বাধীনতাই তোমাদের দিনের চিন্তা ও রাত্রের স্বপ্নে পরিণত হউক। নরনারী-নির্বিশেষে ভারতের সন্তান-সন্ততিরা ভারতীয় জাতীয়তার বেদীমূলে সমবেত হউক। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধ্বনি নিয়ে তারা অবিরাম নিরলসভাবে এগিয়ে চলুক স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জীবনের লক্ষ্যের দিকে।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

বীর শহীদ মহেন্দ্র বিশ্বাস

অবিনাশ দত্ত

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০। ভারতের বিপ্লব ইতিহাসে একটি স্মরণীয়, বরণীয়, মহনীয় দিন—১৮ই এপ্রিল। ১৮ই এপ্রিলের রাত্রে অগ্নিমন্ত্রের উদ্গাতা, মহান্ সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের [মাষ্টারদা] সুযোগ্য নেতৃত্বে চট্টগ্রামের মরণপাগল যুবকদের সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত সশস্ত্র অভ্যুত্থান ভারতের পূর্বপ্রান্তকে অন্তত কয়েকদিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ শাসনমুক্ত করেছিল। ইংরাজ সরকারের ভীত, সন্ত্রস্ত সাদা ভি. আই. পি-র দল চট্টগ্রাম ছেড়ে অতি সুরক্ষিত অবস্থায় নিরাপদ দূরত্বে সমুদ্রের বুকে আশ্রয় নিয়েছিল। চট্টগ্রাম স্বাধীন। পূর্ব দিগন্তের জ্বলন্ত সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ইংরাজশাসন ঝলসে গেল এবং তার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় ভারতবাসী নতুন প্রেরণায়, নতুন উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হল। বৃটিশশাসকবর্গ দেওয়ালের লিখন সুস্পষ্ট দেখতে পেল।

২২শে এপ্রিল, ১৯৩০। ১৮ই এপ্রিলের অভ্যুত্থানের পর মাষ্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবীদল জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। এই সুযোগে অন্য জেলা হতে সৈন্যদল এসে হাজির হল এবং বিরাট বাহিনী বিপ্লবীদের চারিদিক থেকে আক্রমণ করল। এই অসম যুদ্ধে বিপ্লবীরা অতি সীমিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অসীম বীরত্বের সহিত মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন। ফলে, সেনাবাহিনী পিছু হঠে যেতে বাধ্য হল। বারজন বিপ্লবী বীর শহীদ হলেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী, বিনোদ চৌধুরী এবং বিনোদ দত্ত গুরুতরভাবে আহত হলেন। তাঁদের তাজা রক্তে জালালবাদ পূত, পবিত্র, ধন্য হল।

মাষ্টারদা অবশিষ্ট বিপ্লবীদের পরিচালিত করলেন গ্রামের দিকে। এর পর তিনি আত্মনিয়োগ করলেন নতুন রণকৌশলে ভবিষ্যৎ আক্রমণের কর্মসূচী রচনায়। পরবর্তী স্তরে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রয়োজন হল নিরাপদ আশ্রয়। গোপন বিপ্লবী আন্দোলন এবং সংগঠন মুখ্যতঃ যুবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মাষ্টারদা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণের মনে যুগসঞ্চিত তীব্র ঘৃণা আর পুঞ্জীভূত

আক্রোশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকটি মানুষ বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ। তাই জনগণের উপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। প্রয়োজনের সময় মাষ্টারদা এবং তাঁর বিপ্লবী বাহিনীর জন্য জনগণের সাহায্য, সহানুভূতি, আশ্রয়ের অভাব হয় নি এতটুকু, বরং, সাধারণের মধ্যে সাহায্যের প্রতিযোগিতাই চলেছিল। এইভাবে প্রতিটি বাড়ী, প্রতিটি গ্রাম বিপ্লবীদের সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়েছিল।

কধুরখীল গ্রামে গোপন আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন বিপ্লবীদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল। গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রামকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং এই দুই অংশের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্র এই গ্রাম। গ্রামের পরিবেশও ছিল আদর্শ আশ্রয়কেন্দ্রের উপযুক্ত। গ্রামের বুক চিরে একটি মূল রাস্তা। দুই ধারে ঘন বসতি। প্রত্যেকটি বাড়ীর সঙ্গেই গাছপালা ঘেরা বাগান। এই বাগানের মধ্য দিয়েই মূল রাস্তা এড়িয়ে গ্রামের এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্তে আসা যায়। বিপ্লবীদের বিশেষ নজর এ গ্রামের উপর। দেখতে দেখতে গ্রাম জুড়ে আশ্রয়ের জাল তৈরী হল, গ্রামের বিপ্লবী কর্মী সুবোধ চৌধুরী, মনোরঞ্জন চৌধুরী, হরিপদ চৌধুরী, অবিনাশ দত্ত এবং এই গ্রামে পার্টি-প্রেরিত কর্মী তেজেন দত্ত, রমণী নন্দী, বটস্তী ধর এবং সুকুমার চক্রবর্তীর সহায়তায়। গোপন মূলকেন্দ্র মহেন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ী হল মাষ্টারদার আশ্রয়স্থল। প্রথম থেকেই অতি গোপনীয় এবং নির্ভরশীল নিরাপদ আশ্রয় ছিল দ্বারিকা চৌধুরীর বাড়ী। যাতায়াতের পথে সাময়িক অবস্থানের জন্য তারাচরণ দত্তের বাড়ী।

মহেন্দ্র বিশ্বাস গ্রামের বর্ধিষ্ণু তালুকদার। বহু জমির মালিক, বাড়ী সংলগ্ন বিরাট বাগান। তেজারতি ব্যবসাও আছে। তিন ভাই-এর বিরাট যৌথ পরিবার। অর্থে-বিত্তে, মান-মর্যাদায়, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে মহেন্দ্রবাবু এক সুখী স্বচ্ছল পরিবারের মুখ্যপ্রধান। তিনি পাড়ার মোড়ল। তাঁকে ছাড়া কোন শালিসী হয় না। অত্যন্ত রাশভারী লোক। পাড়ার যুবকেরা তাঁকে ভয় করত এবং এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতেন—দলের কাজ কি রকম চলছে এবং সাবধানে চলার জন্য হুঁসিয়ার করে দিতেন। এই লোকটাকে বুঝে উঠা খুবই কঠিন। গ্রামে গ্রামে মোড়লরাই ছিল ইংরাজ সরকারের স্বার্থরক্ষক, আইন-শৃঙ্খলার মালিক এবং প্রায়শই অত্যাচারী খয়ের খাঁ।

মাষ্টারদাকে প্রায়ই এই গ্রাম পার হতে হয়। এক রাত্রে সঙ্গী নির্মল সেন ও নির্মলকান্তি দত্ত সহ গ্রামের পথে হঠাৎ টহলদার মিলিটারী দলের সামনে পড়ে যান। চকিতে গতিপথ বদলে কিছুদূর গিয়ে মহেন্দ্রবাবুর গোয়াল ঘরে আশ্রয় নেন। রাতও প্রায় শেষ। ভোররাত্রে বাড়ীর চাষী গিরীশ ধূপী হালের গরু বের করার জন্যে গোয়ালে ঢুকেই অপরিচিত লোক দেখে আঁৎকে উঠে। মাষ্টারদা অতি সহজ স্বাভাবিকভাবেই বলেন— বাড়ীর কর্তার সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে, তাঁকে যেন ডেকে দেওয়া হয়। গিরীশ বিমূঢ় অবস্থায় বাড়ীর ভিতরে চলে যায় এবং মহেন্দ্রবাবুকে ডেকে নিয়ে আসে। মাষ্টারদা নিজের পরিচয় দিয়ে একদিনের জন্য আশ্রয়ের প্রস্তাব করেন। মহেন্দ্রবাবু স্থির নির্বিকার মাষ্টারদা এবং তাঁর সঙ্গীদের সাদরে বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং প্রাতরাশের ব্যবস্থা করেন। তারপর চলে বিস্তারিত আলোচনা। মহেন্দ্রবাবু অবশেষে তাঁর বহুবাঞ্ছিত একমাত্র কামনার ধনের দর্শন পেলেন যেন। এতদিন কি মাষ্টারদার পথ চেয়েই বসে ছিলেন? তিনি তাঁর বাড়ীকে মাষ্টারদার স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র করার প্রস্তাব দিলেন। মহেন্দ্রবাবু আজ সর্বমুক্ত হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর দুই ছেলেকে মাষ্টারদার হাতে সমর্পণ করলেন দেশসেবার জন্যে। তিনি বোধ হয় জানতেন না যে, বড় ছেলে সুরেশ বিশ্বাস ইতিপূর্বেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। কনিষ্ঠ ছেলে বিমল অতি ছোট। মহেন্দ্রবাবু সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব ছোট ভাই ক্ষেত্র বিশ্বাসের উপর অর্পণ করে নিজেকে সর্বক্ষণের জন্য বিপ্লবীদের সেবায় নিয়োজিত করলেন। দিনরাত পাহারার ভার নিলেন তিনি নিজে এবং ছোট ভাই সুরেন বিশ্বাস পালা করে। তিনি বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে বিপ্লবীদের পরিচর্যার দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। গিরীশ ধূপীর উপর বাইরের সমস্ত খবরাখবর জোগাড় করার ভার পড়ল। মহেন্দ্রবাবু বিপ্লবীদের কাছে "কাকাবাবু" নামে পরিচিত হলেন।

ঘন ঝোপ ঝাড় বেষ্টিত সুপারী বাগানে নেতৃস্থানীয়দের গোপন বৈঠক এবং বাছাই বিপ্লবীদের মহড়ার কাজ নিয়মিত চলত। এই আশ্রয়ে নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী এবং এ্যাকশনের জন্য বাছাই বিপ্লবীদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। বাড়ী এবং বাগানের মাঝে ছিল গভীর জলপূর্ণ গড়। এই গড়গুলি বিপ্লবীদের বাধা না হয়ে সহায়কই হয়েছিল। গড়গুলি সারাবৎসর জলে

ভর্তি থাকত এবং একপ্রকারের সরষেপ্রমাণ হাল্কা সবুজ ক্ষুদে পানা গড়গুলি ছেয়ে থাকত। কাকাবাবু গড়ের বিভিন্ন জায়গায় হাঁটু জলের নীচে বাঁশের সাঁকো তৈরী করে দিলেন। তা কেবল বিপ্লবীদেরই জানা ছিল। গড পেরিয়ে গেলে পানাগুলি সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পর মিশে যেত কোন চিহ্ন না রেখে। বাইরে থেকে অন্য কারো বোঝার উপায় থাকত না। কাকাবাবুর মাথায় নিত্য-নতুন পরিকল্পনা। একবার স্থির করেন, বাগান থেকে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে নিরাপদ দূরত্ব পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজেই পাড়ায় কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্র এবং যোগাযোগ কেন্দ্র জোগাড় করেন। মাষ্টারদা এই আশ্রয়ে বসে কত পরিকল্পনা রচনা করেছেন এবং রূপায়ণের ব্যবস্থা করেছেন, তা আজ আর কেউ বলতে পারবে না। এই গ্রামের দ্বারিকা চৌধুরীর বাড়ী হতে হরিপদ ভট্টাচার্য আসানুল্লা হত্যার জন্য তৈরী হয়ে যাত্রা করেন।

মাষ্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের গ্রেপ্তারের পর এই আশ্রয়ে আসেন বিনোদ দত্ত দলের নেতৃত্ব নিয়ে। কাকাবাবুর প্রথম জিজ্ঞাসা— মাষ্টারদার পর কে দলের নেতৃত্ব নিলেন। হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মুহূর্তের জন্য বিনোদবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। যখন সঙ্গীরা বিনোদবাবুকে দেখিয়ে বললেন, পরিদা'ই [বিনোদবাবুর সাংকেতিক নাম] দলের নেতৃপদে মনোনীত হয়েছেন, কাকাবাবু তাঁকে একে একে বাড়ীর এবং বাগানের অন্ধিসন্ধি সবই বুঝিয়ে দিলেন। বিনোদবাবু তাঁর আগের মুহূর্তের দ্বিধার জন্য লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন।

বিনোদবাবুর কাছে জানা যায়, এই আশ্রয় পরবর্তীকালে মূল কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং কাকাবাবুর বাগান ছিল সমস্ত কর্মের প্রাণকেন্দ্র। এই আশ্রয়ে বসেই বিনোদবাবু বহু পরিকল্পনা রচনা করেন। নেত্র সেন হত্যা, পাহাড়তলী ক্রিকেট মাঠে আক্রমণ এবং ক্লিয়ারী হত্যার পরিকল্পনা ও চুড়ান্ত মহড়া এই আশ্রয়েই সম্পূর্ণ হয়।

কাকাবাবুর দৃষ্টি ছিল সদাজাগ্রত। তিনি দিনের বেলায় গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করতেন এবং জনগণের মনোভাব লক্ষ্য করতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর দ্বৈত ভূমিকার দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

কর্ণফুলীর ঘাটে কাকাবাবুর পরামর্শে বিপ্লবীদের নদী পারাপার করবার জন্য একজন মুসলমান মাঝিকে নিযুক্ত করা হয়। সে নিয়মিত নিষ্ঠার

তার কাজ করছিল। কাকাবাবু একদিন গ্রামের কর্মী মনোরঞ্জন চৌধুরী মারফৎ মাঝিকে খবর দিয়ে বিনোদবাবুর অন্যত্র যাবার ব্যবস্থা করেন। পরদিন তিনি মাঝির সঙ্গে দেখা করে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন, "কি হে, শুনলাম, কাল নাকি সাম্পানে করে অপরিচিত লোক পার করেছিস?" গ্রামের মোড়লের কাছে মিথ্যা জবাবে কোন ফল হবে না জেনে মাঝি বলে, "হ্যাঁ বাবু! কাল লোক পার করেছি। কিন্তু পুলিসের লোক কি স্বদেশী, তা তো জানি না।" তিনি তখন মাঝিকে সতর্ক করেন, "যাই করিস, কাউকে বলিস তো নিজেও মরবি, গ্রামেরও বিপদ হবে। এ সব নিয়ে গল্প করবি না।" মাঝি কাতরভাবে বলে, "না বাবু, খোদার কসম্, আমি কাউকে বলব না, আপনিও কাউকে বলবেন না।"

কাকাবাবু আর একবার খবর পেলেন, পাড়া ঘেরাও করে তল্লাসী হবে। তিনি বিনোদবাবুর নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গ্রামেই বিনোদবাবুর এক আত্মীয় রাজকুমার মহাজনের সঙ্গে দেখা করে বিনোদ বাবুকে দু'একদিন আশ্রয় দেবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব শুনেই রাজকুমার বাবু ভয়ে আড়ষ্ট। অবস্থা বুঝেই কাকাবাবু তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "ভয়ের কিছুই নেই। আমি শুধু তোমায় পরীক্ষা করছিলাম। জানত বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অজুহাতে মিলিটারী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাচ্ছে। বিনোদ দত্ত তোমার আত্মীয় বলে শুনেছি। ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেও না, তা হলে নিজেও মরবে, গ্রামটাও ধ্বংস হবে।" ফিরে এসেই বাগানের শেষ প্রান্তে বিনোদবাবুর থাকার ব্যবস্থা করে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করলেন।

একদিন ঘরের মধ্যে বিপ্লবীরা রিভলভার ঠিক করার সময় হঠাৎ একটি গুলী ছুটে পাশের টেবিলে বসা কাকাবাবুর কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা টেবিলে রাখেন। বিনোদবাবু বিপদের আশঙ্কায় কাকাবাবুর পাশে আসতেই তিনি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেন, "কোন বিপদ হয় নি তো?" তিনি বিনোদবাবুদের সব ঠিক করে রাখার পরামর্শ দিয়ে বললেন, "আমি একটু ঘুরে আসি, আশে পাশে কেউ আছে কিনা দেখি।"

এইভাবে ১৯৩০ সাল থেকে একটানা সাত বছর তিনি বিপ্লবীদের সেবা করে গেছেন। কাউকে এতটুকু অসুবিধা বা অস্বস্তি বোধ করার অবকাশ দেন নি।

বিপ্লবীদের আনাগোনা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে এই বাড়ী বেশ কিছুকাল ধরে পুলিশের নজরে পড়েছিল। কিন্তু গ্রাম্য মোড়লের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ বা প্রমাণ ব্যতিরেকে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষ হয়তো বা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। অবশ্য কয়েকবার তল্লাসী হয়। প্রতিবারই বিপ্লবীরা পুলিশ মিলিটারীর পাশ কাটিয়ে নিরাপদে সরে গেছেন। তল্লাসীর সময় পাশের বাড়ীর সন্দেহভাজন যুবকদেরও টেনে আনা হত এবং সবাইকে বাইরে দাঁড করিয়ে অমানুষিক প্রহার করা হত। একবার জাঠ সৈন্যরা তল্লাসী চালাচ্ছিল। বিছানার তলায় ছিল প্রচুর কার্তুজ এবং অস্ত্রাগার থেকে পাওয়া একটি তরোয়াল। তোষক টান দিতেই তরোয়ালটি বেরিয়ে পড়ে। একজন জাঠ সৈন্য অফিসারের অজ্ঞাতসারে তরোয়ালটি পাশের পুকুরের জলে নিক্ষেপ করে এবং বিছানাটি সাবধানে গুটিয়ে এক পাশে রেখে দেয়।

বিভিন্ন গোপন আশ্রয়কেন্দ্র হতে নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা একে একে ধরা পড়লেন। বিপ্লবীদের গতিবিধির খবর প্রায় ক্ষেত্রেই আগেভাগেই পুলিশের গোচরে আসছিল। দলের মধ্যে যারা দুর্বলচিত্ত এবং যাদের গতিবিধি অস্বাভাবিক মনে হতো, বিপ্লবীরা তাদের প্রতি নজর রাখলেন। এইভাবে পরেশ গুপ্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হল এবং তাকে হত্যা না করে চিরজীবনের মত পঙ্গু করে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং পরেশ গুপ্তকে মারাত্মকভাবে জখম করা হল। পরেশ গুপ্তকে আক্রমণের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং আক্রমণে অংশ গ্রহণের অজুহাতে নবাব মিঞা, তেজেন্দ্র দত্ত, অমূল্য আচার্য, বিমলেন্দু সেন প্রমুখ এবং কধুরখীল গ্রামের অবিনাশ দত্ত ও কাকাবাবুর ছোট ছেলে বিমল বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। কাকাবাবুর উপর কর্তৃপক্ষের আক্রোশ বহুদিনের। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক খবরই পুলিশের কাছে ছিল। এবার পুলিশ সে সুযোগ নিল। সন্দেহের অজুহাতে বিমলের সহিত কাকাবাবুকেও গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম জেলে আনা হল, ১৯৩৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সরস্বতী পূজার দিন।

মাষ্টারদার শেষ প্রয়াণের স্থান চট্টগ্রাম জেল কাকাবাবুর তীর্থস্থান। মাষ্টারদাকে শেষ প্রণাম জানিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, জেলের মধ্যে কোন খাদ্য তিনি স্পর্শ করবেন না। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি যে সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন

তাতে অচিরেই তাঁর মৃত্যু অবধারিত। তাঁকে জামিনে খালাস করার, এমন কি, নগদ অর্থ জমা দিয়েও জামিনের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে অনশনের সঙ্কল্প হতে বিরত থাকার জন্য কাতর মিনতি জানালেন। কিন্তু কোন ফল হল না। কাকাবাবু সঙ্কল্পে অটল। তিনি তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। সতের দিন পরে ১৯৩৭ সালের ৫ই মার্চ শুক্রবার তাঁর সমস্ত কাজকে পেছনে ফেলে রেখে অনশনরত অবস্থায় কাকাবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং মাষ্টারদার একান্ত কামনা "স্বাধীনতা-সংগ্রামে শহীদ হও"—সার্থক করে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

মহান্ বিপ্লবী যতীনদাস বৃটিশশাসনের প্রতিবাদে জেলের মধ্যে ৬২ দিন অনশনের পর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। বৃদ্ধ মহেন্দ্র বিশ্বাসও সেই অটুট সঙ্কল্প এবং আপোষহীন সংগ্রামেব মহান্ আদর্শকে অম্লান রেখে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উত্তরসাধকদের জন্য রেখে গেলেন।

পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো ভাই—
সবারে আমি প্রণাম করে যাই॥
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি, রাখি না আর ঘরের দাবি—
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই॥
অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি, নিবিয়া গেল কোণের বাতি—
পড়েছে ডাক, চলেছি আমি তাই॥

রবীন্দ্রনাথ

স্বাধীন বাংলাদেশে

জালালাবাদ বিপ্লবতীর্থে প্রথম শহীদ-স্মৃতিতর্পণ

শ্রীতেজেন্দ্রনাথ গুহ [চট্টগ্রাম]

কলিকাতা হইতে যাঁহারা জালালাবাদ শহীদতীর্থে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে নন্দনকানন বোস ব্রাদার্সের উপরের তলায়। প্রতিদিন বিকালে অফিসের ফিরতি পথে সেইখানে আসিয়া সকলের খবর লইতাম। ২১শে এপ্রিল রাত্রে প্রথমে সুশীলদার [মাষ্টারদার সহকর্মী শ্রীসুশীল দে] সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আগরতলা হইতে আসিয়াছেন। তিনি দীর্ঘদিন পরে আমাকে দেখামাত্রই জড়াইয়া ধরেন। ঐ দিন রাত্রে ও দিনে কলিকাতা, আগরতলা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি নানা জায়গা হইতে সকলে আসিয়া সমবেত হইতে থাকেন। এই ব্যাপারে সারদাদা [শ্রীসারদা শীল], বিনোদদা [জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক শ্রীবিনোদ চৌধুরী] এবং প্রভাতদা [শ্রীপ্রভাত রক্ষিত] প্রমুখ মাষ্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতাম।

সর্বশ্রী অর্ধেন্দু দত্ত, বিনোদ দত্ত, দ্বিজেন দস্তিদার, শচীন সেন, সুধীন দাশ, বিজয় সেন, বিজয় আইচ, ব্রজেন সেন, অর্ধেন্দু গুহ, মধু গুহ, সরোজ গুহ, সুবোধ বল, নরেন্দ্র দত্ত, হেমেন্দু দস্তিদার, বনবিহারী দত্ত, আশু দে, কাশীশ্বর দত্ত, রটন্তী ধর, দীনেশ দাশগুপ্ত, কালী দে, কালিপদ চক্রবর্তী, মতিলাল চক্রবর্তী, সুরঞ্জিতা চক্রবর্তী, চিত্ত দাস [কলিকাতার সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক] শশধর চক্রবর্তী, সাধনপ্রসাদ দত্ত, হরিপদ কানুনগো, দিলীপ কানুনগো [কলিকাতার চট্টগ্রাম পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য] এবং অনিল গুহ প্রমুখ মাষ্টারদা সূর্য সেনের বহু সহকর্মী ও অনুরাগীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। এই মিলন চট্টগ্রামবাসীর হারানো দিনের এক পরম শুভলগ্ন বলিয়া আমার মনে হয়। কেহ কোন মতেই ভাবিতে

পারেন নাই, এমন একটি শুভ দিন প্রত্যেকের জীবনে ঘুরিয়া আসিয়া জীবন-পরিক্রমায় একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজন করিবে।

শুভ ২২শে এপ্রিল। সকাল প্রায় ৭-৩০ টার দিকে নন্দনকানন বোস ব্রাদার্সের সম্মুখে হাজির হইলাম। দেখিলাম, দুইটা বিরাট বাস আর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে অনেকগুলি ট্যাক্সি। ক্রমে ক্রমে সকলে সমবেত হইতে লাগিলেন। সকলের পরিধানে শুচিশুভ্র পোষাক আর অনেকেরই হাতে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক। ...একটু পরে শ্রীঅমূল্য চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হইল সেইখানে। মনের চাঞ্চল্য আর গতিবেগ বাড়িয়া গেল। জীবনে হয়ত বহু শহীদের রক্তসিঞ্চিত এই পবিত্র শহীদবেদী দেখিবার সুযোগ নাও হইতে পারে। তাই এই বাসনা পূরণ করিবার মানসে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিলাম। এইবার যাত্রা সুরু।

সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। ৮-৩০ টায় গাড়ী ছাড়িল। সারিবদ্ধভাবে গাড়ী চলিল। নন্দনকাননের পার্শ্ব দিয়া ডেপুটি কমিশনারের পাহাড়ের পাদদেশস্থ রাস্তা ধরিয়া গাড়ী চলিল। ৮-৩৫ মিনিটে গাড়ী আসিয়া থামিল দামপাড়াস্থ সারকিট হাউসের সামনে। এই রাস্তা দিয়া যাইবার সময় বুক কাঁপিয়া উঠিল। গত বৎসর এই দিনে এই সারকিট হাউসের আশে-পাশে কত নরনারী গণকবরে শায়িত হইয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই। ধ্বংসের বহু ক্ষতচিহ্ন এখনও বিরাজমান। মন্ত্রিদ্বয় ফণিভূষণ মজুমদার ও জহুর আহমদ চৌধুরী সাহেব স্ব স্ব গাড়ীতে সপারিষদ আমাদের শরিক হইলেন। ঐখান হইতেও কয়েকখানি ট্যাক্সি আমাদের অনুসরণ করিয়া চলিল। দৃশ্যটা খুবই মনোরম। দেখিলেই মনে হয়, নীরবে, নিস্তব্ধ গাড়ীর শোভাযাত্রা চলিয়াছে। রাস্তার উভয় দিকে কত ধ্বংসচিহ্ন এখনও বিরাজমান। দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কলিকাতা হইতে আসিয়া এত দীর্ঘ পরিক্রমায় বাহির হই নাই। একটু পরেই চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কাছে আসিলাম। বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। স্মৃতির দর্পণে অনেক কথা ও কাহিনী আসিয়া অন্তর ভারাক্রান্ত করিল। অশ্রুসিক্ত হইল নয়নদ্বয়।

ঠিক ৯টায় আমরা উপস্থিত হইলাম জালালাবাদ পাহাড়ের পুণ্য পাদদেশে। সুরু হইল পদযাত্রা। পাহাড়িয়া পথ ধরিয়া আঁকা-বাঁকা পথ-পরিক্রমায় সারিবদ্ধভাবে উঠিতে লাগিলাম। আনন্দে, গর্বে বুক স্ফীত

হইয়া উঠিল। সারিবদ্ধ লোকযাত্রা দেখিতে খুবই আনন্দ লাগিল। ছোট ছোট ঘাস আর বালুকণা বিয়াল্লিশ বৎসরের স্মৃতিচারণায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। প্রভাতসূর্য আজ যেন নূতনভাবে কিরণদানে উন্মুখ। মৃদু সমীরণ অতীতের কথা বলিয়া যাইতেছে প্রতি জনমনে।

সেই পুণ্যভূমিতে উঠিলাম ৯-১০ মিনিটে। বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম শহীদবেদীতে। আস্তে আস্তে সকলে আসিয়া সেইখানে সমবেত হইলেন। অন্ততঃ পাঁচশতাধিক লোকের সমাবেশ হইল সেই পুণ্যতীর্থের পূত-পবিত্র ভূমিতে। আলোকচিত্র তুলিবার হিড়িক পড়িয়া গেল। শ্রীদিলীপ কানুনগো-র সঙ্গে সেইখানেই দেখা হইয়া গেল। তিনিও অনেক আলোকচিত্র তুলিয়াছেন।

এইবার মাল্যদানের পালা। বারজন শহীদের নামাঙ্কিত স্মৃতিফলক মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল। বিনোদদা, পুলিনদা [মাষ্টারদার সহকর্মী শ্রীপুলিন দে] এবং বিদেশাগত বিপ্লবীবৃন্দ নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া সুন্দরভাবে কার্যসমাপনে অগ্রণী হইলেন। প্রথমেই মাল্যদান করিয়া পুণ্যভূমির শহীদ-বেদীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে শ্রীফণিভূষণ মজুমদার। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে গৌরবদীপ্ত সংগ্রামের রোমাঞ্চকর ইতিহাস ভাবগম্ভীর পরিবেশে আলোচনা করেন। তারপর বিপ্লবী অতিথিবৃন্দ একে একে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন বেদীমূলে, শহীদ বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে, অশ্রুসিক্ত নয়নে। কলিকাতার চট্টগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন শ্রীদুলাল ভট্টাচার্য। উপস্থিত জনসমক্ষে বিপ্লবী অতিথিবৃন্দকে একে একে পরিচয় করাইয়া দেন জালালাবাদ যুদ্ধের বীর সৈনিক শ্রীদ্বিজেন দস্তিদার [শঙ্কু]। লোকাদার [জালালাবাদ যুদ্ধের অধিনায়ক লোকনাথ বল] পত্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রতিমা বল শহীদবেদীতে মাল্যদান করিয়া কান্নায় ফাটিয়া পড়েন। তাঁহার পুত্র শ্রীহিমাদ্রি বল তীর্থভূমির বেদীমূলে মাল্যদান করিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যে প্রতিটি লোকের নয়নদ্বয় সিক্ত হইয়া উঠে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ চড়াই-পথ দিয়া কীভাবে ব্রিটিশ সৈন্য আসিয়াছিল, কীভাবে যুদ্ধ হইয়াছিল, প্রথম শহীদের মৃত্যুবরণ কে কোথায় করিয়াছিলেন, সেইগুলির প্রত্যেকটির বিস্তৃত বিবরণী দিলেন মাষ্টারদার সহকর্মী শ্রীঅর্ধেন্দু গুহ।

পুষ্পমাল্যে আর পুষ্পার্ঘে শহীদবেদী অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পস্তবকে বেদীমূল রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া যে মহিমময় দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বের শহীদদের সেই তাজা রক্ত আজও যেন আমাদের মানসপটে সজীবতার প্রাণস্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আসন্ন বিদায়ে শ্রদ্ধানত অন্তরে মৌন শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধীরে ধীরে পুণ্যভূমি জালালাবাদের পবিত্রতম শহীদবেদী পশ্চাতে রাখিয়া নামিয়া আসিলাম।......

বিকাল ৪টায় লালদীঘির ঐতিহাসিক ময়দানে [মুজিব পার্ক] সভা আরম্ভ হইল। সভাপতি মন্ত্রিবর শ্রীফণিভূষণ মজুমদার, প্রধান অতিথি আল্‌হজ্ব জহুর আহমদ চৌধুরী [মন্ত্রী]। বিরাট সুদৃশ্য মঞ্চের উপরে বিদেশাগত বিপ্লবী অতিথিবৃন্দ উপবেশন করেন। অনেক বিপ্লবী বক্তা অতীতের কথা ও কাহিনী এবং বর্তমান সংগ্রামের সাফল্যের উপর নির্ভর করিয়া মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। দেশ-বিদেশ হইতে অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া অনেকেই বাণী প্রেরণ করেন। সম্পাদক শ্রীবিনোদ চৌধুরী তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণ সমাপনান্তে সর্বজনসমক্ষে ঐ বাণীগুলি পাঠ করিয়া শুনান। প্রধান অতিথি তাঁহার হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ ভাষণের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁহার শুভেচ্ছাবাণীতে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়া শহীদ-স্মৃতিমিনার তৈয়ার করাইয়া নিজেই আসিয়া উহা স্থাপন করিবেন। কলিকাতার চট্টগ্রাম পরিষদ হইতে প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীও বিনোদদা পাঠ করিয়া সকলকে শুনান। দলমত নির্বিশেষে অনেকেই মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রি ১০টায় সভার কাজ শেষ হয়।

তৎপর কবিগানের আসর বসে। পল্লীকবি শ্রীরায়মোহন দাশ [ধোরলা] এবং শ্রীফণিভূষণ বড়ুয়া [বেতাগী]—উভয়েই যথাক্রমে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়বস্তু অবলম্বনে মনোজ্ঞ কবিগানের মাধ্যমে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হন। বিশেষতঃ বিদেশাগত বিপ্লবী অতিথিবৃন্দ তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাত্রি ১২টার সময় জালালাবাদ সম্মেলনের সুশৃঙ্খল অনুসরণী সমাপ্ত হয়। [২৩শে এপ্রিল, ১৯৭২].

চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতি

মহেন্দ্রলাল বড়ুয়া

বিপ্লবী বন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির সংগঠন সম্বন্ধে লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। অনুশীলন সমিতির চট্টগ্রাম শাখার নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রবীণ বিপ্লবী চন্দ্রশেখর দে, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, চারুবিকাশ দত্ত, প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত, যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী আজ জীবিত নাই। বাস্তবিকপক্ষে চারুবিকাশ দত্ত অনুশীলন সমিতিকে চট্টগ্রামে জীবন্ত রাখিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অবর্তমানে এই ইতিহাস কেহ লিপিবদ্ধ করিলেও হয়ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

১৯০২ সালের ২৪শে মার্চ দোলপূর্ণিমার দিন [বাং ১০ই চৈত্র, ১৩০৮] সোমবার ব্যারিষ্টার পি. মিত্র [প্রমথনাথ মিত্র] মহাশয়ের নেতৃত্বে বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতি কলিকাতায় প্রথম স্থাপিত হয়। কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে অনুশীলন সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ববঙ্গে উহার প্রসার বৃদ্ধির উদ্দেশ্য পি. মিত্র মহাশয় ঢাকা যান। ১৯০৫ সালে পুলিন দাস মিত্র মহাশয়ের নিকট বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে পুলিন দাসের উপর পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে সমিতির বৈপ্লবিক শাখা গঠন করার ভার অর্পিত হয়। ১৯০৬-১৯০৮ সালে বিভিন্ন স্থানে পুলিনবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির প্রায় পাঁচশত শাখা সমিতি বিদ্যমান ছিল। ইহাতে অনুমেয়, ১৯০৬-১৯১০ সালের মধ্যবর্তী কোন সময় চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির পত্তন হইয়াছিল। অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত নায়ক বিপ্লবসাধক ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী [মহারাজ] তাঁহার প্রণীত 'তিরিশ বছর জেলে' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৯১০ ইং তিনি প্রথম চট্টগ্রাম যান।

অতীত দিনের কাহিনী বিপ্লবী সতীর্থদের সহিত আলাপ-আলোচনায় যাহা শুনিয়াছি, স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া অগ্নিযুগের সেই পুরাতন ইতিহাসকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। মহারাজের 'তিরিশ বছর জেলে' ও চারুবিকাশ দত্ত মহাশয়ের প্রণীত 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' বই-এরও

সাহায্য নিয়াছি। আমি অনুশীলন সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম বলিয়া আমার জীবনের অনেক ঘটনাও এই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে।

১৯০৫-১৯২০ সাল। বাংলার বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সরকারকে আঘাত হানিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু জাপান যান, তারকনাথ দাস আমেরিকা ও ভূপতি মজুমদার যান সিঙ্গাপুর। বাংলার বিপ্লবীরা আত্মপ্রকাশ করিতেছিলেন কখনও মজঃফরপুরে, কখনও কলিকাতায়, কখনও ঢাকায়। ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিলেন শহীদ ক্ষুদিরাম, কানাই ও সত্যেন। বহুসংখ্যক বিপ্লবী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় কঠোর শাস্তি পাইয়া ভারতের বিভিন্ন জেলে ও আন্দামান সেলুলার জেলে কারারুদ্ধ হইলেন। এই সময় ১৯১৪ সালে কলিকাতায় রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলায় অমৃত হাজরা প্রমুখ ১০।১২ জন বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের চন্দ্রশেখর দে।

সমাজের অবাঞ্ছিত এবং চরিত্রহীন লোককেও বিপ্লবীরা ক্ষমা করেন নাই। চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডের মোহান্ত চরিত্রহীন বলিয়া কুখ্যাত ছিল। সম্ভবত ১৯১১ সালে বিপ্লবীরা তাহাকে হত্যা করেন। একদিন মোহান্ত সীতাকুণ্ডের রাস্তায় পরিভ্রমণ করার সময় চন্দ্রশেখর দে তাহাকে গুলী করেন। সঙ্গে ছিলেন মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। মহারাজের তখন দাড়িগোঁফ ছিল। তাই সহসা প্রচার হইয়া পড়িল একজন দাড়িগোঁফওয়ালা লোক মোহান্তকে হত্যা করিয়াছে। যাহা হউক, পুলিশ তাঁহাদের কোন হদিস্ পায় নাই।

পরবর্তীকালে সমাজ-সংস্কারের প্রতি বিপ্লবীরা বিশেষ নজর দিতে পারেন নাই। মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করা হইল বিপ্লবীদের দৃঢ় পণ। তাই বিপ্লবী নেতারা পূর্ণ উদ্যমে বিপ্লব প্রতিষ্ঠান গঠন ও বিপ্লবের পটভূমি তৈরী করিতে মনোনিবেশ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী অনুশীলন সমিতি ও আমেরিকার গদর পার্টির সহযোগিতায় ভারতের সর্বত্র রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ও স্বাধীনতা-ঘোষণার দিন ধার্য হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ অভ্যুত্থানের সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ে; কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সিঙ্গাপুরের বীর সিপাহীগণ ২১শে ফেব্রুয়ারী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারতীয় সৈন্যগণ ইংরাজ সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া দুই সপ্তাহ সিঙ্গাপুর শহর দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৯২১ সাল। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়াছেন। সমগ্র ভারতের জনসাধারণ এই আন্দোলনে সাড়া দিলেন, চট্টগ্রামও পিছাইয়া রহিল না। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম বার্মা অয়েল কোম্পানীর ধর্মঘট হইল। ২৪শে মে তাঁহার পরিচালনায় বিখ্যাত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট শুরু হইল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা কংগ্রেসের এই আন্দোলনে যোগদান করিবেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মুক্তি-সংগ্রাম আগাইয়া যাইবে এবং এই পথেই স্বাধীনতার বীর সৈনিক সৃষ্টি হইবে। ইতিমধ্যে চারুদা এবং মাষ্টারদা কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। কলেজে-স্কুলে ধর্মঘট আরম্ভ হইল। প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী শুরুতেই পথ দেখাইলেন। ক্রমশঃ শহর হইতে গ্রামের স্কুলে ধর্মঘট ছড়াইয়া পড়িল। এই আন্দোলন চলার পথে যশোদা চক্রবর্তী ও দ্বিজেন্দ্র নন্দী বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্ত হইয়াছে। তরুণ কর্মীরা আবার স্কুল কলেজে পড়া আরম্ভ করিয়াছে। সতর্ক গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া তাহারা ভাবী সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য কর্মী-সংগ্রহে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এইবার বিপ্লবীদের যাত্রাপথে নামিয়া আসিল 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'। ১৯২৪ সালের শেষভাগে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাশী ও ধরপাকড় আরম্ভ হইল। অনুশীলন সমিতির প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত, যশোদা চক্রবর্তী, ডাঃ যোগেশ দে, রমণী শর্মা, অনিল গুহ ও যুগান্তর দলের লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ বিপ্লবীরা ধৃত হইলেন। কিন্তু চট্টগ্রামের যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীযদের মধ্যে সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অনুশীলন দলের চট্টগ্রাম শাখার নেতা চারুবিকাশ দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারিল না।

এই সময় চট্টগ্রামের অনুশীলন ও যুগান্তরের বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে মিলন ঘটে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম নেতা নির্মল সেন ও অনুশীলন দলের একনিষ্ঠ কর্মী আলিপুর জেলে গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত প্রমোদ চৌধুরী। চট্টগ্রামে গড়িয়া উঠিল নূতন এক বিপ্লবী সংস্থা।

চট্টগ্রাম হইতে বাঁকুড়া পর্যন্ত বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় তরুণ কর্মীদের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইল। বাংলার বাহিরে অনুশীলন সমিতির নেতা

শচীন সান্যাল, গোবিন্দ কর, যোগেশ চ্যাটার্জী, রাজেন লাহিড়ী প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হইল। গঠিত হইল শচীন সান্যালের নেতৃত্বে এক নূতন দল। সভাপতি হইলেন শচীন সান্যাল এবং অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রাজেন লাহিড়ী, সূর্য সেন, চারুবিকাশ দত্ত, নগেন সেন, হরিনারায়ণ চন্দ্র, অনন্তহরি মিত্র, অনন্ত চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন। চট্টগ্রামকে নিয়া বাংলা ও আসামের দশটি জেলায় একই সঙ্গে বৃটিশ সরকারের অস্ত্রাগার আক্রমণ, শক্তিকেন্দ্রগুলিকে দখল করা ইত্যাদি কর্মপন্থা সম্মুখে রাখিয়া নবগঠিত দল কাজ সুরু করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ শচীন সান্যাল বেশীদিন বাহিরে থাকিতে পারিলেন না। ইহা ছাড়া যুক্ত প্রদেশ হইতে কলিকাতা আসিবার পথে যোগেশ চ্যাটার্জীর গ্রেপ্তার, কাকোরী ষড়যন্ত্রের আবিষ্কার নবগঠিত দলের কর্মীদের পথে বিঘ্ন ঘটাইল। এতদ্ব্যতীত নগেন সেন এবং চারুবিকাশ দত্তের গ্রেপ্তারও এই সময় তাঁহাদের পক্ষে প্রচুর ক্ষতি হইল। বাহিরে রহিলেন একমাত্র সূর্য সেন।

দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজারের নিভৃত গৃহে বোমা তৈরী হইতেছে। হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বরের বোমার কারখানায় ও শোভাবাজারের আস্তানায় আসিয়া পড়িল পুলিশ। দক্ষিণেশ্বরে হরিনারায়ণ চন্দ্র, রাজেন লাহিড়ী, রাখাল দে, অনন্তহরি মিত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। শোভাবাজার আস্তানায় ছিলেন মাষ্টারদা সূর্য সেন, চট্টগ্রামের প্রমোদ চৌধুরী ও বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ কর্মিগণ। প্রমোদরঞ্জন মাষ্টারদাকে গৃহের পশ্চাতের জল-নিষ্কাশনের পাইপ ধরিয়া নামিয়া যাইবার কথা বলিয়াই রুদ্ধগৃহের দরজা সজোরে ঠেলিয়া ধরিলেন। সঙ্গে অনন্ত চক্রবর্তী। কিছুক্ষণ ধরিয়া দরজা খুলিবার জন্য পুলিশ চেষ্টা করিল। অবশেষে ভগ্ন অবস্থায় দরজা উন্মুক্ত হইল। গৃহের নীচে অপেক্ষারত পুলিশরাও উপরে চলিয়া আসিল। তাহাদের ধারণা হইল সূর্য সেন এই বাড়ীতেই আছেন। পুলিশ প্রমোদরঞ্জন ও অনন্ত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করিল। ইতিমধ্যে মাষ্টারদা পুলিশের বেড়াজাল হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই পরাজয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া পড়িল; বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান চলিল। সূর্য সেন তখন কলিকাতায় কর্মব্যস্ত। শেষে এই বিপ্লব অধ্যায়ের নায়ক সূর্য সেন একদিন ধরা পড়েন কলিকাতার রাজপথে।

১৯২৫ সালের শেষভাগ। প্রমোদ চৌধুরী, অনন্তহরি মিত্র আলিপুর জেলে কারারুদ্ধ। আরও অনেক বিপ্লবী সেখানে বিনাবিচারে আটক আছেন। এই সময় গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিনটেনডেণ্ট ভূপেন চ্যাটার্জী বন্দীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজ করিতেছেন। আলিপুর জেলের ভিতরে এই ব্যাপারে সুরাহা করিবার জন্য অগ্রণী হইলেন দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বন্দীরা।

আলিপুর জেলে এক বিকালবেলা রাজবন্দীদের আস্তানায় বিশ্রাম করিয়া ভূপেন চ্যাটার্জী জেলগার্ড সহ বাহির হইতেছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে প্রমোদরঞ্জন, অনন্তহরি, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী ফটকের পাহাড়রত সিপাহী হইতে চাবি কাড়িয়া লইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। গোপনে তাঁহারা শাবল ও লৌহদণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই সকল অস্ত্র লইয়া ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যা করিয়া স্ব-স্ব প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়া পড়িলেন। ইংরাজের বিচারে প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরির ফাঁসীর হুকুম হইল। প্রমোদরঞ্জন চট্টগ্রামের প্রথম বিপ্লবী শহীদ।

১৯২৭ সালের প্রথম ভাগে বিপ্লবীরা বন্দীজীবন হইতে ছাড়া পাইতেছেন। চারুদা, প্রতাপদা, যশোদা দা তখন জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। আমি সবেমাত্র ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছি। এই সময় তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয়। চারুদার নির্দেশে আমি চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্তি হইলাম। আমার পিতৃদেবের ইচ্ছানুযায়ী কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার ভর্তি হওয়া সম্ভবপর হইল না। আমি চট্টগ্রামে রহিলাম। প্রবীণ বড়ুয়াকে পাঠান হইল বার্মায়। প্রবীণ বড়ুয়াও তখন ১৯২৪ সালের বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

বন্দীজীবন হইতে মুক্ত হইয়া চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা আবার একযোগে কাজ করিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। ১৯২৪-২৫ সালে তাঁহারা মিলিতভাবে কাজ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মিলন কার্যকরী হইল না। কার্যক্রমের পটভূমিকায় মাষ্টারদা ও তাঁহার অনুবর্তী কর্মিসমাজের সহিত চারুদার সুস্পষ্ট মতান্তর ঘটিল। চারুবিকাশ দত্ত ছিলেন ব্যাপক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিপোষক। তাই তিনি তাঁহার অনুবর্তী কর্মিদল লইয়া অনুশীলন সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। অপরপক্ষে মাষ্টারদা ও তাঁহার অনুবর্তী কর্মিদল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

রক্ষা করিয়া যুগান্তর দলের সঙ্গে রহিলেন। পরবর্তী কালে সমগ্র বাংলা জুড়িয়া ব্যাপকভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন গতিহারা হইল। চারুদা স্বীকার করিযাছেন, বিপ্লবী বাংলার এই উপসংহার ভূমিকায় সূর্য সেন (মাষ্টারদা) বিজয়ীর গর্বে ভাস্বর।

১৯২৭ সাল। চারুবিকাশ দত্ত এইবার ব্যাপকভাবে চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির গুপ্তকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য উদ্যোগী হইলেন। চট্টগ্রামের বুকে তরুণের নবযাত্রা শুরু হইল। ব্যায়ামচর্চার জন্য বহু ব্যায়ামাগার গড়িয়া উঠিল। নন্দনকাননস্থ অঞ্চলের অন্যতম বিপ্লবী কর্মী করুণাময় দত্তের [সাধন দত্ত নামে পরিচিত] বাড়ীর অভ্যন্তরস্থ বিস্তৃত জায়গায় ছিল অনুশীলন সমিতির প্রধান ব্যায়ামকেন্দ্র। পরিচালনা করিতেন ক্যাপ্টেন রবীন্দ্র সেনগুপ্ত।

ইহা ছাড়া শহরে রহমতগঞ্জ এবং দেওবান বাজার প্রভৃতি অঞ্চলেও ব্যায়ামকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। গ্রামাঞ্চলে ব্যায়ামকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার প্রধান দায়িত্ব ছিল শ্রীসতীন্দ্র হোড়ের উপর।

ছাত্রসম্মেলন, যুবসম্মেলন ও ব্যায়াম-প্রদর্শনী শুরু হইল। ছাত্রসম্মেলন ও যুবসম্মেলনে চারুবিকাশ দত্ত আলোকচিত্রের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, দেশের তৎকালীন নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ছাত্র ও যুবসমাজ ক্রমে ক্রমে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করিল। এই সময় চট্টগ্রামের প্রায় প্রত্যেক স্কুলে অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। পার্বত্য চট্টগ্রামও বাদ পড়িল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘনশ্যাম দেওয়ান, স্নেহকুমার চাক্‌মা, খগেন্দ্র দেওয়ান এবং আরও অনেক ছাত্র অনুশীলন সমিতির সদস্য হইলেন। চট্টগ্রাম শাখার কর্মীরা ফেণীতেও বিপ্লবকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। মণীন্দ্র চৌধুরী, বিজন ঘোষ, যামিনী সেন তখন ফেণী কলেজের ছাত্র। অধ্যাপক দয়ানন্দ চৌধুরী ছিলেন ফেণী কলেজের বাংলার অধ্যাপক। চারুদা বাঁকুড়া জেলায়ও অনুশীলন সমিতির শাখা গঠন করেন। এই কেন্দ্রর তত্ত্বাবধান করিতেন চট্টগ্রামের ডাঃ নীরদ দত্ত। বাঁকুড়ার বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে প্রফুল্লকুমার কুণ্ডু অন্যতম।

বার্মাতেও নগেন দাশগুপ্ত, কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য, প্রবীণ বড়ুয়া, সারদা ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সুমতি মজুমদার এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। বার্মাতে অনেক বৌদ্ধসন্ন্যাসীও অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। মান্দালয়ের রেভাঃ সি. পি. থিংমংগ, রেঙ্গুনের উঃ উত্তম,

উঃ নাগিদা, উঃ সানদা প্রমুখ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নাম উল্লেখযোগ্য। সিংহলবাসী বৌদ্ধভিক্ষু শরণংকরও অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের শাকপুরা গ্রামের বৌদ্ধমন্দিরে থাকিতেন। ১৯২৯ সালে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত থাকায় তিনি ১৯৩২ সালে বন্দী হন। তিনমাস পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল হইতে বৃটিশ শাসক তাঁহাকে মুক্তিদান করে এবং ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করে। ভিক্ষু শরণংকর এখন শ্রীলঙ্কায় আছেন।

স্মরণ করিতেছি, আজ পরম শ্রদ্ধেয় সাধুবাবা শ্রীমৎ তারাচরণ পরমহংসদেবের হাসিমাখা মুখখানি। সুভাষ দত্ত, সাতকড়ি দাশ, দুর্গাকিঙ্কর ঘোষ এবং আমরা আরও কয়েকজন তাঁহাকে ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য প্রস্তাব করি। ধলঘাট গ্রামের সেই দিনের বিরাট অনুষ্ঠানে সাধুবাবা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং আমাদের সহিত মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত করেন 'বন্দে মাতরম্'।

বিপ্লব আন্দোলনে চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের অবদানও কম নহে। চট্টলার বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁহারা ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করিয়াছেন, শহীদ রোহিণী বড়ুয়া তাঁহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ১৯৩৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলে তাঁহার ফাঁসী হয়। ১৯৪২ সালে সৈনিক বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করায় কক্সবাজার মহকুমার নিরঞ্জন বড়ুয়াকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। মাদ্রাজ জেলে (Madras Ponitentiary) ১৯৪৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার ফাঁসী হয়।

বিপ্লবী পরিবারের অর্থে চট্টগ্রাম সহরে দুইটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়— ন্যাশানেল ষ্টোরস্ ও চট্টল বুক ডিপো। ন্যাশানেল ষ্টোরস্ পরিচালনা করিতেন অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ফতেয়াবাদ গ্রামের শ্রীযতীন সেনগুপ্ত।

মোহরার সুরেন্দ্র চৌধুরী গ্রাজুয়েট স্কুলের ছাত্র। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাহার সহিত আমার পরিচয়। সে মাষ্টারদার মন্ত্রশিষ্য মহেন্দ্র চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। চট্টগ্রাম বিপ্লব আন্দোলনে এই পরিবারের দান বিলক্ষণ। এই পরিবারের অর্থে চট্টগ্রাম শহরে 'চট্টল বুক ডিপো' এবং কলিকাতায় 'বন্দে মাতরম্ সাহিত্য ভবন' নামে দুইটি পুস্তকের দোকান স্থাপিত হয়। 'বন্দে মাতরম সাহিত্য ভবন'-এ থাকিতেন শ্রীচারুবিকাশ দত্ত। 'চট্টল বুক

ডিপো' পরিচালনা করিতেন শ্রীপতি নন্দী। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিপ্লবী সহযাত্রীদের সহিত প্রকাশ্যভাবে যোগাযোগ করার সুযোগ ছিল।

আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়ে সুরেন্দ্র চৌধুরীর কথা। অনুশীলন সমিতির অত্যন্ত দায়িত্বশীল সক্রিয় কর্মী সুরেন্দ্র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানব-মুক্তির জন্য কাজ করিয়া গিয়াছে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামেও তাহার অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ রাজনৈতিক কমিটির সদস্য (Personnel of the Political Committee of Bangladesh) হিসাবে সুরেন্দ্র মুক্তি-সংগ্রাম চলার সময় অত্যন্ত গোপনীয় জরুরী কাজের দায়িত্ব নিয়া ভারতে আসে এবং আমার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। এখানে কাজ সমাপ্ত করার পর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় সীমান্তে পাকবাহিনীর গুলীতে সে নিহত হয়। তাহার নিকট বাংলাদেশ সংগ্রাম কমিটির পরিচয়-লিপি ছিল।

১৯২৮ সালের জুলাই কি আগষ্ট মাস। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী চট্টগ্রামে আসিয়াছেন। এই সময় চারুদা আমাকে মহারাজের সহিত পরিচয় করান। কিছুদিন পরে চারুদা আমাকে মাষ্টারদার সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দেন। চট্টগ্রামের প্রবীণ উকিল সুরেন্দ্রলাল দাশের দেওয়ানজী পুকুরপারস্থ বাড়ীতে এই বিপ্লবী নায়কদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির গোপন বিপ্লবী কার্য-পরিচালনার প্রধান দপ্তর।

মহারাজ আমাকে বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশে অস্ত্র-সংগ্রহ ব্যাপারে জাপান পাঠাইবার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে নানা ষড়যন্ত্র মামলায়, রাজনৈতিক ডাকাতির সংস্রবে বহু বিপ্লবী কর্মী ধরা পড়েন, ফলে আমার জাপান যাওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত চট্টগ্রামের মুক্তিপাগল দামাল ছেলেরা দুর্বার গতিতে বিপ্লবী সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, আত্মবলিদানের জন্য নিজেদের তৈরী করিতেছে। তাহারা জানে, এই পথ দুর্গম। কিন্তু তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতেই হইবে।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল বিপ্লবজগতের এক স্মরণীয় দিন। মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা ইংরাজ শাসনকে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছেন। অন্যান্য বিপ্লবীদের মধ্যে অনুশীলন সমিতির নেতা চারুবিকাশ দত্ত, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, ডাঃ যোগেশ দে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কিছুদিন পর তাঁহারা কারামুক্ত হইলেন। অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে এক সমস্যা দেখা দিল। অবশেষে

স্থির হইল, আমরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিব। অনুশীলন সমিতির অন্যান্য জেলা শাখায়ও তাহাই ঠিক হইয়াছিল। আমি তখন বি. এ. চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজ ষ্ট্রাইক হইল। ইহার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সুচারু সেনগুপ্ত, শৈলেশ ব্যানার্জী, চট্টলেশ চৌধুরী, চিত্ত দাশ, ধীরেন দাশগুপ্ত এবং আমাকে কলেজ কর্তৃপক্ষ এক বৎসরের জন্য 'সাসপেণ্ড' করিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, ছাত্রেরা দলে দলে কলেজ, স্কুল ত্যাগ করিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে। কলিকাতায় অল্ বেঙ্গল ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশনের পরিচালনায় 'বেঙ্গল ন্যাশানেল মিলিশিয়া' গঠিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের কৃতী ছাত্র ও অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীউত্তর কুমার ধর ছিলেন ঐ সংস্থার অন্যতম দায়িত্বশীল নেতা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রাম। তাই নীতিগতভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের সৈনিকেরা অকাতরে ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। যাত্রামোহন সেন হলে কেন্দ্রীয় সত্যাগ্রহ শিবির অবস্থিত। শিবিরের কার্যাধ্যক্ষ হইলেন সুধাংশু সেন, সত্যাগ্রহ-সেনার ক্যাপ্টেন ছিলেন রবীন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শিবিরের ম্যানেজমেণ্টের ভার পড়িল আমার উপর। প্রতিদিন সত্যাগ্রহবুলেটিন বাহির হইত। চারুদা ইহার সম্পাদনা করিতেন। তাঁহাকে সহায়তা করিতেন ধীরেন দাশগুপ্ত, মোক্ষদা দাশ, প্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়া, বিমলেন্দু চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন। সত্যাগ্রহ কমিটির সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত প্রত্যহ শিবির পরিদর্শন করিতেন।

প্রায় পাঁচশত ভলাণ্টিয়ার এই শিবিরে থাকিতেন। ভোর ৫টার সময় সংকেতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে উঠিয়া পড়িতাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সত্যাগ্রহী সেনাদল জে. এম. সেন হলের প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতেন এবং ক্যাপ্টেন রবীন্দ্র সেনগুপ্তের নেতৃত্বে প্যারেড্ করিতেন। সবাই মিলিত কণ্ঠে গাহিতাম, 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'।

ভোরের খাওয়া কিছু ছোলা ও গুড়। তাহাতেই সবাই সন্তুষ্ট। তাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক—'দুঃখে যাদের জীবন-গড়া, তাদের আবার দুঃখ কিসের?' এক-এক জনের নেতৃত্বে তাঁহারা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হইতেন। আবগারী দোকান, মদের দোকান, বিদেশী দ্রব্যের দোকান—সবজায়গায় পিকেটিং আর পিকেটিং। মনোরঞ্জন চৌধুরী, চট্টলেশ

চৌধুরী, সুবিনয় দত্ত [হাসি দত্ত নামে পরিচিত], সুধাংশু দত্ত পিকেটিং কেন্দ্র তত্ত্বাবধান করিতেন।

প্রথম দিনের সংগ্রাম। সদরঘাট মদের দোকানের সামনে ইউরোপীয় সার্জেন্টরা ও পুলিশ বেমালুম লাঠি চার্জ করিয়াছে। নিকুঞ্জ বৈরাগী মাথায় গুরুতর আঘাত পাইয়াছে, আরও কয়েকজনের হাতে, পায়ে লাঠির আঘাত। বিভিন্নস্থানের প্রায় একশত জন কর্মী আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় শিবিরের হলে পড়িয়া আছেন। কাহারো মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কাহারো হাতে, কাহারো পায়ে। অনেকে আঘাতের যন্ত্রণায় কাতরধ্বনি করিতেন। রাত্রে শিবিরের দৃশ্য অসহনীয় হইয়া উঠিত। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের শুভার্থী ডাঃ মহিম দাশগুপ্ত তাঁহাদের শুশ্রূষা ও সেবায় রত।

পরের দিন আবার এক নূতন দল সেইস্থানে গেল। কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল এবং পরে চট্টগ্রাম শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে নিয়া ছাড়িয়া দিল। ইহা একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কেহ কেহ কারারুদ্ধ হইলেন, আবার কেহ ছাড়া পাইলেন। অন্যদিকে চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি মহিম চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য বঙ্গোপসাগরের পারে পতেঙ্গায় অনেক সত্যাগ্রহী গিয়াছেন। কয়েকজন ধৃতও হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের অন্যান্য থানায়ও সত্যাগ্রহ-শিবির স্থাপিত হইয়াছে। পটিয়া থানার শিবিরের অধিকর্তা ছিলেন ডাঃ সুধাংশু দাশ ও সাতকড়ি দাশ। বোয়ালখালী থানার শিবিরের ভার অর্পিত হইল দুর্গাকিঙ্কর ঘোষ ও রাজেন বড়ুয়ার উপর। যতটুকু মনে পড়িতেছে, সাতকানিয়া থানার দায়িত্ব ভার নিলেন শশী দাস। রাউজান শিবিরেব তত্ত্বাবধান করিতেন ডাঃ দেবেন দাস ও শচীভূষণ বড়ুয়া। রাঙ্গুনিয়া থানার শিবির মনোমোহন সাহা ও বিজয় বড়ুয়ার পরিচালনাধীন। ডাঃ হেম সেনের তত্ত্বাবধানে ছিল ফটিকছড়ি ও রোসাংগিরি এলাকার শিবির। কাক্সবাজারও বাদ পড়ে নাই। সেখানে কর্মরত কেশব চন্দ্র বিশ্বাস। পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন ঘনশ্যাম দেওয়ান। চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজের আই. এ. দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ঘনশ্যাম চারুদার নির্দেশে কলেজ ত্যাগ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের জনসাধারণ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, মজুর, চাষী সকলেই সহানুভূতিশীল। শিবিরের কর্মীদের তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেন 'আচ্ছা, তোমরা

কি ইংরাজকে তাড়াইতে পারিবে?' দৃঢ় উত্তর, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারিব'।

আইন অমান্য আন্দোলন প্রায় শেষ। অনুশীলন সমিতির তরুণ কর্মীদের প্রশ্ন: এখন কোন্ পথে? ঘাটফরাদবেগ বৌদ্ধ-হোষ্টেলে আমার ঘরে এক গোপন বৈঠক হইল। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ব্রজেন দাশ, সুধাংশু দত্ত, মনোরঞ্জন চৌধুরী, রবীন্দ্র সেনগুপ্ত, ধীরেন দাশগুপ্ত, বঙ্কিম দত্ত ও মনোমোহন সাহা। স্থির হইল, আমরা আর ঘরমুখো হইবনা। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা বৃটিশ সরকারকে আঘাত হানিতে হইবে। এইজন্য বিভিন্ন জেলার সহ-বিপ্লবীদের সহিত যোগস্থাপন করিতে হইবে, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতে হইবে, অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের এই সর্বসম্মত প্রস্তাব জেলা নেতৃবৃন্দ—চারুবিকাশ দত্ত, যশোদা চক্রবর্তী, প্রতাপ রক্ষিত, সুধাংশু সেন, ডাঃ সুধাংশু দাশ—উৎসাহসহকারে অনুমোদন করিলেন।

ইতিমধ্যে এক ডাকাতি হইল সুধাংশু সেন ও ডাঃ ব্রজেন দাশের নেতৃত্বে। লুণ্ঠিত দ্রব্য জমা পড়িল আমার হাতে। আমি তখন গভর্ণমেণ্ট হোষ্টেলে থাকি। দলের অন্যতম সহানুভূতিসম্পন্ন সদস্য ছিলেন ললিতমোহন আচার্য (ঠাকুরদা)। পাথরঘাটায় তাঁহার স্বর্ণশিল্পের দোকান ছিল। তাঁহার দ্বারা গলিত সোনা বিক্রী হইল। সেই অর্থে ১৩০ টাকার দ্বারা মনোমোহন সাহা চট্টগ্রামের এক মুসলমান খালাসী হইতে একটি পিস্তল ক্রয় করিল। অবশিষ্ট টাকা দেওয়া হইল চারুদার হাতে।

ফেণীর মাজদিয়া ষ্টেশনের কাছাকাছি পোষ্ট অফিসের ৮০০০ টাকা সহ মেলব্যেগ লুণ্ঠন করারও চেষ্টা হইল; কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হইল না।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল, বাংলা দেশে বিপ্লবীরা অনেক ডাকাতি করিয়াছেন; কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সেই অর্থ ব্যয় হয় নাই। তাঁহারা জানিতেন, এই অর্থের দ্বারা ভাবী বিপ্লবের আয়োজন করা হইবে। একই উদ্দেশ্যে যে সকল বিপ্লবী ডাকাতি করিয়াছেন তাঁহারা এবং তাঁহাদের সহকর্মীরা অনেকে নিজ নিজ বাড়ী হইতে মাতা-ভগিনীর স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি আনিয়া বিপ্লবীদলে দিয়াছেন।

১৯৩১ সালের মে কি জুন মাস। মনোরঞ্জন চৌধুরীকে অস্ত্রসংগ্রহ ব্যাপারে পাঠান হইল ঢাকায়। গৌহাটি যুদ্ধের নায়ক শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষের সহিত মনোরঞ্জন দেখা করিল; কিন্তু কোন ফলপ্রসূ হইল না। জুলাই মাসে আমাকে আবার ঢাকায় পাঠান হইল। ঢাকায় তখন অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট নেতা

ফরিদপুরের আশুতোষ কালী পলাতক অবস্থায় ছিলেন। আমি প্রথমে নারায়ণগঞ্জে নলিনীদার সহিত তাঁহার চাষারস্থিত বাড়ীতে দেখা করিলাম। এখানে কুমিল্লার ধীরেশ ঘোষের সহিতও আমার দেখা হয়। নলিনীদা আমাকে অনুশীলন সমিতির প্রধানতম নেতা মদনমোহন ভৌমিকের নিকট পাঠাইলেন। মদনবাবু তখন ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। তিনি আমাকে আশুতোষ কালীর সহিত দেখা করার সব বন্দোবস্ত করিলেন। ঢাকার রাজভবনের নিকটবর্তী এক বাগানে আশুদার সহিত দেখা হয় এবং তাঁহার সহিত বিস্তারিতভাবে আলাপ-আলোচনা হয়। তাঁহার নির্দেশে আমি ঢাকা হইতে কলিকাতা রওনা হইলাম এবং বাঞ্ছারাম অক্রুর দত্ত লেনে অবস্থিত ডাইং ক্লিনিং-এ উঠিলাম। এখানে অহিভূষণ চৌধুরী ও হেম ভট্টাচার্য থাকিতেন। পরবর্তী সময়ে হেম ভট্টাচার্য আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত হন এবং তাঁহার দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাবাস কালে হেম ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়।

আমি তিন দিন কলিকাতায় ছিলাম। চারুদা তখন কলিকাতায় 'বন্দে মাতরম্ সাহিত্য ভবন'-এ থাকেন। চারুদার পরামর্শ অনুযায়ী মহেশ বড়ুয়াকে সঙ্গে করিয়া আমি আবার চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম। সঙ্গে একটি ওয়েবলি রিভলভার।

অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে মহেশ অত্যন্ত সাহসী বলিয়া সুখ্যাত এবং 'মামা' বলিয়া পরিচিত ছিল। ১৯৩১—৩৩ সালে পলাতক-জীবনে মহেশ কখনও গ্রাম্য মুসলমান, কখনও ফকীর অথবা কুলীর ছদ্মবেশে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত। ১৯৩৩ সালে বাথুয়া ডাকাতি মামলায় তাহার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই মামলায় ফতেয়াবাদের মোক্ষদা চক্রবর্তী, প্রিয়দা চক্রবর্তী, যোগদা চক্রবর্তী, সীতাকুণ্ডের নিরঞ্জন বড়ুয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাঙ্গুনিয়ার প্রকৃতি বড়ুয়ারও তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রাজসাহী জেলে ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী মহেশের মৃত্যু হয়।

দেশের ডাক। মহেশ চট্টগ্রাম আসিয়াছে। ডাঃ ব্রজেন দাশ ও মহেশ বড়ুয়ার নেতৃত্বে গঠিত হইল 'মিলিটারী স্কোয়াড্'। ডাঃ ব্রজেন দাশ তখন পলাতক অবস্থায় রহিয়াছেন। নিরলস দৃঢ়চেতা কর্মী ও অভিজ্ঞ সংগঠক। কখনও কখনও পলাতক জীবনে সাতকানিয়া গ্রামে হরিহর দত্তের সহিত

রিভলভারের বুলেট তৈরী করিতেছেন, আবার হয়ত সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতির কর্মীদের মধ্যে যদি কেহ প্রত্যেক গ্রাম-কেন্দ্রে ঘুরিয়া থাকেন, তবে তিনি একমাত্র ডাঃ ব্রজেন দাশ।

মনে পড়িতেছে, ১৯৩১ সালের কোজাগরী পূর্ণিমার আগের একটা রাত। আমাদের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত 'সুবেদার দীঘি'র পশ্চিম-উত্তর কোণে বসিয়া ডাঃ ব্রজেন দাশ ও আমি নূতন-তৈরী বুলেট পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলাম। এই বুলেটগুলি কতটুকু কার্যকরী হইবে তাহা নির্ণয় করা ছিল এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

অত্যাচারী পুলিশ ইনস্পেক্টর আসানুল্লাকে হত্যার পর চট্টগ্রামে পুলিশী অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে। আমরা স্থির করিলাম, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কেমকে তাহার ইচ্ছাকৃত কুশাসনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড। ফতেয়াবাদ গ্রামের রায়সাহেব দুর্গাদাস নন্দীর বাড়ীতে ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি এক গোপন বৈঠকে ইহা ঠিক হয়। ঐ বৈঠকে চারুবিকাশ দত্ত, ডাঃ ব্রজেন দাশ, ডাঃ সুধাংশু দাশ, সুধাংশু সেন, সুধাংশু দত্ত, বঙ্কিম দত্ত, বিমল নন্দী, মনোরঞ্জন চৌধুরী ও এই প্রবন্ধের লেখক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থায় এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। আমি ১লা নভেম্বর পুলিশের হাতে ধরা পড়ি। আর মনোরঞ্জন চৌধুরী ধরা পড়েন কলিকাতায়।

নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজেও অনুশীলন সমিতির চট্টগ্রাম শাখার সদস্যরা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি শুনিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে সুধাংশু কাঞ্জিলাল ও সুশীল খাস্তগীর নেতাজীর দেহরক্ষক ছিলেন। সুধাংশু কাঞ্জিলাল টেকনাফের ভিতর দিয়া বার্মা হইতে আকিয়াব অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পথে টেকনাফের নিকটবর্তী কোন স্থানে বৃটিশবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁহাকে প্রথমে দিল্লীর 'লালকেল্লায়' বন্দী রাখা হয়। পরে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আলিপুর জেল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কাঞ্জিলাল শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামে তাঁহার জন্মস্থান কেলিসহর গ্রামে ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় [১৯৭১ খৃঃ] অত্যাচারী খানসেনারা তাঁহাকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে হত্যা করে।

বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান হইয়াছে। আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। আমাদের জীবন-সাধনা ছিল আমরা দেশকে বড করিয়া তুলিব, আমরা শৌর্যেবীর্যে, শিক্ষা ও চারিত্রিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইব। শোষণ ও সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত করিয়া সাম্যবাদী সমাজ গডিয়া তুলিব। বিশ্বে ভারতবর্ষ এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবে, যেখানে থাকিবে না মানুষে মানুষে কোন ব্যবধান। বিপ্লবীরা মানবপ্রেমিক এবং সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তি তাঁহাদের ছিল একমাত্র কাম্য। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।

দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্বকোণ।
ছিঁড়ি, গোলামির দলিলকে ছিঁড়ি,
বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়ি
খুঁজি কোনখানে স্বর্গের সিঁড়ি,
কোথায় প্রাণ!
দেখব, ওপারে আজো আছে কারা,
খসাব আঘাতে আকাশের তারা,
সারা দুনিয়াকে দেব শেষ নাড়া,
ছড়াব ধান।
জানি রক্তের পিছনে ডাকবে সুখের বান॥

[বিদ্রোহের গান : সুকান্ত]

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে
চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির অবদান
শ্রীশশাঙ্কমোহন দাশ

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস প্রায় শতবর্ষের কাহিনী। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে ইংরেজের শাসন ও শোষণ থেকে ভারতের জনগণের মুক্তিলাভের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে নানা ভাবে, নানারূপে—কাব্যে, কবিতায়, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, গুপ্ত প্রকাশনায় ও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে। উনিশ শতকের শেষের দিকে অরবিন্দ ঘোষ [ঋষি অরবিন্দ] বরদা রাজ্যে অবস্থানকালে "ভবানী মন্দির" নামক পুস্তক রচনা করে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে ভারতের সর্বত্র গুপ্ত সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রচার শুরু করেন।

এর পর ব্যারিষ্টার পি. মিত্র কলকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে রাজা রামমোহনের বাড়ীর পাশে অর্থাৎ যেখানে পুলিশ ষ্টেশন ছিল ঠিক তার পাশের বাড়ীতে "অনুশীলন সমিতি" স্থাপন করেন।

এই সমিতির প্রাথমিক কাজ ধার্য হয়েছিল অতীব গোপনে বৃটিশ শাসনযন্ত্রের অগোচরে মেধাবী, নিষ্ঠাবান্ শিক্ষিত যুবকদিগকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, তাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উক্ত সমিতির সদস্যভুক্ত করা, ব্রহ্মদেশ সহ সমগ্র ভারতের প্রতিটি সহর ও গ্রামে সংগঠন-শাখা স্থাপন করা, সম্ভব হলে পুলিশবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে গোপন দল গঠন করা। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ এবং দেশের মধ্যে গোপনে বোমা তৈরী করা। এর পর প্রস্তুতিপর্ব শেষে একই দিনে একই সময়ে একই সঙ্গে সমগ্র ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করা। মূল উদ্দেশ্য ছিল, শোষণকারী, অত্যাচারী বৃটিশ শাসনযন্ত্রকে চরম আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা এবং এমন একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও সুখসমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা—যাতে কোন মানুষের খাওয়া-পরার অভাব থাকবে না, থাকবেনা প্রকৃত শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব অর্জনের পূর্ণ সুযোগের অভাব, থাকবে না শোষণ, থাকবে না অত্যাচার, অবিচার, অনাচার।

বস্তুতঃ, স্বাধীনতা-অর্জনের ঐ পথ ছিল অতীব দুর্গম, অতীব কঠোর। এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু শিক্ষিত যুবক অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির সদস্যভুক্ত হল। দেশে দেশে দিশে দিশে এর শাখা গঠিত হল। ঢাকা জেলার বিখ্যাত ছোরা, লাঠি ও অসি খেলার প্রবর্তক পুলিন দাসের নেতৃত্বে এই সংগঠন একটা কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ বিপ্লবী সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠল এবং দেশের চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করতে থাকল।

১৯০৫ সালে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্য বৃটিশ শাসক বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করল। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে আলোড়ন ও আন্দোলন শুরু হয়। ৭ই আগষ্ট কলকাতায় এক সভা ডাকা হয়। স্যার সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন—বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হোক। অরবিন্দ ঘোষ তা সমর্থন করেন। মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার যতীন্দ্র রায়চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলে বিলাতী বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি দ্বিমুখী ধারায় অগ্রসর হতে থাকে।

আনুমানিক ১৯১০ সালের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠক পুলিন দাসের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির এক শাখা গঠিত হয়েছিল। যতটুকু জানা যায়, সেযুগে যাদের চেষ্টা ও উদ্যোগে চট্টগ্রামে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন—চন্দ্রশেখর দে, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, চারুবিকাশ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন সেন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, যেহেতু সমিতির সব কাজই অতীব সংগোপনে সম্পাদিত হত, যেহেতু কে কখন দলভুক্ত হচ্ছে কিংবা কার দ্বারা কি কাজ সম্পন্ন হচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট দু'এক জন ছাড়া অন্য কেউই জানতে পারত না, সেহেতু এই দলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া কারো দ্বারাই সম্ভব নয়। এই নিবন্ধে দলের একজন কর্মী হিসাবে আমার জানা কয়েকটা ঘটনা অবলম্বনে অনুশীলন সমিতি [চট্টগ্রাম শাখা] ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এর অবদান সম্বন্ধে শুধু একটা আংশিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করব।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম ভাগ থেকেই এই সমিতি চট্টগ্রামের মানুষকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে আসছিল বটে; কিন্তু বহু বছর পর্যন্ত এই সংগঠন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করল। সে সময় চট্টগ্রামের সুযোগ্য কংগ্রেস নেতা ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। কেন্দ্রীয় অনুশীলন সমিতি ঐ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সমিতির চট্টগ্রাম শাখাও চারুবিকাশ দত্তের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যশোদা চক্রবর্তী, দ্বিজেন নন্দী, সুধাংশু সেন ও ডাঃ যোগেশ দে প্রমুখ বহু দেশকর্মী অনুশীলন সমিতির সহিত যুক্ত হন।

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্ত হওয়ার পর অনুশীলন সমিতির কর্মীরা আবার গোপনে দলবৃদ্ধির কাজ শুরু করেন।

বিপ্লবীদের কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করে ১৯২৪ সালের শেষভাগে "বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স" আইনে অনুশীলন সমিতির প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত, যশোদা চক্রবর্তী, ডাঃ যোগেশ দে, রমণী শর্মা, অনিল গুহ প্রমুখ কর্মিবৃন্দকে সরকার গ্রেপ্তার করে। দলের প্রধান নেতা ও সংগঠক চারুবিকাশ দত্ত আত্মগোপন করেন।

১৯২৬ সালে চারুবিকাশ দত্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং কারাবরণ করেন। কিছুদিন পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে ১৯২৭-২৮ সালে—তিনি জেল থেকে মুক্তিলাভ করার পর থেকে।

জেল থেকে এসে চারুবিকাশ দত্ত বাসস্থানের জন্য আমার পিতা ৺সুরেন্দ্র লাল দাশ মহাশয়ের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কারণ পুলিশের ভয়ে তাঁর অন্য আত্মীয়েরা তাঁকে তখন আশ্রয় দিতে অসম্মত হন। তিনি দল সম্পর্কে আমার কাকা হন। আমার পিতার আশ্রয়ে তিনি আমাদের চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানজী পুকুরের উত্তরপারস্থ বাসভবনে আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং ঐ বাড়ীতে অনুশীলন সমিতির চট্টগ্রাম শাখার গুপ্ত কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপন করেন।

আবার পূর্ণোদ্যমে সমিতির কাজ আরম্ভ হল। চারুকাকার নেতৃত্বে এবার থেকে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে নতুন ভঙ্গিতে সমিতির কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। প্রকাশ্যে চলতে থাকল প্রচার-অভিযান, কর্মিদল-সংগ্রহ এবং তাদের শরীর ও মন গঠনের বিভিন্ন আয়োজন আর গোপনে চলতে থাকল প্রকাশ্য সংগঠন থেকে বেছে বেছে বিপ্লবী সৈনিক মনোনয়ন।

চারুকাকার সৃজনীশক্তি ছিল অদ্ভুত। যেমনি ছিল তার জোরালো হৃদয়গ্রাহী ভাষা, তেমনি ছিল বক্তৃতা করার তেজোদ্দীপ্ত প্রতিভা। প্রথমে ছোট ছোট পুস্তক-রচনার মাধ্যমে তিনি বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য শুরু করলেন। কিছুদিন পর ১৯২৬ সালে আলিপুর জেলে গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন চাটার্জীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অবলম্বনে "বিদ্রোহী প্রমোদরঞ্জন" নামে একটা বিপ্লবাত্মক বই রচনা করেন। প্রমোদরঞ্জন ছিলেন চট্টগ্রামের কেলিশহর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তিনি চারুকাকার অতি প্রিয় ও অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্মী। বইটিতে একদিকে লেখক মধুর হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন প্রমোদরঞ্জনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহমমতা, প্রমোদরঞ্জনের দেশপ্রেম, শৌর্যবীর্যের কথা, আর অন্যদিকে তাঁর অগ্নিবর্ষী ভাষায় প্রকাশ করেছেন তৎকালীন সরকারের অত্যাচার-অবিচারের কথা এবং তার প্রতিকারের জন্য বিদ্রোহাত্মক আবেদন। অল্পদিনের মধ্যেই বইটি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু সরকার তা বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করল এবং চারুকাকার গতিবিধির উপর প্রখর পাহারার ব্যবস্থা করল। এরূপ নানা বৈপ্লবিক কার্যাবলীর জন্য তাঁর আস্তানায় ঘন ঘন খানাতল্লাসী হতে থাকল। রাতদুপুরে পুলিশ হানা দেয়। ঘরের সকলকে উঠানে দাঁড় করিয়ে তল্লাসী চালায়। কোনও কোন সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, আবার ছেড়ে দেয়। এইভাবে আমাদের পরিবারের সকলকে পুলিশের নির্যাতন দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে একদিন দু'দিন না—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

চারুকাকার নেতৃত্বে বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান ক্রমেই বেড়ে চলল। ছাত্রসম্মেলন ডাকা হল, যুবসম্মেলন ডাকা হল। চারুকাকা প্রধান বক্তা। প্রাণবন্ত ভাষায় সরকারের বিরুদ্ধে তিনি যেন আগুন ছড়াতেন। ঐ সমস্ত সম্মেলনে ছাত্র নেতাদের মধ্যে বক্তৃতা করতেন উত্তর ধর, চক্ত দাশ, সুধাংশু সেন, ধীরেন দাশগুপ্ত [সাংবাদিক] এবং আরো অনেকে। সম্মেলনের মাধ্যমে দলে দলে ছাত্র, যুবক সংগঠিত হতে থাকল। স্কুলে কলেজে গড়ে উঠল অনুশীলন সমিতির ছোট ছোট কেন্দ্র।

চারুকাকা দু'এক জন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে স্কুলে স্কুলে ম্যাজিক লেণ্টানের সাহায্যে আলোকচিত্র দেখাতে থাকলেন। ঐ আলোকচিত্রের বিষয়বস্তু ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড নীল চাষীদের

উপর সরকারের অকথ্য অত্যাচার, অবিচার আর ঢাকার বিখ্যাত মসলিন কাপড় যাঁরা তৈরী করতেন সেই তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে দেওয়া ইত্যাদি। ঐ সমস্ত আলোকচিত্র-প্রদর্শনীতে বহু জনসমাগম হত। চারুকাকা তাঁর ব্যবহৃত লাঠিটির সাহায্যে নির্দিষ্ট ছবির প্রতি ইঙ্গিত করে ছবির এপাশ ওপাশ ঘুরে ঘুরে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বৃটিশ শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে অনর্গল জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতেন। এভাবে তিনি চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষকে বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে সজাগ করে তুললেন—স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে আন্দোলনমুখী করে তুললেন।

চারুকাকার নির্দেশে চট্টগ্রাম সহরে শরীরচর্চার কাজও শুরু হল। প্রথম ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হল দেওয়ানবাজারে জমিদার যোগেশ বাবুর পাহাড়ের উপর। তারপর রহমতগঞ্জ, নন্দনকানন প্রভৃতি স্থানে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হল। এসমস্ত ব্যায়ামাগারে ডন, বৈঠক, রিং, প্যারলাল বার, মুগুর ইত্যাদি নানা রকমের ব্যায়ামচর্চা করা হত। বক্সিং, যুযুৎসু, ছোরাখেলা, লাঠিখেলারও চর্চা হত।

আমি দেওয়ানবাজার ব্যায়ামাগারের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সে সময় অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট নেতা সুধাংশুদা [সুধাংশু সেন] কুমিল্লা কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে চট্টগ্রাম ফিরে এসেছেন। কুমিল্লাতেই তিনি লাঠিখেলা ছোরাখেলা শিখেছিলেন। তিনি আমাদের ব্যায়ামাগারে লাঠিখেলা ও ছোরাখেলা শেখাতে আরম্ভ করলেন। আমি তাঁর কাছে লাঠি ও ছোরাখেলা শিখেছিলাম এবং গোপনে বিভিন্ন ধরণের পিস্তল ও রিভলভার চালনা করাও শিখেছিলাম তাঁর কাছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে উত্তরদা [উত্তর ধর] এবং আরো অনেকে লাঠি ও ছোরাখেলায় নিপুণতা অর্জন করলেন। ঐ ব্যায়ামাগারে সপ্তাহে দু'দিন সদরঘাট ক্লাবের অনন্তদা [বিপ্লবী অনন্ত সিং] এসে বক্সিং শিখাতেন। চট্টলেশদা [চট্টলেশ চৌধুরী], নটেনদা [নটেন সেন] এবং আরো অনেকে তাঁর কাছে বক্সিং শিখতেন। ক্রমে ক্রমে গ্রামেও ব্যায়ামাগার স্থাপিত হল। আমি আমার জন্মভূমি ধলঘাট গ্রামের ব্যায়ামাগারে মাঝে মাঝে গিয়ে আমার বন্ধুদের লাঠি আর ছোরা খেলা শিখাতাম। ধলঘাট গ্রামের অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন—সুভাষদা [সুভাষ দত্ত], দুর্গাদা [দুর্গাকিঙ্কর ঘোষ], মহেন্দ্রদা [মহেন্দ্র বড়ুয়া], সাতকড়িদা [সাতকড়ি দাশ], সুমতিদা [সুমতি মজুমদার] প্রমুখ। মনে পড়ে, নগেনদার [নগেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত] কথা। আমি যতদূর জানি, তিন

ছিলেন ধলঘাটে অনুশীলন সমিতির প্রথম সদস্য। তিনি বার্মায় গিয়েছিলেন। সেখানেও তিনি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। দুর্গাদা ও সুভাষদা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন।

সম্ভবতঃ ১৯২৮ সালে ব্যায়ামবীর রাজেন গুহঠাকুরতা তাঁর দলবলসহ চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম সহরে টাউন হলে তাঁর নেতৃত্বে একটা ব্যায়াম প্রদর্শনী হয়েছিল। কয়েকটা গ্রামেও তিনি প্রদর্শনী দেখাতে গিয়েছিলেন। এতে চট্টগ্রামে ব্যায়ামাগারের সদস্যরা ব্যায়াম-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে খুব উৎসাহবোধ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ব্যাযাম-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। প্রতি প্রদর্শনীতে বহু জনসমাগম হত, বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত।

এমনিভাবে এগিয়ে চলল ছাত্র-যুবকের শরীরগঠনের কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্র-পত্রিকা পাঠ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনগঠনের কাজ। এভাবে গড়ে উঠল যুব-সংগঠন সহরে, গঞ্জে, গ্রামে—এমন কি সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও।

উক্ত যুব-সংগঠন থেকে বেছে বেছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গোপনে অনুশীলন সমিতির বিশ্বস্ত নিষ্ঠাবান বিপ্লবী সদস্য সংগ্রহ করা হত এবং তাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যথাযথ সশস্ত্র সৈনিকরূপে তৈরী করা হত। তাদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা, বোমা তৈরী করা, যানবাহন চালান ইত্যাদি শেখান হত। নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আদর্শনিষ্ঠ, সাহসী ও চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন মানুষ করে গড়ে তোলা হত।

এই প্রকারে হাজার হাজার ছাত্র, যুবক চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে এসে শিক্ষায়-দীক্ষায়, নৈতিক চরিত্রে দৃঢ়চেতা, সাহসী, স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে উঠেছিল।

মনে পড়ে, অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট নেতা মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর চট্টগ্রাম আগমনের কথা। ১৯২৮ সালের জুলাই কিংবা আগষ্ট মাসে তিনি কুমিল্লায় এক রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পর চট্টগ্রামে এসেছিলেন। তিনি আমাদের চট্টগ্রাম সহরের বাড়ীতে সপ্তাহকাল ছিলেন। তখন অনুশীলন সমিতির অনেক সদস্য গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতেন, দেখতাম। দিনের বেলায় তিনি ঘরেই থাকতেন, সন্ধ্যার পর অন্যত্র যেতেন। বুঝতে পারলাম, তিনি গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে চলাফেরা করছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে তিনি বার্মায় গিয়েছিলেন।

সম্ভবতঃ তারপর থেকে চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতিতে মহিলা-সংগঠনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এই সমিতির প্রথম মহিলা সদস্যা ছিলেন শ্রীমতী মতিপ্রভা দেবী। দ্বিতীয় সদস্যা ছিলেন শ্রীমতী চারু চক্রবর্তী। তারপর মতিপ্রভা দেবীর বোন বাসন্তী দেবী এবং আরো অনেকে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন।

অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পুরুষকর্মীদের উপর মহিলা-সংগঠনের ভার দেওয়া হত। আমি যতদূর জানি, চট্টগ্রামে মহিলা সংগঠনের ভার নিয়েছিলেন চারুবিকাশ দত্ত, চিত্ত দাশ, ধীরেন দাশগুপ্ত, সুধাংশু রাহা ও পরিমল দাশগুপ্ত প্রমুখ কর্মিগণ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রামের মহিলাসমাজের ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। কিন্তু তবু চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতিতে মহিলা সদস্যা গ্রহণে আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছিল—এ কথা বলা যায় না।

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সালে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি-পর্বে চট্টগ্রাম শীর্ষ স্থানে ছিল—একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না। ঐ সময় অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠক চারুবিকাশ দত্তের নেতৃত্বে একদিকে যেমন অনুশীলন সমিতির কর্মতৎপরতা ও সম্প্রসারণ শীর্ষে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি বিপ্লবী মহানায়ক মাষ্টারদার [সূর্য সেন] নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ভারতের সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতিও শীর্ষে উঠেছিল।

এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে, চারুকাকা ও মাষ্টারদা দু'জনেই সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবলুপ্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের চলার পথের মধ্যে একটা অমিল দেখা যায়। চারুকাকা অনুশীলন সমিতির কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তাঁদের আদর্শানুযায়ী সমগ্র ভারতব্যাপী একসঙ্গে বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বপ্নে ব্যাপৃত ছিলেন। অন্য দিকে মাষ্টারদা তাঁর চট্টগ্রামের শক্তিশালী সংগঠন দ্বারা কেবলমাত্র চট্টগ্রামেই বৃটিশ শাসনযন্ত্র বিকল করে দিয়ে সমগ্র ভারতের সামনে একটা বাস্তব আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সমস্ত ভারতের যুবকদের স্বাধীনতাস্পৃহা বাড়াবে এবং ভবিষ্যতে বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ সুগম হবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল সত্য-সত্যই মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক সুপরিকল্পিত সশস্ত্র বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করল। এই অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড

আঘাতে চট্টগ্রামের প্রশাসনযন্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা সরকারী দু'টি অস্ত্রাগারই দখল করে নিল। আর দখল করল যোগাযোগ কেন্দ্রগুলি। তারা বহির্জগতের সঙ্গে চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ, টেলিফোন-টেলিগ্রাম যোগাযোগ, বেতার যোগাযোগ সব ছিন্ন করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত স্বাধীন চট্টগ্রামে মাষ্টারদার নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সাময়িক সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হল।

যদিও কিছুদিনের মধ্যে অত্যাচারী বৃটিশ শাসকেরা তাদের শাসন পুনর্বহাল করতে সমর্থ হয়েছিল, তথাপি ইতিহাসের পাতায় চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহের কাহিনী এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে তার বিশেষ অবদানের কথা চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ও থাকবে। অনুশীলন সমিতির শিক্ষণ-কৌশলে শিক্ষিত কিছু কিছু যুবক মাষ্টারদার বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছিল। এই হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির চট্টগ্রাম শাখার অবদানও ছিল।

ঐ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর চট্টগ্রামের বুকে নেমে এল বৃটিশ শাসকের নির্মম নির্যাতন, অত্যাচার, অবিচার। ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী চলতে থাকল। চট্টগ্রামবাসীমাত্রই যেন সরকারের কাছে অপরাধী। বহু যুবককে থানায় নিয়ে গিয়ে অযথা লাঞ্ছনায় জর্জরিত করেছে। প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ, পরে কিল চড় বেত্রাঘাত আরোও কত কি! স্কুলে স্কুলে ঢুকে পুলিশ নানাভাবে অত্যাচার করেছে। উক্ত বিদ্রোহের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির কোনও যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও এই সমিতির বহু কর্মী নির্যাতিত হয়েছে, বিনাবিচারে জেল খেটেছে, অনেককে বাড়ীতে অন্তরীণ অবস্থায় আবদ্ধ থাকতে হয়েছে।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ থেকে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংস ডাণ্ডি অভিযান শুরু হয়েছিল। চট্টগ্রামেও দেশসেবক শ্রদ্ধেয় মহিমচন্দ্র দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

এই সময় চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতি সক্রিয়ভাবে ঐ আন্দোলনে যোগ দিল। বিরাট সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হল চট্টগ্রাম টাউন হল প্রাঙ্গণে। তার পরিচালনার ভার ছিল সুধাংশু সেন, রবীন্দ্র সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র বড়ুয়া, মনোরঞ্জন চৌধুরী, বঙ্কিম দত্ত, সুধাংশু দাশ [নোনা দা], দয়ানন্দ চৌধুরী, চট্টলেশ চৌধুরী প্রমুখ কর্মীদের উপর। প্রায় প্রত্যেক দিনই বুলেটিন বের হত। বুলেটিন-সম্পাদনায় ছিলেন চারুকাকা। তাঁর সহকারী ছিলেন ধীরেন্দ্র

দাশগুপ্ত, মোক্ষদা দাশ, প্রকৃতি বড়ুয়া, বিমল চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। তাঁরা সকলেই অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, অনুশীলন সমিতি সশস্ত্র বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাসী হয়েও মহাত্মার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে কী করে যোগ দিল? অনুশীলন সমিতি তাদের বিপ্লবী সংগঠনকে অধিকতর শক্তিশালী করার একটা উপায় হিসাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তারা তাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও পন্থা ত্যাগ করে নি। তাই অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ধুরন্ধর বৃটিশ শাসকেরা চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় প্রায় সকল ব্যক্তিকে এবং অনেক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে রাজবন্দী করে বিভিন্ন জেলে রেখেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজীর আন্দোলন কত গুরুত্বপূর্ণ, তা আজ আর কোন ভারতবাসীকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। এই আন্দোলনে চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতির অংশগ্রহণ ও আন্দোলনকে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এই সমিতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মনে পড়ে, সুশীল খাস্তগীরের কথা, সুধাংশু কাঞ্জিলালের কথা। সুশীল ও আমি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে একই শ্রেণীতে পড়তাম। কাঞ্জিলালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম টাউন হল শিবিরে থাকাকালে। এঁরা দুজন অনুশীলন সমিতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এঁরা দুজনই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন এবং নেতাজীর দেহরক্ষী ছিলেন। সুধাংশু কাঞ্জিলাল পেরাসুটে চট্টগ্রামে নেমে আত্মগোপন করেছিলেন। সম্প্রতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী তাঁকে হত্যা করে। নেতাজী কর্তৃক সংগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজে অনুশীলন সমিতির আরো কিছু কিছু সদস্য যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাজীর ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান অপরিসীম। কাজেই পরোক্ষভাবে হলেও উক্ত সংগ্রামে অনুশীলন সমিতিরও অবদান রয়েছে।

মনে পড়ে, চট্টগ্রামের ভাটিখাইন গ্রামের হেম ভট্টাচার্যের কথা। ১৯২৮ সালের প্রথম ভাগে তিনি আমাদের সহরের বাড়ীতে কয়েক মাস ছিলেন। তিনি অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্মী এবং চারুকাকার অত্যন্ত প্রিয়

ছিলেন। তিনি আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন এবং কারাবাস কালে মারা যান।

১৯৩০-৩১ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর অনুশীলন সমিতির নেতাদের মনে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা দেখা যায়। যাঁরা জেলের মধ্যে ছিলেন, তাঁদের সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ধুরন্ধরেরা বিভিন্ন জেলের মধ্যে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট ভাবধারায় লিখিত বহু পুস্তক বিলি করেছিল। জেলে চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির বন্দীদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলেই কমিউনিষ্ট ভাবধারায় প্রভাবিত হন এবং তাঁরা জেল থেকে বের হয়ে আসার পর কমিউনিষ্ট দলে যোগ দেন।

জেলের বাইরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক ভাবধারা টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চলছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে ব্রজেন দাশ ও মহেশ বড়ুয়ার নেতৃত্বে "মিলিটারী স্কোয়াড" গঠিত হয়। তাঁরা আত্মগোপন করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গোপন দলকে সঞ্জীবিত রাখতে বদ্ধপরিকর হন। ঐ সময় ব্রজেনদা কিছুদিন ধলঘাটে আমাদের নিজ বাড়ীতে ছিলেন। তাঁদের চেষ্টা সত্ত্বেও অনুশীলন সমিতির আর বিশেষ প্রসারলাভ ঘটে নি। দলের প্রধান নেতা চারুকাকাসহ অনেকেই সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে ব্রজেনদাসহ অনেকেই কমিউনিষ্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন।

অনুশীলন সমিতির পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র ভারতে একযোগে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করে ভারতের স্বাধীনতা-অর্জন বাস্তবায়িত না হলেও ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলন সমিতির সদস্যদের যথাযথ সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য।

অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন। নানা কারণে তাঁদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই হয়ত অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কর্মীর নাম এ আলোচনায় বাদ পড়েছে। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

চট্টগ্রাম পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের অনুরোধে ও অনুপ্রেরণায় আমি চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে আমার এই সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণা অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছি। ইহা উক্ত সমিতির বিশিষ্ট নেতা সুধাংশু সেন মহাশয়ের অনুমোদনে ও সম্মতিতে প্রকাশ করা হল। এজন্য আমি দু'জনের কাছে কৃতজ্ঞ।

স্বাধীনতার সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালী

শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী

চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া ও গুজরা গ্রামের সংযোগস্থলে বিশ্বেশ্বরী স্কুল। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার চারি পুত্র—নিশিকান্ত, কাশীনাথ, জ্যোতিষ ও ক্ষিতীশ বিশ্বাস। কাশীনাথ ও জ্যোতিষের বিবাহ কলিকাতাবাসিনীর সঙ্গে ঘটিয়াছিল। সুতরাং সর্বদাই তাঁহাদের কলিকাতায় যাতায়াত ছিল। কলিকাতার শিরায় শিরায় যে বিপ্লবের প্রবাহ চলিত, সুদূর চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামেও তাহার স্পন্দন অনুভূত হইত। কাশীনাথ ও ক্ষিতীশ এই প্রবাহের বাহক ছিলেন।

বিশ্বেশ্বরী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ কলিকাতা হইতে সমাগত কাশীনাথ ও জ্যোতিষের প্ররোচনায় নাচিয়া উঠিত। পরবর্তী যুগের খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন এই স্কুলের অন্যতম বিদ্যার্থী ছিল। আমরাও অনেকে তাহার সহপাঠী। সকলে মিলিয়া বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের মুখে কলিকাতায় জাগরণের কথা শুনিতাম।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হয়। বন্যায় দেশ ডুবিয়া গেলে যে প্রকার হাহাকার উঠে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বন্যা ততোধিক হাহাকার সৃষ্টি করিল। বিপ্লবের বন্যায় ভাসিয়া কাশীনাথ ও জ্যোতিষ দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাড়ী [গুজরা নয়াপাড়া-গ্রামে] আসিয়াছেন। চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জার্মান জাহাজের একজন সারাঙ্গ আবদুল কাদেরের নিকট হইতে রিভলভার সংগ্রহ করিয়া যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে [বাঘা যতীন] দেওয়ার দায়িত্ব লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, আবদুল কাদের আমাদের গ্রামবাসী।

কলিকাতায় কালীঘাটে কালীপূজার সময় মহামেলায় এবং টালিগঞ্জের রাসের মেলায় কলিকাতার ছাত্রগণের অভিনয়ে বালক বুদ্ধ ও বদর ফকিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমার যোগ্যতা আছে বুঝাইয়া আমাকে কলিকাতায় আনিতে কাশীনাথ আমার পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া তিনি আমাদের গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ বহুরূপীর পুত্র রমণীরঞ্জনকে দিয়া আমাকে 'মুশ্‌কিল আশান' গানের যোগ্য ফকির বালক সাজাইতে প্রয়াসী হইলেন। তিনদিনের চেষ্টায় আমার 'মুশ্‌কিল আশান'

গায়কের প্রস্তুতি সমাপ্ত হইল। কাশীনাথের কনিষ্ঠ জ্যোতিষ আমার সমবয়স্ক খুল্লতাত ভাই ও সহপাঠী মণীন্দ্রকে বাউল সাজাইবার পরিকল্পনা করিলেন। সেই শিক্ষায় মণীন্দ্রের সফলতার পরিচয় পাইয়া কাশীনাথ ও জ্যোতিষ আমাদের উভয়কে লইয়া নয়াপাড়া হইতে চট্টগ্রাম বন্দরে আসিলেন।

অপূর্ব বহুরূপী সাজ। কাশীনাথ আর কাশীনাথ নাই; তিনি শেখ বদরুদ্দিন। আমিও আর যোগেশ নই, আমি জামীর আলি সাজিয়াছি। জ্যোতিষচন্দ্র বাউল প্রেমচাঁদ এবং মণীন্দ্র বাউল বালক ঠাকুরদাস। মণীন্দ্রের কাঁধে ডুগ্‌ডুগি, আমার কাঁধে এক 'আশা'। মণীন্দ্রের যন্ত্রটা সহজ ও হাল্‌কা; আমার 'আশা' যেমন বাঁকা, তেমন ভারী। একটা সামান্য মোটা বাঁশের ভিতরটায় এক ডজন রিভলভার রাখা হইয়াছে। যে দিকে কাটিয়া রিভলভার ঢুকান হইয়াছে, সেই দিকটা লাক্ষা দিয়া বন্ধ করিয়া তাহাতে সারিবদ্ধ জুতার পেরেকের মত পিতলের পেরেক বসান হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিতে তাহা ঐ 'আশা' নামক লাঠির শোভাবৃদ্ধির অলংকার বলিয়া মনে হয়। শেখ বদরুদ্দিনের (কাশীনাথ) কাঁধেও একটি 'আশা' এবং জামীর আলির কাঁধে আর একটি 'আশা'। প্রেমচাঁদ বাউল ও ঠাকুরদাস বাউলের কাছে আত্মরক্ষার উপযোগী দুইটি রিভলভার ও কিছু কার্তুজ। তাঁহারা দেহরক্ষীরূপে থাকার নির্দেশ পাইয়াছেন। এই সব নামাইয়া দিয়া জার্মান জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়িয়া গেল।

বহুরূপী ফকির-বালকদল রেলপথে কলিকাতা চলিল। কিন্তু সৎ কাজে শত বাধা। পিটার নামক আমাদের গ্রামবাসী একজন খৃষ্টান একই গাড়ীতে কলিকাতা চলিয়াছেন। তিনি পাদরীর প্রচারকের কাজ উপলক্ষে কলিকাতা যাতায়াত করেন। আমাদিগকে এইভাবে চলিতে দেখিয়া পিটার সাহেব বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।

কাশীনাথ ও জ্যোতিষচন্দ্র চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহারা রেলযাত্রীর মনোরঞ্জনের ছলনায় রেলের এক কামরা হইতে অন্য কামরায় বাউল ও ফকিরের গান গাহিতে গাহিতে আমাদিগকে লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। পিটার সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ এইভাবে বন্ধ করা হইল। যদিও কলিকাতার টিকিট ছিল, তবুও ফেনী ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া আমাদিগকে লইয়া তাঁহারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশের পথ ধরিলেন। পিটার সাহেব চাঁদপুরে নামিয়া আমাদিগকে না দেখিয়া চট্টগ্রামের পুলিশের নিকট

গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। এইদিকে অতি সামান্য দূর গিয়া আত্মগোপন করার সুযোগ থাকায় আমরা ঘুমাইয়া রাত কাটাইলাম এবং পরদিন গোয়ালন্দ যাওয়ার পথ পরিত্যাগ করিয়া নোয়াখালী-বরিশাল হইয়া কলিকাতা আসার পরিকল্পনা করিয়া ফেনী ষ্টেশন হইতে গাড়ী ধরিয়া নোয়াখালী আসিলাম। আমরা পরদিন নোয়াখালী হইতে ষ্টীমারযোগে বরিশাল গেলাম। সেখান হইতে সুন্দরবনযাত্রীর এক স্টীমারে উঠিয়া কলিকাতার জগন্নাথঘাটে উপস্থিত হইলাম। আত্মগোপনের বিশেষ প্রয়োজন হইল না। নিরাপদে যতীন্দ্রনাথের ঈপ্সিত বস্তু কাশীনাথের বাড়ীতে আনা হইল।

কাশীনাথ আর বদরুদ্দিন ফকির নাই; তিনি কাশীবাবু হইয়াছেন। বঙ্গবাসী কলেজের সন্নিকটে জেলেপাড়া সংলগ্ন তাঁহার বাড়ী। যতীন্দ্রনাথকে সংবাদ দিয়া আনা হইল। বাঘা যতীনের বাঘমারা শরীর আমার তৃষিত দৃষ্টিপথে আসিল। যতীন্দ্রনাথ যখন আদর করিয়া জামীর আলি নামে ডাকিয়া আমার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বাহুর মাংসপেশী ধনুকের মত বাঁকা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই স্মৃতি আজও মনে আছে।

পরিকল্পিত স্থানে রিভলভারগুলি পৌঁছাইবার উপায় নির্ধারণ করা হইল। আমাকে গাড়ীতে করিয়া এক এক অঞ্চলে নামাইয়া দেওয়া হইল।

আমার গায়ে ছেঁড়া কম্বলের আলখাল্লা থাকিবে, কাঁধে 'আশা' ও ভিক্ষার ঝুলি থাকিবে। ডান হাতে চামড় থাকিবে। আমি গাহিতে থাকিব, 'মুশ্‌কিল আশান কর—মুশ্‌কিল আশান। আল্লা আমায় দোয়া কর, লে লো সালাম'।

সেই 'আশা' কাঁধে লইয়া শ্যামবাজার অঞ্চলের এক এক বাড়িতে আসিয়া গাহিতে লাগিলাম। এই বাড়ি সেই বাড়ি করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলাম। কেহ চাল ভিক্ষা দেয়, কেহ পয়সা দেয়। চলিতে চলিতে এক বাড়ির সম্মুখে মহীয়সী মহিলার সম্মুখীন হইলাম। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি আরম্ভ হইল। এই ভদ্রমহিলা বাঘা যতীনের ভগ্নী বিনোদবালা। তিনি আমাকে ডাকিলেন, 'মুশ্‌কিল আশান—এ দিকে এস। তোমার নাম কি ?'

আমি বলিলাম, 'আমার নাম জামীর আলি।'

তিনি বলিলেন, 'তোমার কাঁধে ওটা কী ?'

আমি বলিলাম, 'এর নাম আশা।'

হাসিতে হাসিতে দেবী বিনোদবালা বলিলেন, 'এই বাঁকাবুঁকা এক বাঁশকে "আশা' বলছ কেন? একটা ভাল লাঠি নেবে?'

আমি বলিলাম, 'না, এ আমার ফকির সাহেবের 'আশা', এটা না থাকলে আমাকে আল্লা মুশ্‌কিল আশান করতে দেবেন না।'

দেবী বিনোদবালা আবার এক গাল হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি ত বড় ফকির হয়ে গেছ; আমাদের ভবিষ্যৎ কিছু বলতে পার?'

সেই সময় ষাটোধিক প্রৌঢ়া এক ভদ্রমহিলা বলিলেন', আহা, ভিখারী ছেলের মুখ একবারে শুকিয়ে গেছে। ওকে আগে কিছু খেতে দাও।'

তিনি ভিতর হইতে কিছু মুড়ি ও মুড়কি আনিয়া আমাকে খাইতে দিলেন। আমি খাইবার উপক্রম করিয়া 'আশা' ও চামড় প্রভৃতি বাহিরের বারান্দার উপর রাখিলাম এবং মুড়ি-মুড়কি আঁচলে লইলাম। হাস্যময়ী মহিলা অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের ভগিনী বিনোদবালা আমার 'আশা'কে হাতে লইয়া দেখার ছলনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মাকে দেখাইবেন—এই ছলনায় ভিতরে লইয়া গেলেন।

এদিকে পাড়ার ছেলেগুলি আমাকে ঘিরিয়া রাখিযাছে। তাহারা আমাকে তখন নানা কথায় খেপাইতে লাগিল। আমিও 'মুস্কিল আশান' গাহিতে গাহিতে তাহাদের তুষ্টিবিধান করিলাম। কিছু সময় কাটাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এই সময়ের মধ্যেই দেবী বিনোদবালা 'আশা' হইতে এক ডজন রিভলভার বাহির করিয়া লইলেন এবং 'আশা'কে উনানে গরম করিয়া লাক্ষা দিয়া বন্ধ করিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

বিনোদবালা হাসিমুখে বলিলেন, 'ফকির, নাস্তা খেয়েছ?'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, বেগমসাহেবা।'

যতটা পারি, মুসলমানী ভাষায় কথা চালাই, যেন কেহ আমাকে হিন্দু বলিয়া সন্দেহ না করে।

বিনোদবালা বলিলেন, 'আবার এস। এই ক'দিনের মধ্যে যে-মুশকিল জমবে, তুমি এসে আশান করে দিও।'

আমি 'আশা' কাঁধে করিয়া চামড় দোলাইতে দোলাইতে বালকদিগের উপহাসের হাসিতে আপ্যায়িত হইয়া পুনরায় সংকেতস্থানে চলিয়া আসিলাম।

যতীন্দ্রনাথের বাড়ীর দ্বারে এইবার বাউল আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার ছেলেদের ভীড় পড়িয়া গিয়াছে। এদিকে বাউল গাহিয়া চলিল, 'মনের মানুষ চেনা বড় দায়, চিনতে হলে কিনতে হবে প্রেমেরই পাল্লায়।' হাসিতে হাসিতে যতীন্দ্রনাথের ভগ্নী দরজায় আসিলেন। বাউল হিন্দু; সুতরাং তাহাকে আঙিনায় নেওয়া যায়। বিনোদদেবী বাউলকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। বাউল গান ধরিল, 'তার ঠাই হবে কার আঙিনায়, মনের মানুষ চেনা বড দায়।' বিনোদদেবী তামাসার ছলে বাউলকে বলিলেন, 'তোমার ডুগড়ুগি বাজে না কেন? দেখি, কেমন তোমার ডুগডুগি?'

ঠাকুরদাস বাউল (মণীন্দ্র) বিনোদবালার হাতে ডুগডুগি দিল। বিনোদদেবী তাহা ভাল করিয়া দেখার ভাণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কাহাকেও দেখাইবার ছলে ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। এদিকে প্রেমচাঁদ (জ্যোতিষ) নাচিয়া গাহিয়া দরজায় দাঁড়ানো সকলকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন। ভিতরে আনীত ডুগড়ুগি হইতে রিভলভার বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে আবার চাউল ভরিয়া দিয়া এবং পূর্ববৎ সাজাইয়া ডুগডুগি ফেরৎ দেওয়া হইল। বাউলের ঝুড়িতে মুড়ি-মুড়কি দিয়া বিনোদবালা আবার সেই হাসির আপ্যায়নে ইহাদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানাইলেন। যতীন্দ্রনাথের গচ্ছিত বস্তু তাঁহার সঙ্কেতস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলা কাশীনাথ, জ্যোতিষচন্দ্র তথা মণীন্দ্র ও আমি নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিলাম। কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইল।

পিটার সাহেব আমাদের স্বগ্রামবাসী। প্রথমে জাতিতে জেলে ছিলেন। খৃষ্টান হওয়ার পূর্বে ও পরে কাশীনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা আসিবার সময় আমাদিগকে ফকিরের বেশে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। তিনি আমাদের রহস্যপূর্ণ গতিবিধির কথা চট্টগ্রামের খৃষ্টানসমাজকে জানাইয়া দেন। চট্টগ্রামের পুলিশ তাঁহাদের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার পুলিশকে সজাগ করিয়াছেন; কিন্তু কলিকাতার পুলিশ আমাদের গতিবিধির কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কয়েকদিন পরে পিটার সাহেব স্বগ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছেন। কাশীনাথ তাঁহাকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি অতিরিক্ত মদ

খাইয়া প্রায় অচল হইয়া পড়িলেন। কাশীনাথ অচলপ্রায় পিটারকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দেওয়ার পথে ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র বড়ুয়ার বাড়ীর পেছনের গড়ের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে পিটারের জীবনের অবসান হইল।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে চন্দ্রনাথ তীর্থে শিবরাত্রির মেলা। কাশীনাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া আমাকে ও মণীন্দ্রকে সেই মেলাতে লইয়া গেলেন। আমাদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, কৌপীন পরাইয়া, ভস্ম মাখাইয়া নাগাবাবা করা হইল। আমাদের বটুয়া বা ঝোলার মধ্যে কার্তুজ এবং পিতলের সিঙ্গার মত নাগফণী নামক বাদ্যযন্ত্রের ভিতর একটি করিয়া রিভলভার রাখা হইল। বাম দিকের বগলের নীচে নাগফণী ও বটুয়া ঝুলিতে লাগিল। ডান হাতে চিমটা রহিল।

শিবরাত্রির মেলার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম। কাশীনাথের স্ত্রী আমাদের সঙ্গে একই গাড়ীতে চলিয়াছেন। তিনি আমাদের ভিক্ষাদাত্রী এবং আমাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথ আদিনাথ দর্শনে আগত যাত্রী বলিয়া পরিচয় দিলেন। আমাদের সাহচর্যে তাঁহার যাত্রা সফল হইল—তিনি বারবার এই উক্তি করিতে লাগিলেন। সাধুদের মধ্যে কাহারও টিকিট আছে, কাহারও নাই। আমরা এক শেঠানী মা পাইয়া ভালভাবে খাইয়া পরিয়া টিকিট করিয়া যাইতে পারিতেছি।

গোয়ালন্দে আসিয়া গাড়ীতে দাঁড়াইবার স্থানও পাইতেছি না—এমন অবস্থা। আমরা যেন স্থানাভাবে মেয়েদের গাড়ীতে উঠিলাম। কয়েক জন মুসলমান নারী আপত্তি তুলিলেন। হিন্দু নারীরা সশ্রদ্ধ সহানুভূতি জ্ঞাপন করায় আমরা বাঁচিয়া গেলাম। তাঁহারা আমাদের খাইতে দিলেন এবং আমরাও তাঁহাদিগকে গান শুনাইতে লাগিলাম।

আমরা নিরাপদে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে কাশীনাথের ছোট ভাই জ্যোতিষচন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম; কিন্তু আমরা শিয়ালদহে সাধুর জমায়েতে কোথাও আসন পাতিবার ছলনা করিতে লাগিলাম, কিছুক্ষণ পরে লোকচক্ষে ধূলি দিয়া জ্যোতিষচন্দ্রের সঙ্গে চলিলাম।

জ্যোতিষচন্দ্র সাধুসেবার অভিনয় করিয়া কাশীনাথের স্ত্রীসহ আমাদের দুইজনকে লইয়া শ্যামবাজারের দর্জিপাড়ার দিকে চলিলেন। আবার সেই

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। গাড়ী হইতে দ্রুতপদে কাশীনাথের স্ত্রী নামিয়া বলিলেন, 'ও দিদি, দেখ চন্দ্রনাথতীর্থ থেকে দুটো বালক সাধু ধরে এনেছি। কি সুন্দর গান করে! তাই তোমাকে দেখাতে আনলাম, শোন শোন, একবার ওদের গান শোন।'

আবার সেই বিনোদবালা একগাল হাসিয়া বলিলেন, 'গান শুনব কি! আগে ওদের সেবা করি। বাঃ, বেশ সুন্দর নাগাবাবা।' —এই বলিয়া আমাদিগকে বসিতে দিলেন। আমাদিগকে আহার করিতেও বলিলেন। আমরা বলিলাম, 'আমাদের খাবার আমাদের বটুয়ার মধ্যে ভরে দিন।'

বিনোদবালা বটুয়া দুইটি ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া ঐ বস্তুগুলি (কার্তুজ) গ্রহণ করিয়া এবং মুড়ি-মুড়কি তাহাতে ভরিয়া দিয়া বটুয়া ফেরৎ দিলেন। এইবার বিনোদবালার দৃষ্টি সিঙ্গাসদৃশ নাগফণীর উপর পড়িল। সবিস্ময়ে বিনোদবালা নাগফণী দেখার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং কাহাকেও দেখাইবার ভাণ করিয়া নাগফণী দুইটি বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন। রিভলভার দুইটি বাহির করিয়া লইয়া আবার নাগফণী দুইটি ফেরৎ দিলেন। আমরা নাগফণী বাজাইয়া পাড়াপ্রতিবেশীকে চমকাইয়া দিলাম এবং একটি গান শুনাইয়া সমবেত সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া কিছু ভিক্ষার পয়সা আদায় করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছি। কাশীনাথের স্ত্রী ও জ্যোতিষ গাড়ী লইয়া আসিয়া সাধু দেখার ছলনায় সেখানে নামিলেন এবং সাধুদিগকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেবা করার অভিনয় করিতে গিয়া আমাদিগকে টানিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে উঠাইলেন। নির্বিঘ্নে তাঁহাদের বাড়ী পৌঁছিয়া বিজয়যাত্রীর অভিযানে দ্বিতীয় পর্ব সমাধান করিলাম। পরদিনই জ্যোতিষচন্দ্র আত্মীয়বিশেষকে সঙ্গে দিয়া আমাদিগকে চট্টগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের বিশ্বেশ্বরী স্কুলের পাঠ সমাপ্ত হইল। সূর্য চট্টগ্রাম সহরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতে গেল। আমি পার্বত্য অঞ্চলের প্রারম্ভস্থ মহামুনি স্কুলে ভর্তি হইলাম। এইখানে ঘটনাচক্রে অম্বিকা চক্রবর্তী আমার সান্নিধ্যে আসিল। স্কুল বোর্ডিংয়ে থাকিয়া অম্বিকার গৃহশিক্ষকরূপে জীবিকার্জন করিয়া আমাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে।

পরে অম্বিকার মাধ্যমে আমি সূর্য সেনের সহিত ভাববিনিময় করিবার সুযোগ পাইলাম।

পূজার ছুটিতে কাশীনাথ গ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছেন। কাশীনাথ আমাকে আরাকানী ভিক্ষু সাজাইলেন, বৌদ্ধভিক্ষুর কাষ্ঠনির্মিত ভিক্ষাপাত্র গলায় ঝুলাইয়া দিলেন। তাহার দুই দিকে বাঁধনের মধ্যে দুইটি রিভলভার রাখা হইল। হরিদ্রাবসন, মুণ্ডিতমস্তক আরাকানী ভিক্ষু সাজিয়া চলিলাম। চট্টগ্রাম হইতে জাহাজে বরিশাল আসিলাম। বরিশালে কিছুসংখ্যক আরাকানী বৌদ্ধ বাস করেন। উক্ত বৌদ্ধদের নিকট চট্টগ্রামী ভিক্ষু বলিয়া পরিচয় দিয়া ভিক্ষা আহরণ করিলাম। বরিশাল হইতে ষ্টীমারে করিয়া কলিকাতা জগন্নাথ ঘাটে আসিলাম। কাশীনাথ ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে আছেন। জেলেপাড়ায় আসিয়া কষ্টার্জিত সম্পদ কাশীনাথের বাড়ীতে পৌছাইয়াই ভদ্রবেশে পরদিন চট্টগ্রাম মেলে ফিরিয়া গেলাম। কাঠবিড়ালীর তৃতীয় পর্বও সমাপ্ত হইল।

কয়েকদিন পরে কাশীনাথের বাসস্থানের অদূরে সার্পেণ্টাইন লেনে পুলিশ ইন্সপেক্টার নন্দকুমারকে হত্যা করা হইল। দেশমাতৃকার নীরব কর্মী-দীন সেবকের আনীত রিভলভারের দ্বারা এই কার্য সমাপ্ত হইল। ঐ হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে কাশীনাথকে গ্রেপ্তার করা হইল। ইহার পর হইতে কাশীনাথের অবস্থা শোচনীয় হইল। পুলিশের অত্যাচারে তাঁহার দেহ জর্জরিত হইল। পুলিশের দেওয়া একটা ইন্‌জেকশনের ফলে তাঁহার দেহের গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া বড় হইতে লাগিল। কাশীনাথ অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেন।

আমি ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছি। আমার গতিবিধি ধর্মের দিকে; কিন্তু দেশসেবা ও ধর্মানুশীলন এক করিয়া ফেলার বুদ্ধি আমাকে সমস্ত দল হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ধার্মিকগণের চক্ষে আমি উচ্ছৃঙ্খল, কর্মবন্ধনে আবদ্ধ পশু। দেশসেবকগণের চক্ষে আমি অন্ধবিশ্বাসী অকর্মণ্য।

এখনও কাশীনাথ বাঁচিয়া আছেন, যতীন্দ্রনাথ সমরাঙ্গনে আছেন। কাশীনাথ অচল হওয়ায় যতীন্দ্রনাথের সহিত যোগাযোগ করা কঠিন হইয়াছে। গোপন বিপ্লবী দলের চক্রব্যূহে প্রবেশ করার অগ্রদূতের অভাবে প্রকাশ্য আন্দোলনকর্মীদের পিছনে পা ফেলিয়া চলিয়াছি।

চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে অস্ত্রসংগ্রহ কাশীনাথের অসুস্থতায় অসম্ভব বুঝিয়া যতীন্দ্রনাথ উড়িষ্যার বালেশ্বরে গোপনকেন্দ্র গড়িয়া চলিয়াছেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমার বি. এ. পাশ করিবার পূর্বেই কাশীনাথের কাশীপ্রাপ্তি ঘটিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমার বি. এ. পরীক্ষার প্রাক্কালে শরীর অত্যন্ত রুগ্ন হওয়ায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে কক্সবাজারে সমুদ্রতীরে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়াছি। ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাস সেখানে অন্তরীণ অবস্থায় আছেন। অপূর্ব যোগাযোগ! চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করিল; কিন্তু কাঠবিড়ালীর হনুমানের সম্মুখে সভয়ে উপস্থিত হইতে হইত। আমাদের পরস্পরের আলাপের মধ্যে সফলতার সোপানগুলি ফুটিয়া উঠিল।

সমুদ্রের চড়ায় দুইজনে বেড়াইতেছি, অদূরে সম্মুখে জার্মান ডুবজাহাজ এমডেন ভাসিয়া উঠিল। যাত্রিগণের দুইজন নামিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথা বলিয়া আধ ঘণ্টা পরে বিদায় গ্রহণ করিল। যাওয়ার সময় করমর্দন করিতে গিয়া দুইজনের হাতের মধ্যে দুইটি রিভলভার (কার্তুজশূন্য) দিয়া চোখের উপর অদৃশ্য হইল।

আমি সরকারী উকিল দীনবন্ধু চক্রবর্তী মহাশয়ের অতিথি। তাঁহার ঘরে রিভলভার রাখা সম্ভব নয়। তাই পূর্ণবাবু তাহা কৌশলে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বি. এ. পাশ করিলাম। দর্শনে এম. এ.-ও পাশ করিয়াছি। মনোবিজ্ঞান শ্রেণীতে পড়িতে আবার প্রবিষ্ট হইলাম; সেখানে সুভাষচন্দ্রের পাশে (তখন তিনি নেতাজী হন নাই) বসার অভাবনীয় সৌভাগ্য লাভ করিলাম। আমার বিদ্যারম্ভে আমি গ্রাম্য মধ্য ইংরাজী স্কুলে সূর্য সেনের সহপাঠী। বিদ্যাসমাপ্তির সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী হওয়ার সৌভাগ্য ভগবান আমাকে দিয়াছেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের এম. এ. শ্রেণীতে পড়িতেছি। মহারাষ্ট্রের নেতা গোখেলের দল কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহারা বোম্বাইতে 'সারভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রচলিত

করিয়াছেন। বাংলার ছাত্রগণের মধ্যে সেই ভাব প্রসারিত করিবেন। তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহাদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া সরিয়া আসিলাম।

আর এক বিপ্লবের বন্যা আনিলেন আয়ার্ল্যাণ্ড-দুহিতা এ্যানি বেশান্ত। তিনি সাধনজগতের নেত্রীত্ব লইয়া ভারতে আসিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে নেত্রীত্ব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আয়ার্ল্যাণ্ড তখন বৃটিশরাজ্য হইতে পৃথক হইতেছে। ডি. ভ্যালেরার নেতৃত্বে আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি তখন আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর। আয়ার্ল্যাণ্ড-দুহিতা বলিয়া গর্ব করিয়া ভারতকে আয়ার্ল্যাণ্ডের মত বৃটিশ কবলমুক্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জানাইয়া এ্যানি বেশান্ত বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় বাংলার ছাত্রসমাজ মাতিয়া উঠিয়াছে। আমি চট্টগ্রামের বীরসাধক শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মাধ্যমে এ্যানি বেশান্তের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হোমরুল লীগে প্রবেশ করিলাম। বাংলার নেতৃগণ বাংলার মৌলিক ভাবধারার উৎকর্ষসাধন ভিন্ন বিদেশীয় ভাবধারার প্রবর্তন সহ্য করিলেন না। সিংহগর্জনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার গতিরোধ করিলেন। বাংলার বিপ্লবে সুরেন্দ্রনাথ নরম দলে এবং বিপিনচন্দ্র গরম দলে বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারা পরস্পরদ্রোহী ছিলেন; কিন্তু এখন এ্যানি বেশান্তের বিরোধিতায় একমত হইয়াছেন। এই বিপ্লবের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার আকুলতা দেখিয়া আমি হোমরুল লীগ হইতে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে চলিয়া আসিলাম।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এম. এ. পাঠ শেষ করিয়া সায়েন্স কলেজে মনোবিজ্ঞানের এম. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছি। সেখানে অদ্ভুতদর্শন সুভাষচন্দ্র বসুর পাশে বসিতে পারায় বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সুভাষবাবু অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে বাঙ্গালীর মর্যাদাহানিকর মন্তব্যের জন্য প্রহার করায় দুই বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কয়েক মাস দুইজন এক সঙ্গে ছিলাম। একে অন্যের স্বপ্নের সংবাদ লইয়াছি। এই সংবাদের মধ্যে আত্মগোপন করার কৌশলশিক্ষার বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কয়েক মাস পরে আই. সি. এস. পড়ার জন্য বিলাত গেলেন।

আমার এই অন্তরঙ্গ সঙ্গীর অভাব পূরণ করিলেন আর এক গৌরবচরিত অথচ নীরব কর্মী হরিনারায়ণ চন্দ্র। সুভাষবাবুর মুখে আমি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামীর স্বরাজ্যসাধনার [স্বায়ত্তশাসন] কথা শুনিয়াছিলাম। মনোবিজ্ঞানের তান্ত্রিক শিক্ষার প্রসঙ্গে এই সাধকশিরোমণির নাম দৃষ্টান্তস্থলে বলা হইয়াছিল। সন্ধানের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সুযোগও আসিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কোনও শিষ্যের এক পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। আমার ছাত্র গৌরাঙ্গসুন্দর, তাহার পিসতুত দাদা হরিনারায়ণ ও ছোট ভাই গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। এই চন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম চট্টগ্রামের বিপ্লবীগণের মধ্যে অবিস্মরণীয়। এই অবিস্মরণীয় কথা গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাহার 'অবিস্মরণীয়' নামক গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস-বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছে। ঐ গ্রন্থে এই প্রবন্ধের লেখককর্তৃক হরিদার সাহচর্যলাভের কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

হরিনারায়ণ এখন অনেক গুপ্ত-ষড়যন্ত্রকারীর প্রেরণার উৎস। মাষ্টারদা সূর্য সেন এবং তাহার অনেক সহকর্মী এই হরিনারায়ণের নিকটও বোমা প্রস্তুত করা শিখিয়াছে। তাহারা চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করিয়াছে কলিকাতার বড়বাজারের লোহাপট্টির ৩নং ময়রাপট্টিতে। হরিদার সঙ্গে আমি ইহাদিগকেও দেখিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি বাচাল হইয়া গিয়াছি। বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছি বলিয়া ইহারা আমাকে অন্তরঙ্গ মনে করিত না। তবুও বহিরঙ্গ আলোচনায় আমাকে স্থান দিত।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বৃটেন ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের পরিকল্পনায় কর্ণেল ওয়েজউড বেনকে ভারতে পাঠাইয়াছেন। দেশবন্ধু দাশ, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত, দেশপ্রাণ শাসমল তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবেন। কলেজ স্কোয়ারে সংস্কৃত কলেজ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন করা হইয়াছে। লোক-সমাবেশের আধিক্য দেখিয়া বেন সাহেবকে ভিড়ের মধ্যে আনা কষ্টকর মনে করিয়া উক্ত স্কোয়ারের অপর দিকে তাঁহারা সভারম্ভ করিলেন। ছাত্রগণ তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বেন সাহেব ও নেতৃবৃন্দকে এই সমাবেশে আসিতে বাধ্য করিল। এই বিদ্যার্থিবিক্ষোভে আমাকে অগ্রণী করা হইয়াছিল বলিয়া আমি নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচিত হইলাম। দেশপ্রিয়ের সহিত পূর্বেই পরিচিত ছিলাম। দেশপ্রিয় আমাকে দেশবন্ধু ও দেশপ্রাণের দৃষ্টিপথে আনিলেন।

চট্টগ্রামের কলিকাতা-প্রবাসী ছাত্রগণ তৎকালে 'চট্টগ্রাম সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করিয়া চট্টগ্রামের সমস্ত লোককে সংঘবদ্ধ রাখিত। বিজ্ঞানাচার্য প্রিয়দারঞ্জন

রায় এক সময় সম্পাদক ছিলেন। ডাঃ রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত ও আমি তাঁহার সহকারী ছিলাম। শ্রদ্ধেয় মোক্ষদা বিশ্বাস ৩১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে 'চট্টলা মেস' এবং শ্রদ্ধেয় শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী ২৮/এ শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে 'ব্রহ্মচারী ভবন' করিয়া কলিকাতায় অবস্থানকারী চট্টগ্রামের ছাত্রগণকে চট্টগ্রাম হইতে আগত চট্টগ্রামবাসী ছাত্রগণের সহিত মিলনের সুযোগ দিতেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবে। ছাত্রদিগকে ডাক দিলেন এবং ছাত্র-সভায় ছাত্রসভাপতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি একবার এম. এ. পরশ করিয়া আবার পড়িতেছি। সুতরাং বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া সভাপতিত্ব করার জন্য আমার ডাক পড়িল।

ওয়েলিংটন (সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে সভা। গান্ধীজীর ভাব ও ভাষায় উৎসাহ ছিল, উত্তেজনা ছিল না। বিশ্বাস ছিল, আশ্বাস ছিল, কিন্তু উচ্ছ্বাস ছিল না। আমার বক্তৃতা তদ্রূপ হইতে পারে না। এত বড় জনসভায় জীবনে এই প্রথম বলিতে উঠিয়াছি। সাধারণ বক্তারূপে না বলিয়া একেবারে সভাপতিরূপে বলিতে বাধ্য হইয়াছি। বাংলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাঁহাদিগকে যে সুরে বলিতে শুনিয়াছি—তাহা অনুকরণ করিয়া বক্তৃতা করিলাম। মহাত্মাজী আমার কথায় বাংলার প্রকৃত রূপের পরিচয় পাইয়া ৬ই ডিসেম্বর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় 'গোপনীয়তা পাপ' প্রসঙ্গে লিখিলেন, তাঁহার এই ছাত্র-সভাপতি গোপন ষড়যন্ত্রকারীদলের লোক শুনিয়া তিনি বিস্মিত, বাংলা গোপন ষড়যন্ত্রকারীর দেশ —বাংলা প্রকাশ্য আন্দোলনকারীর দেশ নয়।

বড়দিনের বন্ধে নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী-সম্মেলন করার ভার আমার উপর পড়িল। দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয় মহাত্মাজীর পক্ষে দাঁড়াইবেন। আমাদিগকেও তাঁহার পক্ষে থাকার কথা বলিতেছেন; কিন্তু বিপিনচন্দ্র দেশবন্ধুর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াও ভিন্ন মত পোষণ করিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক অল্পদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভারতের লাল-বাল-পাল—এই ত্রিমূর্তির লাল মহাত্মাজীকে সমর্থন করিয়াছেন। তথাপি একা পাল মহাত্মাজীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কংগ্রেসে অনুমোদিত হইল। ছাত্রসম্মেলনের সভাপতি লালা লাজপত রায়, আমি তাঁহার সহকারী। তিনি দিকে দিকে আমাকে পাঠাইতেছেন, কিন্তু

অহিংস মনোবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কথা বলিতে ও কাজ করিতে তিনি আমাকে সতর্ক রাখিতেছেন। আমি এই অহিংস আন্দোলনের পশ্চাতে হিংসার পথ প্রশস্ত হয় কিনা এবং তদ্দ্বারাই সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করিতে সকলে সচেষ্ট কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে থাকিলাম। দেখিলাম—বাংলার প্রায় অধিকাংশ লোক যেমন মৌলিক চিন্তা করিতে পারদর্শী, অন্য প্রদেশে অধিকাংশ লোক তেমনই পরানুবর্তিতায় পারদর্শী। গান্ধীজীর কথাই বেদবাক্য, তাঁহাকে বিচারের প্রয়োজন নাই, ফলাফল তাঁহার হাতে ইত্যাদি কথাই অন্যান্য প্রদেশে শুনিতেছি। জানিতাম ও শুনিতাম, বাঙ্গালী জাতিই ভাবপ্রবণ জাতি; কিন্তু দেখিলাম—বাঙ্গালীতে তবুও বিচার আছে, অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে তাহার মাত্রা অতি অল্প।

মাত্র তিন মাসের মধ্যে গান্ধীজী মহাত্মাজী হইতে অবতারের পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন। অহিংস আন্দোলন অল্পায়ু বুঝিয়া পথ-পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছি, এমন সময় পাশ্চাত্যদেশে ভারতের অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য ডাক আসিল। কংগ্রেসের অর্থ আছে, কিন্তু ছাত্রসম্মেলনের অর্থ নাই—অর্থ-সংগ্রহের উপায়ও নাই। অহিংস আন্দোলনে সশস্ত্র ডাকাতির পথ রুদ্ধ দেখিয়া নিরস্ত্র ডাকাতির পথ ধরিলাম।

নিরস্ত্র ডাকাতির নাম চুরি ও জুয়াচুরি বা প্রতারণা। আমি এম. এ. পাশ বলিষ্ঠ সুন্দর যুবক। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রতারণা করার উপকরণ আমার আছে। অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ একজনকে আবিষ্কার করিলাম। চুক্তি-নামায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করার সর্তে সম্মতি দিয়া রেজেস্ট্রীকৃত দলিলের বিনিময়ে ২১ হাজার টাকা লইয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছি। ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ করিতেছি ও করাইতেছি। তাই বিলাত যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। খিদিরপুরের চট্টগ্রামী মুসলমান খালাসীগণের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া আবার জামীর আলি নাম ধরিয়া লণ্ডনযাত্রী জাহাজে যাত্রা করিলাম। ভাবী শ্বশুর লণ্ডনস্থ আত্মীয়ের নিকট টাকা পাঠাইয়াছেন; কিন্তু খালাসীরূপে আত্মগোপনকারীকে অভ্যর্থনা করার কেহই নাই। খালাসীর ছাড়পত্রে লণ্ডনে নামা যায়, থাকা যায় না। কাপ্তেন সাহেবের পত্নী তাঁহার পরিচিত লোকের মাধ্যমে আমার লণ্ডন থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পাশ্চাত্যদেশ-পরিভ্রমণে আমি জোসেফ নাম গ্রহণ করিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে ভারতের অনুকূলে জনমত গঠন করিতে করিতে কঠিন চেষ্টায় মস্কো যাইবার অনুমতি পাইলাম। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী মস্কোয় পৌঁছিয়া তথায় এক মাস অবস্থান করি। ৩রা ফেব্রুয়ারী মহামতি লেনিনের দর্শন পাওয়ার সুযোগ ঘটিল। তাঁহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি, সহাস্যবদন, সহৃদয় ব্যবহার আমাকে চিরতরে তাঁহার আপন করিয়া রাখিয়াছে। দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা হইত। আমার মুখে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। তিনি অনেক কথার মধ্যে একটি স্মরণীয় কথা বলিয়াছিলেন, 'Hindu Religion may be fine in principle, but for its foul application India is yet in fallen condition,'

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে ফিরিয়াছি। তখনও তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ চলিতেছে। আমি তাহাতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের হাতে ধরা পড়িলাম; কিন্তু ব্যবসায়ীগণ পুলিশকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করায় আমি বিনাবিচারে অব্যাহতি পাইলাম। তৎপর আমি কোকনদ কংগ্রেসে গেলাম, বিদ্যার্থী-সম্মেলনে আমাকে সম্পাদক করা হইল। সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত [পরবর্তীকালে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রী]। আমরা 'ষ্টুডেণ্ট' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিলাম। ৩নং ময়রা পট্টীতে থাকি। সেখানে হরিনারায়ণ চন্দ্র আছেন। তাঁহার অতিথি জুলুদা [নগেন সেন] ও মাষ্টারদা সেখানে আসাযাওয়া করেন। হরিদা শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা হইতে শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধগুলির ভাষার ইতরবিশেষ করিয়া 'ষ্টুডেণ্ট' কাগজে ছাপাইতে দিতেন। হরিদার ছোট ভাই গঙ্গানারায়ণ তখন ছেলেমানুষ। সে এই পত্রিকা ফেরি করিত। নিরঞ্জন ব্যয়ভার বহন করিত। সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে অনুশীলন প্রেসের নলিনীকান্ত গুহ এই পত্রিকার মুদ্রক।

সুভাষবাবু বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে আমিও তাঁহার সহকর্মী। তিনি যুবসম্মিলনী গঠন করিয়াছেন। একদিন তিনি 'ষ্টুডেণ্ট' অফিসে আসিয়া বলিলেন, নিরঞ্জন রাশিয়ার টাকায় পত্রিকা ছাপাইতেছে— এই যুক্তিতে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিবে। আমি সম্পাদক এবং নিরঞ্জন

সহকারী সম্পাদক। দুইজন দুই দিকে পালাইলাম। আমি গৌহাটি শ্মশানে নাগাবাবা ঋিদলানন্দ। প্রায় দুই মাস কাটিল। গৌহাটি পুলিশ সন্দেহ করিতেছে; কারণ নাগা হইয়াও গাঁজায় দম দিতে পারি না। রাখেন কৃষ্ণ মারে কে? হরিদা পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন। হরিদা তাঁহার ভগ্নীপতি মহানন্দ নন্দীকে পুলিশের গতিবিধি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। মহানন্দদা আমাদের গুরুদেব শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজকে এই কথা জানাইয়াছেন। গুরুদেব তাঁহার অন্যতম ভক্তশিষ্য, কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ব্রজবিহারী বর্মণকে বলায় বর্মণদা তাঁহার উপরিস্থ টেগার্ট সাহেবকে বলিয়া আমার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বেলগাঁও কংগ্রেসে গিয়াছি। দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ও চট্টলগৌরব মহিমচন্দ্র দাসও গিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে চট্টগ্রামের এই দুইজন নেতার সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ পাইলাম। দেশপ্রিয় আমাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন যে, ব্রজবিহারী বর্মণ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এইবার টেগার্টের হাতে আমার রক্ষা নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি, হরিদা ও তাঁহার চট্টগ্রামবাসী সহকর্মিগণ দক্ষিণেশ্বরে কোথাযও আশ্রয় লইয়া চট্টগ্রামে কোনও মহৎকার্যের পরিকল্পনায়-ব্রতী।

আমি দেশপ্রিয়ের সতর্কতা এবং বন্ধুবর্গের উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া সাধুর ছদ্মবেশে নেপালে চলিয়া গেলাম। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাঠবিড়ালী এইরূপে ধর্মারণ্যে আত্মগোপন করিল বটে, কিন্তু তাহার আবাল্য জাগ্রত বিদ্রোহানল ভস্মাবৃত বহ্নির মত তাহাকে এখনও ধর্মানুশীলনের মাধ্যমে দেশসেবকের কার্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছে।

বার্মায় চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রভাব

শচীন্দ্রনাথ গুহ

১৯৩০ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর ঐ অভ্যুত্থানের সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা সূর্য সেনের নির্দেশে মে মাসের মাঝামাঝি আমি বার্মা থেকে চট্টগ্রামে চলে আসি। কিছুদিন পর মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। এই সাক্ষাৎকার ঘটে সারোয়াতলী গ্রামের বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী অর্ধেন্দুদার [অর্ধেন্দু দত্ত] বাড়ীতে।

মাষ্টারদাকে সেদিন দেখে অভিভূত হলাম। এই রকম একজন ক্ষীণদেহ মানুষের মধ্যে বিপ্লবের বহ্নি কী করে থাকতে পারে ! এক টুকরো চটের উপর উপবিষ্ট এই প্রশস্তললাট, শান্তসৌম্য মানুষটির চোখ থেকে বের হচ্ছে যেন বহ্নিশিখা !

ধোরলা গ্রামের বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী সারদাদা [সারদা শীল] আমার পরিচয় দেওয়ার পর মাষ্টারদা অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন : বস।

আমি পায়ের ধুলো নিলাম। মাষ্টারদা আমার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর নীরব—শুধু তাকাচ্ছিলেন আমার চোখ-মুখের দিকে। তাঁর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তাৎপর্য বুঝতে পারলাম পরে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ একটি অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন : তা হলে সত্যি সত্যি তুমি আর রেঙ্গুন যাচ্ছ না ?

এই রকম প্রশ্ন কেন ? তাঁর নির্দেশেই তো চলে এসেছি বার্মা থেকে। আমি উত্তর দেওয়ার অবকাশ পেলাম না। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন : কয়েক দিন পরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আজ যাও।

আমার চোখমুখ দেখেই কি আমার অন্তরের পরিচয় পেলেন ?

১৯২৮ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রেঙ্গুন চলে গেলাম। আমার কাকা শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় গুহ কাজ করতেন বার্মা একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে। তাঁর ইচ্ছা, আমি সেখানকার কোন কলেজে পড়ি। আমার ইচ্ছা, সেখানে পড়া এবং বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা।

এই প্যাগোডাসজ্জিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিকেতন বার্মার প্রতি আমার আকর্ষণ বহুদিনের। চট্টগ্রামের বহু ব্যক্তি সেখানে নানাভাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁরা চট্টগ্রামে এলে তাঁদের কাছে শুনতাম আকর্ষণীয় বিবরণ। ভারতের [বার্মা তখনো বৃটিশের ভারত সাম্রাজ্য-ভুক্ত] স্বাধীনতা-সংগ্রামে বার্মার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত উপযোগী বলে আমার সেই বয়সে একটি অস্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল। বার্মায় যাওয়ার মূলে এই ধারণাও আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

বার্মায় যাওয়ার এই সংকল্পের কথা আমি নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী কর্মী অর্ধেন্দু দস্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, সারদা শীল, আমাদের কানুনগোপাড়া গ্রামের হিমাংশু চক্রবর্তী [দেওয়ানজীদা] এবং আমার সহপাঠী ও বিপ্লবী বন্ধু রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে জানালাম। তাঁরা সানন্দে সম্মতি দিলেন। তাঁরা বললেন: নির্মলদা [বিপ্লবী নেতা শহীদ নির্মল সেন] ও মণিদা [বিপ্লবী নেতা মণীন্দ্র মজুমদার] বেশ কিছুদিন বার্মায় থেকে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়েছেন। তাঁরা চলে আসার পর সেখানে আমাদের বিশেষ কেউ নেই। তুমি গিয়ে সেখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে যথাকর্তব্য সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবে।

বেশী দিন নয়, বার্মা বৃটিশের পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। ১৮৮৫ খৃঃ বার্মার শেষ রাজা থিব মিনকে [১৮৭৫-৮৫] সিংহাসন-চ্যুত করে বৃটিশ-শক্তি সমগ্র বার্মা দখল করে। পরাধীনতা বার্মার অধিবাসীদের মনে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড দাবদাহ।

বিক্ষুব্ধ বর্মীরা স্বদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃটিশের শাসনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে; কিন্তু সে প্রচেষ্টা যথাযথ সুসম্বদ্ধ ও সুসংগঠিত নয়। বর্মীদের বিক্ষুব্ধ অন্তরের সুসম্বদ্ধ ও সুসংগঠিত প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯১৩ খৃঃ ঝালুন বিদ্রোহে। এর পর থেকে দেখা যায় বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত বিদ্রোহ।

এই বিক্ষুব্ধ বার্মা ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে বিপ্লব-প্রচেষ্টার নবদিগন্ত হিসাবে দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকে বহু ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী বিপ্লবী বার্মায় গিয়ে এই স্বাধীনতা-প্রয়াসী বর্মী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রথম মহাযুদ্ধের সুরুতেই (১৯১৪ খৃঃ) ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে বিদ্রোহ করার জন্য

উত্তেজিত করেন। কয়েকমাস পরে আমেরিকা থেকে গদর পার্টির কয়েকজন সদস্য গোপনে বার্মাতে এসে ঐ সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সিঙ্গাপুরে বহু সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু অতি নির্মমভাবে দমন করা হয় প্রত্যেকটি বিদ্রোহ।

১৯২৮ খৃঃ ২রা জুন রেঙ্গুন যাত্রা করি। জাহাজে আমার সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম অনুশীলন দলের বিশিস্ট সদস্য ও পরবর্তীকালে বার্মার একটি বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা শ্রীনগেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত। তিনি আমার আত্মীয়—ভগ্নীপতি। আমি সূর্য সেন-পরিচালিত বিপ্লবী দলের কর্মী হলেও নগেনদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ।

৭ই জুন রেঙ্গুন পৌঁছি। সেদিন বিকেলবেলা শ্রীদিনরঞ্জন চৌধুরী নামক আমার পূর্বপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর বাগানে বেড়াতে যাই। দেখলাম, বিল্ডিং-এর সিঁড়িতে বসে একটি কিশোর গান্ধীজী-রচিত 'আমাদের স্বরাজ' বইটি পড়ছে। কিশোরটি দিনরঞ্জনবাবুর পরিচিত। তাই আমরা গিয়ে বসলাম তার পাশে। সেই কিশোর আর দিনরঞ্জনবাবুর মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা সুরু হল। দিনরঞ্জনবাবু গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনের সমর্থক আর কিশোরটি বলছে: সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া স্বাধীনতা-অর্জন অসম্ভব। দুজনের মধ্যে আলোচনা ক্রমে কথা কাটাকাটিতে পরিণত হয়। এই সময়ের মধ্যে আমি কিশোরটিকে সমর্থন করে দুচারটি কথা বলি।

সন্ধ্যা হয়ে এল। দিনরঞ্জনবাবু ও আমি একটি ফটক দিয়ে বের হলাম। কিশোরটি অন্য ফটক দিয়ে বের হয়ে গেল। দিনরঞ্জনবাবু আগে আর আমি তাঁর পেছনে। আমরা স্পার্ক ষ্ট্রীট পার হয়ে ফুটপাতে উঠেছি, হঠাৎ আমার পেছনে জামায় সামান্য টান পড়ল। তাকিয়ে দেখি—সেই কিশোরটি। চুপি চুপি বলল: কাল ৪-টায় নিশ্চয়ই আসবেন।

বুঝলাম, এই আহ্বান আমার আলোচনায় অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি। পরস্পরের মনের কথা একই।

পরদিন যথাস্থানে যথাসময়ে গিয়ে দেখি, কিশোরটি আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝতে পারলাম, মনের মানুষের সন্ধান মিলেছে। এর পর বহুদিন আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল সম্পর্কে তখনকার দিনে আমার যতটুকু জানা ছিল, সব কিশোরটিকে বললাম। সেও বার্মার বিপ্লবী দল সম্পর্কে আমাকে কিছু কিছু সংবাদ দিল।

এই কিশোরের নাম জিতেন দাশগুপ্ত। রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমীর নবম শ্রেণীর ছাত্র।

জিতেন ছিল অত্যন্ত তেজস্বী ও সাহসী। একদিন একজন হিন্দীভাষী গয়লার সঙ্গে একটি জেরবাদী [যার মা বার্মার মেয়ে ও বাবা মাদ্রাজী মুসলমান] ছেলের ঝগড়া হয়। ছেলেটি গয়লার দুধ ফেলে দেয়। জিতেন এই অন্যায় সহ্য করতে না পেরে ছেলেটিকে ছুরিকাঘাত করে। ফলে পুলিশ জিতেনকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু বিচারে সে মুক্তি পায়। এর পর জিতেনের কাকা তাকে পাঠিয়ে দেন চট্টগ্রামে।

জিতেন চট্টগ্রামে আসার সময় আমি তাকে আমার চট্টগ্রামস্থ কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করার কথা বলি। পরে সে চট্টগ্রামে মাষ্টারদা সূর্য সেন-পরিচালিত বিপ্লবী দলের একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মীরূপে সকলের স্নেহভাজন হয়ে উঠে। জিতেন ১৯৩০ খৃঃ ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধে রক্তের স্বাক্ষর রেখে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে।

জিতেনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কিছুদিন পরে সে আমাকে রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসের জিতেন ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। জিতেনদার [জিতেন ঘোষ] কাছে জানতে পারলাম, রেঙ্গুনে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল আছে। জিতেনদা ঐ দলের নেতা। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন এবং বেঙ্গল একাডেমীই ছিল সদস্য-সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

আমি এই বিপ্লবী দলের সঙ্গেও বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। কিছুদিন পরে এই দলের অন্যতম নেতা, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র খগেন মুখার্জী [পরবর্তীকালে বার্মার অন্যতম কমিউনিষ্ট নেতা] এবং বেঙ্গল একাডেমীর ছাত্র সুকুমার সেনের [পরবর্তীকালে থাকিন সেন নামে পরিচিত কমিউনিস্ট নেতা] সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে।

বার্মা যাওয়ার আগে জিতেনদা পূর্ণদার [অগ্নিযুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাস] নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। নগেন দাশগুপ্ত

অনুশীলন দলের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও বার্মাতে অনুশীলন ও যুগান্তর দল এক সঙ্গে কাজ করত।

রেঙ্গুনে দিনেশ বিশ্বাস নামক আরো একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বোধ হয়, তাঁর বাড়ী ছিল ঢাকাতে। রেঙ্গুনের লুইস ষ্ট্রীটে 'বিশ্বাস কোম্পানী' নামে তাঁর বই ও সংবাদপত্রের দোকান ছিল। সেই দোকানের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলা দেশ থেকে নানা প্রকার পুঁথিপত্র বার্মায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল।

রেঙ্গুনে চট্টগ্রাম অনুশীলন দলের প্রবীণ বড়ুয়া, সারদা ভট্টাচার্য, বসুধা রক্ষিত ও সুমতি মজুমদার প্রমুখ কর্মীরাও ছিলেন। প্রবীণবাবু রেলওয়েতে চাকুরী করতেন এবং থাকতেন থিনাঞ্জং স্টেশনের কাছে একটি ভাডাটে বাড়ীতে। থিনাঞ্জং-এ তাঁর প্রচেষ্টায় Purity League নামক একটি শরীরচর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এই কেন্দ্র থেকে বিপ্লবী দলের সদস্য সংগ্রহ করা হত। প্রবীণবাবুর সঙ্গে আমি প্রায়ই এই কেন্দ্রে যাওয়া-আসা করতাম।

একদিন বিকেলের দিকে প্রবীণবাবুর বাডীতে গেলাম। দেখলাম, একজন অপরিচিত ব্যক্তি বসে আছেন তাঁর ঘরে। আমাকে দেখামাত্রই তিনি কটমট করে তাকালেন আমার দিকে। প্রবীণবাবু সেই ভদ্রলোকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবামাত্রই তাঁর দৃষ্টি স্বাভাবিক হল। এর পর তিনি আমার নামধাম ইত্যাদি নানাকথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রবীণবাবু বললেন: এই ভদ্রলোক প্রথম রেঙ্গুন এসেছেন। রাস্তাঘাট কিছুই চেনেন না। তুমি তাঁকে লুইস স্ট্রীটে দিয়ে এস।

প্রবীণবাবু থিনাঞ্জং ষ্টেশনে আমাদের দুজনকে রেঙ্গুন-অভিমুখী ট্রেনে উঠিয়ে দিলেন। গাডীতে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল। তার কথাবার্তার মধ্যে আমার এই ধারণা হল যে, তিনি সম্ভবত একজন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী।

রেঙ্গুন ষ্টেশনের অদূরে লুইস স্ট্রীট। গাডী থেকে নেমে লুইস স্ট্রীট ও ডালহৌসী স্ট্রীটের সংযোগস্থলে আসামাত্রই ভদ্রলোকটি বললেন: তুমি এবার চলে যাও।

এই কথায় তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা আরো বদ্ধমূল হল। তিনি সত্যি একজন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী, তা না হয় আমাকে তাঁর গন্তব্যস্থলে নিয়ে না গিয়ে মাঝপথে ছেড়ে দিলেন কেন?

পরে প্রবীণবাবুর কাছে জানতে পেরেছি যে, এই অপরিচিত ভদ্রলোকটি প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। পরিচয় পেয়ে বিপ্লবকর্মে আমার উৎসাহ ও উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেল। রেঙ্গুনে এই বিপ্লবী নায়কের গোপন উপস্থিতিতে বুঝলাম, শিকড় অতি গভীরে—নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের ক্রিয়াকাণ্ড সমগ্র বার্মায় পরিব্যাপ্ত।

রেঙ্গুনে আর একজন বিপ্লবী নেতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি চট্টগ্রামস্থ ছণহরা গ্রামের কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য। যতদূর মনে পড়ে, তিনি রেঙ্গুনে কোন একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রণীত "India in Bondage" গ্রন্থটি বার্মাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের জন্য "Modern Review" ও 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি পেয়েছিলেন। সেই অনুমতি-পত্রটি আমি দেখেছি। আমি যতদূর জানি, গ্রন্থটি বার্মাভাষায় প্রকাশ করা কেদারবাবুর দ্বারা সম্ভব হয় নি।

১৯২৩ খৃঃ ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় ১৭ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। সরকার বুঝলেন,এটি রাজনৈতিক ডাকাতি—গোপনে চলছে বিপ্লবের প্রস্তুতি। বাংলা দেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে সরকার দমননীতি গ্রহণ করলেন। ১৯২৪ খৃঃ জারি করা হল বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স। বন্দী করা হল বাংলাদেশের বহু বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে। চট্টগ্রামের অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বন্দী হলেন। মাষ্টারদা সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। তিনি আত্মগোপন করে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াস পান। এই সময় বিভিন্ন বিপ্লবী দলকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি নতুন কর্মসূচীর ভিত্তিতে ব্যাপক বিপ্লব আন্দোলনে সচেষ্ট হন। এদিকে অন্যতম নেতা নির্মল সেন বিপ্লব আন্দোলনকে সফল করার পরিকল্পনা নিয়ে আত্মগোপন করে চলে যান বার্মাতে।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অর্থলুণ্ঠনকারীদের অন্যতম ছিলেন দেবেন দে [খোকাদা]। তিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কংগ্রেস দলের চীফ্ হুইপ ও স্বরাষ্ট্রবিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হয়েছিলেন। ঐ

অর্থলুণ্ঠনের কিছুদিন পরে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেবেন দে চলে যান সিঙ্গাপুরে। নির্মল সেন রেঙ্গুন পৌঁছে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং সংগৃহীত আগ্নেয়াস্ত্র কীভাবে চট্টগ্রামে পাঠানো যায় তার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হন। এদিকে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি রেঙ্গুনের লুইস স্ট্রীটে সরষের তেলের ব্যবসা সুরু করলেন। নির্মল সেনের বিপ্লবী কার্যকলাপে সাহায্য করার জন্য অন্যতম বিপ্লবী নেতা মণীন্দ্র মজুমদার রেঙ্গুন গমন করেন মাষ্টারদার নির্দেশে। নির্মল সেন পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে চট্টগ্রামে এলে পুলিশ তাঁকে কারারুদ্ধ করে। কিছুদিন পরে নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য মণীন্দ্র মজুমদারও চট্টগ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এই দুজন বিপ্লবী নেতা বার্মায় অবস্থানকালে সেখানকার অন্যান্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে কাজকর্ম করেছেন। তাঁরা চলে আসার পর আমি রেঙ্গুনে উপস্থিত হই এবং নগেন দাশগুপ্ত ও জিতেন ঘোষের সহায়তায় সেখানকার বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করি।

রেঙ্গুন একটি বিরাট বন্দর। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের জাহাজ এখানে আসা-যাওয়া করে। আমরা জানতাম, জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ সহজ হবে। তাই নগেন দাশগুপ্ত ও আমি বিকেলের দিকে প্রায় প্রতিদিন জাহাজঘাটে গিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম। দীর্ঘদিন সমুদ্র ও বিদেশ-বিভূঁয়ে থেকে স্বদেশবাসীর সঙ্গে প্রাণ খুলে দুচারটা কথা বলার জন্য জাহাজীরা উন্মুখ হয়ে থাকত। জাহাজীদের অধিকাংশই ছিল চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও শ্রীহট্টের লোক। কাজেই আমাদের সঙ্গে তাদের অনেকের ভাষাগত মিল থাকার ফলে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠত অতি সহজেই। এই ঘনিষ্ঠতার সদ্ব্যবহার আমরা করেছিলাম।

বিদেশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা অন্তত তখনকার দিনে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। জাহাজীদের মারফৎ কিছু সংগ্রহ করে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। চট্টগ্রাম-রেঙ্গুন যাতায়াতকারী একটি জাহাজের হোটেলের মালিক ছিলেন রেবতী দত্ত। তিনি নগেনদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, স্বগ্রামবাসী ও অনুশীলন দলের কর্মী। তাঁকে পুলিশ কোনদিন সন্দেহ করে নি। তিনি চাল-ডালের ভিতর আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখে চট্টগ্রামে নিয়ে আসতেন।

রাসবিহারী বসু ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রমুখ নির্বাসিত বিপ্লবীদের সঙ্গে বাঙালী বিপ্লবীদের গোপন যোগাযোগ ছিল। তাঁরা Pan-Asiatic Movement-সংক্রান্ত পুঁথিপত্র গোপনে জাপান থেকে প্রায়ই ভারতে পাঠাতেন বার্মার মধ্য দিয়ে। ঐ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে বার্মায় আসতেন। তাঁদের সঙ্গে নির্মল সেনেরও যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

রেঙ্গুনে পৌঁছে লক্ষ্য করেছিলাম, সাইমন কমিশন বর্জনের যে তরঙ্গ উদ্বেল করেছিল সারা ভারতকে, তা বার্মাকেও স্পর্শ করেছে। এই সময়েও বহু বর্মী তরুণ-তরুণী বাঙালী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসে। একটি দেশ স্বাধীনতা-লাভের উপযুক্ত হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখবে একটি বিদেশী কমিশন! এই কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে লাহোর ষ্টেশনে পুলিশের লাঠিচালনায় গুরুতর আহত হন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়। ফলে কিছুদিন পরে তাঁর জীবনাবসান হয়।

সাইমন কমিশন গঠনের অপমানকর প্রস্তাব বিক্ষুব্ধ করেছিল বার্মাপ্রবাসী ভারতীয়দের। বিক্ষুব্ধ করেছিল অসংখ্য স্বদেশপ্রাণ বর্মীদেরও। বার্মা সরকার ও বৃটিশভক্ত কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এই কমিশনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র রেঙ্গুন ও পার্শ্ববর্তী লেকটি বর্ণাঢ্য আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যায় নানা আকারের ও বর্ণের বাজী পোড়ানো হয় এবং রেঙ্গুন লেকে প্রমোদ-তরণীতে বিহার করেন এই কমিশনের সদস্যবৃন্দ।

ঐদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিতেন দাশগুপ্ত ও আমি রেঙ্গুনের বড় বড় রাস্তা, পার্ক ও প্যাগোডাগুলিতে ঘুরে বেড়াই। উদ্দেশ্য ছিল, সাইমন কমিশন সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া অবগত হওয়া। এই সময়ে জিতেনের পরিচিত অনেক বর্মী ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাদের সঙ্গে সাইমন কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করে মতামত জানতে চেষ্টা করেছি। তখন লক্ষ্য করেছি, তাদের মধ্যে পরাধীনতার দাবদাহ। সন্ধ্যার পর জিতেনসহ আমরা কয়েকজন Monkey point নামক একটি জায়গায় গভীর রাত্রি পর্যন্ত অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করেছিলাম।

এরপর আমি বার্মার রাজনীতি আরো ভাল করে বুঝবার জন্য সচেষ্ট হই। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত যুগান্তর দলের মুখপত্র 'স্বাধীনতা'

[২৭শে মার্চ, ১৯৩০] পত্রিকায় 'বার্মার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা' নামক একটি প্রবন্ধে আমি লিখি :

"……ব্রহ্মদেশও বিদেশী শক্তির অধীনে থাকিয়া আর তাহার বৈশিষ্ট্য, শিল্প, কলা, আচার ও সভ্যতা হারাইয়া একেবারে পঙ্গু হইয়া থাকিতে রাজী নয়। সেও আজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষতা ঘোষণা করিতেছে—কিন্তু অতি ক্ষীণ কণ্ঠে।

……এখানকার রাজনীতিকদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে। যে দলটি জাতীয় দল বলিয়া পরিচিত, তাহাও সরকারের অঙ্গুলীসঙ্কেতে চালিত হইতেছে। এখানে এমন কয়েকজন দেশপ্রেমিক আছেন, যাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতি সমর্থন করিবার মত মনোভাব এদেশবাসীর এখনও হয় নাই। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সরকারের রোষানলে পতিত হইতে হইতেছে ও হইবে। এখানে যে বিভিন্ন দল আছে, তাহা 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত ভিক্ষু উত্তম-লিখিত প্রবন্ধের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে সম্যক্‌রূপে বুঝা যাইবে : 'ব্রহ্মদেশে G. C. B. A. or General Council of Burmese Association নামক সমিতিই সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও জনসাধারণের কাজে হাত দেয়। পরে এই G. C. B. A. রাজনৈতিক মতামত লইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারই একটি ছোট রাজনৈতিক সম্প্রদায় ব্রহ্মদেশে 21 Party (বা একুশ জনের দল) নামে পরিচিত। এই দলটি নরমপন্থী অর্থাৎ ইংরেজভক্ত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সকলে যখন মণ্টেগু সংস্কার বর্জ্জন করে, এই 21 Party তখন দ্বৈতশাসন গ্রহণ করিল।' ইহা ব্যতীত 3 Party (বা তিনজনের দল) নামে হেন্‌জাদাতে এবং 7 party (বা সাতজনের দল) নামে মান্দালয়ে দুইটি রাজনৈতিক দল আছে। প্রথমোক্ত দলের সভ্য প্রায় ওদেশীয় শিক্ষিতা ভদ্রমহিলারা। এই দলের সভানেত্রী একজন বিদুষী মহিলা। তাহাদের আদর্শও কিছু কিছু অন্যান্য প্রপীড়িত দেশের চরমপন্থীদের মত।"

"……এই দেশের রাজনীতির হাটে দলাদলির অন্ত নাই।…একদল বলেন, 'আমরা ভারতবর্ষের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সর্বপ্রকারে বৃটিশের সহযোগিতা করিব।' আর একদল বলেন,

'Dominion Status না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা ভারতবাসীর সহযোগিতা করিব।' আবার অন্য দল বলেন, 'ভারত আমাদের ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত ও ব্রহ্ম মিলনের পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ, তাই আমরা কোন মতেই কখনও ভারতবাসীর সহযোগিতা ত্যাগ করিতে পারি না।' অবশ্য উপরের দল দুইটিই অল্পবেশী বৃটিশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত এবং শেষোক্ত দলটিতে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের সমাবেশ। এই দলে ভিক্ষুদের প্রভাবই বেশী বলিয়া মনে হয়। আশ্চর্য্য ও প্রশংসার কথা এই যে, আমাদের দেশের সাধু, সন্ন্যাসীরা ভগবানের পূজায় অলসভাবে দিন কাটান আর এদেশীয় সাধু, সন্ন্যাসীরা প্রায়ই রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, পরাধীন জাতির কোন ধর্ম্ম নাই। যেদিন দেশ স্বাধীনতার আলোকে আলোকিত হইবে, সেইদিনই আমরা প্রকৃত ধার্ম্মিক হইব। চোখ দুইটি বুজিয়া থাকিলে ভগবান মিলে না —মিলে সজাগ, সজীব, সতেজ কর্ম্মে।"

বার্মার এই রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে থারাওয়াডী অঞ্চলের সায়া সান-পরিচালিত গোপন বিপ্লবী দলের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলা দেশ থেকে আগত বিপ্লবীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। উ স নামক একজন বিপ্লবী নেতার সঙ্গেও তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়। কেমেণ্ডাইন ষ্টেশনের কাছে ছিল তাঁর একটি ছাপাখানা। এই ছাপাখানাটি ছিল বিপ্লবীদের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

১৯৩০ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এই দিনটি। বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা চট্টগ্রামে বৃটিশশক্তিকে পর্যুদস্ত করেছে।

১৯শে এপ্রিল। ভোরবেলা রেঙ্গুনে পুলিশের অস্বাভাবিক তৎপরতা। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের দোকানের সামনে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন। সংবাদপত্রে অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদ : চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক অভ্যুত্থান। অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত।

দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এই সংবাদ। সবাই বিস্মিত, স্তম্ভিত। অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় এই সংবাদ।

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ রণক্ষেত্রে এবং ৬ই মে কালারপোলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে বিপ্লবীদের প্রচণ্ড সংগ্রাম। কালারপোল সংগ্রাম সম্পর্কে বাঙালী-

সম্পাদিত 'রেঙ্গুন মেইল্' নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রে শিরোনাম ছিল : **A pitched battle near Chittagong.**

চট্টগ্রামের এই অবিস্মরণীয় অভ্যুত্থান পরাধীন জাতির যুগসঞ্চিত বেদনার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বাংলার বিপ্লবীদের মত বার্মার বিপ্লবীদের মনেও সঞ্চারিত হল স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবার প্রেরণা। মৃত্যুর এই মহোৎসব তাঁদের কর্মচঞ্চল করে তুলল। বিপ্লবীদের দৃপ্ত পৌরুষ এবং অবিচল আদর্শনিষ্ঠায় বিপ্লবী নেতা উ স [১] আনন্দিত হয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন : চট্টগ্রামের এই অভ্যুত্থান বার্মার বিপ্লব আন্দোলনকে অধিকতর গতিশীল হতে সহায়তা করবে।

রেঙ্গুনের বিপ্লবী নেতারা পরামর্শে বসলেন। তাঁরা স্থির করলেন : বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করে তাঁদের অধিকতর সংগ্রামমুখী করতে হবে। বিপ্লবমূলক প্রচারপত্রের মাধ্যমে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে বিপ্লবের বাণী। সংহত শক্তিতে প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে।

সংকল্পগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা। নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন রেঙ্গুন পুলিশ কমিশনার অফিসের নগেন দাশগুপ্ত, রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসের জিতেন ঘোষ, শিক্ষক কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য এবং উ স প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যাঁরা এগিয়ে এলেন, তাঁদের দুজনের নাম এখনো স্পষ্ট মনে আছে। এঁরা হলেন মং জী (Maung Gyi) এবং তাঁর বোন মা জী (Ma Gyi).

রেঙ্গুনের লামদ নামক অঞ্চলে মং জী-র ছিল কাঠের ব্যবসা। মা জী ছিলেন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এই দুজনের সঙ্গে নগেন দাশগুপ্ত আমার পরিচয় করিয়ে দেন, কারণ এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ছিল।

রেঙ্গুনে নানা কারণে আমার পড়ার সুযোগ হল না। বার্মা রেলওয়েতে চাকুরী নিতে হল। রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে পোজাণ্ডং রেলওয়ে অফিসে কাজ করার সময় উক্ত বিপ্লবী জী ভাই-বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার সুযোগ পাই। এই স্টেশনের অতি কাছে এই কর্মচঞ্চল জী ভাই-বোনের বাড়ী।

---

[১] ১৯৪৭ খৃঃ ১৯শে জুলাই রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েটে জেনারেল আউঙ সান ও অপর ৫ জন মন্ত্রীকে হত্যা করা হয়। এই অভিযোগে উ স-র মৃত্যুদণ্ড হয়।

এই ভাইবোনকে পড়তে দিতাম ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের ইংরেজীতে লেখা জীবনী ও অন্যান্য গ্রন্থ। দেখেছি, বার্মার অন্যান্য বিপ্লবীদের মত এই ভাইবোনের অন্তরও বাঙালী বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। তাঁদের সঙ্গে আমার অল্পদিনের পরিচয় পরিণত হয় অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে। তাঁরা প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী বিপ্লবীদের সাহস, আত্মোৎসর্গ ও সংগঠন-নৈপুণ্যের কাহিনী। কথায় কথায় তাঁরা একদিন চন্দননগরে অনুষ্ঠিত কানাইলাল স্মৃতিসভায় বার্মার অন্যতম বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও বিপ্লবী নেতা ভিক্ষু উত্তমের পৌরোহিত্য করার বিষয় উল্লেখ করেছিলেন।

এই জী ভাইবোনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য আমি বিকেলের দিকে অফিস ছুটির পর প্রায়ই তাঁদের বাড়ী যেতাম। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর মা জী একদিন আমার অফিসে এসে বলেন: Revolutionaries of Bengal এবং What the students of other conntries have done—বই দুটো রেঙ্গুনের কোন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার বই দুটো আমাকে দিন। আমি বার্মা ভাষায় অনুবাদ করে সেগুলো ছাপিয়ে বার্মাতে প্রচারের ব্যবস্থা করব।

বই দুটো বার্মার ছাত্রছাত্রীদের খুবই প্রিয় ছিল। পরদিন এগুলো মা জী-কে দিয়েছিলাম। তাঁর সংকল্প কতখানি বাস্তবে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন জানি না; কারণ কিছুদিন পরে মাষ্টারদা সূর্য সেনের নির্দেশে আমাকে ফিরে আসতে হয় চট্টগ্রামে।

রেঙ্গুনের বিপ্লবী নেতাদের সিদ্ধান্তের অত্যল্প কালের মধ্যে বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয় একটি বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র। ছড়িয়ে দেওয়া হল একই দিনে একই সময়ে। ইংরেজী ও বার্মা ভাষায় রচিত এই প্রচারপত্রটির শিরোনাম "ভ্যানগার্ড"। যতদূর জানি, বৃটিশশক্তির নাগপাশ থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য ছাত্র এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বার্মায় প্রচারিত প্রথম বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র এই "ভ্যানগার্ড"।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি বার্মায় একটি আবেদনপত্র প্রচারিত হয়। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য বার্মায় কর্মরত ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও সামরিক পুলিশবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রতি এই আবেদন। এটি প্রচার

করেন আমেরিকা থেকে বার্মায় গোপনে আগত গদর দলের বিপ্লবীরা। আবেদনপত্রটির শিরোনাম ছিল : **'A Message of Home to Military Brethren, to the Native Officers of the Military Police.'**

বিপ্লবী নেতারা বার্মায় শুধু বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন, তা নয়। অন্যদিকেও নিবদ্ধ ছিল তাঁদের দৃষ্টি। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর কোন-কোন বিপ্লবী সৈনিকের আত্মগোপন করে বার্মায় আসার সম্ভাবনা। তাঁদের নিরাপদে রাখতে হবে। তাই গোপন আশ্রয়স্থান দরকার।

১৯২১ খৃঃ অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বেল চট্টগ্রাম। সুদূর গ্রামে-গঞ্জে সেই আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাত। সারোয়াতলী স্কুলের ছাত্র নিকুঞ্জ বৈদ্য, মণীন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্র রক্ষিত ও দ্বিজেন্দ্র পাল প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই তরঙ্গে। কিছুদিন পরে নিকুঞ্জ বৈদ্য চলে যান বার্মায়।

বার্মার দক্ষিণাংশে বেসিন সহর। এই সহর থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে তাবং গ্রাম। সেখানে ব্যবসা করেন বিপ্লবী নিকুঞ্জ বৈদ্য। নির্মলদা ও মণিদা [মণীন্দ্র মজুমদার] রেঙ্গুনে অবস্থানকালে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন নিকুঞ্জদার সঙ্গে।, নিকুঞ্জদার ভাই নীলকণ্ঠও ছিল সারোয়াতলী স্কুলের ছাত্র এবং আমার সহপাঠী ও সহকর্মী। সেও তখন তাবং-এ। আমার এক কাকা শ্রীরেবতীরমণ গুহ ও আমি সেই তাবং গ্রামে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চট্টগ্রামের আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের জন্য গোপন আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা করি।

মধ্য বার্মার টাউংডেঞ্জী ডাকঘরে কাজ করতেন বিপ্লবী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ী ছিল চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাট গ্রামে। চট্টগ্রামে থাকার সময় তিনি অনুশীলন সমিতির কর্মী ছিলেন। আমি টাউংডেঞ্জী গিয়ে মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গেও দেখা করে আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা করি।

এইভাবে আমাদের অনেকের প্রচেষ্টায় রেঙ্গুনে ও বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি গোপন আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা হয়।

কিছুদিন পরে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কসপ্ অফিসের শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত [বিদগ্রামের অধিবাসী] রেঙ্গুনের ৪০নং ষ্ট্রীটে গিয়ে উপস্থিত। সঙ্গে লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের অভিজাত মুসলমানের পোষাকপরিহিত এক সুদর্শন কিশোর। এই কিশোর জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক হেমেন্দু দস্তিদার। ঐ ঘরটির সামনের দিকে ছিল আমার দাদা শ্রীযতীন্দ্রনাথ গুহের সেলাইয়ের

দোকান। পেছনের অংশে ছিল একটি মেস। এতে নগেনদাসহ আমরা কয়েকজন থাকতাম। হেমেন্দু দস্তিদার একদিন আমাদের মেসে ছিলেন। পরে তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

হেমেন্দু দস্তিদার রেঙ্গুন যাওয়ার পর রেঙ্গুন সহরের একটি মানচিত্র মাষ্টারদার কাছে পাঠাবার প্রয়োজন অনুভব করি। নগেনদা পুলিশ কমিশনার অফিস থেকে পুলিশের বিশেষ একটি মানচিত্র গোপনে বের করে নিয়ে আসেন। পূর্বোক্ত রেবতী দত্তের মারফৎ সেটি পাঠানো হয় চট্টগ্রামে। নির্দেশ ছিল, এই মানচিত্রটি যেন মাষ্টারদার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

১৯৩০ খৃঃ শেষ দিক থেকে বার্মায় বিপ্লবী কার্যকলাপ সুরু হয় সুসংবদ্ধভাবে। সেপ্টেম্বরে লুণ্ঠিত হয় বেঙ্গল একাডেমীর টাকা। নগেনদা তাঁর অফিস থেকে জানতে পারেন, সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রেঙ্গুনে আসছেন গ্রীষ্মকালীন রাজধানী মেমিও থেকে। সুরু হল তাঁদের প্রাণনাশের প্রস্তুতি। নগেনদার নেতৃত্বে কয়েকজন বিপ্লবী টাঙ্গু জেলার ন্যাঙ্গচি-ডাউকে [Nyaungchi Dauk] ট্রেনটি লাইনচ্যুত করেন ; কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

১৯১৩ খৃঃ থেকে বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত থারাওয়াডী, হেনজাদা, ইনসিন, থেটম্যাও, হাম্বাওয়াডী ও প্যায়াপন প্রভৃতি জেলায় ছোট বড় অনেক বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর থারাওয়াডী জেলায় বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে করে প্রচণ্ড আঘাত। বস্তুত এই দিন থেকে সুরু হয় ব্যাপকভাবে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল আক্রমণ। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সায়া সান [Saya San]। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় জ্বলে উঠে বিদ্রোহের আগুন। বহু জেলায় নেতা সায়া সান স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। ১৯৩১ খৃঃ ২রা আগষ্ট হ্সুমসি অঞ্চলে [Hsumhsi State] তিনি ধৃত হন। ২৮শে নভেম্বর ফাঁসীর মঞ্চে তাঁর জীবনাবসান হয়। এই বিদ্রোহে ফাঁসীর মঞ্চে আত্মনিবেদন করেন প্রায় তিন শত বিপ্লবী।

থারাওয়াডী বিদ্রোহ-দমনে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বর্বরতা চরমে উঠে। ১৯৩১ খৃঃ ১৩ই জুন ওয়েটো [Wetto] নামকস্থানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পুলিশ-বাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ফলে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন ২২ জন বিপ্লবী। তাঁদের ১৬ জনের মুণ্ড ছেদ করে লম্বা খুঁটিতে বেঁধে কয়েকটি গ্রামে মিছিল করে

দেখানো হয়। এর পর সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয় প্রোম সহরে এবং বেশ কয়েকদিন সেই কাটা মুণ্ডগুলি জনসাধারণের মনে ভীতিসঞ্চারের জন্য সাজিয়ে রাখা হয় ঐ সহরের রাজপথে।

নেতা সায়াসানের বহু সহকর্মী ইনসিন জেলে বন্দী। তাঁদের ২০ জনকে প্রাণ দিতে হয় ফাঁসীর মঞ্চে। মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ। ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণের সময় সমগ্র কারাগার প্রকম্পিত হল তাঁদের সুতীব্র কণ্ঠস্বরে। মৃত্যুবরণের পূর্বমুহূর্তে দেশবাসীকে জানিয়ে গেলেন তাঁদের মর্মকথা : **Ahlone Kaung Ba De** [আলোং কাউ বা ডে—সব কিছু ভাল]। অর্থাৎ আমরা যা করেছি, সবই ভালোর জন্যে।

সমগ্র বার্মাতে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৯৩১ খৃঃ ৩১শে জানুয়ারী বার্মা সরকার জারি করল একটি অর্ডিন্যান্স। থারাওয়াডী বিদ্রোহের সঙ্গে যোগাযোগ সন্দেহ করে ১লা ফেব্রুয়ারী নগেন দাশগুপ্ত, জিতেন ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদেরও রাখা হয় ইনসিন জেলে। তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন পূর্ববর্ণিত বিপ্লবীদের বিদায়কালীন মর্মবাণী।

থারাওয়াডী বিদ্রোহের ব্যাপকতা, জনসমর্থন ও সরকারী নৃশংসতা সম্বন্ধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র [১৭ই মাঘ, ১৩৩৭ সন] মন্তব্য উদ্ধৃত করছি :

> 'ব্রহ্মদেশের থারাওয়াডী জেলার বিদ্রোহ সম্পর্কে স্যার জেমস্ ক্রেরার দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদে এক বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা গেল, এই বিদ্রোহ কেবল একটি জেলায় আবদ্ধ নহে, নানাস্থানেই সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহীদল মাথা তুলিয়াছিল। কিন্তু সামরিক পুলিশ তাহাদের দমন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এখনো বিদ্রোহীদল আছে বটে, কিন্তু তাহারা আর প্রবল নহে। এই বর্ণনা হইতে বোঝা যায়, এই বিদ্রোহীদলে সাধারণ লোকেরাও যোগ দিয়াছে। কি কারণে এই বিদ্রোহ, বিদ্রোহীরা কি দুরাশায় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদ কামনা করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে স্যার ক্রেরার কিছু বলেন নাই। কেবল পুলিশ কিভাবে তাহাদের দমন করিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে, সেই কথাই শুনাইয়াছেন।......'

আরো একজন বর্মী বিপ্লবী নেতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

তিনি ভিক্ষু বিজয় বা ফুঙ্গী উ উইজায়া [Hpoongyi U Wizayya]। এই বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্বের আসনে ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯২১ খৃঃ থেকে ১৯২৯ খৃঃ পর্যন্ত কয়েকবার কারারুদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল বন্দীজীবন অতিবাহিত করেন। কারাগারে কয়েকটি দাবী আদায়ের জন্ত তিনি অনশন সুরু করেন ১৯২৯ খৃঃ ৯ই এপ্রিল। ১৬৩ দিন অনশনের পর ২০শে সেপ্টেম্বর কারাগারেই এই অদম্য স্বাধীনতা-যোদ্ধার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

বলা বাহুল্য, এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নায়কের শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ-স্পৃহা বার্মার বিপ্লবীদের মধ্যে লক্ষ্য করছি। চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং ভিক্ষু বিজয়ের কারাগারের অভ্যন্তরে আত্মদান থারাওয়াডী বিদ্রোহ ত্বরান্বিত করে।

এত ফাঁসী, অত্যাচার এবং নির্যাতন সত্ত্বেও বার্মার বিপ্লব-প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। ১৯৩১ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা গেল কয়েকদিন পর-পর তিনখানি বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র—Freedom First, Freedom Second এবং Freedom Third.

এই অশান্ত বার্মাকে বৃটিশশক্তি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ১৯৩৭ খৃঃ তার ভারত সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে; কিন্তু ১৯৪৭ খৃঃ ভারতের মত স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

আমার বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

অণিমা বিশ্বাস

জীবনের অস্তাচলের দ্বারপ্রান্তে এসে ফিরে তাকাই পূর্বাচলের দিকে। স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে কত ছবি! হারানো দিনগুলোর কত অমূল্য মুহূর্ত— কত চেনা মুখ! কে যেন অদৃশ্য সূত্র দিয়ে জাল বুনে চলেছে মনের আনাচে কানাচে!

রম্যভূমি চট্টলা। প্রকৃতি তাকে সাজিয়েছে অফুরন্ত সৌন্দর্য-সম্ভারে— লীলা-বৈচিত্র্যে। আর দিয়েছে মৃত্যুপাগল গুটি কয়েক দামাল ছেলেমেয়ে— যাদের কাছে জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—নিন্দা-খ্যাতিকে তুচ্ছ করে যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার ইতিহাসে রেখে গেছে আপন স্বাক্ষর।

মহাবিপ্লবের রথচক্রের তলায় কত শত শহীদের রক্তাক্ত দেহ গুঁড়িয়ে গেছে, তার হিসেব কি আজ ইতিহাস দিতে পারবে! কত শহীদের নীবব আত্মদান, কত মাতার, অশ্রুজল, কত পত্নীর দীর্ঘশ্বাস আজো রয়েছে মিশে চট্টলার আকাশে-বাতাসে। স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কূট চক্রান্তের কুঠারাঘাতে আজ আমরা ছিন্নমূল। স্বদেশ আজ আমাদের কাছে বিদেশ। কত ক্ষুদ্র বৃহৎ অবদানে মিলে প্রজ্বলিত করেছিল এই মহা বিপ্লবযজ্ঞের পূত হোমাগ্নি। এই মহাযজ্ঞের সমিধ যাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরাও আমাদের নমস্য। প্রদীপের পাদদেশে দাঁড়িয়ে যাঁরা দীপ শিখাটিকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁদের অবদানও কম নয়। যাঁদের সংস্পর্শে একদিন আমরা এসেছি, তাঁদের তো ভুলতে পারি না! আমাদের মনের মণিকোঠায় তাঁরা থাকবেন চিরভাস্বর।

দেশ তখন পরাধীন। বয়সও ছিল কম। মাষ্টারদার নেতৃত্বে সারা চট্টগ্রাম জুড়ে চলছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুকে চরম আঘাত হানার প্রস্তুতি। হঠাৎ বিপ্লবের একটা ঢেউ এসে লাগল আমার মত চট্টগ্রামের এক নিভৃত পল্লীর একটি সামান্য মেয়ের জীবনের তটভূমিতে। মহত্তর আদর্শের প্রেরণায় ভেসে গেল আজন্মলালিত সংস্কার, ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা। মন হয়ে উঠল বন্ধন-অসহিষ্ণু।

ছোট বেলায় মামার বাড়ীতে [গুয়াতলী গ্রামের চৌধুরী বাড়ী] গৃহশিক্ষক ছিলেন বনবিহারী দত্ত। আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল চিন্তাহরণ দত্ত নামে। তাঁর এই ছদ্মনামের কারণ আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। সম্ভবতঃ পুলিশের চোখে ধূলো দেবার জন্যই তিনি এই নাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শরীর ছিল ইস্পাতের মত। তিনি পূবের পাড়ার খোকা চৌধুরী, জোনা চৌধুরী এবং আরো অনেকে মিলে তখন মাঝে মাঝে শারীরিক শক্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। বনবিহারী দত্তই প্রধান অংশ গ্রহণ করতেন। প্রদর্শনীতে প্রচুর লোক সমাগম হত। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা ছেলেমেয়েদেব আকৃষ্ট করে দলে আনতেন এবং সংগঠনের কাজ চালাতেন। খোকা, জোনার জ্যেঠাইমা ছিলেন একজন জাঁদরেল মহিলা। পুলিশের লোক পর্যন্ত তাঁকে ভয় করত। শুনেছি, তিনি অনেক পলাতক বিপ্লবীকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন। খোকা, জোনার ভাগ্নী ফুটু খাস্তগীর ছিল আমার বন্ধু। সে মামাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দলে যোগ দিয়েছিল এবং মামাদের কাজের সহায়তা করত। ঐ বাড়ীর পরিবেশটার মধ্যেই ছিল একটা বিপ্লবের হাওয়া। মাঝে মাঝে মাষ্টারমামার বনবিহারী দত্ত] টেবিলের উপর কিছু বই পড়ে থাকত। আমি সেগুলো গোপনে পড়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিতাম। তিনি বুঝতে পারতেন কিনা জানি না। বইগুলোর লেখার মধ্যে কিসের যেন একটা উদ্দীপনা, কোন একটা মহৎ আদর্শের পিছনে ধাবিত হওয়ার কি যেন একটা ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু সাহস করে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারতাম না।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকারের কিছুদিন পরে জানতে পারলাম, আমার মামাত ভাই প্রিয়রঞ্জন চৌধুরী (টুণ্টু) বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে। পটিয়া হাইস্কুলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। চট্টগ্রামে তখন আগুন জ্বলছে। একদিকে বৃটিশ পুলিশের বর্বর অত্যাচার, অপর দিকে বিপ্লবীরা আঘাতের পর আঘাত হানছে ঐ বর্বরদের উপর। এই সময়ে আমার ভাই টুণ্টুর মারফৎ সুধীনদা [ভাটীখাইন গ্রামের সুধীন দাস] 'ফাঁসির সত্যেন' ও 'কানাইলাল' এই দু'খানি বই আমার কাছে পাঠান। সত্যেন ও কানাইলালের আত্মদানের কাহিনী আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। পর পর আরো অনেকগুলো বই পড়ার পর আমি বিপ্লবী দলে যোগ দেবার জন্য অধীর হয়ে পড়লাম। শুনেছিলাম, মাষ্টারদা মেয়েদের দলে

নেবার পক্ষপাতী নন। কিন্তু মেয়েদের অবদান, সাহস এবং আত্মত্যাগ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সুধীনদা আমাকে সাহসের পরীক্ষা দিতে নির্দেশ পাঠালেন। কঠিন পরীক্ষা! অমাবস্যার গভীর নিশীথে একা শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতে হবে। যথাযথভাবে পরীক্ষা দিলাম। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে মনে বড় দুঃখ হল। ভাবলাম, আমার অত বড় দুঃসাহসিক অভিযান বুঝি ব্যর্থ হল! পরের দিন জানতে পারলাম, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। সুধীনদা একখানি চিঠিতে আমাকে উৎসাহিত করে লিখলেন যে, বিপ্লবের পথ দুর্গম, প্রয়োজন দুশ্চর তপস্যার। এই আমার প্রাথমিক পরীক্ষা! আরো কঠোর পরীক্ষার জন্য আমাকে তৈরী থাকতে হবে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলাম। সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী হয়ে বিপ্লবের দুর্গম পথের অভিযাত্রী হবার জন্য দেহে-মনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তৈরী করতে লাগলাম। ঘর ও বাইরের বাধা তুচ্ছ করে দেশমাতৃকার চরণে আত্মনিবেদনের সাধনা আরম্ভ হল আমার জীবনে।

তারপর আমার কর্মজীবন আরম্ভ হল ছনহরা গ্রামে। আমার ভাইপো শৈলেশ বিশ্বাস ও পরেশ বিশ্বাসের সাহায্যে আমি দলের স্থানীয় সংগঠক দেবেন ধর, চিত্তরঞ্জন গুহ, ফণী দাশ এবং আরও অনেকের সাথে পরিচিত হই। আত্মীয়তার সূত্র ধরে দলের মেয়েদের সাথে মেলামেশার সুযোগ করে নিতাম। এই সময়ের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। চিত্তদা (চিত্তরঞ্জন গুহ) একদিন আমাকে একটি ইংরেজী শব্দের ('Wire') মানে জিজ্ঞাসা করেন। তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যে নিয়ে ঐ শব্দের মানেটা সেদিন বলতে পারি নি। চিত্তদা আমাকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'তোর দ্বারা কিছু হবে না। এই বিদ্যা নিয়ে বিপ্লব করা যায় না।' বড়ই অপমান বোধ হল। সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, ম্যাট্রিক পাশ আমাকে করতেই হবে। কিন্তু কী উপায়ে! বাড়ীর ছোট ছেলেদের কাছ থেকে স্কুলের পাঠ্য বইগুলো নিয়ে অভিধান দেখে দেখে অর্থ খুঁজে পড়তে আরম্ভ করলাম। সে আর এক সাধনা আমার জীবনে। দু'বছর পরেই আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই। চিত্তদার সেদিনের সেই বিদ্রূপ আজ আমার কাছে আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। এই বিপ্লবী জীবনই আমার লেখাপড়ার প্রেরণার উৎস।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমাকে সকল কাজে সহায়তা করত। তাদের মধ্যে ভাইঝি মালতী বিপ্লবী দলের সদস্য ছিল। সে ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ

করত। তার জন্য সে অনেক নির্যাতন ভোগ করে। আমার সকল কাজের প্রধান সহায়ক ছিল আমার ভাইপো পরেশ। চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে তখন বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। নিতান্ত লোভী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ছাড়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মনে বিপ্লবীদের প্রতি একটা ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছে।

যতদূর মনে পড়ে, সম্ভবতঃ আসানুল্লা হত্যার পরে পুলিশ দেবেন ধরের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল তার নজির ইতিহাসে খুব বেশী মেলে না। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে পুলিশ একটি কথাও বার করতে পারে নি। চিত্তদা ছিলেন দলের অক্লান্ত কর্মী। তিনি বিশেষভাবে আমাকে প্রভাবিত করেন। পাটনীকোটা গ্রামের ফণী দাশ শিক্ষকতা করতেন ছনহরা গ্রামে। শিক্ষকতার অন্তরালে তিনি দলের কার্য পরিচালনা করে দলকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জেলে যাবার আগে পর্যন্ত।

এর মধ্যে চট্টলগৌরব সুখেন্দুবিকাশ দত্ত মায়ের অসুখের ছলনায় কয়েক দিনের জন্য জেল থেকে ছুটি পেয়ে গ্রামে আসেন। এই সুযোগে আমি পুলিশ প্রহরাধীন সুখেন্দুদার সঙ্গে দেখা করি। শিশুর মত সরল অথচ বজ্রের মত কঠোর এই আজন্ম-তপস্বী আত্মভোলা মানুষটিকে দেখে আমি মুগ্ধ হই এবং চলার পথে তাঁর আশীর্বাদ চেয়ে নিই। তিনি আমাকে বিশেষ-ভাবে উৎসাহিত করেন।

সুখেন্দুদা, দেবেন ধর, ফণী দাশ, চিত্তদা ও পরেশকে আমি শুধু বিপ্লবী জীবনের সাথীরূপে পেয়েছিলাম তা নয়, তাঁরা আমাকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পরেশ ও চিত্তদা জেল থেকে আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফী পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে পড়াশুনায় উৎসাহিত করেছেন।

ছনহরা গ্রামের রাখাল কানুনগো ও মণীন্দ্র দাস ছিলেন দলের নীরব কর্মী। রাখালের ছোট ভাই (নেপাল) ও ছোট বোন কল্পনাও ছিল দলের কর্মী। মণীন্দ্র দাসের সহায়তায় হাওলা গ্রামের জ্যোতিপ্রকাশ সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে। রাখাল কানুনগোকে দীর্ঘদিন গ্রামে হোম ইন্টার্ণ করে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যেও তিনি দলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন যথারীতি। নেতৃস্থানীয় কর্মীরা যখন প্রায় সকলেই কারান্তরালে, তখন এই মণীন্দ্র দাসই দলের নির্বাণোন্মুখ দীপশিখাটিকে প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। ১৯৩৫ সালে ১২ই জানুয়ারী গভীর রাতে গোপনে রাখাল কানুনগোর বাড়ীতে আমরা মাষ্টারদার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে।

শ্রীপুর গ্রামের নির্মলাদি (চক্রবর্তী)-র সাথে আমার যোগাযোগ হয় ধূর্জটি অধিকারীর মাধ্যমে। ধূর্জটি অধিকারী আমাদের গ্রামে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং গোপনে তিনি আমাদের বাড়ীতে থাকেন। মাঝে মাঝে অনেকেই বাইরের ঘরে এবং পরেশদের বাড়ীর দোতলায় আশ্রয় নিতেন। তাঁদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা আমরাই করতাম গোপনে। ধলঘাট গ্রামে ঝুলন যাত্রা এবং হাওলা গ্রামে কালাচাঁদ ঠাকুর দেখাকে উপলক্ষ্য করে নির্মলাদির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। এই ঠাকুর দেবতার মাধ্যম ছাড়া ১০।১২ মাইল দূরবর্তী গ্রামে গিয়ে কাজ করা সম্ভব ছিল না। হাওলা গ্রামের 'কালাচাঁদ ঠাকুর' বাড়ীতে বসে মালতী বিশ্বাস, ধূর্জটীবাবু, নির্মলাদি ও আমার মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। তখন এই গ্রামগুলির মধ্যে নির্মলাদি ও আমি ছিলাম সক্রিয়। নির্মলাদির নাম ছিল 'সর্বহারা' আর আমার ছিল 'পুয়োর' (Poor)। এই ছদ্মনামে আমরা দলের মধ্যে পরিচিত ছিলাম।

বিপ্লবী দলের কার্যপরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হত। মাষ্টারদা বলতেন, প্রাণ দেওয়ার চেয়ে অর্থ দেওয়ার গুরুত্ব কম নয়। তাই দলের ছেলে-মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলের অর্থ সংগ্রহ করত। এই অর্থ জোগাড় করতে হত অনেক সময় মা-বাবার যথাসর্বস্ব বার করে নিয়ে। অনেক ছেলেমেয়ে বিয়ে করত শুধু দলের স্বার্থে। পরে যা হবার হোক কিছু গয়না ও টাকা তো হাতে আসবে। অর্থের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে মা-বাবার টাকা চুরি করেছি। গয়নাও যা কিছু ছিল দিয়েছি। এক্ষেত্রে একজনের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ে। সে আমার বোনঝি মায়া (দত্ত) চৌধুরী। মায়া ছিল ছনহরা গ্রামের জমিদার বাড়ীর মেয়ে। মায়ের এবং নিজের অঢেল গয়না। সম্ভবতঃ মাষ্টারদার মুক্তি-প্রচেষ্টার প্রয়োজনে মায়া বার করে দিল বাক্স সুদ্ধ কয়েক হাজার টাকার জড়োয়ার গয়না। তার জন্য কী অকথ্য নির্যাতনই না তাকে সহ্য করতে হল! তার কথা আজ আর কে-ই বা স্মরণ করে! এমনি করে কত শত মায়াই না স্বাধীনতার বেদীমূলে সর্বস্ব দিয়ে নীরবে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তার খবর কে-ই বা রাখে!

অর্থ-সংগ্রহের নিতান্ত প্রয়োজনে ডাকাতিরও প্রয়োজন হত। ভাটীখাইন গ্রামে এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে স্বদেশী ডাকাতি বলে এক ডাকাতি হয়। গ্রামের অনেক ছেলেকে জড়িয়ে পরেশ বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে দীর্ঘদিন

মামলা চলে। আমার বড়দা শ্রীনলিনীরঞ্জন বিশ্বাসের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে পরেশ বিশ্বাস অভিযোগ থেকে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য এ সমস্ত ছেলে কত দুঃখই না বরণ করেছে, কত অপবাদই না মাথায় তুলে নিয়েছে! কিন্তু কোন মালিন্য এদের স্পর্শ করতে পারে নি।

গুয়াতলী গ্রামের আমার মামাত ভাই প্রিয়রঞ্জন চৌধুরী ছিল বনবিহারী দত্তের ছাত্র। তার উপর ছিল পুলিশের কড়া নজর। আমার এবং দলেব অন্যান্য কয়েক জনের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কথা বার করতে না পেরে পুলিশ অফিসার (এমায়ু ?) তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়, যার ফলে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য সুদূর বার্মা দেশে গিয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হয়।

পাটনীকোটা গ্রামের স্বনামধন্য শশাঙ্ক চৌধুরী (রাঙাদা) একজন নীরব কর্মী। তাঁর পূর্ববর্তী বিপ্লবী জীবনের মহান্ অবদানের কথা ছেড়ে দিলেও ১৯৪২ সাল থেকে দেশ যখন যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে মরণাপন্ন তখন গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে তিনি নিঃস্বার্থভাবে দেশের যে সেবা করেছেন তা অবিস্মরণীয়। তখন দলের প্রায় সকলেই কারান্তরালে। সেই দুর্দিনে আমাদের মত দলের কর্মী এবং বন্দী বিপ্লবীদের স্ত্রী, বোন, আত্মীয়স্বজন যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের দায়িত্বভার তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ স্বাবলম্বী। তাঁদের মধ্যে আমি নিজেও একজন।

চট্টগ্রাম বিপ্লবের অংশীদার শুধু যে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাই ছিল তা নয়, সমাজে যারা অশিক্ষিত অবহেলিত সামান্য মানুষ বলে পরিচিত, তাদের অবদানও এক্ষেত্রে কম নয়। তাদের মধ্যে আমাদের একজন ধোপার নামও ভুলবার নয়। সম্ভবতঃ তার নাম ছিল বিশ্বেশ্বর। দলের চিঠিপত্র আদান-প্রদান থেকে আরম্ভ করে পলাতক বিপ্লবীদের নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজই সে করত। অনেক সময় গভীর রাতে তার বাড়ীতেই দলের বৈঠক বসত।

দলের অস্ত্রশস্ত্র, নিষিদ্ধ পুস্তক, বিপ্লবীদের লেখা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি নানা জিনিস থাকত আমার কাছে। পুলিশ অনেকবার খানাতল্লাসী করেও তার কোন হদিস পায় নি। আমরা লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুৎসু, লাফ-ঝাঁপ, গাছে-চড়া, সাঁতার-কাটা ইত্যাদি শিখতাম। একবার রিভলভার প্র্যাক্টিস্ করতে গিয়ে একজন পুলিশের গুপ্তচরের কাছে ধরা পড়ি। সে থানার মোহন দারোগার কাছে ছুটে যায় আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। দারোগা মোহন

ভট্টাচার্য ছিলেন আমার জ্যেঠতুত দাদা বিমলচন্দ্র বিশ্বাসের বন্ধু। দাদা দারোগাকে নানাভাবে বুঝিয়ে সে যাত্রা আমাকে রক্ষা করেন। আমাকে হোমইণ্টার্ণ করে রেখেছে বলে যখন দৈনিক কাগজে খবর বেরুল, তখন কয়েকজন কূট চক্রান্তকারীর ষড়যন্ত্রে বাবার চাকরীটি যাবার উপক্রম হয়েছিল। জানি না, নানা মামলা-মোকদ্দমার পর বাবা কিভাবে অব্যাহতি পান।

আমাদের পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। চলার পথে পদে পদে অসংখ্য বাধা— গ্রাম্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিকূল পরিবেশ। ঘরে অভিভাবকদের বাধা—বাইরে গ্রামের লোক, পুলিশ এবং গুপ্তচরের শ্যেন দৃষ্টি। সর্বত্র গুপ্তচরের জাল পাতানো ছিল। তারা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। এই মির্জাফরদের সাহায্যেই বৃটিশ সরকার ১৯০ বৎসর পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করে গেল। তা ছাড়া গ্রাম্য সমাজব্যবস্থায় ৯।১০ বৎসর বয়সের পর মেয়েদের বাইরে বেরুনো বা কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলা নিষেধ ছিল। আমাদের পাডাটা ছিল এ সমস্ত ব্যাপারে অত্যন্ত কডা। এই পরিবেশে দিনের বেলা কোন কাজকর্ম করা বা কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা সম্ভব ছিল না। তাই আমাদের বেশীর ভাগ কাজকর্মই করতে হত রাতের গভীর অন্ধকারে। সভাসমিতি, শিক্ষণকেন্দ্র ও আলাপ-আলোচনার জায়গা ছিল কোন এক নির্জন স্থানে—ভৌতিক পরিবেশে। সর্পসংকুল কর্দমাক্ত পিছল পথে রাতের অন্ধকারে আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে হত। ভূতের ভয় আমাদের ছিল না। পুলিশ এবং গুপ্তচরের চোখে ধূলো দিয়ে কার্যসিদ্ধি করাই ছিল আমাদের আসল উদ্দেশ্য। তাই দুর্গম পথেই ছিল আমাদের যাত্রা। গভীর রাতে বেরুতে গিয়ে কতদিন অভিভাবকদের কাছে কত নির্যাতনই না ভোগ করেছি! দুরপনেয় দুর্নামের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছি। আমরা ছিলাম দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত-প্রাণ। তাই মনে এই সান্ত্বনা ছিল যে, মাগো, 'তোমারি লাগিয়া কলঙ্কের ভার বহিতে আমার সুখ।' এই দুর্নাম বা কলঙ্ক ছিল আমাদের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ। কারণ, লোকে যতদিন আমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পারবে, ততদিন আমাদের কাজের সুবিধা। কিন্তু আমার কপালে এই সুখ বেশীদিন সইল না। অভিভাবকেরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, আমি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছি এবং কল্পনা দত্ত ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার যোগা-যোগ আছে। পুলিশের কাছে খবর গেল যে, আমার কাছে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র আছে। বাড়ী খানাতল্লাসী হওয়ার পরে সরকারী চাকরী থেকে বাবার কর্মচ্যুতি

হওয়ার ভয়ে বাড়ীর সকলে আমার মরণ কামনা করতে লাগলেন। মাকে আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অত বড় বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মেয়েরাও যে বিদ্রোহ করতে পারে একথা মাকে কিছুতেই বোঝান যেত না। মা মনে করতেন, তাঁদের সনাতন গণ্ডীবদ্ধ পারিবারিক জীবনে আমি এক মূর্তিমান বিদ্রোহ। তার জন্য মা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেন, আর শাসনের নামে আমার উপর চলত অকথ্য নির্যাতন। তাঁদের শাসন যত প্রবল হত, বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবার জন্য আমার মন হয়ে উঠত তত দুর্বার। বিপ্লবের ডাক যে একবার শুনেছে, তার কাছে পথের বাধা তুচ্ছ। তাই মনে হত—

"যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্ত-মাঝে।"

চট্টগ্রাম বিপ্লবের যে মহান্ আদর্শের দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনমুক্ত অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা কেবল হিন্দুর নয়, কেবল মুসলমানের নয়, সে একটি মাত্র জাতির—ভারতবাসীর। সে ভারতবর্ষ হবে শোষণমুক্ত, বঞ্চনাহীন, সুখী সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষ। মুক্তিকামী শহীদেরা উত্তরসূরীদের জন্য এই স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করেছেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবের মহানায়ক মাষ্টারদা বিদায়কালীন বাণীতে তাঁর এই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছেন, "...আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম? মাত্র একটি জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন—একটি সোনালী স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন।" মাষ্টারদার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা-অর্জনে জাতিকে আরো কত চরম মূল্য দিতে হয়েছে! তা লেখা আছে খণ্ডিত ভারতের বেদনার ইতিহাসে—অশ্রু-লেখায়। রাত্রির তপস্যা দিনকে আনয়ন করেছে কোন্ মূল্যে, তা বিচার করবে ভাবীকালের ইতিহাস।

শের-এ-চাটগাম্ কাজেম আলী মিঞা

[১৮৫২-১৯২৬]

শ্রীবিনোদ চৌধুরী

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট মোহাম্মদ কাজেম আলীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মুনসী কাছিম আলী।

বালক কাজেম আলীকে স্কুলে দেওয়া হইয়াছিল। পরে পিতার নির্দেশে তিনি হুগলী গমন করেন। হুগলী হইতে এনট্রান্স পাশ করিয়া কাজেম আলী চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসেন। তৎপর তিনি শিক্ষকতা সুরু করেন সাতকানিয়ায়।

তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি কখনও বিদেশী সরকারের সহিত আপোষ করেন নাই, দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য চিরদিন সংগ্রাম করিয়াছেন। দেশ ও দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য তিনি আপন অন্তরে প্রেরণা বোধ করেন। তাই একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া মানুষ গড়ায় কৃতসংকল্প হন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ সালের দিকে তিনি চট্টগ্রাম কলেজের নিকটে কলেজ রোডের পূর্বদিকে একখণ্ড জমি খরিদ করিয়া চিটাগাং মিডল ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের বেতন ছিল কম। তদুপরি হাফ ফ্রি, ফুল ফ্রি ইত্যাদির জন্য স্কুলের জনপ্রিয়তা বাড়ে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখিতা এই স্কুলের একটা চরিত্রে দাঁড়াইয়াছিল। বস্তুতঃ এই স্কুলও ছিল ভবিষ্যৎ ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র।

পরে পিতার সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ১৮৮৮ সালে তিনি চিটাগাং হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন। কোন এক ব্যক্তির পক্ষে একটি হাই স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা তৎকালে এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল। তাই এই স্কুল সরকার ও জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। সরকার তাঁহাকে "খান বাহাদুর" উপাধি দিবার প্রস্তাব করে। তিনি খেতাব গ্রহণে অস্বীকার করেন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে ১৮৯৩ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত করেন এবং মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি কমিশনার ছিলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হয়। আন্দোলনের ভাবাদর্শ স্বাধীনচেতা কাজেম আলী সাহেবের মনে সাড়া জাগায়। তিনি আন্দোলনে শরিক হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবাসী লাভ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। তুর্কীর খলিফার সহিত চুক্তি ভঙ্গ করায় মুসলমানদের অসন্তোষও চরমে উঠে। ফলে দুর্বার কংগ্রেস-খেলাফৎ আন্দোলন চট্টগ্রামে আরম্ভ হয়। কাজেম আলী সাহেব এই আন্দোলনের এক প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে "শের-এ-চাটগাম্" উপাধি দেয় চট্টগ্রামের জনসাধারণ এক বিশাল জনসভায়।

তিনি চট্টগ্রামী ভাষায় জনসভায় ভাষণ দিয়া জনতাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারদর্শী ছিলেন। একবার জে. এম. সেন হলের এক সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা কয় কোটি, আর বিদেশী শাসক্ কয়টা লোক? এক একটি চাপড মারিলে তাহাদের গাল থাকিবে না—আমরা এক সঙ্গে প্রস্রাব করিলে তাহারা ভাসিয়া যাইবে।" জনতাকে তিনি ভালবাসিতেন, জনতাও তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। এত সার্বজনীন ভালবাসা, এত শ্রদ্ধা একমাত্র দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ছাডা আর কোন নেতা পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

দেশপ্রিয়ের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যখন বার্মা অয়েল কোম্পানী ধর্মঘট, রেলওয়ে ধর্মঘট, অসহযোগ প্রভৃতি আন্দোলন সাফল্যলাভ করিতেছিল, তখন দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের প্রধান সহকর্মী ও পরামর্শদাতা ছিলেন কাজেম আলী সাহেব। এই সময় কাজেম আলী সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ, খাদেমুল ইসলাম সোসাইটি, চট্টগ্রাম এসোসিয়েসান, খেলাফৎ কমিটি, চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটি, জমিওতুল ওলেমা প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের বহু স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার সহিতও জড়িত ছিলেন। সেনগুপ্তের সহিত একবার তিনি ধৃত হইয়া জেলে প্রেরিত হন। বন্দীদের মধ্যে বৃদ্ধ কাজেম আলীকে দেখিতে পাইয়া ইংরেজ সিভিল সার্জন মন্তব্য করেন—"এই বৃদ্ধ কি অপরাধ করিতে পারেন?" বৃদ্ধ জবাব দিয়াছিলেন, "এই শরীরে এখনও যে তেজ আছে, গোটা ইংরেজ জাতটাকে পুড়িয়ে মারতে পারি।"

কাজেম আলী সাহেব কংগ্রেস টিকিটে চট্টগ্রাম হইতে ভারতীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৬ সালে তিনি আইন সভার কাজে দিল্লীতে অবস্থানকালে ১২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হঠাৎ সেখানে প্রাণত্যাগ করেন।

চট্টলগৌরব মহিমচন্দ্র দাস

[১৮৭১-১৯৪০]

দীপক দত্ত

চট্টলগৌরব মহিমচন্দ্র দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে একশত দুই বৎসর পূর্বে (১৮৭১ ইং)। তাঁর লোকান্তরের পর (১৯৪০) তেত্রিশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বদেশের মুক্তিব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহিমচন্দ্রের স্মৃতি আজকের দিনে ক্ষীয়মান হলেও দেশ ও জাতির পুনরুজ্জীবন-ইতিহাসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

বাংলা ১২৭৮ সনের ১৫ই মাঘ চট্টগ্রামের অন্যতম বর্দ্ধিষ্ণু ভাটিখাইন গ্রামে শাস্ত্রজ্ঞ ও মহানুভব যাত্রামোহন দাসের দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয়। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে চট্টলজননী পেয়েছিলেন দুই কৃতী ও কৃতবিদ্য পুত্রকে—বেণীমোহন ও মহিমচন্দ্র। দুই ভ্রাতাই ছাত্রজীবন থেকে অপূর্ব মেধা, ধীশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। মহিমচন্দ্র প্রথম জীবনে ওকালতি ব্যবসায়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। অতঃপর, বৃহত্তর কর্মজীবনে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করে সত্তর বৎসর না হতেই দেহরক্ষা করে গেছেন। বেণীমোহন চট্টগ্রামে নেতৃস্থানীয় ডাক্তার ছিলেন এবং মেডিক্যাল স্কুল, আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতারূপে স্বনামধন্য হয়েছিলেন।

ব্যবহারজীবীরূপে অর্থোপার্জন, খ্যাতিলাভ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন মহিমচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। "জননী জন্মভূমি"র সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন অন্যধর্মী যুবক মহিমচন্দ্র। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে চট্টগ্রামের যুব-নায়ক নলিনীকান্ত সেনের সহযোগে মহিমচন্দ্র সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। সহরে ও বিভিন্ন পল্লীকেন্দ্রে সভাসমিতি, বিলাতী পণ্যবর্জন ও দাহ প্রভৃতি কার্যে তাঁর অদম্য উৎসাহ ও জ্বালাময়ী ভাষণাদি সেদিনের জাতীয় জাগরণে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার পর দেশে নব-জাগৃতির ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে মহিমচন্দ্র "পাঞ্চজন্য" নামক এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে আত্মনিয়োগ

করেন। অল্পকাল মধ্যেই তদানীন্তন বিদেশী শাসনকর্তৃপক্ষ তাঁর কঠোর সমালোচনা ও স্বাধীন সম্পাদকীয় মন্তব্যাদি অসহ্য মনে করে পত্রিকা প্রকাশে বিঘ্নসৃষ্টি করতে থাকে। এর প্রতিবাদস্বরূপ মহিমচন্দ্র কাগজখানি বন্ধ করে দেন।

অতঃপর, বছর দশেকের মধ্যেই স্বাধীনতা-আন্দোলন দেশব্যাপী ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র শান্ত জনতার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ব্রিটিশ চণ্ডনীতির প্রচণ্ড প্রকোপে কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই বিদেশী শাসনের উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয়ে উঠেন। মহাত্মা গান্ধী ঘোরতর নিরাশ অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দেশের সম্মুখে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর সহিত অহিংস অসহযোগের অভিনব আন্দোলনের প্রোগ্রাম উপস্থিত করেন। ১৯২১ সালে ভারতব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়। গান্ধীজীর অন্যতম সহায়ক নেতৃপ্রবর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মার্চ মাসে অসহযোগের মন্ত্রপ্রচার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম গমন করেন। তাঁরই উদাত্ত আহ্বানে অপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। প্রথমেই যে কয়েকজন দেশাত্মবোধের নবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবকর্ম ও অশেষ ত্যাগ স্বীকার করে স্বরাজ-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের মধ্যে তরুণ ব্যারিষ্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে মহিমচন্দ্রও ছিলেন অন্যতম। সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের রণদুর্মদ অগ্রগতি যেমন হয়েছিল বাংলাদেশে দেশবন্ধুর ত্যাগপূত নেতৃত্বে, বাংলার মধ্যেও শীর্ষস্থানীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছিল পূর্ব প্রত্যন্তের ক্ষুদ্র চট্টগ্রাম জেলা। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের ঘটনাবহুল নেতৃত্বে বার্মা অয়েল কোংর কর্মীধর্মঘট এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের বৃহত্তর কর্মচারী ধর্মঘট তখনকার ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক শ্রমিক ধর্মঘটের মর্যাদা লাভ করেছিল। সেদিনের ঘটনার আবর্তে সরকারের নির্যাতন ও বাধানিষেধাদি সত্ত্বেও একাধিক শোভাযাত্রা, সভাসমিতি অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামেই সর্বপ্রথম আইন অমান্য পদক্ষেপ সূচিত হয়। এই সকল অভূতপূর্ব কর্মপ্রবাহে দেশপ্রিয়ের সর্বার্থসাধক নেতৃত্বে ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, প্রসন্নকুমার সেন, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ-এ-চাট্‌গাম কাজেম আলি, মনিরুজ্জমান ইস্‌লামাবাদী, শিখনেতা কৃপালদাস উদাসী, রমেশচরণ রক্ষিত প্রমুখ নেতৃগণের মধ্যে অম্লান মহিমায়, প্রজ্ঞাবলে ও বাক্‌চাতুর্যে মহিমচন্দ্র ছিলেন মধ্যমণি-স্বরূপ। তাঁর স্থিরমস্তিষ্কের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং বিদ্যা-বৈভবের অধ্যাত্মশক্তি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের উৎসাহ-প্রদীপ্ত রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার সাফল্যের পথে যথাযোগ্য সামর্থ্য জুগিয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভেই মহিমচন্দ্র যে ওকালতী ব্যবসা স্থগিত রাখেন, তা তাঁর ত্যাগব্রতের অসাধারণ পদক্ষেপ। স্বরাজআন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবার পরেও তিনি পুনর্বার আদালতে ফিরে যান নি। অসহযোগ আন্দোলনে যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গে মহিমচন্দ্রও ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। পরে ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করে আইন অমান্য অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন এবং তাঁর সম্পত্তিও ক্রোক করা হয়েছিল। তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের প্রথমে সম্পাদক ও পরে সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন অশেষ বিপদ ও সমস্যাবলীর ঝুঁকি বহন করে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরূপে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরিষদের সদস্য হিসাবে কলিকাতায় অবস্থানকালে অত্যধিক পরিশ্রম ও পূর্ব থেকে স্বাস্থ্যহানি হেতু অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দেশপ্রাণ মহিমচন্দ্র মাত্র ৬৯ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। মহানগরীর সকলশ্রেণীর বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের আন্তরিক শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে চট্টলার বরপুত্রের নশ্বর দেহ পরদিন তাঁর প্রিয়তম জন্মস্থান চট্টগ্রামে আনীত হয়েছিল (১৯৪০ সালের ৪ঠা এপ্রিল)। সহস্র সহস্র শোকগ্রস্ত চট্টলবাসীর শোকযাত্রা শেষে, অভূতপূর্ব জনসমাবেশে যাত্রামোহন সেন ভবন প্রাঙ্গণে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মর্মরমূর্তির পার্শ্বদেশে তাঁর শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মহিমচন্দ্রের জীবন বহুমুখী প্রতিভায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। আইনজীবী, সমাজসেবক এবং রাজনীতিচর্চার মধ্যে তিনি ছিলেন শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক। যৌবনে 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েও তাঁর সাংবাদিক স্পৃহা অদম্য ছিল। ১৯২১ সালে বন্ধুস্থানীয় কালীশঙ্কর চক্রবর্তীর সহায়তায় তাঁর সাপ্তাহিক 'জ্যোতিঃ' দৈনিকে রূপান্তরিত হলে মহিমচন্দ্রের উপরই এর সম্পাদনার কঠোর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। ১৯২৯ সালে পুনর্বার সরকারী রোষে পতিত হওয়ায় 'দৈনিক জ্যোতিঃ' প্রকাশ বন্ধ করে তিনি 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলার মফঃস্বলে ইহাই ছিল প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ঘোরতর দুঃসাহসে ভর করে, বিদেশী সরকারের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ উপেক্ষা করে এবং বহুল ক্ষতি সহ্য করেও এই পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালে অনুজ শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস মেজদা'র প্রোজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণ করে 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পাকিস্তান আমলে এই ব্যাপক জনপ্রিয় পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী

[১৮৭৫-১৯৫০]

অভিজিৎ গুহ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম বীর সেনানী, কংগ্রেস-খেলাফৎ-কৃষকপ্রজা ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আন্দোলনের সুনিপুণ নেতা, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানসমাজের অন্যতম পথিকৃৎ, বিশিষ্ট লেখক ও সমাজসেবক মৌলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব চট্টগ্রামের একজন প্রখ্যাত সন্তান।

মৌলানা ইসলামাবাদীর জন্ম ১৮৭৫ সালের আগষ্ট মাসের এক রবিবারে। জন্মস্থান পটিয়া থানার বরলিয়া গ্রাম। তিনি ১৮৯৫ সালে মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে বেছে নিয়ে চলে যান সুদূর উত্তরবঙ্গে। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকবার মানুষ তিনি নন।

১৮৯৮ সালে মৌলানা ইসলামাবাদী কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই বছরেই কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ও মুন্সী রেয়াজউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'মাসিক ইসলাম-প্রচারক'-এ তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। এটি মুসলমান সমাজের পুনর্জাগরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ। এখানেই সাংবাদিক ইসলামাবাদীর জন্ম। ক্রমশঃ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপেও তিনি চিহ্নিত হন। ১৯০৩ সালে কলিকাতায় মুসলমান শিক্ষা কনফারেন্স ও ইসলাম মিশনের মুখপত্ররূপে 'সাপ্তাহিক সোলতান' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন রাজসাহীর মীর্জা ইউসুফ কালী। কিছুদিন পরে 'সাপ্তাহিক সোলতানে'র সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইসলামাবাদীর উপর এসে পড়ে। স্বল্প আয়ের অধিকারী ইসলামাবাদীর পক্ষে এ এক দুঃসহ অবস্থা। অত্যন্ত আর্থিক কৃচ্ছ্রতার মধ্যে তিনি 'সোলতান' প্রকাশ করতে লাগলেন। পরে 'সোলতান'-এর অফিস ও ছাপাখানা সরিয়ে নিয়ে যান চট্টগ্রামে। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে ১৯১০ সালে প্রথম পর্যায়ের 'সোলতান'-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে

গেল। সম্ভবত ১৯১২ সালে আগা মইদুল ইসলাম-প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'হাবলুল মতিন'-এর বাংলা সংস্করণের সম্পাদক হন মৌলানা ইসলামাবাদী। এই পত্রিকার বাংলা সংস্করণের সঙ্গে ইংরেজী ও ফার্সী সংস্করণও প্রকাশিত হত। কিন্তু অল্প দিন পরে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৫ সালে 'মাসিক আল্-এসলাম' প্রকাশিত হলে সম্পাদক মৌলানা আকরম খাঁকে সাহায্য করতেন ইসলামাবাদী। কিন্তু পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে সম্পাদনার সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপর পড়ল। চার বছর চলার পর পত্রিকাটির মৃত্যু হল। ১৯২৩ সালে ইসলামাবাদীর নিজস্ব উদ্যোগে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সাপ্তাহিক সোলতান' প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এর রূপ বদল ঘটল দৈনিক হিসাবে। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত 'দৈনিক সোলতান' প্রকাশিত হলেও ইসলামাবাদী ১৯২৮ সালে তা ত্যাগ করে স্বল্পায়ু 'দৈনিক আমীর' প্রকাশ শুরু করেন। ১৯৩৪ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সত্যবার্তা'র প্রকাশনার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইসলামাবাদী সাহেবের বহুমুখী প্রতিভা সাংবাদিকতাকে জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে বেছে নেয় নি। সাংবাদিকতা তাঁর কাছে আদর্শ ও বক্তব্য প্রচারের মাধ্যম। দেশের অনগ্রসর মুসলমান সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে সাংবাদিক ইসলামাবাদীর অবদান অনস্বীকার্য।

ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনও ঘটনাবহুল। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ও কৃষক-প্রজা পার্টির সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। চট্টগ্রাম জেলা মুসলীম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন ইসলামাবাদী। চট্টগ্রাম দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে ১৯৩৭ সালে তিনি আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদান ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সমর্থনে এগিয়ে আসা। আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সক্রিয় সাহায্য করার জন্য ইসলামাবাদী ঢাকা ও চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজশক্তি তাঁকে ও জালাল আহ্মদ প্রমুখ তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে দিল্লী দুর্গে বন্দী রেখে অশেষ নির্যাতন করে। তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মরহুম আলহজ মৌলবী সৈয়দ সুলতান আহমদ আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সাহায্য

করার ফলে রংপুর ও অন্যান্য জেলে প্রায় ১০ মাস বন্দীজীবন যাপন করেন। ইসলামাবাদীকে কিছুদিন পাঞ্জাবের মীনওয়ালী জেলে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীর অমানুষিক নির্যাতনের হাত থেকে তিনি রেহাই পান নি। ঐ জেলে কড়ির সঙ্গে তাঁর পা দুটো বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে রেখে তাঁর উপর নির্যাতন চালানো হত। কিন্তু এত নির্যাতন-নিপীড়ন সত্ত্বেও তাঁর দেশপ্রেম বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। নেতাজীর আদর্শকে তিনি মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করতেন। তাই ঐ আদর্শ রূপায়ণের জন্য শেষ বয়সে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় 'মাসিক বসুমতী'তে [পৌষ, ১৩৫৯] লিখেছেন :

> 'মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীকে চট্টগ্রামের উগ্র জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের অগ্রদূত বলা যায়। এই সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে আমাদের পত্রিকার [দৈনিক কৃষক] সম্পাদক, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু সিরাজউদ্দীনের মারফৎ। অদ্ভুত মনোবলসম্পন্ন অথচ অত্যন্ত স্বল্পভাষী এই বৃদ্ধ। এঁরা এমনি ধরণের লোক, যাঁরা সভায় বা কোনো প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের ব্যাক বেঞ্চে এসে চুপি-চুপি বসে থাকেন ভালো মানুষটির মতো। হঠাৎ চোখে পড়লে অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন অতি সাধারণ বা তাঁর চাইতেও নিম্নস্তরের অনুল্লেখযোগ্য কাউকে মনে করে। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলেও বক্তৃতা-মঞ্চে এসে এঁরা নিজের পরিচয় দিতে সীমাহীন সংকোচ বোধ করেন, প্রস্তাব উত্থাপন বা সমর্থনের ঝামেলা এড়িয়ে এঁরা শুধু প্রয়োজনের সময় হস্ত উত্তোলনেই কাজ শেষ করে ফেলতে চান। এঁরা চলেন রাজপথ এড়িয়ে অলি-গলি দিয়ে, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে। পরিচিতির গালভরা বুলি উচ্চারণ করে এঁরা নিজেদের ঢাক পেটান না।.........
>
> উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শুভ্রশ্মশ্রু ও শুভ্রকেশ এই বৃদ্ধ মুসলমানকে প্রায়ই আমার মনে হয়েছে প্রাচীনকালের ঋষির মতো। অনেক বার গেছি তাঁর বাসায়, মৌলালীর মোড়ের প্রকাণ্ড বাড়ীখানার দোতলায়, অনেক দিন অনেক কথাই আলোচনা হয়েছে

তাঁর সঙ্গে। নেতাজীর প্রসঙ্গ এসে পড়লেই দেখেছি তাঁর ফরসা মুখখানা উত্তেজনায় একেবারে লাল হয়ে উঠতো।·········

কিছু দিন পর নেতাজীর দুর্ধর্ষ আজাদ হিন্দ্-ফৌজ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে বসে। রেঙ্গুনের ওপর ভারতের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে তারা 'দিল্লী চলো' ধ্বনি তুলে এগিয়ে আসে ভারতের দিকে ইম্ফলের পথে।······

এই সময় মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর সঙ্গে সুবোধের [বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সুবোধ চক্রবর্তী] পরিচয় ঘটে। সুবোধের সঙ্গে আলাপে বৃদ্ধ এতটা মুগ্ধ হন যে, শেষ বয়সে তিনি একটা চরম ঝুঁকি নিতে স্বীকৃত হন। সুবোধকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে যান তাঁর দেশ চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে, ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরাকানের পথে নেতাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনই ইসলামাবাদী ও সুবোধের লক্ষ্য। কিন্তু সীমান্তে সতর্ক প্রহরা ; আরও আরাকান আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দখলে যাবার পর এখানকার সতর্কতা যেন একেবারে সীমাহীন! কী করা যেতে পারে—বৃদ্ধ খানিকটে চিন্তা করলেন, তার পর স্বাভাবিক ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বললেন : সুবোধবাবু, আমার জীবনের মাত্র কয়েকদিন বাকী। তাই চরম ঝুঁকি নেবার অসুবিধে আমার আদৌ নেই।······

কিছুদিন পর দেখা গেল, ভারত-আরাকান সীমান্তে সৈন্যদের ও গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য গোটাকতক সস্তা রেস্তোরাঁ স্থাপিত হয়েছে গোটা কয়েক শানকী, কাচের গ্লাস ও একখানা লম্বা টেবিল ও একখানা বেঞ্চ নিয়ে আর সেই রেস্তোরায় বয় হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নীরেন রায় ও অজিত রায়। আরও দেখা গেল, পার্বত্য পথে গামছা ও লুঙ্গি ফেরি করে বিক্রয় করে বেড়াচ্ছে জন কতক দরিদ্র মুসলমান—উপেন সরকার, জগদীশ ভৌমিক প্রভৃতি। ভারতীয় সেনারা এই সব রেস্তোরাঁয় বেশ আড্ডা জমিয়ে ফেললো···বীভৎস আনন্দের প্রাবল্যে সৈন্যেরা যখন হল্লোড় সুরু করে কোনো মিঠে ঠুংরীর কলি সবাই মিলে একই সঙ্গে ভাজতে সুরু করেছে, ঠিক তখন চৌকার পাশের ঝোপে ছোট্ট একটি শব্দ শোনা গেল। বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ-বয় নীরেন রায়।

একটু পরই ফিরে এসে জানালো, ইসলামাবাদীর জামাই সাহেব এসেছেন। ...নীরেন চোখের ইসারায় অজিতকে রওনা হতে বললো।

বাইরে ঝোপের আড়ালে জামাই সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, এই সুযোগ।......দুজনে পাহাড়ের সর্পিল ঘুর-পথে বহু চড়াই ও উৎরাই পেরিয়ে, পাথর থেকে পাথরে উল্লম্ফনে ধেয়ে-চলা পার্বত্য ঝরণা অতিক্রম করে হাজির হলেন একেবারে চট্টগ্রাম সীমানার শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে বিদায় নিলেন জামাই সাহেব। তারপর একাই রওনা হলো অজিত রায় সেই বিপদসঙ্কুল পথে... অচিন পথে,...তারপর সে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সিপাইদের সাক্ষাৎ লাভ করে এবং অবশেষে একেবারে নেতাজীর কাছে গিয়ে পৌঁছে বাংলার সঙ্গে আরাকানের পার্বত্য পথে গুপ্ত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে।...'

চট্টগ্রাম সহরে মোমিন রোডে দরিদ্র বালকদের শিল্পশিক্ষার জন্য 'কদম্ মোবারক এতিমখানা' প্রতিষ্ঠা সমাজসেবক ইসলামাবাদীর অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই অনাথাশ্রমটি আজ উচ্চ বিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভাঙা কুঁড়েঘর এখন ত্রিতল দালান। সীতাকুণ্ড হাই স্কুল প্রতিষ্ঠাব্যাপারেও তাঁর অবদান অসামান্য। এই ক্ষেত্রে তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী ছিলেন মৌলানা ওবায়দুল হক সাহেব।

ইসলামাবাদী কত দূরদর্শী ছিলেন, তা ১৯৪২-৪৩ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'পাকিস্তানের অসারতা' সম্পর্কে তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলো অনুধাবন করলেই সহজে বোঝা যায়।

এই অনন্যসাধারণ পুরুষের জীবনাবসান হয় ১৯৫০ সালের ২৪শে অক্টোবর তারই বড়ই আদরের, বড়ই সাধের 'এতিমখানা'য়।*

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় বাংলাদেশ সমাজ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দ মোস্তফা জামাল, জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক বিনোদ চৌধুরী, 'দৈনিক আজাদী'তে [২৪শে অক্টোবর, ১৯৭৩] প্রকাশিত শরীফ রাজা সাহেব এবং মাসিক বসুমতী'তে [পৌষ, ১৩৫৯] প্রকাশিত দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছি। এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।—লেখক।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

[১৮৮৫-১৯৩৩]

শচীন দত্ত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্তর-নিঃসৃত বাণীর প্রতিধ্বনি তুলে দেশপ্রিয়ের জীবনালেখ্য স্মরণ করি—"মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি অপরিসীম দুঃখের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। আচরণে মহৎ এবং সৌজন্যে সর্বজয়ী যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যতম সর্বজনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। যাঁর জীবন মহৎভাবে উদ্ভাসিত, উদ্‌যাপিত এবং অকুণ্ঠচিত্তে উৎসর্গীকৃত—তাঁর স্মৃতি ভারতের পক্ষে গৌরবের এবং বেদনায় ভারাক্রান্ত।" ("...The memory of such a life nobly lived and freely given is at once India's glory ano shame.")

স্বাধীনতা-সমরাঙ্গণে সর্বভারতীয় জননায়কগণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনের আয়ুষ্কাল ছিল অতি কম—মাত্র আটচল্লিশ বৎসর (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ থেকে ২২শে জুলাই ১৯৩৩ ইং)। এর মধ্যে তাঁর কর্মজীবন ও নেতৃত্বকাল আরও অল্পস্থায়ী—মাত্র বার বৎসর (১৯২১-১৯৩৩ ইং)। এই অপেক্ষাকৃত সীমিত সময়ের মধ্যে দেশপ্রিয় তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ববলে হয়ে উঠেছিলেন বহুদিকে স্মরণীয় ও বরণীয় পথিকৃৎ—ইংরেজীতে যাকে বলে গ্লোরিয়াস পাইওনীয়ার (glorious pioneer)। তাঁরই নেতৃত্বে ভারতে সর্বপ্রথম বিদেশী শাসকের রুদ্রশাসনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক শ্রমিক-কর্মী ধর্মঘটের সাফল্যমণ্ডিত পরিচালনা করেছিলেন। এই দুই-ই তাঁর প্রিয় জন্মস্থান চট্টলভূমির অমর অবদান—যাকে মহাত্মাজী "চিটাগং টু দি ফোর" ("Chittagong to the fore") রচনায় স্বীকৃতি দান করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের পর গান্ধিজীর ও কংগ্রেসের সহকর্মী সকলের সম্মতিক্রমে তাঁকেই বাংলার স্বরাজ্যদলপতি, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি এবং কলিকাতার মেয়রের আসনে বরা—এই বহুলপ্রশংসিত ত্রিমুকুট-ধারণের গুরুদায়িত্ব-ভার অর্পণ করা হয়েছিল। অতঃপর, তিনিই কলিকাতা মহানগরীর বারংবার

পাঁচবার সর্বজনপ্রিয় মেয়র-পদে অধিষ্ঠিত হয়ে অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। এই বিপুল কর্মক্লান্ত সংগ্রামী বীরের দেহ বার বার কারাবরণ করে ভেঙে পড়েছিল। শেষবার রাঁচীতে অন্তরীণ থাকাকালে নির্জন ও নির্বান্ধব অবস্থায় দেশনায়ক যতীন্দ্রমোহনের দেহাবসান ঘটে। এদিকেও ভারতবর্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্যের প্রথম অন্তরীণরূপে তাঁর মৃত্যুবরণ।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের দেহান্ত হয়েছে প্রায় একচল্লিশ বৎসর পূর্বে। তাঁর নেতৃত্বকালের পর (১৯২১) অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর অসাধারণ ত্যাগমহিমা, জলন্ত প্রাণপ্রবাহ, বিপুল সাহস, অশেষ কর্মকুশলতা ও সংগঠন-শক্তি,—বিশেষ করে সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের জনমানবের—সাধারণ মানুষ, কর্মী, শ্রমিক ও ছাত্র সাধারণের প্রতি তাঁর অন্তরের একান্ত দরদ এবং আপনভোলা প্রেমের কাহিনী অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যতীন্দ্রমোহনেব দীর্ঘ সমুন্নত অবয়ব, সেই উন্নত নাসিকা, আয়ত নয়ন, বিরাট বক্ষ, প্রশস্ত ললাট, আর তারই মধ্যে এক উদার, মহৎপ্রাণ এবং সেই সদাপ্রফুল্ল মানুষটির প্রাণখোলা হাসি ও প্রয়োজনবোধে প্রচণ্ড নির্ভীক সংগ্রামী চিত্ত!

চলিত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভেই ভারতবর্ষের মুক্তিব্রতে যুগান্তকারী অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর অনন্য সহকর্মীরূপে সারাদেশে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করে আবির্ভূত হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। সর্বত্যাগী দেশবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে যাঁরা দেশমুক্তির সংগ্রামে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন, যতীন্দ্রমোহন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তরুণ ব্যারিষ্টার, ভবিষ্যতের বিপুল প্রতিশ্রুতি, অর্থোপার্জনের বহুল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও লালসা এক মুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে তিনি সেদিনের জনআন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে আসেন। জন্মভূমি চট্টলেই তাঁর কর্মসাধনা জীবনমরণ-সমস্যা-সঙ্কুল পথে আরম্ভ হয়। **ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সুরু থেকেই ব্রিটিশ পুঙ্গবদের সাথে মুখোমুখী সংগ্রামের নির্ভীক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন।** এ পর্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯২১ সনের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে বার্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণ। এই ধর্মঘট উপলক্ষে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সর্বাত্মক "হরতাল"কে ভারতবর্ষের তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সফল জনবিক্ষোভ বলা যেতে পারে। কোম্পানীর ইংরাজ কর্তাগণ এবং চট্টগ্রামের ইংরাজ জেলা

ম্যাজিষ্ট্রেট স্ট্রং সাহেব (Mr. Strong, I. C. S.) মিঃ সেনগুপ্তের (তখনও তিনি 'দেশপ্রিয়' হন নি) অদ্ভুত সংগঠনশক্তি, ব্যাপক প্রভাব, ধর্মঘট-পরিচালনায় অশেষ কুশলতায় শেষ পর্যন্ত হার মেনে যান এবং সমস্ত দাবী-দাওয়ার আপোষ-মীমাংসা গ্রহণ করলে ধর্মঘটের অবসান হয়।

অল্পদিন পরে মে মাসে আরম্ভ হয় আসামের চা-বাগানে হাজার হাজার নির্যাতিত কুলীদের চাঞ্চল্যকর আন্দোলন ও চাঁদপুরে সদলবলে আশ্রয়-সমাবেশ এবং এরই প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্মচারীদের চট্টগ্রাম হেড কোয়াটার্স থেকে গৌহাটি-তিনসুকিয়া পর্যন্ত হাজার মাইল জুড়ে বিরাট ধর্মঘট। এও তখন অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে প্রথম রাজনৈতিক শ্রমিক ধর্মঘট। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দগামী যাত্রীবাহী জাহাজগুলিও অচল হয়ে যায়। এই ব্যাপক ধর্মঘটকালে চা-বাগানের হাজার হাজার কুলী, রেলওয়ের কর্মহীন কয়েক হাজার কর্মচারী, জাহাজ কোম্পানীর শত শত ধর্মঘটী খালাসী-কর্মী সকলেরই এবং সম্পৃক্ত সমস্যাবলীর বিরাট দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে বহন করে জাতির পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন যতীন্দ্রমোহন। তাঁর পরম সহায়ক ছিলেন চট্টল নেতারা ব্যতীত চাঁদপুরের বয়োবৃদ্ধ জননায়ক হরদয়াল নাগ মহাশয়। চাঁদপুর ষ্টেশন প্রাঙ্গণে কুলীদের ওপর পুলিশী হামলার পরে কুমিল্লার শ্রদ্ধেয় অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেশপ্রিয় সেনগুপ্তসহ তদানীন্তন শাসক কর্তৃপক্ষের সহিত এই অমানুষিক নির্যাতনের নির্ভীক মোকাবিলা করেছিলেন। পরে কুলী সমাবেশে কলেরার আক্রমণকালে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ (C. F. Andrews) সাহেবও সেবাকর্মে আগমন করেন। দিনের পর দিন, রাতভোর শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিরামহীন কর্ম-তৎপরতা, বিভিন্ন ষ্টেশন ও ক্যাম্প-পরিক্রমা এবং ধর্মঘটের কেন্দ্রস্থল চট্টগ্রামে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর উদ্দীপনাময়ী বজ্রনির্ঘোষ ভাষণ ও মা-ভৈ বাণী একদিকে যেমন ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটকারীদের প্রাণে আশা ও আশ্বাস জাগিয়ে রাখত, অপর দিকে সহকর্মীদের ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর গঠননিষ্ঠা এবং অপূর্ব শৃঙ্খলা দেশবাসীকে চমৎকৃত করে তুলেছিল। দীর্ঘ তিনমাস ব্যাপী এই বিশাল জনসংঘাত শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনায় সংহত শক্তিমান্ যুবনেতা যতীন্দ্রমোহন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত করে দেন। সহস্রাধিক ক্ষুধার্তের অন্ন-সংস্থান করতে গিয়ে তিনি সর্বহারা হয়ে যান। তখন আমরা দেখেছি, প্রায় অর্ধলক্ষ টাকার ঋণজালে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। চাঁদপুরে কুলী-নির্যাতনকালে দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জনও সস্ত্রীক পদ্মা-মেঘনার বাত্যাসঙ্কুল বক্ষে দেশীয় নৌকাযোগে (ষ্টীমার-চলাচল বন্ধ থাকা হেতু) অকুস্থলে আগমন করে পরম ত্যাগী ও অক্লান্ত শিল্প-নায়ক যতীন্দ্রমোহনের অসামান্য কর্মযজ্ঞ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন।

প্রথমে চট্টলে এবং অত্যল্পকাল পরেই (১৯২৩-২৪ সন থেকে) যতীন্দ্রমোহন সমগ্র বাংলার অন্যতম প্রধান নেতার আসনে সংবর্ধিত হলেন। চট্টগ্রামের ঘটনাবর্তের অসামান্য সাফল্যের পর একবার কলকাতা এলে তাঁকে পূর্ববাংলার "মুকুটহীন সম্রাট" আখ্যায় অভিনন্দিত করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই তিনি অনুরাগী জনগণ কর্তৃক "দেশপ্রিয়" আখ্যায় সুপরিচিত হয়ে গেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে সারা ভারতময় তাঁর নেতৃত্ব-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতায় বঙ্গীয় বিধান পরিষদে, পৌর সভায় (করপোরেশনে) এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের অন্যতম অনুগামী ও সহকর্মী হয়ে উঠেন।

১৯৩১ সনের ৩০শে আগষ্ট সায়াহ্নে চট্টগ্রামে ফুটবল ময়দানে বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্যের দারুণ অতর্কিত আক্রমণে দুর্দান্ত পুলিশ ইনসপেক্টার আসানুল্লাহ হত্যার অব্যবহিত পরে চট্টগ্রাম সহরে ও বহু গ্রামাঞ্চলে তদানীন্তন জেলা শাসক ও বে-সরকারী ইউরোপীয়ানদের প্ররোচনায় পুলিশ ও মিলিটারী কর্তৃক সংখ্যা-লঘু (হিন্দু) সম্প্রদায়ের উপর অমানুষিক অত্যাচার, লুণ্ঠন, গৃহ ও দোকানপাট দাহ এবং বিবিধ নিগ্রহলীলার প্রত্যক্ষ তদন্তকালে দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত কতিপয় দেশনায়কসহ সমগ্র উপদ্রুত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে দৃপ্ত কণ্ঠে ও দুর্বার সাহসে ঘোষণা করেছিলেন, 'চট্টগ্রামের ঘটনাবলী সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ত নয়-ই, বরং আমরা সকল ঘটনার সম্পৃক্ত তথ্য প্রমাণ নিয়ে এবং নিজেই সকল উপদ্রুত অঞ্চলে দেখাশুনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এই নৃশংস অত্যাচার ও দমনলীলার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী জেলা শাসক ও পুলিশবাহিনী এবং বে-সরকারী ইংরাজদের পরোক্ষ সহায়তা ও প্ররোচনা।'

দেশপ্রিয় তখন শুধু কলকাতার মেয়র নন, সর্বভারতীয় অন্যতম কংগ্রেস জননায়ক। কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পরেই তিনি টাউন হলে বিরাট জনসভায় চট্টগ্রামের লোমহর্ষক ঘটনাবলীর মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে নির্দোষ জনগণের উপর জেলাশাসকগোষ্ঠীর জঘন্য নিপীড়নের ঘোরতর নিন্দাবাদ করতঃ তদানীন্তন বাংলা সরকারকে রীতিমত 'চ্যালেঞ্জ' দিয়ে তাঁর তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত

জোরালো কণ্ঠে জানিয়ে দেন এবং সরকারকে তার অসত্যতা প্রমাণের জন্য আহ্বান করেন।

বলা বাহুল্য, অতঃপর সরকারী তদন্ত কমিটি বসিয়েও তাঁদের অঘোষিত নির্ধারণের পর শাসকগোষ্ঠী একেবারে নীরব থেকে গেলেন। শুধু চট্টগ্রামে নয়, সারা বাংলাদেশে চট্টগ্রামে অত্যাচারের তীব্র নিন্দা ও তার ফলে ঘোরতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রবল চণ্ডনীতি সত্ত্বেও বিপ্লবীদলের হিংসাত্মক কার্য-কলাপও রণমূর্তি ধারণ করতে থাকে। এরই পরে পরে হঠাৎ জানা গেল, চট্টগ্রামে দমনলীলার অন্যতম কাণ্ডারী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শুটার সাহেব (Mr. Shooter, I. P.) সরকারী কাজে (অর্থাৎ সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে এসে) কলকাতা অবস্থানকালে আত্মহত্যা করে এর চরম প্রায়শ্চিত্ত করে যান। অল্পদিন পরেই দেখা গেল, জেলাশাসক ক্যাম সাহেব (Mr. Kemm, I. C. S.) তল্পীতল্পা গুটিয়ে চট্টগ্রাম ছেড়ে নিজদেশের দিকে পাড়ি জমিয়ে চলে যান। চট্টগ্রামের পুলিশ কর্মচারীদের কেউ সসপেণ্ড হলেন, কেউ হলেন বদলী।

সেদিন দেশের লোক বিস্মিত হয়ে দেখেছিল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বীরোচিত হুঙ্কারে ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কী রূপ প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ-সিংহের শোচনীয় পরিণাম ঘটেছিল।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর যতীন্দ্রমোহন তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে বাংলার বিবিধ দিকের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব যশের "কণ্টক মুকুটের" মত অসামান্য সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করে গেছেন। "নিত্য পরিবর্তনশীল ও কলহ-মুখরিত রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁর অপূর্ব নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ আমরা যতীন্দ্রমোহনে দেখিয়াছি (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এই পরিবেশে যতীন্দ্রমোহনের কর্মধারার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "এই বহুধা-বিভক্ত বৈচিত্র্যশীল সঙ্ঘময় বৃহত্তর বঙ্গের নেতৃত্ব যারপরনাই দায়িত্বযুক্ত ও জটিলতাপূর্ণ। সেইরূপ দায়িত্ব ও জটিলতার সমস্যায় মাথা ঘামাইবার সুযোগ বা ঝুঁকি সুরেন্দ্রনাথেরও জুটে নাই, বিপিন-অরবিন্দেরও জুটে নাই, এমন কি চিত্তরঞ্জনেরও নয়। যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিত্ব এই সকল ঝুঁকিতে যাচাই হইতে পারিয়াছে। এই বৃহত্তর বঙ্গের বৃহত্তর মাপকাঠিতে যতীন্দ্রমোহনের কর্মদক্ষতা ও নেতৃত্বযোগ্যতা পয়লা নম্বরের ইজ্জত পাইয়াছে।..."

স্বরাজ্যদল ও কাউন্সিলে বাধাপ্রদান নীতির গতিবেগ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে গেলে দেশনায়কগণ গান্ধীজীকে পুনরায় জাতীয় নেতৃত্বের পুরোভাগে রেখে ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সাল থেকে যতীন্দ্রমোহন মহাত্মাজীর সার্বভৌম কর্মনীতিতে এগিয়ে যান। অনেক সহকর্মীর সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও তিনি সংকল্পে অটল রইলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সে দুর্যোগের দিনে দেশবাসীর সর্বদা মনঃপুত হয়েছিল।

সর্বভারতীয় নেতারূপে যতীন্দ্রমোহনের অধিক কাল কাজ করার সুযোগ হল না! ১৯৩০ সনে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্বও তিনি সগৌরবে পালন করেছিলেন। তৎপূর্বে ১৯২৮ সনে জাতীয় মহাসমিতির কলকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে, সেই বৎসর ভারতের সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধকরূপে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে, লণ্ডনে Caxton Hall-এ এবং কেরালা রাষ্ট্রনৈতিক সমাবেশে সভাপতিরূপে দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের রাজনৈতিক ভূয়োদর্শন ও ভারত-স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর মননশীল ও আবেগপ্রবণ ভাষণসমূহ স্বদেশের মুক্তি-ইতিহাসের চিরন্তন সম্পদ হয়ে থাকবে।

বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়। দেশপ্রিয়ের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এল। রাঁচীতে অন্তরীণ অবস্থায় হল তাঁর জীবনাবসান। "সে মূর্তি আর দেখিলাম না। সে উদাত্ত গম্ভীর আবেগময় কণ্ঠস্বর আর শুনিলাম না। কারাগারের অন্ধকারময় পথ দিয়া বন্ধন-শৃঙ্খলভার দূরে নিক্ষেপ করিয়া বাংলার পুরুষসিংহ ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন" (সত্যেন্দ্রনাথ)। দারিদ্র্যের ভয়, রাজশক্তির রক্তচক্ষুর ভয়, দুঃখদহনের সর্বভয়ের বহু উর্ধ্বে উঠে গেলেন মৃত্যুঞ্জয়ী দেশপ্রিয়।

আমার অনুজ তারকেশ্বর

শ্রীসতীশচন্দ্র দস্তিদার

১৯৩০ সাল। ৪ঠা মে রাত্রি প্রায় ১টা। আমার অনুজ তারকেশ্বর [ফুটু] অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ীতে উপস্থিত। সঙ্গে আছে তার কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধু—রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, সুবোধ চৌধুরী এবং ফণীন্দ্র নন্দী। তারকেশ্বর বলল, পরদিন তার সঙ্গী বন্ধুরা সহরে যাবে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা সহরে যাবার জন্য তৈরী হল। আমি আমাদের সারোয়াতলী গ্রামের কালীকুমার চক্রবর্তীকে তাদের পথ-প্রদর্শক করে এগিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। কালীকুমার আসানুল্লা-হত্যাকারী হরিপদ ভট্টাচার্যের মামা। পরবর্তীকালে সে পেস্কার হয়েছিল। কালীকুমার ছয়জন বিপ্লবীকে আমাদের বাড়ীর পেছনের মাঠ দিয়ে শাকপুরা গ্রামের বোয়ালখালী খালের পাড়ে নিয়ে যায়। সে সেখান থেকে সাম্পানে করে তাদের সহরে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। ঐ ছয়জন বিপ্লবীর মধ্যে রজত, দেবপ্রসাদ, স্বদেশ ও মনোরঞ্জন কালারপোল যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে শহীদের মৃত্যু বরণ করে। সুবোধ ও ফণীন্দ্র গ্রেপ্তার হয়।

তারকেশ্বরের জন্ম ১৯০৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার সারোয়াতলী গ্রামে। পিতা চন্দ্রমোহন দস্তিদার ও মাতা প্রমীলা দস্তিদার। গ্রামের বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারকেশ্বর সহরে গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্তি হয়। বিদ্যালয়ে পড়বার সময় সে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। কলেজে পড়ার সময় তার কর্মক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়। চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কয়েকদিন পূর্বে আমাদের গ্রামের রামকৃষ্ণ বিশ্বাস [তারিণী মুখার্জি হত্যার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত] পাথরঘাটায় তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এবং কিছুদিন পরে তারকেশ্বর চট্টগ্রামের কংগ্রেস অফিসে বোমা তৈরীর সময় গুরুতরভাবে আহত হয়। তাই তাদের ঐ অভ্যুত্থানের প্রথম পর্বে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয় নি।

তারকেশ্বর গ্রামে পড়বার সময় বিপ্লবী অর্ধেন্দু দস্ত প্রমুখ তার কয়েকজন সহকর্মীর সহযোগিতায় 'বীণাপাণি লাইব্রেরী' ও একটি ব্যায়ামগার প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো ছিল বিপ্লবী দলে সদস্য-সংগ্রহের কেন্দ্র। কলেজে পড়ার সময়ও সে প্রায়ই গ্রামে এসে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্ম দেখাশোনা করত। তার সঙ্গে বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও সদরঘাট ক্লাবের কোন কোন সদস্যও আসত। তারকেশ্বরের দেখাদেখি আমাকে প্রায় সকলেই 'দুগ্গাদা' বলে সম্বোধন করত। আমিও তাদের আপন ভাইয়ের মত আদর যত্ন করতাম।

একদিন ফেরারী অবস্থায় তারকেশ্বর ও বীরেন দে বরমা গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাচ্ছিল। ডি. আই. বি-র শশাঙ্ক ভট্টাচার্য তাদের রাস্তায় দেখতে পেয়ে তারকেশ্বরকে ধরতে চেষ্টা করে। তারকেশ্বর শশাঙ্ককে গুলীবিদ্ধ করে বীরেনসহ অন্য গ্রামে চলে যায়।

তারকেশ্বরের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ দেখেছি। ধলঘাট যুদ্ধের শহীদ নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনকে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে ধলঘাট ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর শুনে তারকেশ্বরের চোখে জল দেখা দেয়।

১৯৩৪ সালের ১৮ই মে আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামে এক খণ্ডযুদ্ধের পর তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত ও সুধীন দাশ গ্রেপ্তার হয়। এই যুদ্ধে অন্যতম বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আশ্রয়দাতা গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার শত্রুপক্ষের গুলীতে নিহত হয়।

মাষ্টারদা সূর্য সেন কয়েকমাস আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁর মোকদ্দমা চলছিল। তারকেশ্বর প্রমুখ গ্রেপ্তার হওয়ার পর আবার নতুনভাবে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। জেলের মধ্যে একটি ঘরে তাঁদের বিচার চলছিল।

আমার এক আত্মীয় তারকেশ্বরকে 'স্নেহের ফুটু' সম্বোধন করে এক চিঠি দেয়। চিঠির নীচে সে আমার নাম লিখেছিল। তারকেশ্বরের নাম 'ফুটু'—তা প্রমাণ করার জন্য আমাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ চিঠিখানি আমার লেখা নয় বলাতে আমাকে তার একটি কপি করতে বলা হয়। ঐদিন মাষ্টারদা, তারকেশ্বর ও কল্পনাকে কাঁটাতারে-ঘেরা একটি বেঞ্চিতে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম।

চট্টগ্রাম কোর্টে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরের ফাঁসীর হুকুম হওয়ার পর আমরা হাইকোর্টে আপীলের সিদ্ধান্ত করি। আপীলের ব্যবস্থা করার জন্য আমি

চট্টগ্রাম থেকে উকিল বিনোদ সেনকে কলিকাতায় নিয়ে আসি। মাষ্টারদার পক্ষে বি. সি. চ্যাটার্জি, তারকেশ্বরের পক্ষে মেয়র সন্তোষ বসু ও কল্পনার পক্ষে জে. সি. গুপ্ত কৌসলী ছিলেন। কাজ কিছুই হল না, ফাঁসীর আদেশ বহাল রইল।

মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরকে বাঁচাবার জন্য শেষ চেষ্টা করি। প্রিভি কাউন্সিল করার বিষয় নিয়ে একদিন জেলে তারকেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে যাই। দেখি, একটি সেলে সে একা। তার পরনে কয়েদীর পোষাক, ডোরাকাটা প্যাণ্ট ও জামা। আমার সঙ্গে ডি. আই. বি-র শচীন ভৌমিক। তারকেশ্বর আমাকে পায়ে ধরে প্রণাম করতে চাইল, কিন্তু শচীন ভৌমিক বাধা দিল। তারকেশ্বর বলল, 'বুগ্‌দা, আর প্রিভি কাউন্সিল করে কী হবে! গভর্ণমেণ্ট এখন determined যে আমাদের ফাঁসী দেবেই। তাই প্রিভি কাউন্সিল করে লাভ নেই।' তারকেশ্বরের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

চট্টগ্রাম জেল থেকে লেখা তারকেশ্বরের অনেকগুলো চিঠির মধ্যে দুখানি চিঠির কিছু অংশ এখনো মনে আছে। মার কাছে লিখেছিল:

> 'মা, রাত্রে তোমাকে স্বপ্নে দেখি। শারদীয়া পূজার সময় শিউলি ফুলের গন্ধ যেন জানালা দিয়ে আমার কাছে আসছে। বুগ্‌দাকে বলো কিছু বই ও কাপড় পাঠাবার জন্য।'

আমার স্ত্রীর কাছে লিখেছিল:

> 'বৌদি, তোমাদের স্নেহ-ভালবাসা থেকে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছি। মাকে বলো, আমার যে টাইফয়েড হয়েছিল, তখনো তো মারা যেতে পারতাম। কত লোক যে প্রতিদিন নানারকমভাবে মারা যাচ্ছে! আমার এ-মৃত্যু তা থেকে অনেক শ্রেয়ঃ। মনকে প্রবোধ দিও। বুগ্‌দাকে বলার আর কিছু নেই।'

আমি তারকেশ্বরের কাছে গীতা ও গীতাঞ্জলি পাঠিয়েছিলাম। ফাঁসীর পর সেগুলো ফেরৎ দেওয়া হয় নি। ফাঁসীর খবরটাও আমাদের জানানো হয় নি। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলাম, আমরা হিন্দু, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির জন্য হিন্দুমতে আমাদের কিছু কাজ করতে হয়। ফাঁসীর কয়েক দিন পরে আমার চিঠির উত্তরে আমাকে মৃত্যুর তারিখটা জানায়—১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ ইং।

স্মৃতিকথা

শ্রীবাদল সেন

১৯২৮ সাল। এপ্রিল মাসের একটি দিন। ভোর রাত্রে পুলিশ আমাদের বাড়ী খানাতল্লাসী করে; কিন্তু ওদের মনের মত কিছুই পেল না। গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল আমার দাদা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সেনকে। সেদিন গ্রেপ্তার হলেন আমাদের ধোরলা গ্রামের আরো দু'জন তরুণ—শ্রীসারদা শীল ও শ্রীসুশীল দে।

এই রকম পুলিশী হামলার কারণ কি? গ্রামের সমাজসেবী ও চরিত্রবান্ এই তিনজন ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল কেন?—গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোকের মনে এই জিজ্ঞাসা।

পরে এই জিজ্ঞাসার উত্তর তারা পেয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, এই যুবকেরা দেশকে ভালবাসে এবং দেশকে ভালবাসা সরকারের চোখে মহা অপরাধ।

আমাদের গ্রামে একটি খালি বাড়ী ছিল। গৃহকর্তা ত্রিপুরা চক্রবর্তী। তাঁর অনুমতি নিয়ে এই নির্জন বাড়ীতে একটি শরীরচর্চাকেন্দ্র স্থাপন করেন ঐ তিনজন যুবক। আসলে এইটি ছিল বিপ্লবী কর্মী-সংগ্রহের একটি কেন্দ্র। মাঝে মাঝে সদরঘাট ক্লাব থেকে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল প্রমুখ এখানে আসতেন। তাঁদের সান্নিধ্যে এই কেন্দ্রের সকলে উৎসাহিত হত, অনুপ্রাণিত হত।

ক্রমে ক্রমে একটি মজবুত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠল এই গ্রামে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনেক তরুণ দীক্ষা নিল বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে। তাদের শিক্ষা দেওয়া হত রিভলভার-চালনা। এই রকম একজন বিপ্লবী তরুণ শচীন চক্রবর্তী।

একদিন শচীন চক্রবর্তীর বাড়ীতে রিভলভার চালনা শিক্ষা হচ্ছে। হঠাৎ অসাবধানতার জন্য একটি গুলী এসে লাগে শচীনদার মুখে। সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সারদা শীল, সুশীল দে ও বিজয়কৃষ্ণ সেন। স্থানীয় ডাক্তার দিয়ে শচীনদাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়; কিন্তু আঘাত গুরুতর দেখে ডাক্তার তাঁকে সহরে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। সবাই গভীর চিন্তিত। সহরে নিয়ে গেলে তো সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাঁরা স্থির করলেন, থানায় ডায়েরী করা হোক এই মর্মে যে, গভীর রাতে কে বা কারা

শচীনদাকে গুলী করে পালিয়ে গেছে। ডায়েরী করা হল। পুলিশ এসে শচীনদার উপর অপরিসীম অত্যাচার চালাল, তাঁর জবানবন্দী নিল; কিন্তু কোন গোপন কথা তাঁর মুখ থেকে বের হল না।

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহ করেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সারদা শীল, সুশীল দে ও বিজয়কৃষ্ণ সেনকে। হাজতে তাঁদের উপরও অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়; কিন্তু তাঁদের কাছ থেকেও কোন কথা বের করা সম্ভব হয় নি। প্রায় এক বৎসর মামলা চলার পর শচীনদাসহ সকলে মুক্তি পান।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ২২ শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। আমার দাদা বিজয়কৃষ্ণ সেনও এই সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক। তিনি ২৫ শে তারিখ ভোর রাত্রে বাড়ীতে আসেন। পরদিন ভোরবেলা আমাদের বাড়ীতে বিরাট পুলিশবাহিনীর উপস্থিতি। সকলে ভাবল, এবার বুঝি দাদাকে আর রক্ষা করা যাবে না।

বাড়ী খানাতল্লাসী করা হল। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া গেল না। পুলিশ বৃদ্ধ গ্রামবাসীদের ডেকে আনল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মুসলমান, কারণ আমাদের বাড়ীর কাছে বহু মুসলমানের বাস। পুলিশ একের পর এক সকলকে জিজ্ঞাসা করল, আমার দাদা এতদিন কোথায় ছিলেন। সকলের মুখে একই উত্তর: বিজয় বাড়ীতেই ছিল।

সমগ্র গ্রাম ঐক্যবদ্ধ, গ্রামের স্বদেশী ছেলেকে বাঁচাতেই হবে। তখনকার দিনে সাধারণ গ্রামবাসী পুলিশ দেখলে ভয় করত; কিন্তু এবার তারা এতটুকু দুর্বলতা দেখায় নি। বৃদ্ধ কৃষক বাচা মিঞা ও ইজ্জত আলীর মনোবল কোন সক্রিয় বিপ্লবীর চেয়ে কম ছিল না।

আমাদের বাড়ীতে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা প্রায়ই থাকতেন। মাষ্টারদাও কিছুদিন ছিলেন। বাড়ীর সর্বক্ষণের কাজের লোক ছিল নজীর আহম্মদ। সে দেখত, আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই অপরিচিত লোক আসে এবং কয়েকদিন থেকেও যায়। পুলিশ তার কাছ থেকে এসব খবর জানার চেষ্টা করত। প্রলোভন এবং ভয় দেখিয়েও যখন পুলিশ তার কাছ থেকে কোন খবর বের করতে পারল না, তখন একদিন তাকে গাছে তুলে দিয়ে হুলো পিঁপড়ের বাসা ভেঙে তার গায়ে ছেড়ে দিল। সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল, তবুও পুলিশের কাছে কোন কথা প্রকাশ করে নি।

আসামুল্লা হত্যার পর অন্যান্য অঞ্চলের মত আমাদের গ্রামেও চলছিল পুলিশী অত্যাচার। এই সময় সাহস করে এগিয়ে এসেছিল ঐ বাচা মিঞা, ঠাণ্ডা মিঞা ও নজীর আহমদ। এরাই আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল, খাবার দিয়েছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামে এদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

আমার মায়ের অসাধারণ সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও স্নেহপরায়ণতা মাষ্টারদা প্রমুখ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আমার মা প্রত্যেক বিপ্লবীর মাসীমা। দেখেছি, মাষ্টারদা প্রমুখ প্রত্যেক বিপ্লবী আমাদের বাড়ী থেকে অন্য আশ্রয়ে যাবার সময় মাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন।

একদিন ভোরবেলা বাড়ীতে বিরাট পুলিশবাহিনী উপস্থিত। ঘরের ভিতরে আছেন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তী। পুলিশের উপস্থিতি জানামাত্রই মা শৈলাদার রিভলভারটি নিজের কোমরে লুকিয়ে রেখে পুলিশের সামনে এসে তাদের ঘরে ঢুকতে বাধা দেন। মা পুলিশের সঙ্গে নানা তর্কবিতর্ক শুরু করেন। বলেন, ঘরে ঢোকার আগে প্রত্যেক পুলিশের দেহ তিনি তল্লাসী করবেন। এই রকম কথা কাটাকাটির মধ্যে শৈলাদা বাড়ীর পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। পরে পুলিশ বাড়ী তল্লাসী করে হতাশ হল।

আরো কয়েকদিন পরের ঘটনা। সেদিনও কয়েকজন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী আছেন আমাদের বাড়ীতে। পুলিশকে আসতে দেখে মা কোন কাল্পনিক 'বৌমা' কে [কারণ সেদিন পর্যন্ত মায়ের কোন 'বৌমা'র আগমন আমাদের বাড়ীতে হয় নি] সম্বোধন করে বললেন, 'বোমা, চাবিটা দাও তো'। মা ইচ্ছা করেই 'বৌমা'র বদলে 'বোমা' বলেছিলেন। 'চাবিটা দাও তো' অংশের উচ্চারণ ছিল অস্পষ্ট। পুলিশ 'বোমা' শব্দ শুনে অনেকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়েছিল। এই অবসরে বিপ্লবীরা অন্যত্র সরে পড়েন।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কয়েকদিন পূর্বে আমার দাদা মায়ের অগোচরে টাকা-পয়সা ও অলংকার মিলিয়ে প্রায় ৫০০০টাকা মূল্যের জিনিষ নিয়ে যায় দলের নির্দেশমত। মা পরে জানতে পেরে মোটেই দুঃখ করেন নি, বরং গৌরব অনুভব করেছিলেন যে, এই অর্থ দেশের মুক্তির জন্য ব্যয়িত হয়েছে।

অবিস্মরণীয় সান্নিধ্য

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

[১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের কয়েকজন বিপ্লবী বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। সফল আক্রমণের পর সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে প্রীতিলতা স্বেচ্ছায় পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন। উদ্দেশ্য—ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানের জন্য নারীসমাজের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করা। তাঁর মৃতদেহে জামার ভিতর স্বহস্তে ইংরেজীতে রচিত তাঁর বিদায়বাণী ও বক্ষঃসংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণের একটি ছোট ছবি পাওয়া যায়। ধলঘাট যুদ্ধের পর রচিত প্রীতিলতার একটি প্রবন্ধ সূর্য সেনের গ্রেপ্তারের সময় সামরিকবাহিনীর হস্তগত হয়। এই **প্রবন্ধ** ও **বিদায়বাণী** বাংলা অনুবাদসহ মুদ্রিত হল। প্রবন্ধের শিরোনাম সম্পাদক-প্রদত্ত।—

সম্পাদক]

কণ্টক-মুকুট শিরে পরেছিলে বলে
আজ কত কোহিনুর তব পদতলে !

সেই গভীর নিশীথে পল্লীর কোন এক অন্ধকার জীর্ণশীর্ণ কুটিরে বহু পুণ্যবলে নির্ম্মলদার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, জীবনের সে শুভ মুহূর্ত্তটিকে শত ক্রন্দনেও আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কেন না আজও সেই সবই তেমনিভাবে আছে। আমিও আছি, আমার জীবনে আরও কত রজনীই এসে গেল; কিন্তু নাই কেবল সেই মহিমান্বিত তেজস্বী মানুষটি যাঁর উপস্থিতি সেই দিন সেই পর্ণকুটির আলো করে দিয়েছিল। বিপ্লবীর কি মনোহর রূপই না সেদিন দেখেছিলাম! অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলছিল ও মনে হচ্ছিল যেন বিদ্রোহীর মনের আগুন দুই চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে। তাঁর মুখের কথার চাইতে আমার ঐ তেজোময় চোখের চাহনিই অনেক বেশী মনে হয়েছিল। বিদ্রোহীর বাণী কেবল ঐ চোখ দুটোই যেন প্রচার করে দিচ্ছিল। পেছনে মেশিনের ব্যাগটা ঝুলছে, সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু, কথাবার্ত্তা বলার পরে যখন উঠে দাঁড়ালেন মনে হ'ল যেন বংশীবাদক পলাশপদ্মলোচন কদমতলা ছেড়ে সুদর্শনচক্র হস্তে সমর-প্রাঙ্গণে এসে পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিয়ে সপ্তকোটি বীর সন্তানকে মুক্তির জন্যে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করছেন।

নির্ম্মলদা আমায় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমায় কে কি বলেছে? বললাম, সবটুকু গুছিয়ে এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে বলব? যা যা মনে

আসবে তাই বলে যাচ্ছি। রামকৃষ্ণদা (১) যে বলেছিল……Nirmalda is the last man to be captured. He is very intelligent—এই কথাটাই প্রথমে বললাম। তারপর রামকৃষ্ণদার আরও কয়েকটি কথা হুড় হুড় করে বলে গেলাম। কি কি বলেছিলাম ঠিক মনে নাই। তবে এই দুটো কথা বলেছিলাম, "'No revolutionary can die with satisfaction. আমি যদি এখন বের হই, তবে I shall declare equal right to brothers and sisters.'"

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, family-র প্রতি আমার কিরূপ টান আছে। বললাম, টান আছে, কিন্তু duty to family-কে duty to country-র কাছে বলি দিতে পারব।

পরীক্ষা কেমন দিয়েছি, পাশ করব কিনা সব জানতে চাইলেন। বললাম, পাশ করব বলেই মনে হচ্ছে।

সেদিন যখন পাশের খবরটা পেলাম, মনে পড়ে গেল নির্ম্মলদা প্রথম দিনই আমাকে পাশ করার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমার তো বিশ্বাস, যে যায় সে একেবারে চলে যায় না। আমাদের অন্তরে বেঁচে থাকে এবং প্রাণের যা কিছু নিবেদন সবই তার কাছে পৌঁছায়। তাই মনে মনে খবরটা নির্ম্মলদার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু তবুও হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে একটা গভীর বিচ্ছেদব্যথার সুর বেজে উঠে। মানবহৃদয়ের এই সব অতি সাধারণ সুখদুঃখের কাহিনী যুগযুগান্তর ধরেই চলেছে। কিন্তু আমরা এ সবের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করতে পারি না বলেই বিশ্বের বুকে এত হাহাকার, হা-হুতাশ আর ক্রন্দন। আমরা ভুলে যাই, যে শুভপ্রভাতে দুঃখের সঙ্গে একান্ত বোঝাপড়া করে নিতে পারব সেই দিনই অমৃতের সন্ধান পাব।

তারপর আমি যখন বললাম যে, পাশ করতে পারব, তখন বললেন, "তোমার কাছ থেকে extreme success demand করি, আগামী convocation-এ একটা attempt দিতে পারবে তো?"

আনন্দে আমার অন্তর ভরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্জ্জয় অভিমান এসে মনটা জুড়ে বসল এই ভেবে যে, এতদিন পরে মনের ইচ্ছাটা জানাবার সুযোগ মিলল। তাই নির্ম্মলদার এই প্রশ্নের উত্তরে বলে বসলাম, পারব না

---

(১) রামকৃষ্ণ বিশ্বাস—পুলিশ ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জি হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।—সম্পাদক।

কেন ? আপনারা তো আর বোনদের আমল দেন না। আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "কেবল তোমাকে একথা বললাম—আমি অনেক দিন থেকেই জানি।" আমার সঙ্গে যে উনি দেখা করেছেন সেই আনন্দেই তখন বিভোর ছিলাম। অথচ সেই সময় একথা বলার কারণ আর কিছুই নয়, অভিমান। তারপর আমাকে এই কথাগুলো বললেন, "পাশ করবার পর যে কোন district-এ একটা কাজ নেবার চেষ্টা করো—যেমন ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া ইত্যাদি। সেখানকার Magistrate, Commissioner সবার নাম একেবারে মুখস্থ করে বসবে। কখন কোথায় meeting হয় সব খবর রাখবে এবং opportunity খুঁজে বেড়াবে।"

একটা Code বলে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আগে রমণের (১) through-তে যে Code পাঠিয়েছিলেন তা সে বলেছে কি না এবং কি বলেছে।

তারপর বললেন, "আমাদের ইচ্ছা যাবার আগে আর একটা কিছু করে যাই। এবার আমরা চাই যে একটা fight between intelligent and intelligent হোক।"

"যত তাড়াতাড়ি পারি করে যাব, কারণ কখন ধরা পড়ি ঠিক নাই। এত কিছুর মধ্যেও যে এতদিন ধরা পড়ি নি, সেজন্য আমাদের thanks দেওয়া উচিত।"

দ্বিতীয় বার যখন দেখা হয়, তখনও বলেছিলেন, "চাটগা শহরের উপর একদিন আগুন জ্বালিয়ে দেব। হঠাৎ একদিন শুনতে পাবে যে পৃথিবীর বুকের উপর থেকে কয়েকজন revolutionist crushed হয়ে গেছে।"

যখন এসব কথা বলতেন, ভাবতাম এমন ছেলে থাকতে ভারতের আজ এ দুর্দশা কেন ? যে দেশের সন্তান এমন করে মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ করতে পারে সেই দেশে আবার কিসের দৈন্য ? কবি সত্যই গেয়েছেন :

কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী
ওগো আমার ভারতরাণী !

তারপর বললেন, "আমাদের সাথে যদি আর কোন দিন দেখা না হয়, তবে চিরদিন আমাদের কথা মনে রেখ।" আমি বললাম, সে কথা কি আজ আমাদের বলে দিতে হবে ?

---

(১) বীরাঙ্গনা কল্পনা দত্তের [যোশী] ছদ্মনাম।—সম্পাদক।

মেশিনটা বের করে বললেন, "আর কোন দিন দেখেছ কি?" খুব ছোট্ট একটি মেশিন একবার দেখেছিলাম, তাই বললাম। মেশিনের কোন্ part-কে কি বলে, কি করে গুলি ভরতে হয় সব দেখিয়ে দিলেন। আমি বললাম; আমি তো এখন পর্য্যন্ত একটুখানি trainingও পেলাম না, কাজ করব কি করে? বললেন, "বাড়ী থেকে আর কোথাও যাচ্ছ বলে চলে আসতে পারবে তো?" পারব—বললাম। ও-রকম করে এসেই তো training নিতে হবে। সেদিন আর বেশী কথা হয় নি। আমি যখন রমণকে ডেকে দিতে আসছি তখন বললেন, "তোমাকে তো ভাল করে দেখলাম না, আচ্ছা, আমি একবার ঐ ঘরে যাব তুমি আমায় চিনতে পারবে তো?" বললাম—চিনব। অন্ধকারে যতখানি পারা যায় নির্ম্মলদাকে দেখে নিয়েছিলাম এবং যখন একথা জিজ্ঞাসা করলেন, মনে মনে বললাম, আর কিছু দেখে না চিনি চোখ দুটো দেখে তো চিনবই।

এই ভাবে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ শেষ হ'ল। কি অনুভূতি নিয়ে যে সেদিন ফিরে গেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব! এ-সব জনের সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, এবার মাষ্টারদার দেখাও পাব—এ আশা নিয়ে সেদিন ফিরেছিলাম। তিন সপ্তাহ পরে আবার দেখা করতে যাওয়ার ঠিক হল। এবার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, মাষ্টারদার সঙ্গেও নিশ্চয়ই দেখা হবে।

চাঁদের আলোতে যখন আমাদের নৌকাখানি স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছিল, মনে পড়ল রামকৃষ্ণদার কথা। আমার কাছেও একদিন কি উৎসাহ ভরেই না বন্ধুদের সঙ্গে এক নৌ-অভিযানের গল্প করেছিল! নৌকা ভেসে চলেছে। চারদিকের গাছপালা মাঠ ঘাট সব দেখে মনে হচ্ছিল, চট্টলমায়ের প্রতিটি অঙ্গে বিপ্লবী ভাইদের কত ইতিহাসই না লেখা রয়েছে! নৌকা করে যখন মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে চলেছি, মনে হ'ল আমার এতদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। আমি কত দিন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছি—এমনি করে দেবতাদর্শনে চলেছি।

একটা ছোট কুটিরের অঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, নির্ম্মলদা একটা লুঙ্গী পরে উঠানে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন এবং বললেন, "খুব ক্লান্ত হয়েছ বুঝি? এতক্ষণ দেরী দেখে আমি তো ভাবছি, মাঝি তোমাকে মেরে গয়নাপত্র চুরি করে নিল।" দু'জনেই

হাসলাম। আমাকে সিঁড়ির কাছে ডেকে নিয়ে বিধবা মহিলাটিকে (১) কি বলব সব বলে দিলেন। তারপর নিতান্ত শিশুটির মত হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার তো হাতে শাখা নাই কপালে সিন্দুর নাই, মহিলা যদি সন্দেহ করে!" কথাগুলো বলবার ভঙ্গি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শিশুর মত উলঙ্গ প্রাণ না হলে কি এরা এত সহজে পরকে এতখানি আপন করে নিতে পারে!

আমার আশা নিষ্ফল হল না। নির্ম্মলদা বললেন, "মাষ্টারদা এখানে আছেন।" আনন্দে প্রাণ ভরে গেল।

নির্ম্মলদা পুকুর থেকে এক হাঁড়ি জল এনে দিয়ে বললেন, "হাত পা ধোও।" আমি শুধু মুখ ধুয়ে যখন ঘরে গেলাম, তখন বলছিলেন, "পা ধুলে না কেন? এমন লক্ষ্মীছাড়ামি করলে চলে না।" নির্ম্মলদা যখন এরূপ ধরণের কথাগুলো বলতেন, আমার ভারি চমৎকার লাগত। তারপর মাষ্টারদা ঘরের ভিতর এলেন। পরে নির্ম্মলদা আস্তে আস্তে বললেন, "প্রণাম কর।" সেই রাত্রিতে নির্ম্মলদার সঙ্গে বেশী কথা বলি নি, মাষ্টারদার সঙ্গেই বলেছিলাম। নির্ম্মলদা শুধু বলেছিলেন, "বাড়ীতে কি বলে এলে? কয়দিন থাকবে?" ইত্যাদি।

তারপর বললেন, "মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বল। এই মানুষটি অতল, এঁর তল পাবে না। আমাদের মত মানুষ ঢের পাবে, কিন্তু এঁর মত পাবে না। আমি উঁকে বলেছি তুমি খুব intelligent. দেখি, তাঁকে কতখানি move করতে পার।" আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল, কারণ আমি ভাল করেই জানি যে আমি intelligent নই। কিন্তু উল্টা চাপ দিয়ে বললাম, intelligent দেখাবার এমন কি একটা সুযোগ দিয়েছেন যে বলছেন? তা ছাড়া আমি একটা মস্ত বোকা। মাষ্টারদা যখন আমার সঙ্গে কথা বলে বলবেন যে, আমার বুদ্ধি নেই, তখন আপনি খুব জব্দ হবেন। শুনে হাসতে লাগলেন। তারপর মাষ্টারদার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে খেতে গেলাম। আমি নির্ম্মলদার সঙ্গে গেলাম।

খুব ভোরে নির্ম্মলদা এসে আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে গেলেন। সামান্য বাজে কথাবার্ত্তা বলার পর আমার হাতে মেশিনটা দিলেন। Trigger টিপতে পারছি না দেখে মুখে হতাশ হলেন না, বরং আমাকে উৎসাহিত করতে

(১) আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী ধলঘাট গ্রামের সাবিত্রী দেবী।—সম্পাদক।

লাগলেন। আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল আর বললাম, একেই তো মেয়েলোক লক্ষ্মীছাড়া, তারপর হাতটা আরও লক্ষ্মীছাড়া—আমার আঙ্গুলটাকে পিটিয়ে ঠিক করে দিন। আমাকে নিরুৎসাহ হতে দেখে বললেন, "নিরাশ হয়ো না, তিন দিনে সব ঠিক করে দেব। যদি আরও আগে তোমাদের পেতাম তবে অনন্তলালের হাতে তুলে দিতাম।" এই বলে অনন্তলালের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন, "অনন্ত একজন born revolutionist—ভারি সুন্দর। সুখেন্দুর (১) মৃত্যুর পর যখন আমরা meeting করি তখন একেবারে চটে গিয়ে বলেছিল, 'এ সব করে কি হবে ? বুকের রক্ত যেদিন দিতে পারব, সেদিনই এর প্রতিকার হবে।'" তারপর বললেন, "তোমাদের অনন্তলালকে ভাল লাগত না।" খুব আশ্চর্য্য লাগল। বিশেষ কিছু না বলে শুধু বললাম, কে বলল আপনাকে ? আমি তো বহুদিন ধরেই তাঁকে Indian Nepolean ভেবে শ্রদ্ধা করে আসছি। আরও কিছুক্ষণ মেশিনটা নিয়ে নাড়াচড়া করলাম। কয়েকটা যুযুৎসুও শিখিয়ে দিলেন।

এক একটা সাধারণ কথা শুনে নির্ম্মলদা কি রকম প্রাণ খুলে হাসতেন, আমি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভাবতাম, এদের দুঃখ সইবার শক্তি যেমন অসীম তেমনি সত্যকার আনন্দ উপভোগ করতে কেবল এরাই জানে।

নির্ম্মলদার মধ্যে আমি এ জিনিষটা এত বেশী দেখতাম যে, অবাক হয়ে যেতাম। আমি আর রমণ ঘোমটা দিয়ে কি ভাবে এসেছিলাম, একটা মুসলমানী মেয়েলোককে কি কি বলেছিলাম এসব গল্প বলছিলাম আর মহোৎসাহে শুনছিলেন। একবার বলছিলেন, "তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখার বড ইচ্ছা ছিল। দেখি তোমরা কি কর, কিন্তু দেখলাম না।" যাঁদের ভেতরটি সুন্দর, তাঁরাই এমনি করে জগতের সব কিছুর থেকেই সৌন্দর্য্য গ্রহণ করে থাকেন। তারপর আমাকে রামকৃষ্ণদার কথা বলতে বললেন আর আমি অনর্গল বলে যেতে লাগলাম। বললেন, "তুমি যখন রামকৃষ্ণের কথা বল তখন মনে হয় যেন গল্প শুনছি—আমার প্রতি রামকৃষ্ণের খুব regard ছিল। আমি যে ধূর্ত্ত তা সে জানত। তাই বলেছিল যে, সবার শেষে ধরা পড়ব। সত্যি ও যে কত বড় আগে বুঝি নি। একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করতাম যে, ও

---

(১) বিপ্লবী সুখেন্দুবিকাশ দত্ত। ১৯২৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে একদল গুণ্ডাকর্তৃক ছুরিকাহত হন। ৯ই অক্টোবর কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে [বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল] তাঁর জীবনাবসান হয়।—সম্পাদক।

যখন কাউকে প্রণাম করত মাথাটা খাড়া থাকত।" বলতে বলতে নির্ম্মলদার চোখের কোণে জল দেখা দিল, দেখে আমার বুক ফেটে কান্না এল। এদের চোখের জল দেখা সেও বহু জন্মের পুণ্যের কথা, কেন না এ অশ্রুজল মর্ত্ত্যের নয়—স্বর্গের। তারপর আমি নির্ম্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে লাগলাম। ওর নাকি নিরামিষ খেতে একটুও ভাল লাগত না। রোজই খেয়ে উঠে কাশত আর নির্ম্মলদা বলতেন, "কি যে খেয়ে উঠেই কাশতে আরম্ভ কর!"...... এর পর থেকে খেয়ে উঠেই নাকি রামকৃষ্ণদা বলত, "নির্ম্মলদা, একবার কাশব, শুধু একটি বার।" নির্ম্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে আমার বড়ই ভাল লাগত, উনিও খুব আগ্রহভরে বলতেন।

রামকৃষ্ণদাকে কয়েদীবেশে কারাগারে প্রথম দেখেছিলাম এবং সেখান থেকেই সে বিদায় নিল। ওর জীবনের এদিকটা আমার কাছে নিতান্তই অজানা ছিল। নির্ম্মলদার কথা শুনতে শুনতে আমি রামকৃষ্ণদাকে আমাদের মাঝখানে কল্পনা করতাম আর মনটি ব্যথায় ভরে উঠত। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই একটু ঘোরা-ফেরা করতে লাগলাম। নির্ম্মলদা একটু পরে উপরে যেতে বলে চলে গেলেন—আমি গিয়ে দেখি দু'তিনটি মনিব্যাগ খুলে টাকা গুণতে বসেছেন। আমাকে পাশে বসতে বললেন। মাষ্টারদার ব্যাগ থেকে কতকগুলি সিকি আর গিনি দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ, এগুলি হারালে অমঙ্গল হবে।" বলে খুব হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের টাকা আলাদা আলাদা থাকে বুঝি? "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, মাষ্টারদার চেয়ে আমার বেশী টাকা আছে। আমি চেয়ে নিতে পারি, কিন্তু মাষ্টারদা কারো কাছে চান না। মাষ্টারদার কাছে সব সময় এক হাজার টাকা থাকা দরকার। ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এক এক সময় টাকা-পয়সার চিন্তায় আমার ঘুম পায় না—আর মাষ্টারদা শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়েন ঠিক একটি ছোট ছেলের মত। আমার ভারি চমৎকার লাগে।"

এসব কথা হচ্ছে, এমন সময় মাষ্টারদা নীচের থেকে এলেন। ওঁরা দুজনে অন্য ঘরে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন। একটু পরে দেখি, নির্ম্মলদা ঐ দিন দুপুরে বের হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে বললেন, "দেখ, আমাদের সাহস কম নয়, দিনের বেলা বের হচ্ছি।" বললাম, তা তো দেখছিই, দুনিয়াতে আপনারা কিই বা না পারেন? কিন্তু আমার তো ভয় করছে। কোমরে মেশিন ও যুদ্ধ-beltটি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন

চোখে খুব সুন্দর লেগেছিল, বাঙালী বীরের এই সাধারণ যোদ্ধার বেশ ভারি নতুন লাগল।

সন্ধ্যার একটু পরে নির্ম্মলদা ফিরে এলেন। তখন জালালাবাদের কাহিনীর একটু বর্ণনা দিয়ে বললেন, স্বর্গের দেবতাগণ হয়ত সেইদিন এই লীলা দেখবার জন্য একত্র হয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রিবেলা targetting-এ বের হলাম। জ্যোৎস্না-দেবী অতি সন্তর্পণে তাঁর রূপালী আঁচলখানি পৃথিবীর বক্ষে পেতে রেখেছিলেন। আমি যখন male dress নিয়ে নির্ম্মলদার সামনে এসে দাঁড়ালাম—কি ভীষণ হাসতে লাগলেন, আর বললেন, "তোমাকে দেখে মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে না। একটি ছোট্ট ছেলের মত লাগছে।" আমি বললাম, তাই নাকি? তবে আমি আপনার ছোট ভাই। হাসতে হাসতে বললেন, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে।" আমরা পাঁচজন ছিলাম; কে যেন বললে—পঞ্চপাণ্ডবের মত লাগছে। নির্ম্মলদা আমাকে বললেন, "তুমি সহদেব।" না, আমার অর্জ্জুন হতে ইচ্ছে হচ্ছে আর আপনি তো ভীম। যখন মাঠের উপর দিয়ে চলেছি নির্ম্মলদা বলেছিলেন, "Absconding life-এ এ রকম অভিযান আর হয় নি। আজকের তারিখটা লিখে রেখো। মনে হচ্ছে যেন যাবার আগে দুনিয়ার সব সুখ লুটে নিয়ে যাচ্ছি।" এ-কথাটা আমার বড়ই লেগেছিল।

ফিরবার পথে মাঠের মাঝখানে দু'জনে বসলাম। আমাকে একটি গান করবার জন্য খুব সাধাসাধি করতে লাগলেন। বললাম, পারব না; যা তা হবে। লক্ষীটি, আমাকে সাধবেন না, শেষকালে আমার কষ্ট হবে। লক্ষীটি বললাম বলে খুব হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা দেখি, তুমি কেমন দৌড়াতে পার। একটি দৌড় দাও তো।" আমার খুব মজা লাগল, কারণ দৌড়াতে খুব ভালই পারি। দৌড়ে অনেকখানি গিয়ে যখন ফিরে এলাম, বললেন, "বা:! বেশ তো দৌড়াতে পার, action করার সময় এ রকম দৌড়াতে পারবে তো?" তারপর বললেন, "তুমি আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে কোথায় চলে এসেছ! আমরা এখন তোমাকে মেরে ফেললেও কেউ টের পাবে না।" বললাম, সে অধিকার তো আপনাদের আছেই। আপনাদের কাছে তো নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আপনারাই তো নিচ্ছেন না। কেবল আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। বললেন, "তোমাদের কিসের জন্য মারব? মারব না।"

যখন ফিরলাম, তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই অভিযান আমার জীবন-খাতার একটি বৃহৎ শূন্য পাতা পূর্ণ করে দিয়েছে। যদিও একটি মাত্র গুলি লাগাতে পেরেছিলাম বলে এক একবার খুব খারাপ লাগছিল, তবুও গুলি করলাম বলেই খুব মজা লাগছিল। আজও যখনি সেদিনের কথা মনে হয়, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি নির্ম্মলদার সঙ্গে targetting-এ যাওয়ার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আমি যেন তার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি।

পরের দিন সকালবেলা অনেকক্ষণ মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বললাম। দুপুরবেলা নির্ম্মলদার কাছে গেলাম। তখন বলেছিলেন "No revolutionary can die with satisfaction." ওটা খুব ঠিক কথা। অনেক কিছু করা হ'ল না, ভেবেই তারা সারা।

সেদিন বিকেলেই আমার চলে আসবার কথা। নির্ম্মলদা বললেন, "তুমি চলে যাবে বলে আমার খারাপ লাগছে। আমিও এখান থেকে চলে যাব। মাষ্টারদাকে একা একা রেখে যেতেও প্রাণ কাঁদে।" বললাম, একেবারে রেখে দিন না। আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না। হাসতে হাসতে বললেন, "আমি মত দিলাম, এবার মাষ্টারদার মত লও।"

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এস, সোনার বরণী রাণী গো...... গানটা জানিস্? আমাদের দলে তিনটি রাণী আছে of which you are the eldest."

আমি বললাম, Of which আমি হলাম লোহার রাণী আর রমণ হল সোনার বরণী রাণী।

শুনে কি প্রাণমাতানো হাসিই না হেসেছিলেন! বললেন, "লোহার বরণী রাণীকেই তো আমার বেশী সুন্দর লাগে।" আমি ভীষণ হাসতে লাগলাম। নির্ম্মলদাও হাসলেন।

তারপর বললেন, "একদিন হয় তো দেখবি যে দোকান সাজিয়ে দোকানদার হয়ে বসে আছি। যেখানেই থাকি না কেন তোদের খবর নেব। আর যদি ধরা পড়ি, তবে তুই আর রমণ মাঝে মাঝে লালদীঘির পাড়ে একটু দেখা দিস।"

অদৃষ্টের গতি একেবারে অন্যদিকে গেল। নির্ম্মলদার আমাদের খবর নিতে হ'ল না, আমাদেরও দেখা দিতে হ'ল না।

সেদিন বলেছিলেন, "এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে one foot in grave. পৃথিবীর উপর সবাই এমনিভাবেই চলবে, থাকব না কেবল আমরা।"

নির্ম্মলদার কথাগুলো হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সেদিন তো ভাবি নি যে, তাঁর কথামত এত শীঘ্রই তিনি যাবেন। সত্যই তো আজ পৃথিবীর উপর জীবনের স্পন্দন তেমনিভাবেই হচ্ছে—কর্ম্মের অবিরাম প্রবাহ বিশ্বের বুকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তেমনিভাবেই চলেছে—কিন্তু নির্ম্মলদা তাঁর কাজ শেষ করে চলে গেছেন।

ক্রমে আমার আসার সময় হ'ল। আসবার সময় যখন নির্ম্মলদাকে প্রণাম করতে গেলাম, বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলব—আমাকে আর কোনদিনও প্রণাম করো না।" বললাম, আচ্ছা, আপনি এমনি প্রণাম করতে না দিলে কি হবে? মনে মনে করলে তো আর আটকাতে পারবেন না।

একটা কাগজে বেঁধে আমাকে একটা আশীর্ব্বাদ দিলেন। মাষ্টারদা বললেন, "এগুলো preserve করো।" কি আনন্দের সঙ্গেই না এই আদেশ মাথায় নিয়েছিলাম!

ওঁদের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে ও ওঁদের দেওয়া শক্তি বুকে ধরে সেদিন ঘরে ফিরলাম।

কিছুদিন পর আবার আমার ডাক পড়ল। সেদিন রওনা হওয়ার কথা। সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। সকালবেলা আমার কাছে একবার খবর দেবার কথা ছিল। কিন্তু কোন খবর না পেয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হলাম। ভাবলাম—যদি বৃষ্টির জন্য আমাকে না নেন, তবে খুব বকে দেব। আবার ভাবলাম, হয়তো situation খুব খারাপ হয়ে গেছে। বাসায় বলে রেখেছিলাম, সীতাকুণ্ড যাব। মাকে বললাম—বন্ধুদের জন্য কিছু খাবার করে দাও। দুপুর শেষ হয়ে গেল, তবুও কেউ যাচ্ছে না দেখে মাকে বললাম—নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরূপ কিছু করো না। কাপড়-চোপড় ঠিক করে রাখলাম—তারপর কেবল ঘর-বার করতে লাগলাম।

প্রায় ৫-টার সময় লোক গেল। কি উৎসাহ নিয়েই না সেদিন রওনা হয়েছিলাম—নির্ম্মলদার সঙ্গে সেই শেষ দেখা করতে আসছি বলেইতো সেদিন

এত উৎসাহ নিয়ে এসেছিলাম। উৎসাহ সব সময়ই তো থাকে, কিন্তু এবার যেন একটা অভিনব অনুভূতিতে মনটা ভরে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় যখন কর্দ্দমাক্ত গ্রাম্য পথ বেয়ে চলেছি, ভাবলাম: এরকম কাদা মাড়াবার সুযোগ জীবনে আর কয়বার মিলবে কে জানে!

গন্তব্যস্থানে যখন গিয়ে পৌঁছালাম—একটা অফুরন্ত উচ্ছল হাসির শব্দ আমার কানে গেল। নির্ম্মলদা বললেন, "এই হল অপূর্ব্ব সেন, যার সঙ্গে রামকৃষ্ণ তোমাকে আলাপ করতে বলেছিল।" চোখে দেখলাম, একখানা সহাস্য কচিমুখ, অন্তরের সরলতা যেন মুখখানাতে ফুটে উঠেছিল।

আমি যে খাবারের টিনটা নিয়েছিলাম, মাষ্টারদা সেটা থেকে একটা নারকেলের সন্দেশ বের করে খেলেন। দেখে আমার খুব আনন্দ হল।

আমি ঘরের ভিতরে রইলাম, আর সবাই বারান্দায় খেতে বসে গেলেন। নির্ম্মলদা এক একবার ভিতরে ঢুকে আমার ভাগেরটা দিয়ে আসতে লাগলেন। ওনার কাছে যে আশীর্ব্বাদ ছিল আমার মাথায় যখন তা সস্নেহে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন—ভাবলাম, স্নেহ বিলাতেও বুঝি কেবল এঁরাই জানেন!

রাত্তিরে আর বেশী কথাবার্ত্তা হ'ল না। মাষ্টারদা, নির্ম্মলদা দুজনেই বের হয়ে গেলেন। নির্ম্মলদাকে বললাম, আমাকে নিয়ে যাবেন না? বললেন, "আর একদিন নেব।"

আমি নীচে মহিলার পাশে শুয়ে রইলাম, ছাদে কেবলই মচমচ শব্দ হচ্ছিল আর হাসির ফোয়ারা ছুটছিল। মহিলা আমার কাছে নালিশ করল, একটা ছেলে এসেছে কেবলই হাসে আর 'ভাল লাগে' বলে এমন একটা টান দেয় যে আর থামে না। শুনে ভোলার (১) প্রতি গভীর স্নেহে আমার মনটা ভরে গেল।

সকালবেলা ভোলা নীচের থেকে খাবারের টিনটা নিয়ে এল। আমি তখন অন্য ঘরে নির্ম্মলদার কাছে বসেছিলাম। টিনটা হাতে নিয়ে ভোলা খুব হাসছিল। তারপর কি মাতামাতি করেই না সবাই মিলে খেতে লাগলেন। এঁদের খাইয়ে তৃপ্তি আছে।

নির্ম্মলদাকে বললাম, আমি এসে অবধি কেবল ওর হাসিই শুনছি, হাসিটা আমার ভারি সুন্দর লাগছে। উনি তখন বললেন, "ছেলেটা ভারি Jolly আর Sincere—Comic করতে জানে। ওর কাছে থাকলে আমিও হাসি

(১) ধলঘাট যুদ্ধের শহীদ অপূর্ব সেনের ডাকনাম।— সম্পাদক।

থামাতে পারি না। সম্প্রতি absconder-দের মধ্যে ও হ'ল best production—এ রকমের ছেলে দু'একটা থাকলে দেশ আলো করে রাখতে পারবে।"

নির্ম্মলদার কথা শুনে কেবলই মনে হচ্ছিল এই সেই অপূর্ব্ব সেন। রামকৃষ্ণদা আমার কাছে শুধু তার নামটা করেছিল। ভাবলাম, নির্ম্মলদাকে বলি ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে, কারণ রামকৃষ্ণদা বলে দিয়েছে। বলা আর হ'ল না।

সেদিন সারাটা দুপুর নির্ম্মলদা আমাকে machine training দিলেন। কি করে কাপড়ের মধ্যে লুকাব, হঠাৎ বের করব—aiming ইত্যাদি সব শিখিয়ে দিতে লাগলেন। এবার নির্ম্মলদা আমাকে মধ্যের অঙ্গুলী দিয়েই practice করালেন আর বললেন, "তোকে এই আঙ্গুল দিয়েই action করাব। Secretটি কাউকে বলে দিস না, শুধু আমরা জানব। তারপর action হয়ে গেলে সবাই জানবে।" আমার খুব আনন্দ হ'ল। বললাম, আগের বার যখন আমি পারছিলাম না, তখন কেন এই আঙ্গুল দিয়ে practice করালেন না? নির্ম্মলদা হাসতে হাসতে বললেন, "তখন তো মাথায় আসে নি।"

তারপর দু'জনে গল্প করতে বসলাম। তখন বিকেল হয়েছে। নির্ম্মলদা কয়েকজন ছেলের নাম করে বললেন, "এরা সব সময় এক সঙ্গে চলত, সদরঘাট এর'ই আলো করে রেখেছিল। আনন্দ, রজত, ত্রিপুরা ও টেগরাকে আমরা টুনু, টান্টু, টুনু ও টেগরা বলে ডাকতাম। এতগুলিকে মেরে ফেলেছি আর ভাল লাগছে না।" ভগবান বোধ হয় অন্তরীক্ষ থেকে এই কথা শুনেছিলেন! তাই আর দেরী না করে নির্ম্মলদাকে কোলে তুলে নিলেন।

নির্ম্মলদা যখন এই সব ছেলের কথা বলছিলেন, তখন আমি বললাম, সত্যি চাটগার উপর যে কাণ্ডটা হয়ে গেল তার পেছনে যে কত সুন্দর ইতিহাস রয়ে গেছে তার খবর কয়জনে রাখে? আমার কথা শুনে বললেন, "তোমার কাছে পাণ্ডিত্য ও ছেলেমানুষি দুটোই আছে, এটা আমার খুব চমৎকার লাগে।" নির্ম্মলদার এই 'চমৎকার' কথাটিও চিরদিন আমার মনে থাকবে। কথায় কথায় শুধু 'চমৎকার' বলতেন। ভাবতাম, যে নিজে চমৎকার তার কাছে সবই চমৎকার লাগে। ওখানে খুব smart চেহারার একটি ছোট ছেলে আসত। আমি নির্ম্মলদাকে বললাম, এই ছেলেটাকে আমার খুব ভাল লাগে। তখন বললেন, "মাষ্টারদা ওকে খুব আদর করেন—আমাকে আজকাল আদর করেন না। আমি বড় হয়ে গেছি, আমি যে, বুড়ো হয়ে গেছি সে কথা আমার মনেই

থাকে না।" আয়না দেখলে মনে পড়ে, শিশুর মত সরল ও পবিত্র প্রাণ যাদের তাদের আবার কিসের বার্দ্ধক্য?

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল বলে খিচুড়ী রান্নার প্রস্তাব হ'ল এবং রান্নার ভার আমার উপর পড়ল। শুধু খিচুড়ীটা রান্না হলেই সবাই মিলে একটা থালা করে খেতে বসে গেল। মহিলাটি বলছিল বেশী করে দেবার জন্য। ভাজাগুলো তখনো হয় নি বলে আমি নিষেধ করলাম। খাবার সময় ভোলার হাসি তেমনভাবেই চলছিল। নির্ম্মলদা খিচুড়ী খেয়ে এসে আমাকে বললেন, "খিচুড়ীটা বেশ ভালই হয়েছে। রান্না করতে কবে শিখলে? তোমাদের হাতে নিশ্চয়ই অন্নপূর্ণা আছেন।" বললাম, হ্যাঁ, আমাদের হাতে অন্নপূর্ণা আর আপনাদের হাতে বিশ্বকর্মা। খুব হাসতে লাগলেন।

আমি যখন আলুভাজা করছি, ভোলা এক টুকরা কাগজ নিয়ে আমার কাছে বসে রইল আর বলল, "দিদি, I must take আলুভাজা।" অল্প করে দিলাম। আরো চাইলে পর বললাম, আর দেব না, খিচুড়ী খাওয়া হবে কি দিয়ে? আলুভাজা খেয়ে পেঁয়াজভাজা খাওয়ার জন্য বসে রইল। আমাকে ডিমভাজার জন্য কাঁচালঙ্কা কেটে দিল।

নির্ম্মলদা দূর থেকে এসব লক্ষ্য করছিলেন। রাত্রিবেলা আমাকে বলছিলেন, "ভোলা যখন তোমার সাথে কথা বলছিল আমার দেখে খুব ভাল লাগছিল।" আজ ভাবছি, যাবার আগে নির্ম্মলদা পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণার সৌন্দর্য্য উপভোগ করে গেলেন। দু'জনে এক সঙ্গে যাবে বলেই হয়ত এমনি করে একজন আর একজনকে প্রাণভরে দেখে নিল।

রান্না হবার পর সবাই মিলে খেতে বসলাম। কেউ বেশী খেতে পারল না। পাতেই অনেক রয়ে গেল। ভোলা মহোৎসাহে বলতে লাগল, "আমি কাগজ বেঁধে সব রেখে দেব আর সকালবেলা খাব। Excellent হবে।" খাওয়া-দাওয়ার পর নির্ম্মলদা নিজের ঘরের ভিতর শুয়ে রইলেন। ঝুমঝুম বৃষ্টি পড়ছিল। আমাকে ডেকে বললেন, "একটা গান—সঙ্গে ভাত খেলাম—তোর রান্না খেলাম, রইল তোর একটা গান শোনা।"

চিরঅভ্যাসমত আমি কিছুতেই গান করলাম না। যদি জানতাম যে, নির্ম্মলদা এ জীবনে আমাকে আর সাধতে আসবেন না তবে সে দিন যা হয় একটা গেয়ে দিতাম। আমি জানতামই যে মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তেই এঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেজন্য গান করছি না বলে আমার খুব খারাপ লাগল আর

বললাম, দোহাই আপনার, আমাকে সাধবেন না। ইতিমধ্যে বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাষ্টারদা ওপর থেকে নেমে এলেন। নির্ম্মলদাও উঠে কাপড়-চোপড় পরে নিলেন। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। নির্ম্মলদা যখন একটা ছাতা মাথায় দিয়ে উঠানে দাঁড়িয়েছেন, আমি বললাম, আমাকে নিয়ে যান। বললেন, "আচ্ছা চল, এস আমার ছাতার নীচে এসে দাঁড়াও।" বললাম, দাঁড়ালে কি হবে? শেষকালে তো তাড়িয়ে দেবেন।

রাত্রির অন্ধকারে বারিধারা মাথায় করে রওনা হলেন। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলাম; ভাবলাম, কবি নিশ্চয়ই এই আপন-ভোলা ছন্নছাড়া বিপ্লবীদের হয়েই বলেছেন:

কেবল তব মুখপানে চাহিয়া
বাহির হ'নু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।

পরের দিন সকালবেলা (অর্থাৎ ১৩ই জুন, সোমবার) আমি যখন গেলাম সবাই তখন ঘুমাচ্ছেন। মাষ্টারদা আমাকে নির্ম্মলদা যেই ঘরে ঘুমিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে বসতে বললেন। নির্ম্মলদা ঘুমুচ্ছিলেন, আমি চুপ করে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পর নির্ম্মলদা ঘুম থেকে জেগে বললেন, "তুমি যে কখন গোপনে এসে বসে আছ টেরই পাই নি।" তারপর বলতে লাগলেন:

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি—
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।

শুনে আমি খুব হাসতে লাগলাম, নির্ম্মলদাও হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, বাঃ! poetry-তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন দেখছি। আমরা ক্লাশে বসে কি রকম poetry লিখতাম, জানেন?

রাগ করেছিল ছেলেমানুষ
দেখবি ফিরে উড়বে ফানুস
কিম্বা খাবি লজেঞ্জুস্।

হাসতে হাসতে বললেন, "তোমরা তো ভয়ানক দুষ্টু দেখছি। মেয়েরা যে এত দুষ্টু হয় তা জানতাম না। আমার বড় দুঃখ রইল তোমাকে আর রমণকে একসঙ্গে দেখলাম না।"

সেদিন যে সমস্ত কথা বলেছিলেন মনে হয় যেন নির্ম্মলদা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর যা কিছু বলার আছে সেইদিনই বলে নিতে হবে, আর বলা হবে না। বললেন, "রমণের সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে বলো, আমার উপর রাগ না করতে। তুমি আর ও প্রায়ই একত্র হয়ে, তোমরা দু'জনের কথা দু'জনকে সব বলতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই। আমার মনে হচ্ছে, Destiny-র against-এ কেউ যেতে পারে না। আমরা যতই করি না কেন, অবশেষে Destiny-র কাছে হার মানতেই হয়।"

তারপর বললেন, "রামকৃষ্ণের একটা কথা আজ তোকে বলব। আমাদের absconding life-এ কত রকম ইতিহাস যে নিহিত আছে, তা কেউ জানে না।" রামকৃষ্ণদার organise করা একটি ছেলে absconding life-এ কি ভাবে মারা গেল, কি ভাবে ওর সৎকার করা হল, রামকৃষ্ণদার মনে কি রকম লেগেছিল, একটি মহাপ্রাণ এমনি করে গোপনে ঝরে গেল—একই পথের পথিক প্রিয় বন্ধুগণ ছাড়া আর কেউ জানল না।

তখন বললেন, "রামকৃষ্ণ যখনই খুব গম্ভীর হয়ে থাকত আমরা ওকে ফুইট্যাদার (১) কাছে পাঠিয়ে দিতাম। ও নিজে কিছুই বলত না। ফুইট্যাদাকে ও ভালবাসত এবং খুব respect করত।"

রামকৃষ্ণদাকে planchet-এ ডাকার কথা বলে বললেন, "তুই আর মাষ্টারদা আনিস—আমি নয়; আমার ভয় করে, যদি কিছু না করে বসে আছি বলে বকে দেয়!"

আশ্চর্য্য, এবার মাষ্টারদার সঙ্গে এই দুই দিন ধরে মোটেই কথা বলি নি। সারাক্ষণই কেবল নির্ম্মলদার কাছে বসেছিলাম। নির্ম্মলদার সঙ্গে এই জীবনে আর কথা বলতে হবে না বলেই হয়ত এ রকম হয়েছিল। সেদিন সকালবেলা ভোলার জ্বর এসেছিল। জ্বরসুদ্ধ সারাদিন comic করেছে। এই আনন্দের উৎসটিকে যতই দেখছিলাম, ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

নির্ম্মলদা বললেন, "ভোলা হ'ল মাষ্টারদার assistant, ও বেশ ইংলিশ জানে। যা কিছু লেখা হয়, মাষ্টারদা ওকে দিয়ে পড়ান।" তারপর বকে যেতে লাগলেন, "ভোলা এর মধ্যে একদিন বাড়ী গিয়েছিল। বাড়ীতে ওর সাতজন বৌদি আছে। বাড়ীতে বৌদিদের বলেছিল, 'তোমরা সবাই fall-in কর; আমি command করছি।' ছেলেপিলে সবগুলোকে জাগিয়ে

(১) শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদারের ডাকনাম 'ফুইট্যা'।—সম্পাদক।

দিয়েছিল।" শুনে আমার ভারি সুন্দর লাগল। আজ ভাবছি—এরকম করে বিদায় নেওয়াটা কেবল ওকেই সাজে, যাবার আগে একবার বাড়ী গিয়ে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে এল।

নির্ম্মলদা আর একটু ঘুমিয়ে নিলেন। জেগে উঠে বললেন, "দেখ, আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতে পারতাম। এখন যেন brain-এ কিছুই নেই বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে ক্রমাগত তিন চার দিন শুয়ে থাকতাম আর কাঁদতাম। লোকে বলত, এটার হ'ল কি?"

এই কথাগুলো যে নির্ম্মলদার কতখানি পরিচয় দিচ্ছিল শুধু তাই ভাবছিলাম। জগতের লোকে মনে করে বিপ্লবীরা একটা নেশার ঝোঁকে কেবল মারামারি কাটাকাটিই করতে জানে, কিন্তু এদের ভিতর যে কি বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার আছে তার খোঁজ পাওয়ার সৌভাগ্য কয়জনেরই বা হয়! আব নির্ম্মলদার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের বিশ্বকবির সেই গানটাই কেবল মনে হচ্ছিল:

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস,
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।

আমাকে একবার একটু অন্যমনস্ক দেখে বলেছিলেন, "তুমি এখন জীবননদীর এপারে, না ওপারে? জান, আমরা নদীর পারে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করতাম, 'এই জীবননদীব এপারে থাকবি, না ওপারে যাবি?'" আজ ভাবছি, ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে বুঝি লোকের মুখ দিয়ে এরকম কথাই বের হয়। আমি বলেছিলাম, আপনারা যাবার আগে আমাদের দিয়ে কিছু করিয়ে যান। বললেন, "আমরা চলে গেলেও করতে পারবে। কিন্তু আমবাও মাঝে মাঝে স্বার্থপরের মত মনে করি যে, আমবা না করলে চলবে না। মাষ্টারদার শেষ কাজটা বাকী রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে female action." আমি বললাম, আমার বড মরতে ইচ্ছে করছে। চন্দননগরে সুহাসিনীদি একটা great chance হারিয়েছেন। এখানে যদি পুলিশ আসে আমি আপনার কাছ থেকে নডব না। নির্ম্মলদা বললেন, "কিসের জন্য মরবি?" কে জানত যে কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে হাজির হবে আর নির্ম্মলদাকে কোলে তুলে নেবে—আমাকে স্পর্শও করবে না!

তারপর আমাকে বললেন, "আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আমায় শান্তি দে।" আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, শান্তি দেব তো না, নেব। বললেন, "আমি আর এক জন্মে তোমার বোন হয়ে জন্মাব।" আমি বললাম, আমি আর এক জন্মে কিছুতেই লক্ষীছাড়া মেয়েলোক হব না।

এমনি করেই নির্ম্মলদা যাবার আগে সব কিছুই বলে গেলেন। আমাকে ভোলার জন্য সাগু জ্বাল দিতে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন সাগু রান্না করছি, ভোলা তখন ঘরের ভিতর গুন গুন করে গান করছিল। সাগুটা ঠাণ্ডা করে লেবু আর চিনি মিশিয়ে ভোলাকে খাওয়ালাম। জীবনের শেষ খাওয়া খেয়ে নিল!

ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন। স্মৃতির বোঝা আর ভারি না করলে খুশীই হব এবং করলেও অনুযোগ দেব না। তারপর ভাত খাওয়ার ডাক পড়ল। নির্মলদা ভাত খাবেন না বলে দিয়েছিলেন। আমি বরাবর নির্ম্মলদার সঙ্গে খেতাম। মাষ্টারদার সঙ্গে ভাত দিয়েছে দেখে এক দৌড়ে উপরে চলে গেলাম। নির্ম্মলদা একা চুপ করে শুয়েছিলেন, না জানি তিনি তখন কোন্ অমরলোকের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন!

আমি বললাম, মাষ্টারদার সঙ্গে খেতে লজ্জা করছে বলে আমি পালিয়েছি, পালিয়েছি বলে আরও লজ্জা করছে। মাষ্টারদা নিশ্চয় এ টের পেয়েছেন। নির্ম্মলদা হাসতে হাসতে বললেন, "তাতে কিছু হবে না।" এমন সময় নীচে থেকে মাষ্টারদা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে বললেন, "পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে।" ভাবলাম, এই মুহূর্ত্তেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। ওঁদের বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব। কিন্তু আমায় থাকতে দিলেন না—মই বেয়ে নীচে নেমে যেতে বললেন। কথামত নেমে গেলাম।

দুই দিক থেকে গুলি চালাচালি হতে লাগল। দুই একটা জয়ধ্বনিও আমার কানে গেল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হবার পর নির্ম্মলদার আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম, শোনামাত্র উপরে উঠতে গেলাম আর তিনজনে মিলে আমাকে চেপে ধরল। ওদিকে কি করুণ স্বরেই না আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন! উপরে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। ওদের কত ভয় দেখালাম—চোখ রাঙালাম। ছোট মেয়েটিকে একটি ঘুষি দিলাম। কিছুতেই আমায় ছাড়ল না। তারপর বললাম, আচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব না। তবু ছাড়ল না। একবার মইয়ের প্রায় অর্দ্ধেক যেতে পেরেছিলাম—টান দিয়ে

আমাকে ফেলে দিল। নির্ম্মলদার ডাক আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। নির্ম্মলদার কাছে যদি একটিবার যেতে পারতাম, জানি না আমায় কি বলতেন; কিন্তু আমার নাম ধরে যে এতবার ডাকলেন এর চাইতে বেশী আর কি চাই? ভগবান আমাকে একটিবার নির্ম্মলদাকে দেখে আসতে দিলেন না! এই ব্যর্থতা আমার বুকে প্রতিনিয়ত শেলের মত বেঁধে—ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে দিতে চায়। এমন সময় মাষ্টারদা ও ভোলা নীচে নেমে এলেন। দেখে বড়ই আনন্দ হল। এতক্ষণ ওঁদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে একবার মনে হয়েছিল তাঁরাও নেই। মাষ্টারদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব—তোর life-টাও নষ্ট করলাম।" মাষ্টারদার পায়ে ধরে বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। আমি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, মাষ্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না। চোখের একটি মাত্র পলকে ভোলাকে একবার দেখেছিলাম। কি চমৎকার লেগেছিল! মুখে এতটুকু চাঞ্চল্যের ভাব নেই। বীরের মত বুক ফুলিয়ে মাষ্টারদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তিনজনে রওনা হলাম। ভোলা আগে আগে ছিল। সম্মুখে মৃত্যু এই বীর ভাইটিকে গ্রাস করবার জন্য তার লেলিহান্ জিহ্বা বের করেছিল। আর সে বীরদর্পে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভদ্রার অভিমন্যুর প্রতি শত্রুর দল শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেছিল; আমাদের অভিমন্যু সহস্রভেদী বাণ খেয়ে নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

মাষ্টারদা দু'টি রত্ন হারিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। মাষ্টারদার সঙ্গে আমি চলে এলাম। আমার জীবন ধন্য হল। না—মাষ্টারদার নাম উল্লেখ করে আর কাজ নাই! মাষ্টারদার যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম এখন তা লিখতে বসে আমি তাঁকে ছোট করে দেব না।

রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন, ভোলার সঙ্গে আলাপ করতে। আলাপ চূড়ান্ত হয়ে গেল। দু'দিন ধরে কেবল ওর হাসিই শুনেছিলাম। সবশেষে আমারই দু' চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্ম্মলদা অতি অল্প দিনেই অনেকখানি আপন করে নিয়েছিলেন আমাকে। কেবলই মনে হয় যে, নির্ম্মলদা সব বুঝেছিলেন, তাই একটুও দেরী না করে যা কিছু বলবার বলে নিলেন। যতই মনে পড়ে যে, নির্ম্মলদা বলেছিলেন চাঁটগা শহরের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন, যাবার আগে একটা কিছু করে যাবেন ততই মন বলে ওঠে:

মরমেই মরে গেল, মুকুলেই ঝরে গেল
প্রাণভরা আশা সমাধি-পাশে।

বিদায়বাণী

শ্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

LONG LIVE REVOLUTION

I solemnly declare, I belong to the Chittagong Branch of the Indian Republican Army whose lofty ideal is to liberate my mother-country from the yoke of the tyrannical, exploiting and Imperialistic British Government and to establish a Federal Indian Republic instead. This remarkable Chittagong Party has captured the imagination of the youths and has given a new impetus to the Revolutionaries of Bengal, nay of the whole of India, by its unprecedented display of the memorable 18th April, 1930 and its subsequent heroic achievements on the Jalalabad hill, at Samirpur, at Feni, at Chandannagar, at Chandpur, at Dacca, at Comilla and at Dhalghat. I feel proud that I have been thought fit to be a member of such a glorious party.

We are fighting freedom's battle. To-day's action is one of the items of that continual fight. British people have snatched away our independence, have bled India white and have played havoc with the lives of millions of Indians, both male and female. They are the sole cause of our complete ruin—moral, physical, political and economic—and thus have proved the worst enemy of our country, the greatest obstacle in the way of recovering our independence. So we have been compelled to take up arms against the lives of any and every member of the British Community, official or non-official, though it is not at all a pleasant thing to us to take the life of any human being. In a fight for freedom we must be ready to remove, by any means whatsoever, every obstacle that stands in our way.

When I was summoned by the Great Masterda, the venerable leader of our party, to join to-day's armed raid I felt myself fortunate enough seeing my long-felt hankering fulfilled at last and accepted the task with full sense of responsibility. But

when I was asked by that exalted personality to lead the raid, I felt diffident and protested by saying why a sister should take the lead when so many able and experienced brothers were present. Masterda soon convinced me by his able arguments and I took my leader's command on my head and invoked the Almighty Father, Whom I have adored since my childhood, to assist me in discharging my grave duty.

I think, I owe an explanation to my countrymen. Unfortunately, there are still many among our countrymen who may be shocked to learn how a woman brought up in the best tradition of Indian womanhood has taken up such a horrible deed as to massacre human lives. I wonder why there should be any distinction between males and females in a fight for her cause. Instances are not rare that the Rajput ladies of hallowed memory fought bravely in the battle-field and did not hesitate to kill their country's enemies. The pages of history are replete with high admiration for the heroic exploits of these distinguished ladies. Then why should we, the modern Indian women, be deprived of joining the noble fight to redeem our country from foreign domination ? If sisters can stand side by side with the brothers in a Satyagraha movement, why are they not so entitled in a revolutionary movement ? Is it because the method is different or because females are not fit to take part in it ? As regards the method, i. e. armed rebellion, it is not a novel method. It has been successfully adopted in many countries and the females have joined it in their hundreds. Then why should India alone regard this method as an abominable one ? As regards fitness, is it not sheer injustice to the females that they will always be thought less fit and weaker than the males in a fight for freedom ? Time is come when this false notion must go. If they are yet less fit, it is because they have been left behind.

Females are determined that they will no more lag behind, but they will stand side by side with their brothers in any activities, however dangerous or difficult. I earnestly hope that my sisters will no more think themselves weaker and will get themselves ready to face all dangers and difficulties and join the revolutionary movement in their thousands.

Now, I shall briefly relate how I was drawn into the revolutionary organisation.

When I was studying in the Matriculation class in Dr. Khastagir's Girls' School, I got an idea of a revolutionary organisation in Chittagong and was told that there was a very powerful man, endowed with many qualities befitting a revolutionary leader, at the helm of this organisation.

During the two-year stay at Dacca for my Intermediate course, I was engaged in preparing myself as a fit comrade of the Great Masterda. However, I did not neglect my studies and in the year 1930, I passed the Intermediate Examination standing first among the girls and fifth in the general competition.

It was the morning of the 19th April, 1930, when I came home after the examination and heard of the glorious activities (of the previous night) of the Chittagong heroes. My heart was filled with deep admiration for these great souls. But it pained me much that I could not take part in such heroic exploits and could not have a glimpse of Masterda whom I have adored since I heard his name. The thought of Jalalabad Martyrs touched my heart to its very depth. With such a state of mind I left for Calcutta for my B.A. Degree. The thought of my country was ever pre-dominant in my mind. I saw the tears of mothers mourning the loss of their beloved sons who had sacrificed their lives on the altar of freedom.

All this new impetus came to me when I was asked by one of my brothers to visit Ramkrishnada in the Alipore Central Jail when in a solitary cell. He was awaiting extreme penalty meted out to him by the British law for his love of country. I passed for a cousin of Ramkrishnada and anyhow managed to see everyday this smart jolly young hero. I had about forty interviews with him before his execution. His dignified look, free conversation, calm surrender to death, sincere devotion to God, childlike simplicity, loving heart, sound knowledge and profound realisation impressed me very deeply and made me ten times more forward than what I had been. The association of this dying patriot made a great

contribution to the advancement of my life towards perfection. After Ramkrishnada's execution my hankering after some practical revolutionary action grew more intense. However, I had to pass some 9 months more in Calcutta for my B. A. Examination. In the meantime, I tried several times to have an interview with Masterda, but failed.

After my examination in 1932, I hurried towards home with a strong determination to interview Masterda anyhow. In a few days my long-cherished desire was fulfilled and I soon stood before Masterda and Nirmalda, the two great personalities, guiding the famous Chittagong Revolutionary Party.

In my short interviews with Nirmalda I recognised his noble and beautiful heart in which staunch revolutionary principles and strong religious temperament so nicely combined. I am fortunate that I got opportunities to come in touch with such a great soul that silently passed away from the world without giving the countrymen any opportunity to know how pure, how uncommon he was.

Nirmalda's tragic end gave me a severe shock and I became more desperate. The result of B. A. Examination was out by this time and I passed with Distinction. A few days after I plunged myself heart and soul into the revolutionary preparations leaving for good my beloved family.

Firm faith in my Almighty Father and cordial devotion to Him have been the most valuable treasure to me since my childhood. I have carefully cherished this treasure in my bosom throughout my whole life and today, when I have come finally prepared to embrace His feet that I have so earnestly hankered after, my treasure seems to be more precious, more pleasant and more illuminating. Had not my revolutionary ideal been thoroughly consistent with my devotion to the Almighty, I would never have been a revolutionary.

With an invocation to Him, I launch to discharge my todav's responsibility and pray to Him to purge me clean, so that I may be a worthy offering to Him. (১)

(১) বাংলা অনুবাদ পরের পাতায় দেখুন।—সম্পাদক।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

আমি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘোষণা করছি, আমি ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই বাহিনীর সমুন্নত আদর্শ—অত্যাচারী শোষণকারী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের কবল থেকে আমার মাতৃভূমিকে মুক্ত করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই অসাধারণ চট্টগ্রাম শাখার ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখের অভূতপূর্ব কৃতিত্ব ও তার পরবর্তী পবিত্র জালালাবাদ পাহাড়, সমীরপুর, ফেনী, চন্দননগর, চাঁদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও ধলঘাটে অসমসাহসিক কার্যকলাপ যুবসমাজের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে এবং শুধু বাংলাদেশের কেন সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তুলেছে। এরূপ একটি গৌরবোজ্জ্বল দলের সভ্য হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে আমি গর্ববোধ করছি।

আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি। আজকের কাজটি সেই ধারাবাহিক সংগ্রামের একটি অঙ্গ। বৃটিশ জনগণ আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, ভারতের রক্ত শোষণ করে রক্তহীন করেছে এবং লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নরনারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। তারা আমাদের সম্পূর্ণ নৈতিক, শারীরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের মূল কারণ। কাজেই তারা আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পথে তারা সবচেয়ে বড় বাধা। এজন্য আমরা সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী নির্বিশেষে সকল ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছি, যদিও কোন মানুষের জীবন নেওয়া আদৌ সুখকর কাজ নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে কোন উপায়েই হোক, পথের প্রত্যেক বাধা অপসারণের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

যখন আমার দলের শ্রদ্ধাস্পদ নেতা মহান্ মাষ্টারদা আজকের সশস্ত্র আক্রমণে যোগদানের জন্য আমাকে আহ্বান জানালেন, আমি তখন আমার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে দেখে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করলাম এবং অবশেষে দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে এই ভার গ্রহণ করলাম।

কিন্তু যখন সেই মহান্ ব্যক্তি আমাকে সেই আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বললেন, তখন আমি আমার নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলাম এবং এই বলে আপত্তি জানালাম যে, এতগুলো যোগ্য ও অভিজ্ঞ ভাই উপস্থিত থাকতে একজন বোন কেন নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করবে। মাষ্টারদা তখনি তাঁর সুন্দর যুক্তির সাহায্যে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করলেন এবং আমার নেতার আদেশ শিরোধার্য করলাম। আমার আশৈশব পূজিত সর্বশক্তিমান্ ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম, তিনি যেন আমার গুরু-কর্তব্য পালনে আমাকে সাহায্য করেন।

আমি মনে করি, আমার দেশবাসীর কাছে একটি কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশবাসীর মধ্যে এখনো অনেকে আছেন, যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত-পালিত একজন নারী নরহত্যারূপ বীভৎস কার্যে লিপ্ত হয়েছে শুনে চমকে উঠবেন। আমি ভেবে বিস্মিত হই, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পুরুষ ও নারীর মধ্যে তারতম্য থাকবে কেন। চিরস্মরণীয় রাজপুত নারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন এবং তাঁদের দেশের শত্রুদের বধ করতে দ্বিধা করেন নি—এরূপ দৃষ্টান্ত বহু আছে। বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য এই সকল মহীয়সী নারীদের প্রশস্তিতে ইতিহাসের পাতা পূর্ণ হয়ে আছে। তাহলে আমরা, আধুনিক যুগের ভারতীয় নারীরা, বিদেশীর আধিপত্য থেকে আমাদের দেশকে উদ্ধারের জন্য এই মহান্ সংগ্রামে যোগদানে বঞ্চিত হব কেন? সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যদি বোনেরা ভাইদের পাশে দাঁড়াতে পারে, তাহলে তারা বিপ্লবী আন্দোলনে পারবে না কেন? এর কারণ কি এই যে, দুটো আন্দোলনের পদ্ধতি ভিন্ন, অথবা নারীরা বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণের উপযুক্ত নয়? আন্দোলনের পদ্ধতি হিসাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ নতুন নয়। বহু দেশে এই পদ্ধতি সফল হয়েছে এবং তাতে নারীরা শ'য়ে শ'য়ে যোগদান করেছে। তাহলে শুধু ভারতে কেন এই পদ্ধতি নিন্দার্হ বিবেচিত হবে? যোগ্যতা যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীকে পুরুষের চেয়ে দুর্বল ও কম যোগ্য মনে করা অত্যন্ত অন্যায় নয়? এই ভুল ধারণা দূর করার সময় এসেছে। যদি তারা এখনো কম যোগ্য হয়, তাহলে তার কারণ তাদের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে।

নারীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তারা আর পিছিয়ে থাকবে না এবং সংগ্রাম

যতই বিপদসঙ্কুল বা কঠিন হোক না কেন তারা ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়াবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, আমার বোনেরা আর নিজেদের দুর্বল ভাববেন না, সমস্ত বাধা-বিপদের সম্মুখীন হতে নিজেদের প্রস্তুত করবেন এবং বিপ্লব আন্দোলনে হাজারে হাজারে যোগ দেবেন।

এখন, আমি কি করে বিপ্লবী সংগঠনে এলাম, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়বার সময় আমি চট্টগ্রামে একটি বিপ্লবী সংগঠনের আঁচ পাই এবং শুনেছি বিপ্লবী নেতার উপযুক্ত বহুগুণসম্পন্ন একজন শক্তিশালী মানুষ এই সংগঠনের পরিচালক।

ঢাকায় দু'বছর ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময় আমি মহান্ মাষ্টারদার যোগ্য সহকর্মী হিসাবে নিজেকে তৈরী করবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। অবশ্য পড়াশুনায় অবহেলা করি নি। ১৯৩০ সালে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং সব ছাত্রছাত্রী মিলিযে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আমি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করি।

পরীক্ষার পর ১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল সকালবেলা আমি যখন বাড়ী ফিরে আসি, তখন চট্টগ্রামের বীরদের পূর্বরাত্রের গৌরবোজ্জ্বল কার্যাবলীর কথা শুনতে পাই। এই মহান্ বীরদের প্রতি সশ্রদ্ধ-প্রশংসায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়। কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপে আমি অংশ গ্রহণ করতে পারলাম না এবং যে মাষ্টারদার নাম শোনার পর থেকেই আমি শ্রদ্ধা করে আসছি তাঁকে একবার দেখতে পেলাম না বলে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। জালালাবাদের শহীদদের জন্য আমি প্রাণে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। মনের এই রকম অবস্থায় আমি বি. এ. পড়বার জন্য কলকাতা চলে গেলাম। স্বদেশের কথা সব সময় আমার মন অধিকার করে থাকত। যে সব সন্তান স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়েছে, সেই প্রিয় সন্তানদের বিচ্ছেদ-বিধুরা জননীদের অশ্রু দেখতে পেতাম।

মনের এই রকম অবস্থায় আমি নতুন উদ্দীপনা পেলাম, যখন আমার এক দাদা আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণদার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রামকৃষ্ণদা তখন একটি নির্জন জেলে স্বদেশপ্রেমের জন্য বৃটিশ আইনে চরম দণ্ডের অপেক্ষা করেছেন। আমি তাঁর এক সম্পর্কিত বোন বলে নিজের পরিচয় দিয়ে যেতাম এবং এই সপ্রতিভ, উৎফুল্ল, তরুণ বীরের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ

করতাম। ফাঁসীর পূর্বে আমি তাঁর সঙ্গে প্রায় চল্লিশ বার সাক্ষাৎ করি। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ ভাব, সহজ আলাপন, মৃত্যুর কাছে শান্ত আত্মসমর্পণ, অকপট ঈশ্বরভক্তি, শিশুসুলভ সরলতা, প্রীতিপূর্ণ হৃদয়, গভীর জ্ঞান এবং প্রগাঢ় অনুভূতি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং আমি পূর্বাপেক্ষা দশগুণ বেশী কর্মতৎপর হই। এই মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রেমিকের সান্নিধ্য আমার জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। রামকৃষ্ণদার ফাঁসীর পর কোন বাস্তব বিপ্লবী কার্যে আমার অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল হয়। যাহোক, আমাকে আমার বি. এ. পরীক্ষার জন্য কলকাতায় আরো ন'মাস থাকতে হল। ইতিমধ্যে আমি মাষ্টারদার সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই।

১৯৩২ সালে আমার পরীক্ষার পর যে-কোন উপায়ে মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাতের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমার দীর্ঘ দিনের বাসনা পূর্ণ হল এবং বিখ্যাত চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের দুই মহান্ নেতা মাষ্টারদা ও নির্মলদার সামনে শীঘ্রই উপস্থিত হলাম।

নির্মলদার সঙ্গে স্বল্প আলাপেই আমি তাঁর মহান্ ও সুন্দর অন্তঃকরণ লক্ষ্য করেছি। এতে সুদৃঢ় বিপ্লবী নীতি এবং প্রবল ধর্মবোধের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। আমার সৌভাগ্য যে, আমি এমন একটি মহৎ প্রাণের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি কত মহান্, কত পবিত্র ও কত অসাধারণ—তা দেশবাসীকে জানবার কোন সুযোগ না দিয়ে নীরবে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন।

নির্মলদার শোচনীয় মৃত্যু আমাকে ভীষণ আঘাত হানল এবং আমি আরো মরীয়া হয়ে উঠলাম। এই সময়ে আমার বি. এ. পরীক্ষার ফল বের হয় এবং আমি ডিষ্টিংশনে পাশ করলাম। এর কিছুদিন পরে আমার প্রিয় পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের চিরতরে ছেড়ে এসে বৈপ্লবিক কাজের প্রস্তুতিতে মন প্রাণ দিয়ে আত্মনিয়োগ করলাম।

আশৈশব সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক ভক্তি আমার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্। আমার সারাজীবন এই সম্পদকে আমি সযত্নে অন্তরে পোষণ করেছি এবং আজ যখন আমি আমার অন্তরের এত বাঞ্ছিত ঈশ্বরপদলাভের জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছি, তখন আমার এই সম্পদ্ যেন আরো মূল্যবান্, আরো আনন্দদায়ক এবং আরো দীপ্তিমান

বলে মনে হচ্ছে। সর্বশক্তিমানের প্রতি আমার ভক্তির সঙ্গে যদি আমার বৈপ্লবিক আদর্শের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকত, তাহলে আমি আদৌ বিপ্লবী হতে পারতাম না।

ঈশ্বরের প্রতি সানুনয় আহ্বান জানিয়ে আমি আমার আজকের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হচ্ছি এবং প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে মলিনতা মুক্ত করেন, যাতে আমি তাঁর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার যোগ্য হতে পারি।

প্রীতিলতা—মাষ্টারদার দৃষ্টিতে

স্নিগ্ধ সুষমার ভরা একটি পবিত্র ফুল তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে এই দীন পূজারীর কাছে এসেছিল মায়ের চরণে অর্ঘ্য হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। পূজারীকে কত বড়ই সে মনে করেছিল, কত বড় শ্রদ্ধার আসন তাকে দিয়েছিল মায়ের কাছে উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য! পূজারী ফুলটিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেছে, তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার যাওয়ার ব্যাকুলতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, শেষে মায়েরই চরণে তাকে অঞ্জলি দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। সে আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, মা তাকে কত যত্নে কত আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন!

পূজারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে সে যেন আজ ফুলের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুলের মহত্বটুকু নষ্ট করে না ফেলে।

মহানায়ক সূর্য সেনের মর্মবাণী

[বীরাঙ্গনা (প্রীতিলতার স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের পনেরো দিন পরে বিজয়া দশমীর দিনে মহানায়ক সূর্য সেন **"বিজয়া"** এবং পরবর্তী সময়ে **"অনুভূতি"**—এই প্রবন্ধ দু'টি রচনা করেন।) সূর্য সেনের গ্রেপ্তারের সময় তাঁর কাছে অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়। এই দু'টি 'প্রবন্ধ', ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর **"বিদায়বাণী"** [বাংলা অনুবাদসহ] এবং গ্রেপ্তারের পর পুলিশের কাছে তাঁর **'মহানায়কোচিত উক্তি"** পর-পর মুদ্রিত হল।— **সম্পাদক**]

বিজয়া

তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর
কোন মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু
ততই টেনে লও বুকে।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ কর দহন দানে।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে! কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ—এবারকার বিজয়া যেন সব চেয়ে বেশী মূল্যবান! জীবনে যা দেখি নি, জীবনে যা পাই নি, জীবনে যা শিখি নি এমন কত অভিনব জিনিষ নিয়েই বিজয়া এলো আজ আমার কাছে! কত নূতন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এলো! গত দু' মাস যেন আমার জীবনের অভিনব অভূতপূর্ব্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ, বিষাদ, জ্বালা আমার জীবনের খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল। আজ বিজয়ার দিনে যার কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে। এই দু'মাসের সব কিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনে যে পাই নি, বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরও মধুময় করে তুলেছে। আমার দুর্ভাগ্য

—একান্ত দুর্ভাগ্য যে এমন প্রাণমাতান আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহ ব্যথা দিচ্ছে। আমরা দুর্ব্বল মানব—আমাদের কাছে এত সুন্দর আনন্দটুকুর চেয়ে এমন আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে গেল যে, তাকে হারাবার ব্যথাই বড হয়ে উঠল।

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এলো, এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু, কত আদরের ভাইবোনের জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম—আর পূর্ণ দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম—আজ একে একে সব কথা মনে পড়ছে। আজ মনে পড়ছে, কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করে নি, একটু সঙ্কোচ করে নি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার মত কঠিনহৃদয়ের চোখেও জল আসছে—তাদের বীরত্বের কাহিনী মনে পড়ে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে। নরেশ, বিধু, টেগরা, ত্রিপুরা, মধু, অর্দ্ধেন্দু, প্রভাস, নির্ম্মল, পুলিন, মতি, শশাঙ্ক, জিতেন, আন্দু, অমরেন্দ্র, মনা, রজত, দেবু, স্বদেশ, মাখন, রামকৃষ্ণ, নির্ম্মল, ভোলা সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে। আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম—কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি—কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্ব্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি—দেশের উপর গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার নির্য্যাতন টেনে এনেছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে?

মা, আনন্দময়ি মা আমার, আজ তোমার বিসর্জ্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি—আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? পনর বৎসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভাল মন্দ বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি। দুর্ব্বলতা কি আসতে চায় নি? কত রকমের দুর্ব্বলতা আসতে চেয়েছে, কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে তো ছাড়ি নি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক। এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে যে, আমি অন্যায় করছি না,

পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গেলে আমার দেশে যে হাহাকার, অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশীই—সব দেশেই তাই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথেই আমি চলেছি—এখনও কোন দ্বিধা আসে নি। মা তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙ্গে দিও, আর যদি ঠিক পথেই আমি চলে থাকি তা হলে আমার বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দাও, আমাকে আরও শক্তিমান্ করে দাও—আমার মধ্যে যেন কোন রকমের দুর্ব্বলতা না আসে, আমি যেন আমার পথ থেকে কোন দিন এক চুলও না সরি। আমি যেন বড নিঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের পথচলা যেন আমার নিঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে; তাই অতি আদরের ছেলে, মেয়ে, ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তাঁদের কথা মনে করে আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে। হয়ত তাঁরা আমাকে তাঁদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন—সেজন্য আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, মর্ম্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কত স্নেহময়ী জননী তাঁর আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি মর্ম্মান্তিক কান্নাই কাঁদছেন! কি অসহ্য বেদনায় তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠছে—বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তাঁর কাছে কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে! বাপ তাঁর আদরের দুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন! ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে! কত বড অভাববোধ তাঁদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে! এ সব ভেবে আমার মত পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে। আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? এত মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করছি? যদি তাই হয়, তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিও, আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথে চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি—এই আশায় যে

এ সকল পবিত্র শ্মশান-স্তূপের উপরে একদিন স্বাধীনতার সৌধ নির্ম্মিত হবে।

পনের দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলাম, তার কথাই আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে। যাকে নিজ হাতে বীর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, তার স্মৃতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, "তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না", তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল। কি করুণ সে হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল! সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অফুরন্ত কথা আমার সারা জীবন ভাবলেও শেষ করতে পারব না—শেষ করতে চাইও না। তা যেন আমার জীবনে নিত্য নূতন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে, দিন দিন উন্মত্ত করে তোলে। সে তো নিজ হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। কিন্তু মরজগতে আমরা তার বিসর্জ্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না! আজ বিজয়ার দিনে, সেই দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি যে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে কান্নার সুর তুলছে—চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না—
"চাপিতে গেলে উঠে দু'কূল ছাপিয়া।"

সে যে আমার আনন্দের উৎস—নির্দোষ, নিষ্পাপ ছিল—সুন্দর, পবিত্র মহান্ ছিল! তার মধ্যে একাধারে যত গুণ দেখেছি আর কোন মানুষের মধ্যে তত গুণ আমি দেখি নি। তার অন্তরের সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারও চেয়ে কম দেখি নি। তার সরলতা, বাধ্যতা খুব সুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা, আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর ব্যবহার কিছুরই অভাব ছিল না। সর্ব্বোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস, সে যেভাবে বজায় রেখেছিল তা দেখলে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম—হৃদয়ের সমস্ত উজার করে তাকে দিয়েছিলাম—প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে পাই নি। এত স্নেহের, এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে এলাম। তাই সে

দিনের কথা আজ কেবলই মনে হচ্ছে, মনে পড়ছে সেই প্রতিমাটিকে। সে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল, দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে—আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।

অসুরদলনী মা আমার! আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা, তুমি আমায় এই বর দাও—যেন তার স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অনুভব করি। তার অপূর্ব্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরও শক্তিমান্ করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে—তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না উঠে।

আমার স্নেহের প্রতিমাকে বলছি—"রাণী, তোকে আমি কতদিন কত ব্যথাই দিয়েছি; আজ বিজয়ার দিনে তোর দাদার সব দোষত্রুটি ভুলে যা, আমার উপর আর অভিমান রাখিস্ না। তোকে হৃদয় উজার করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—তোর ভগবৎ ভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি; তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি—এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়ত তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি, তোকে খুব স্নেহ করতাম বলে তোকে গাল দিতে কোনো দিন ইতস্ততঃ করি নি, মনে করতাম তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোনদিন রাগ করিস্‌ও নাই—শেষ মুহূর্ত্তে তোকে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেছিস্। আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস্ সেখান থেকেই আমার সব দোষত্রুটির জন্য আমায় ক্ষমা করে যা। শেষ মুহূর্ত্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি তা তো তুই দেখছিস্। তোর দাদা যেন শান্তি পায় তার ব্যবস্থা তুই করে দে। তোর কি মনে নাই, তুই তোর দাদার দুঃখ একটুও সহ্য করতে পারতিস্ না? তাই আবার বলছি, আজকের এই পবিত্র দিনে আমার দোষত্রুটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়া-সম্ভাষণ গ্রহণ কর্। আমার স্নেহের সম্ভাষণ—শ্রদ্ধার সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি। আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ-বিসম্বাদ, দোষত্রুটি

সবই ভুলে যাওয়ার দিন। আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম, দূর থেকেও সেই আনন্দ তুই আজ আমাকে দে। এমন সুন্দর দিনে মায়ের নামটি নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মত নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কাউকে আমি পাই নি। বাস্তবিক ফুলেরই মত তুই সুন্দর, পবিত্র ও মহান্ ছিলি। তোর অপূর্ব্ব আত্মদানে তোকে আরও সুন্দর, আরও মহনীয় করে তুলেছে।

বরদাত্রী মা আমার—আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার স্নেহের প্রতিমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা কি মহৎ দেখেছি তা যেন আমার এবং আমার প্রিয় ভাইবোনেরা জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করে।

"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

অনুভূতি

সেদিন বিজয়ার সন্ধ্যায় পাশের বাড়ীতে উঠানে কয়েকজন লোক হরিনাম কীর্ত্তন করছিল, শরতের জ্যোৎস্নায় সারা উঠান ভরে গিয়েছিল। আমার সেদিকে খেয়াল ছিল না—যে স্নেহের প্রতিমাটিকে পনের দিন আগে হারিয়েছি তার চিন্তায় বিভোর ছিলাম। গানও তেমন শ্রুতিমধুর হচ্ছিল না, হঠাৎ যেন নাম-কীর্ত্তনটা আমার কানে মধুর ঠেকল। মাথা তুলে জানালার ফাঁক দিয়ে গায়কদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর অনুভূতি এসে আমার অন্তরে একটা আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করল। মনে মনে একটা সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের ছবি খুঁজতে লাগলাম—মনে পড়ে গেল পনের দিন আগে বিসর্জ্জনের দিনে প্রতিমার সঙ্গে ছোট শ্রীকৃষ্ণের ছবিটি দিয়েছিলাম। সেই সুন্দর মূর্ত্তিটি মানসনেত্রে দেখতে দেখতে হৃদয়ের মধ্যে তাঁর ধ্যান করতে আরম্ভ করলাম। কীর্ত্তনের সুর কানের মধ্যে মধুর বাজতে লাগল। মনপ্রাণ পুলকিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল যার বিসর্জ্জনের দিনে মূর্ত্তিটি সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলাম সে কথা। মনে হ'ল হরিনাম কীর্ত্তন শুনলেই তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ত এবং গায়কদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তন্ময় হয়ে হরিনাম গাইত। আমার ধ্যানের

মূর্ত্তিটিও সরে গেল না, অথচ মানসনেত্রে দেখতে পেলাম সে কত যত্ন করে ফুলের আসন সাজিয়ে এই মূর্ত্তিটিকেই পূজা করছে—ধ্যানস্তিমিত নেত্রে মূর্ত্তিটির পানে চেয়ে আছে। আর তার দু'চোখ বেয়ে দরবিগলিত ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এমন পবিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। ধ্যানের মূর্ত্তিটি এবং ধ্যানে নিরত মানুষটি—দু'জনকে এক সঙ্গে দেখতে দেখতে আনন্দে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

কতক্ষণ পরে আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চোখের জল মুছে আমার অনুভূতিটির কথা ভাবলাম। ভাবলাম, যাকে হারিয়েছি তার শোকে সারা দিনরাত দগ্ধ না হয়ে এ ভাবের অনুভূতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারলেই শান্তি পাওয়া যায়—হারাবার ব্যথাটাকে আনন্দে পরিণত করা যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে যাকে হারিয়েছি তাকে যথার্থভাবে অনুভব করা যায়।

ভগবান, আমাদিগকে এত দুর্ব্বল করেছ কেন? এই আনন্দটুকুকে স্থায়ী করে নেওয়ার ক্ষমতা দাও নি কেন?

বিদায়বাণী

Ideal and unity is my farewell message. Rope is hanging over my head. Death is knocking at my door. My mind is soaring towards Eternity. This is the time for 'Sadhana'. This is the time for preparation to embrace death as a friend and this is the time to recall lights of other days as well.

Sweet remembrance of you all! My dear brothers and sisters, break the monotony of my life and cheer me up. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment, what shall I leave behind for you? Only one thing, that is my dream, a golden dream—a dream of Free India. How auspicious a moment it was, when I first saw it! Throughout my life most passionately and untiringly, I have pursued it like a lunatic, I know not where I am compelled to stop my pursuit to-day. If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do to-day. Onward, my comrades, onword—never fall back.

The day of bondage is disappearing and the dawn of freedom is ushered in. Be up and doing. Never be disappointed. Success sure. God bless you !

Never forget the 18th April, 1930, the day of Easter Rebellion in Chittagong. Keep ever fresh in your memory the fights of Jalalabad, Julda, Chandannagar and Dhalghat. Write in red letters in the core of your hearts the names of all patriots who have sacrificed their lives at the altar of India's freedom.

My earnest appeal to you—there should be no division in our organisation. My blessings to you all, inside and outside the jail. Fare you well.

Long live revolution.
Bande Mataram.

Chittagong jail
11th Jan. 1934
at 7 P. M.

[বাংলা অনুবাদ]

আমার বিদায়বাণী—আদর্শ ও একতা। ফাঁসীর রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো 'সাধনা'র সময়। বন্ধুরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার প্রস্তুতির এই তো সময়। চলে-যাওয়া দিনগুলোকেও স্মরণ করার এই তো সময়।

কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি! প্রিয় আমার ভাইবোনেরা, বৈচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের একঘেয়েমিকে ভেঙে দাও তোমরা, উৎসাহ দাও আমাকে। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম? মাত্র একটি জিনিষ, তা হল আমার স্বপ্ন—একটি সোনালী স্বপ্ন, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। কী শুভ মুহূর্ত ছিল সেইটি, যখন আমি এই স্বপ্ন দেখেছিলাম! জীবনভোর উৎসাহভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মত সেই স্বপ্নের পেছনে ছুটেছি। জানি না, কতটা সফল হতে পেরেছি। জানি না, কোথায় সেই অনুসরণ আজ থামিয়ে দিতে হচ্ছে আমাকে।

লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে মৃত্যুর হিম-শীতল হাত তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের হাতে ভার তুলে দেবে অন্বেষণের, আজ যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। প্রিয় আমার বন্ধুরা, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—কখনো পিছিয়ে যেও না। বন্ধনের দিন চলে যাচ্ছে। ঐ দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার নবারুণ। উঠে পড়ে লাগো। কখনো হতাশ হয়ো না। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম ইষ্টার বিদ্রোহের কথা কোন দিনও ভুলো না। জালালাবাদ, জুলদা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সব সময় স্পষ্ট মনে রেখো। ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে যে-সব দেশপ্রেমিক তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লিখে রেখো।

আমাদের সংগঠনে যেন বিভেদ না আসে—এই আমার একান্ত আবেদন তোমাদের কাছে। যারা কারাগারের ভেতরে ও বাইরে রয়েছো, তাদের সকলকে জানাই আমার আশীর্বাদ। বিদায় নিলাম তোমাদের কাছ থেকে।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

বন্দে মাতরম্।

চট্টগ্রাম জেল

১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৪

সন্ধ্যা ৭ টা

মহানায়কোচিত উক্তি

SURYA SEN WAS NEVER A COWARD.

—Surya Sen

চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের তথা সরকারী অস্ত্রাগার অধিকার ও তৎপরবর্তী বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলীর সর্বাধিনায়ক, অমর বিপ্লবী সূর্য সেন যখন পুলিশ ও মিলিটারীর যুগ্মবাহিনীকর্তৃক ধৃত হন, তখন তাঁর সঙ্গে মারাত্মক বিষ (Potassium Cynide) ছিল এবং কোমরে গুলীভরা পিস্তল ছিল। ইচ্ছা করলে অনায়াসেই তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পূর্ব মুহূর্তেই আত্মহত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা তখন শ্রেয় মনে করেন নি।

গৈরলা গ্রামে গ্রেপ্তারের পরদিন তাঁকে কঠোর পুলিশ প্রহরায় সর্বপ্রথমে চট্টগ্রাম সহরে গোয়েন্দা বিভাগীয় তৎকালীন স্পেশ্যাল আই. বি. পুলিশ সুপারের অফিসে এনে লৌহবেষ্টনীযুক্ত কাঠগড়ার মধ্যে রাখা হয়। তখন পুলিশ সাহেব সূর্যবাবুর সঙ্গে (যথোচিত সৌজন্য দেখিয়ে ?) করমর্দন করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন: "Well, Surya Babu, are you a coward or mad ? You had potassium cynide in your pocket and a loaded revolver in your waist. Why you allowed yourself to be caught ?"

সূর্য সেন তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন: "Surya Sen was never a coward. If he was mad, there was method in his madness."

"গোয়েন্দা বিভাগীয় জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের নিকট এই তথ্য অবগত হয়েছিলাম। তারপর স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে বিচারের সময় তাঁর নিকট এই উক্তির সত্যতা নির্দ্ধারণের সুযোগও হয়েছিল। কোর্টে একদিন সুযোগ বুঝে আসামীর কাঠগড়ার নিকট গিয়ে আমি তাঁকে উক্ত জবাবের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সূর্য বলেছিলেন—"দাদা, আমি প্রফুল্ল চাকীর ন্যায় মৃত্যুবরণ পছন্দ করি নাই; ক্ষুদিরাম বসুর মতো মৃত্যু কামনা করেছিলাম……।" [১]

---

[১] উপরোক্ত তথ্য চট্টগ্রামের খ্যাতনামা এড্‌ভোকেট স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের ডায়েরী থেকে সঙ্কলিত। সূর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবীদের বিচারকালে আসামীপক্ষ সমর্থনকারী ব্যারিষ্টার জে, কে, ঘোষালের সহকারী ব্যবহারজীবীদের মধ্যে হেমেন্দ্রবাবুও অন্যতম ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সূর্য সেন ও হেমেন্দ্রবাবু প্রায়-সহপাঠী ও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তাও ছিল। হেমেন্দ্রবাবুর অনুজ ও প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীশচীন দত্তের সৌজন্যে এই তথ্য সংগৃহীত।—সম্পাদক

কয়েকটি ঘোষণাপত্র

[চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়েছিল. ১নং ঘোষণাপত্রটি চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের [১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০] ব্যাপারে গোয়েন্দা-বিভাগকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মহানায়ক সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে ঐ বিদ্রোহের কয়েকদিন পূর্বে প্রচার করেছিলেন। ২, ৩ এবং ৪ নং ঘোষণাপত্রগুলি বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামে প্রচারিত হয়। ৫নং ঘোষণাপত্রটি সূর্য সেন রচিত। বিদ্রোহের কয়েকদিন পরে তা চট্টগ্রামে ও কলকাতায় প্রচারিত হয়। এই ঘোষণাপত্রের শুধু শিরোনামটি জানা গেছে। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের [২৪ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২] সঙ্গে সঙ্গেই ৩টি ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল ১৮ই এপ্রিলে প্রচারিত ঘোষণাপত্রের অনুরূপ। অপর ঘোষণাপত্রগুলি ৬ এবং ৭নং চিহ্নিত। ইংরাজীতে রচিত ঘোষণাপত্রগুলির বাংলা অনুবাদসহ সব ঘোষণাপত্র পর-পর মুদ্রিত হল।—সম্পাদক]

[১]

দেশের দিকে দিকে স্বাধীনতার তূর্য্যধ্বনি শুনা যাইতেছে। সর্ব্বত্র আইন অমান্যের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ সালে যেই চট্টগ্রাম ছিল সবার পুরোভাগে, আজ সেই চট্টগ্রাম পশ্চাতে থাকিবে—ইহা ক্ষোভ ও লজ্জার কথা। এই জেলার লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য এক সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি কি করে তাহা দেখিবার জন্য আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিব। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে লবণ আইন ছাড়া অন্য আইন (যেমন রাজদ্রোহ আইন) অমান্যও আরম্ভ হইয়াছে; কালবিলম্ব না করিয়া আমরাও ২১ শে এপ্রিল হইতে আইন অমান্য করিব স্থির করিয়াছি। ইহার জন্য সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা চাই। লোক ও টাকা চাই।

শ্রীসূর্য্য সেন
সম্পাদক
চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটি

Indian Republican Army

The Indian Republican Army, Chittagong Branch, hereby solemnly declares its intention to stand to-day against the agelong repression by the British people and their Government which they have followed as a cruel policy to keep the three hundred millions of Indian people subjugated for unlimited time and to eradicate .the slightest trace of nationalism and their national originality amongst them.

The right of ownership of India and the control of her destiny belongs to the people of India only and the long usurpation of that right by a foreign people and Government has not extinguished that right or it ever CAN. The Indian Republican Army proclaims to-day its intention of asserting this right in arms in the face of the world and thus put into actual practice the idea of Indian Independence declared by the Indian National Congress and hereby pledges the life of everyone of its members to the cause of freedom, to the welfare and exaltation of the Motherland amongst all other nations.

It remembers to-day with sorrowful indignation the inhuman massacre of the Indian people perpetrated by the British Government on the Indian soil, the blowing up of her woman-folk in the mouth of guns, the indiscriminate hangings and cold-blooded murders of her manhood, the crushing of infants under the cruel British foot and the complete destruction of her trade and industries and takes up the sacred vow of retaliating and avenging the blood of her late wronged children.

The Indian Republican Army is entitled to and hereby claims the allegiance of every Indian people for the upkeep of the national cause and honour and also prays that no person who reveres this cause will dishonour it by callousness, cowardice and inhumanity, In this supreme hour the Chittagong people must, by their valour and patriotism and by the readiness of her children to sacrifice themselves for the common good, prove themselves worthy of the august destiny to which they are called.

By Order,
President-in-Council,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch.

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী

বৃটিশ জনসাধারণ ও তাদের সরকার ভারতের জনসাধারণকে অনন্তকালের জন্য অধীন করে রাখার এবং তাদের জাতীয়তাবোধের সামান্যতম চিহ্ন ও তাদের জাতীয় মৌলিকতা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষণের যে নিষ্ঠুর নীতি অনুসরণ করেছে, তার বিরুদ্ধে আজ ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যুত্থানের অভিপ্রায় ঘোষণা করছে।

কেবলমাত্র ভারতের জনসাধারণই ভারতের প্রকৃত অধিকারী। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র ভারতের জনগণেরই আছে। একটি বিদেশী জাতি ও সরকার দীর্ঘকাল ধরে সেই অধিকার খর্ব করা সত্ত্বেও তা ধ্বংস করতে পারে নি, কখনো পারবেও না।

আজ ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী সমগ্র জগতের সামনে অস্ত্রের সংঘাতে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দৃঢভাবে ঘোষণা করছে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-ঘোষিত ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ এইভাবেই বাস্তবে রূপায়িত হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি এবং অপর সকল জাতির মধ্যে তাকে মহিমান্বিত করার জন্য এই বাহিনীর প্রত্যেক সভ্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করছে।

তারা আজ তীব্র ঘৃণাভরে স্মরণ করছে, ভারতভূমিতে ভারতবাসীর উপর বৃটিশ সরকার-অনুষ্ঠিত অমানুষিক হত্যাকাণ্ড, কামানের মুখে ভারতীয় নারীকে উড়িয়ে দেওয়া, পুরুষদের নৃশংস ও নির্বিচারে হত্যা, নিষ্ঠুর বৃটিশের পদতলে শিশুদের নিষ্পেষণ এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন। তারা সেই নিহত সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য পবিত্র শপথ গ্রহণ করছে।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী এতদ্দ্বারা জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর আনুগত্য দাবী করছে। এই বাহিনীর ঐ দাবী করার অধিকার আছে। এই বাহিনী সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে, যিনি এই আদর্শকে সম্মান করেন, তিনি যেন তাঁর শিথিলতা, ভীরুতা, ও অমানুষিকতার দ্বারা এর অবমাননা না করেন। এই চরম মুহূর্তে চট্টগ্রামের জনগণ তাঁদের শৌর্য, দেশপ্রেম এবং সর্বজনের কল্যাণার্থ তাঁদের সন্তানদের আত্মোৎসর্গের প্রস্তুতির দ্বারা তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণ নিশ্চয়ই দেবেন।

আদেশক্রমে,
সপারিষদ সভাপতি
ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী
চট্টগ্রাম শাখা

The Indian Republican Army

To

The Students and Youths of Chittagong

Dear Brothers,

The Indian Republican Army has made an attempt to assert its rightful claim to liberate the country from the cruel yoke and oppression of the British people and their Government and has kept up flying the ensign of Free India.

The British Government during the last 200 years of their tyrannical reign in India, have crushed the Indians with very cruel hands everytime they have tried to achieve freedom and this time also they will not spare any energy to restore their illegal establishment for predatory exploitation.

So brothers, rise up to the situation, try to feel the anguish of subjugation, see to the sad plights your country has been put to, do what the youths and students of Germany, Russia and China are doing, kindle up the fire of wrath and retaliation in your hearts. Enroll yourselves as soldiers under the Indian Republican Army and make an ardent attempt to save the motherland from the abyss of misfortune and misery.

By Order,

President-in-Council,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch.

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী

চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবকদের প্রতি

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

বৃটিশ জনসাধারণ ও তাদের সরকারের নিষ্ঠুর দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী প্রচেষ্টা করেছে এবং স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করেছে।

ভারতবাসী যতবার স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টা করেছে, বৃটিশ সরকার

বিগত দু'শত বৎসরের অত্যাচারের রাজত্বে সেই প্রচেষ্টাকে প্রত্যেকবার নির্মম হস্তে ধ্বংস করেছে। এবারও তারা তাদের দস্যুমূলক শোষণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে ত্রুটি করবে না।

অতএব, ভাই সব, এই অবস্থার অবসানের জন্য এগিয়ে আসুন, পরাধীনতার বেদনা অন্তরে অনুভব করুন। চেয়ে দেখুন, আপনাদের দেশকে কী রকম অধঃপতনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জার্মানী, রাশিয়া ও চীনের ছাত্র ও যুবকগণ যেরূপ করছে, আপনারাও সেরূপ করুন। আপনাদের অন্তরে ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুন প্রজ্বলিত করুন। দলে দলে আপনারা ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর সদস্যভুক্ত হোন এবং মাতৃভূমিকে দুর্ভাগ্য ও দুঃখের অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করার জন্য সুতীব্র চেষ্টা করুন।

আদেশক্রমে,
সপারিষদ সভাপতি
ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী
চট্টগ্রাম শাখা

[৪]

To

The Citizens of Chittagong

The Indian Republican Army hereby directs and commands everyman, woman and son of Chittagong to capture and produce dead or alive forthwith at the Head Quarters of the Army all Englishmen and white-skinned Anglo-Indians who are hostile to our National aspirations. The Indian Republican Army announces that everybody who will produce the demanded persons will be amply rewarded.

By Order,
President-in-Council
Indian Republican Army
Chittagong Branch

চট্টগ্রামের নাগরিকদের প্রতি

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী চট্টগ্রামের প্রত্যেক পুরুষ, নারী ও সন্তানকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিচ্ছে, তাঁরা যেন আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী সমস্ত ইংরেজ ও শ্বেতচর্ম ইঙ্গ-ভারতীয়কে অবিলম্বে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় বন্দী করে সাধারণতন্ত্র বাহিনীর প্রধান দপ্তরে সমর্পণ করেন। ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী ঘোষণা করছে, এরূপ ব্যক্তিদের যাঁরা সমর্পণ করবেন, তাঁদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেওয়া হবে।

আদেশক্রমে,
সপারিষদ সভাপতি
ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী
চট্টগ্রাম শাখা

[৫]

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধে বৃটিশবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়

[৬]

The Indian Republican Army plunges to-day into this bloody 'revenge and lets the British Rulers know that, however weak and helpless, India will never tolerate these sorts of wanton barbarity with equanimity and silence, and further that The Indian Republican Army which had so long aimed at the official chamber alone, declares henceforward a general expedition against the European Community and orders on indiscriminate massacre of European lives and seizure of their goods and property.

[ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী আজ এই রক্তক্ষয়া প্রতিশোধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং বৃটিশ শাসকদের জানিয়ে দিচ্ছে, যতই দুর্বল ও অসহায় হোক না কেন ভারত কখনো এ-রকম অবাধ বর্বরতা নির্বিকারে ও নীরবে সহ্য করবে না। এই বাহিনী আরো জানিয়ে দিচ্ছে, যে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর এতদিন লক্ষ্য ছিল শুধু সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সেই বাহিনী এখন থেকে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্বিশেষ অভিযান ঘোষণা করছে এবং ইউরোপীয়দের নির্বিচার হত্যা ও তাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত-করণের আদেশ দিচ্ছে।]

In presence of our declaration of the 18th. April, 1930, we, the soldiers of the Chittagong Branch of the Indian Republican Army, launch to-day a campaign against the lives of the members of the British Community—be they official or non-official, merchants or peasants. They are the sole cause of our country's utter ruin. They are responsible for brutal repression on our countrymen, such as Chittagong, Hijli, Jallianwallabagh and other similar incidents. They are the worst enemy of our country.

Our fight for country's freedom has begun long ago. To-day's campaign is one of the links in the chain.

May God bless us and assist us in our sacred campaign.

[আমরা ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈনিকগণ ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের ঘোষণার অনুরূপ বৃটিশসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের—তারা সরকারী বা বে-সরকারী কর্মচারী, বণিক বা কৃষক যা-ই হোক না কেন—জীবনের বিরুদ্ধে আজ সামরিক অভিযান সুরু করছি। আমাদের দেশের সম্পূর্ণ ধ্বংসের একমাত্র কারণ তারাই। চট্টগ্রাম, হিজলী, জালিয়ান-ওয়ালাবাগ এবং এ-রকম অন্যান্য ঘটনাবলীর মত আমাদের দেশবাসীর উপর বর্বর নির্যাতনের জন্য তারা দায়ী। তারা আমাদের দেশের নিকৃষ্টতম শত্রু।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বহু পূর্বে সুরু হয়েছে। আজকের সামরিক অভিযান সেই ধারাবাহিকতার অন্যতম অংশ।

ভগবান আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের পবিত্র সামরিক অভিযানে আমাদের সাহায্য করুন।]

চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা

[১]

[ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে কলিকাতার ১৩ নং লর্ড সিংহ রোডে বাংলা ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের গুপ্ত অফিস ছিল। জনাব সা'দত আলি আখন্দ এখানে ৫ বৎসর ও চট্টগ্রামে কয়েক বৎসর কাজ করেছেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলার বিপ্লববাদ দমনে শাসকশক্তির নৃশংসতার যে রোমাঞ্চকর বিচিত্র তথ্যসমূহ তিনি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন, সেগুলো তিনি "তেরো নম্বরে পাঁচ বছর" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত গ্রন্থ থেকে আমরা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার কিছু বিবরণ প্রকাশ করলাম।—**সম্পাদক**]

মাত্র একটি মীরজাফর তার দেশের ও সমাজের নির্দোষ নরনারীর কত রকমের ক্ষতি করতে পারে, তাদের জীবনকে কতভাবে বিড়ম্বিত করতে পারে, তার কল্পনাও করা যায় না। সে অত্যাচার স্বচক্ষে দেখে শিউরে উঠেছি আমি।

······আর্মারী রেডের সময়ে যিনি চিটাগাং ডি. আই. বি-র অধিনায়ক ছিলেন, তিনি খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্। সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সুপার। এই ত্রিশক্তি তাঁদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য, বুদ্ধি ও কৌশল চট্টগ্রামের হিন্দু বিপ্লবী ধ্বংস-সাধনে নিয়োজিত করেছিলেন।

খানবাহাদুরের নির্যাতনের অনেক অভিনবত্ব ছিল। রেডের ফেরারী খুঁজতে গিয়ে শুধু ফেরারীর বাড়ীই তল্লাসী করতেন না—গ্রামে তার আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সকলের বাড়ীই তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করতেন—তাদের নামে সার্চ ওয়ারেণ্ট থাক আর নাই থাক।······বাড়ীর লোকজনের ওপর দৈহিক অত্যাচার তো করতেনই, খাট পালং আলমারী আর অন্য কোন দামী আসবাবপত্রও রক্ষা পেত না।······

এই রকমের জুলুমের মাত্রা এতো বেশী হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত নিজাম পল্টনে খেলার মাঠে হরিপদ চক্রবর্তী [১] নামে চোদ্দ পনের বছর বয়সের এক ছাত্র খান বাহাদুরকে রিভলবারের গুলী ছুঁড়ে হত্যা করে।·········পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারেও হরিপদ তার কোনো সহকারী কিংবা সাহায্যকারীর নাম প্রকাশ করে নি।·········

[১] হরিপদ চক্রবর্তী নন, হরিপদ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক।

খান বাহাদুরের হত্যার রাতেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল।······সেই রাতেই ন'টার মধ্যে শহরের হিন্দু দোকান, ফার্ম, গুদোম সব লুট হয়ে গেল।······সে এক বিরাট লুঠতরাজ। প্রায় তিন চার ঘণ্টা ধরে ধীরে সুস্থে লুঠ করেছে। কোথাও কোথাও আগুনও দিয়েছে।

······অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রাত থেকে ইংরেজ সরকার যে ক্লান্তিহীন নিপীড়ন চালাতে আরম্ভ করলেন, সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসীর পরে তা কিছুটা হ্রাস পেল। পুরা চার বছর নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালিয়েছে পুলিশ মিলিটারী চট্টগ্রামের হিন্দু নরনারীর ওপর। কিন্তু পর্যুদস্ত হয়েও তারা আপোষ-পন্থা ধরে নি। ক্যাপ্টেন ক্যামেরণকে হত্যা, পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ, স্পাই নেত্র সেনকে······হত্যা - প্রভৃতি কার্যাবলী বিপ্লবীদের মানসিক অনমনীয়তারই পরিচায়ক।·········

খান বাহাদুরের পরে ননীবাবু [১] আসেন। তাঁর জুলুম আরো মর্মান্তিক, আরো দুঃসহ।

রেজা খাঁ অপসারিত হল, কিন্তু উত্তর বাংলার ইজারা নিল দেবী সিং। ঠিক এর কিছুদিন আগেই আমি চিটাগাং কোর্টে জয়েন করেছি।·········মামলা ছিল, কিন্তু হাকিমরা আদায় ওয়াইজ এনগেজড্। সকাল থেকে তারা পিটুনি কর আদায় তহশীলে খুবই ব্যস্ত। স্বয়ং কমিশনার এসে সুপারভাইজ করছেন—একটি পাইপয়সাও যেন বাকি না থাকে। চিটাগাং-এর হিন্দু জনসাধারণের ওপর পিটুনি কর বসিয়ে দিয়েছেন ইংরেজ সরকার পাইকারী হারে। আর্মারী রেডের সমস্ত পলাতক আসামী না ধরা পর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশ এবং মিলিটারীর যাবতীয় খরচের টাকা আদায় করতে হবে হিন্দুদের পকেট থেকে। মাছের তেলে মাছ ভাজতে জানেন শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা।·········

অতএব আজকের দুপুরটা একটা কর্মহীন অবসরের দুপুর। জানালা দিয়ে অদূরবর্তী কর্ণফুলীর শোভা নিরীক্ষণ করছি। শীতের মলিন মধ্যাহ্নে নদীর পূর্ব পারের দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলগুলি অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে।

হঠাৎ তন্ময়তা ভেঙে গেল এক জাঁদরেল দারোগা সাহেবের ডাকে।

একে খানিকক্ষণ রাখুন তো কোর্টবাবু, এখখুনি আসছি ডি, আই, বি, অফিস থেকে কাগজপত্র নিয়ে—বলেই খট্‌খট্ করে চলে গেলেন।

---

[১] ননীবাবু নন, মণিবাবু [মণীন্দ্র দাশগুপ্ত]—সম্পাদক।

তাকিয়ে দেখি উদ্ভিন্নযৌবনা এক কিশোরী আমার খাঁকিপরিহিত দেহের পানে তাকিয়ে আছে।

সামনে চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলাম মেয়েটিকে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এসে অত্যন্ত সাবধানে চেয়ারে বসে অস্পষ্ট কাৎরাতে লাগল সে।

আপনার কি অসুখ করেছে? জিজ্ঞাসা করলাম।.........

উচ্ছ্বসিত কান্না চাপতে চাপতে নতমুখে মেয়েটি বলল,......আমাকে মেরে শরীরের জায়গায় বেজায়গায় জখম করে দিয়েছে।.........

কে মারল?

একটু মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিল, খাঁকি।

পুলিশ? উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

না, ঠিক পুলিশ নয়। আপনাদের গুর্খালী। তবে ডি, আই, বি, ইন্‌সপেক্টার ননী দাশগুপ্ত সঙ্গে ছিল। সেই তো দীপ্তিমেধার (১) বোন বলে সনাক্ত করল আমায়। তারপর কুত্তাটাকে লেলিয়ে দিয়ে এ্যাসল্ট করালো। কাওয়ার্ড! যেন ওর মা বোন নেই।.........

কি বলে ওঁর অপমানিত নারীত্বকে সান্ত্বনা দেব ভাষা পাচ্ছিলাম না খুঁজে। কিছুক্ষণ পরে ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করলেন না কেন?

কি যে বলেন! গর্জে উঠল গুলীবিদ্ধা ব্যাঘ্রীর মতো কিশোরী মেয়েটি, আপনাদের কুষ্ঠমুখো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই তো নালিশ করেছিলাম আজ সকালে। কিন্তু সে মুখপোড়া কি বলল জানেন? দ্যাটস্ নাথিং, অর্থাৎ একটা ভারতীয় নারীর ওপরে ব্রুটাল এ্যাসল্ট কিছু না ওর কাছে।......

[তেরো নম্বরে পাঁচ বছর : সা''দত আলি আখন্দ]

[২]

[আসানুল্লা হত্যাকে (৩১শে আগষ্ট, ১৯৩১) কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে দেখা গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী উন্মত্ততা। এই সম্পর্কে কলিকাতা টাউন হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামী-প্রদত্ত ভাষণের সারমর্ম এবং ঐ সভায় গৃহীত প্রস্তাব নিম্নে মুদ্রিত হল।—**সম্পাদক**]

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের ভাষণ :

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বলেন, তদন্তে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, হাঙ্গামা সাম্প্রদায়িক; কিন্তু সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দাঙ্গা সম্বন্ধে তদন্তের পর

[১] চট্টগ্রাম বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী দীপ্তিমেধা চৌধুরী।—সম্পাদক।

তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক নহে। সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী আর একটি পক্ষ। এই সম্পর্কে তিনি জোর দিয়া বলেন যে, চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই দাঙ্গার পিছনে ছিলেন।......এইরূপ একটি প্রকাশ্য সভায় তাঁহার নিন্দা করা হইল বলিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার [বক্তার] নামে মামলা করুন।......জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট চট্টগ্রামে এই হাঙ্গামা বাধাইবার জন্য কতকগুলি বেসরকারী ইউরোপীয়ানের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন।...... প্রকাশ্য দিবালোকে হাঙ্গামাকারীগণ চট্টগ্রামে দোকান ও বাড়ীগুলি লুঠ করিয়াছে; কিন্তু পুলিশ একজনকেও গ্রেপ্তার করে নাই এবং কাহারও সম্পত্তি উদ্ধার করা হয় নাই। সহরের কেন্দ্রস্থলে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে।··· **ইহা ভারতে ইউরোপীয়ানদের প্রথম নাভিশ্বাস।** চট্টগ্রামের গ্রামগুলিতে লোক সাধারণতঃ মাটির ঘরে বাস করে। সেগুলি নির্দ্দয়ভাবে বিনষ্ট, ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল ঘটনার পর সবাই বুঝিবে যে, চট্টগ্রামের সমস্ত আমলাতন্ত্র প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইয়াছিল।

তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর ভাষণ ঃ

আজ সংযতভাবে কথা বলা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী, তাহারাই জুলুম ও জবরদস্তি চালাইয়া এই দাঙ্গার অবতারণা করিয়াছে।

সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষণ ঃ

চট্টগ্রামে হিন্দু ও মুসলমান এতকাল সৌহার্দ্যসহকারে বাস করিয়া আসিতেছিল।...সেরূপ ক্ষেত্রে এই কাণ্ড ঘটিল কেন? তৃতীয় ব্যক্তির উদ্যমের ফলে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব ঃ

কলিকাতার নাগরিকদের এই সভার মতে ৩০শে ও ৩১শে আগষ্ট এবং ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে যে শোচনীয় ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব নহে। উহা কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী য়ুরোপীয়ান, পুলিশ এবং অন্যান্য স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের প্রচেষ্টার ফল। বঙ্গের কতকগুলি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা এবং য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশনের কতকগুলি সদস্য যে প্রতিহিংসার সমর্থন করিয়া আসিতেছেন, ইহার উৎপত্তি উহা হইতেই।

এই ঘটনা সম্বন্ধে কোন তদন্তের ব্যবস্থা না করার জন্য, কলিকাতার নাগরিকদের এই সভা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতেছে।

[দৈনিক বসুমতী]

[৩]

[চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা সম্পর্কে ১৯৩১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম পৌরসভার অধিবেশনে এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা পৌরসভাব বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিম্নে মুদ্রিত হল।—**সম্পাদক**]

চট্টগ্রাম পৌরসভার প্রস্তাব :

পৌর কমিশনার নলিনীকান্ত দাসের উত্থাপিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

This meeting places on record its deep sense of abhorrence at and strong condemnation of the outrages, loot, arson and burning of shops committed by the mob upon peaceful people at Chittagong town and expresses its sympathy with the sufferers.

[**The Calcutta Municipal Gazettee 19th Sept., 1931**]

কলিকাতা পৌরসভার প্রস্তাব :

অল্ডারম্যান শরৎচন্দ্র বসু-উত্থাপিত ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন-সমর্থিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

That the Corporation is of opinion that a Departmental enquiry by the Government into the outrages, loot and arson to which the people of Chittagong have been subjected is thoroughly unsatisfactory and cannot restore either peace in this Presidency or confidence in the Government.

That the Corporation reiterates its demand for a sifting enquiry as to the persons who are responsible for and the circumstances, direct and indirect, which have resulted in, the outrages at Chittagong and for that purpose, calls upon the Government to constitute an impartial and independent Enquiry Committee in which prominent public men should be given seats.

[**Supplement to the Calcutta Municipal Gazettee, 3rd Oct., 1931**]

কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা

ফেণী সংঘর্ষ [২২ শে এপ্রিল, ১৯৩০]

চট্টগ্রাম পুলিশ অস্ত্রাগার দখলের পর বিদ্রোহীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেন। অস্ত্রাগারটি পরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত হিমাংশু সেনের সর্বাঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হল। হিমাংশুকে গাড়ী করে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল (মাখন) সহরে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেন। তাঁরা ফিরে এসে পুলিশ লাইনে বিদ্রোহী বাহিনীর সাক্ষাৎ পেলেন না ; কারণ ইতিমধ্যে এই বাহিনী অদূরবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই তাঁরা আবার সহরে ফিরে এসে আত্মগোপন করে রইলেন। উভয়পক্ষ থেকে যোগাযোগের জন্য কয়েকদিন চেষ্টা হল ; কিন্তু সব বৃথা।

২২শে এপ্রিল রাত সাড়ে নয়টায় এই চারজন বিদ্রোহী দরিদ্র কৃষকের ছদ্মবেশে ভাটিয়ারী রেল ষ্টেশনে কলিকাতাগামী গাড়ীতে উঠলেন। তাঁদের দেখে সন্দেহ হল ষ্টেশনমাষ্টার অশ্বিনী ঘোষের। পুরস্কার ও পদোন্নতির স্বপ্ন তাঁর চোখে। তাই, যে সকল ষ্টেশনে গাড়ী থামে, সে সকল ষ্টেশনে জানিয়ে দিলেন তাঁর সন্দেহের কথা। জানিয়ে দিলেন ৪ জনের টিকেটের নম্বরও।

ফেণী ষ্টেশনে গাড়ী থামল রাত দু'টোয়। মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের কামরা ঘিরে ফেলল বিরাট পুলিশবাহিনী। টিকেট দেখে ঐ চারজনকে নিয়ে এল ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে প্রহরীবেষ্টিত গণেশ ঘোষ ঐ ঘরের বাইরে গিয়েছিলেন প্রাকৃতিক কারণে। এদিকে অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের দেহতল্লাসী সুরু হল। পুলিশ জীবন ঘোষালের দেহতল্লাসী সুরু করছে, এমন সময় অনন্ত সিংহের রিভলভার গর্জে উঠল—গুড়ুম্ গুড়ুম্। সঙ্গে সঙ্গে জীবন ঘোষাল এবং আনন্দ গুপ্তের রিভলভারও আগুন ছড়াল। গর্জে উঠল গণেশ ঘোষের রিভলভারও।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চারজন বিদ্রোহী ছাড়া ষ্টেশনের সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই সুযোগে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন বিদ্রোহীরা।

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে রেল-লাইনের উপরে মাখন ও আনন্দ এক জায়গায় মিলিত হন। রেললাইন ত্যাগ করে তাঁরা চলতে থাকেন বড় রাস্তা ধরে। অল্প সময়ের মধ্যে রাস্তার ধারে একটি বটগাছের তলায় গণেশ ঘোষের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়।

তিনজনের আবার যাত্রা সুরু। কোথাও সশস্ত্র পুলিশ, কোথাও সন্ধিগ্ধদৃষ্টি জনসাধারণ, সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার কষ্ট—অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এই সমস্ত বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে কলিকাতায় যুগান্তর দলের অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের আশ্রয়ে উপস্থিত হন।

এদিকে অনন্ত সিংহ একজন কালা, বোবা ও অর্ধপাগলের ভাণ করে বহু গ্রাম, মাঠ, পাহাড় ও বনজঙ্গল অতিক্রম করে উপস্থিত হন কুমিল্লা সহরে। সেখানে তিনি প্রখ্যাত জননেতা কামিনীকুমার দত্ত, বসন্তকুমার মজুমদার, কুমিল্লা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক মৌলভী মকেশ্বর রহমান ও মৌলভী এরাদুল্লার আশ্রয়ে থাকেন। কিছুদিন পরে এঁদের সহায়তায় তিনি কলিকাতায় এসে শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

ভূপেনদা চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের কলিকাতার উল্টাডাঙ্গা ও খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পরে ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় একটি আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা করে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সেখানে পঠিয়ে দেন।

কালারপোল যুদ্ধ [৬ই মে, ১৯৩০]

বিপ্লবীদের রক্তে রঞ্জিত জালালাবাদ পাহাড়। জীবিত সহবিপ্লবীরা এর প্রতিশোধ নেবেনই। এই বেপরোয়া বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী। ৫ই মে গ্রামের গুপ্ত আশ্রয়স্থান থেকে তাঁরা যাত্রা করলেন সহরের দিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। উদ্দেশ্য—কর্ণফুলী নদীর ব্যালেণ্টাইন ঘাটের অদূরে অবস্থিত ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে জালালাবাদের প্রতিশোধ নেবেন।

আক্রমণ সম্ভব হল না। সারা সহরে সশস্ত্রবাহিনী। তাই, উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক হল, গ্রামের গুপ্ত আস্তানায় ফিরে

যাবেন। ফিরিঙ্গিবাজার রাস্তা দিয়ে খানিকটা এলেই কর্ণফুলী নদী। সাম্পানে করে ওপারে যেতে হবে।

ফিরিঙ্গিবাজারে রজতদের বাড়ী। ঐ বাড়ীতে উঠে রজতের মা—সব বিপ্লবীর মা—বিনোদিনী দেবীকে প্রণাম জানাবেন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর বিপ্লবীরা তাঁর হাতের খাবারও খাবেন। খাবার তৈরী। এমন সময় রজতের ছোট ভাই এসে খবর দিল—পুলিশ আসছে।

খাওয়া হল না। মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন সবাই। নদীর ধারে এসে একটি সাম্পানে চড়লেন। বিপ্লবীদের আদেশে মাঝি সাম্পান চালাচ্ছে প্রাণপণ শক্তিতে। পেছনে খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার পরিচালনায় পুলিশবাহিনী একটি মোটর লঞ্চে করে অনুসরণ করছে এই সাম্পানকে। পুলিশবাহিনী বারবার হুকুম করছে—সাম্পান থামাও। বিপ্লবীরা সাম্পানের ছাউনীর ভিতর বসে রিভলভার উঁচিয়ে মাঝিকে আদেশ করছেন—জোরে চালাও। সাম্পান নদীর ধারে আসামাত্রই বিপ্লবীরা লাফিয়ে তীরে উঠে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে পুলিশের লঞ্চও এসে পড়ল নদীর ধারে। পুলিশবাহিনী পাড়ে উঠেই নিরীহ সরল গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার চালায়—গ্রামে ডাকাত পড়েছে, ধরতে পারলে পুরস্কার। প্রবল বাধার সম্মুখীন হলেন বিপ্লবীরা। একজন গ্রামবাসীর দা-এর আঘাতে দেবী গুপ্তের ডান হাতখানা কাঁধ থেকে প্রায়-বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে থাকে। কী অপরিসীম যন্ত্রণা! তবু মনোবল অক্ষুণ্ণ।

বিপ্লবীরা বারবার চেঁচিয়ে বললেন—আমরা ডাকাত নই, আমরা স্বদেশী, ইংরেজ আমাদের শত্রু। তোমরা আমাদের বাধা দিও না।

কথায় কাজ হল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুলী চালাতে বাধ্য হলেন বিপ্লবীরা। কয়েকজন গ্রামবাসী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তবুও সেই নিবিড় অন্ধকারে বিরাট জনতা পুরস্কারের লোভে বিপ্লবীদের অনুসরণ করতে থাকে।

একে অন্ধকার, তার উপর পথঘাট বিপ্লবীদের অজানা। ফণীন্দ্র নন্দী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। এক দেশপ্রেমিক কৃষকদম্পতি (মন্‌সর আলি ও তাঁর স্ত্রী) সস্নেহে আশ্রয় দেন তাঁকে; কিন্তু পরদিন তোরাব আলি নামক একজন লোক ফণীন্দ্রকে দেখতে পায় ঐ বাড়ীর মাচার নীচে। ফণীন্দ্র ধরা পড়েন।

অপর পাঁচজন কালারপোল সেতু পার হওয়ার সময় নিকটবর্তী ফাঁড়ির পুলিশ সুবোধ চৌধুরীকে অতর্কিতে ধরে ফেলে।

অবশিষ্ট চারজন এগিয়ে চললেন। তাঁরা ঢুকে পড়লেন জুলদা গ্রামে। প্রায় ভোর হয়ে এল। বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতেই তাঁরা দেখতে পেলেন এক মুসলমান বৃদ্ধা মহিলাকে। বিপ্লবীরা তাঁর কাছে চাইলেন দু'টি পান্তা-ভাত। মাতৃহৃদয় মমতায় উপচে পড়ে। তিনি বললেন, "তোমরা ঐ শনবনে আশ্রয় নাও। আমি পান্তাভাত নিয়ে আসছি।" গৃহস্বামী কিছু পান্তাভাত ও তরকারী পৌঁছে দিয়ে বললেন, পরে তাঁদের জন্য পেটভরে খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

ভোর হওয়ার পর আহমদ মিঞা নামক একজন গ্রামবাসী শনবনে বিপ্লবীদের দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠল, 'ওখানে ওরা লুকিয়ে রয়েছে।' শোনামাত্রই ডি. আই.জি. ফারমারের পরিচালনায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাঁদের ঘেরাও করে ফেলল। তাদের সামরিক কায়দায় এগিয়ে আসতে দেখে বিপ্লবীরা গুলীবর্ষণ সুরু করলেন। কিছুক্ষণ দু'পক্ষেই চলল অজস্র গুলীবর্ষণ। এর পর সব শান্ত। সঠিক অবস্থা জানবার জন্য সরকারপক্ষ উদ্‌গ্রীব। ফারমারের নির্দেশমত দারোগা হেম গুপ্ত চোঙা মুখে বিপ্লবীদের আত্মসমর্পণ করার আদেশ জানালেন। প্রত্যুত্তরে মনোরঞ্জনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করতে জানে না। আমি বালেশ্বর যুদ্ধের যতীন মুখার্জি হতে চাই।'

একজনকে বলতে শোনা গেল, 'আমরা প্রাণ থাকতে ধরা দেব না।' অপরজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'না, না, নিশ্চয়ই না। আমরা মরব, তবু ধরা দেব না।' রজতের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হল আরো কঠিন, আরো দৃপ্ত বাণী, 'মনা, স্বদেশ এইমাত্র মারা গেল। আমি দেবুকে গুলী করছি। সে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে, হাত নাড়তে পারছে না। আমি তাকে গুলী করছি—তুই আমাকে গুলী করবি, বুঝলি ?'

এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবুর কষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে রজত তাঁকে গুলী করেন। এরপর মনোরঞ্জন দু'বার বন্ধু রজতকে গুলী করলেন। পরে শেষ গুলীটি তিনি বসিয়ে দেন নিজের বুকে।

স্বদেশ, রজত ও মনোরঞ্জন চিরবিদায় নিলেন ; কিন্তু জুলদার রণপ্রাঙ্গণ তখনো স্তব্ধ হয় নি। দেবুর দেহে তখনো প্রাণ আছে—তাঁর নিঃশ্বাসের খুবই

কষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থায় হেম দারোগা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বড় সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁকে কি কিছু বলবেন?' তখন দেবুর দৃপ্তকণ্ঠের জিজ্ঞাসা, 'কে বড় সাহেব? লোম্যান? লোম্যান? আমার দু'টি হাতই অচল, নইলে আমি তাকে এক্ষুণি গুলী করতাম।' মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবীর এই শেষ মর্মবাণী। এরপর তাঁর জীবনাবসান।

চন্দননগর সংঘর্ষ [১ লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০]

উত্তর কলিকাতার 'মূকবধির বিদ্যালয়'-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুঁটুদি) ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কর্মচারী শ্রীশশধর আচার্য যুগান্তর দলের অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মী। বিপ্লবী নেতা শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের নির্দেশে তাঁরা চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় একটি বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অবস্থান করতে থাকেন।

১৯৩০ সালের মে মাসের মাঝামাঝি ভূপেনদা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষালকে গোন্দালপাড়ার আশ্রয়স্থানে পাঠিয়ে দেন; বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুবিধার জন্য ভূপেনদার নির্দেশে তরুণ বিপ্লবী হেমন্ত তরফদারও ঐ বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন। কয়েকদিনের মধ্যে ভূপেনদার চেষ্টায় চট্টগ্রামে আত্মগোপনকারী সূর্য সেনের সঙ্গে চন্দননগরে অবস্থানরত বিপ্লবীদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৮শে জুন অনন্ত সিংহ কলিকাতার প্রধান গোয়েন্দা দপ্তর ১৩নং লর্ড সিন্‌হা রোডে গিয়ে একান্তই ব্যক্তিগত কারণে আত্মসমর্পণ করেন। কিছুদিন পরে জালালাবাদ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক লোকনাথবলও মাষ্টারদা সূর্য সেনের কাছ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও নির্দেশ নিয়ে কলিকাতায় আসেন। এর মধ্যে ভূপেনদা গ্রেপ্তার হওয়ায় যুগান্তর দলের অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা কিরণচন্দ্র মুখার্জীর সহায়তায় তিনি চন্দননগরের আশ্রয়স্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন।

২৫শে আগষ্ট প্রকাশ্য দিবালোকে কলিকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে [বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ] কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর আক্রমণ, ঐ দিন ইডেন গার্ডেন পুলিশ ফাঁড়িতে বোমানিক্ষেপ, ২৯শে আগষ্ট বিপ্লবীরা গুলী করে ঢাকায় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা ও ঢাকার পুলিশপ্রধান হাডসনকে আহত করেন।

এই সমস্ত বিপ্লবী কার্যকলাপের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে জেলে বন্দী করে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। এই সময়ে জেলে বন্দী একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি চন্দননগরের আশ্রয়স্থলের কথা পুলিশের কাছে প্রকাশ করে দেয়। ঐ লোকটিই ৩১ শে আগষ্ট সন্ধ্যার অন্ধকারে পুলিশকে ঐ বাড়ীটি দেখিয়ে দেয়।

৩১ শে আগষ্ট রাত্রি প্রায় ২টার সময় পুলিশ কমিশনার টেগার্টের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশবাহিনী ঐ বাড়ী ঘেরাও করে। তারপর বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশবাহিনীর যে সংঘর্ষ হয়, বিপ্লবী আনন্দ গুপ্ত তার নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন:

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল—বন্দীজীবনের প্রথম দিন। ... চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রায় সাড়ে চার মাস পরে ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর উপস্থিত হল...অগ্নিপরীক্ষার দিন, ফরাসী চন্দননগরে। ভোর হবার তখনও দু'তিন ঘণ্টা বাকি, রাত্রির অস্পষ্টতা ঘোচে নি, এমন সময় কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবের [কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার] নেতৃত্বে বাছা বাছা গোরা সার্জেণ্টদের এক বিরাট বাহিনী চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় যে বাসায় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম সে বাসাটি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো। নিষ্ক্রমণের কোন পথ বা উপায় ছিল না। সুপরিকল্পিত নির্দেশ অনুযায়ী সুদক্ষ সার্জেণ্ট বাহিনী তাদের লৌহবেষ্টনীতে এতটুকু ফাঁক রাখে নি।

আমরা কিছুদিন আগে থেকেই রাত্রিতে পালা করে ছাদের ওপর থেকে পাহারা দিতাম, কারণ, চারিদিকের অবস্থা তখন ক্রমশই ঘোরাল হয়ে উঠেছিল। সে রাত্রেও যথারীতি ছাদ থেকে বাইরের দু'দিককার রাস্তার উপর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ আমাদের নজর পড়ল অস্পষ্ট মূর্তি, মাথায় হেলমেট—ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের বাসার দিকে এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ আমরা প্রস্তুত হয়ে তড়িৎগতিতে নেমে এলাম দোতলা থেকে একতলায়, উদ্দেশ্য—পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

কিন্তু প্রথম থেকেই সশস্ত্র সার্জেণ্টবাহিনী বাসার পশ্চাদ্দিককার পাঁচিলের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে নিষ্ক্রমণের সামান্যতম পথও আগলে বসেছিল—ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন থাকে শিকারের অপেক্ষায়। খিড়কির দুয়ার দিয়ে বেরুতে না বেরুতেই একসঙ্গে গর্জে উঠলো শত্রুপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো এবং সেই সঙ্গে জ্বলে উঠলো অনেকগুলো টর্চ আমাদের লক্ষ্য করে। তীব্র

আলোর রেখা কেন্দ্রীভূত হল আমাদের উপর আর সেই আলোকোজ্জ্বল দেহগুলোকে লক্ষ্য করে বর্ষিত হতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী……।

আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও অবশ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিল না, কিন্তু শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি দেহ পাঁচিলের আড়ালে এরূপ সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল এবং এতগুলো টর্চের তীব্র আলো আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে এতটা বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল যে, আমাদের রিভলভার ও পিস্তলনির্গত গুলী কোথায় লাগছে বা না লাগছে তা সঠিক দেখার বা জানার কোন উপায় ছিল না—তা' ছাড়া গুলীর রসদও আমাদের ছিল যৎসামান্য।

বেশীক্ষণ এই অসমান যুদ্ধ স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না।……… একদিকে বিপুল পুলিশবাহিনী অপরদিকে আমরা চারজন—গণেশ দা, লোকনাথ বল, জীবন ঘোষাল ও আমি।…… অল্প কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জীবন ঘোষালের মাথায়, বুকে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে এক ঝাঁক গুলী এসে লাগলো এবং সেই মুহূর্তে তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল পাশের পুকুরে, তলিয়ে গেল জলের ভিতর।

……যেভাবে চারিদিক থেকে গুলীবৃষ্টি হচ্ছিল তাতে আমাদের কারুরই অক্ষত থাকার কথা নয়, কিন্তু সবগুলো বেছে বেছে যেন জীবনের দেহেই আশ্রয় নিল। মাত্র একটা গুলী এসে লাগলো আমার বাঁ পায়ে, আর বাকী দু'জন যে শেষপর্যন্ত অক্ষত ছিলেন, তা' সত্যি অদ্ভুত বলতে হবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন বিরাট ঝড় বয়ে গেল ……… কিছুক্ষণ আগেও ছিলাম মুক্ত, বন্ধনহীন, পুলিশ প্রভুদের ফাঁকি দিয়ে; কিন্তু হঠাৎ সেই কর্মবহুল ও গতিবহুল জীবনের সমাপ্তি ঘটল— শুরু হল কঠোর বন্দীজীবনের ……।

…… বন্দী ছিলাম আমরা মোট ছ'জন— উপরোক্ত চারজন ও শ্রীযুক্ত শশধর আচার্য এবং শ্রীযুক্তা সুহাসিনী গাঙ্গুলী, যিনি আমাদের সবার দিদির মত ছিলেন……।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে এই কয়জনের উপর চলল অবিরাম নির্যাতন—বীভৎস, অমানুষিক নির্যাতন, হাতের ব্যাটন থেকে আরম্ভ করে পায়ের বুট ও রাইফেলের কুঁদো—সব কিছুরই সুপ্রচুর প্রয়োগ হল আমাদের শৃঙ্খলিত দেহের উপর।

এমন কি সুহাসিনীদিও রেহাই পান নি সেই নিষ্ঠুর নির্যাতনের হাত থেকে। তাঁর দেহের উপরও চড়, ঘুষি, ব্যাটনের ঘা, বুটের লাথি—এর কিছুই বাদ যায় নি!………

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে পুলিশের এই বীরত্বলীলা শেষ হবার পর আমাদের টেনে উঠানো হল পুলিশভ্যানে—হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি। ভ্যানগুলো আমাদের নিয়ে হাজির হল চন্দননগরের পাব্লিক প্রসিকিউটারের অ্যাফিসে। ····· চন্দননগর থেকে মোটরযোগে পুলিশপরিবেষ্টিত অবস্থায় আমরা দু'জন উপস্থিত হলাম হুগলী জেলে·· ···পরদিন সকাল হতেই আবার মোটরে চাপিয়ে আমাদের তিনজনকে (গণেশদা, লোকনাথ বল ও আমি) নিয়ে হাজির করা হল কলকাতার বিখ্যাত লালবাজার থানায়।······আমাদের তিনজনকে তিনটি আলাদা সেলে ঢোকানো হল।······

পরদিন ভোর হতে না হতেই একদল সার্জেন্ট ও তাদের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী খুব তাড়াহুড়ো করে আমাদের জেল থেকে বার করে হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বেঁধে আবার ভর্তি করলো পুলিশভ্যানে।·· ··

যথাসময়ে আমাদের ভ্যান এসে উপস্থিত হল শেয়ালদা ষ্টেশনে।····

আমাদের নিয়ে ওঠানো হল একটি বড় প্রথম শ্রেণীর কামরায়, এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠল চারজন সার্জেন্ট, একজন উর্ধ্বতন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী, একদল গাড়োয়ালি মিলিটারী পুলিশ ও তাদের হাবিলদার। যথাসময়ে গোয়ালন্দগামী ট্রেন ছাড়ল—ফিরে চললাম আমাদেব প্রিয় চট্টগ্রামে বন্দীঅবস্থায়।

ধলঘাট যুদ্ধ [১৩ই জুন, ১৯৩২]

চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাট গ্রাম। সাবিত্রী দেবীর বাড়ী। সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন (ভোলা) সেখানে আত্মগোপন করে আছেন। মাষ্টারদা সূর্য সেনের নির্দেশে নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১২ই জুন সেই বাড়ীতে এসেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে সূর্য সেন নীচে ছিলেন। ছাদে ছিলেন নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতা। অপূর্বর জ্বর।

শোনা গেল, দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দেওয়ার আওয়াজ। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, সেনাবাহিনী এসেছে। সূর্য সেন দ্রুতবেগে বাঁশের মই বেয়ে উপরে উঠে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনকে তা জানাবামাত্রই তাঁরা রিভলভার হাতে বাইরের সিঁড়ির মুখে এগিয়ে গেলেন। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন দেখলেন, সেনাবাহিনীর একজন উপরে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে নির্মল

সেনের রিভলভার গর্জন করে উঠল। নিহত ক্যাপ্টেন ক্যামারণ নীচে গড়িয়ে পড়ল।

এই গুলীর শব্দ শোনামাত্রই চারদিক থেকে সেনাবাহিনী ঐ ছাদ লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে সুরু করল। বিপ্লবীরাও মাঝে মাঝে গুলী ছুঁড়ছিলেন

সূর্য সেনকে বাঁচাতে হবে। তিনি ধরা পড়লে বা মারা গেলে সংগ্রামের ক্ষতি হবে অপূরণীয়! তাই নির্মল সেন সূর্য সেনকে বললেন, তিনি যেন অপূর্ব ও প্রীতিলতাকে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। হঠাৎ একটি গুলী এসে লাগে নির্মল সেনের গায়ে। তিনি বুঝলেন, তাঁর আঘাত মারাত্মক, মৃত্যু আসন্ন। তাই মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবী নেতা পুনরায় ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে মাষ্টারদাকে বললেন, তিনি যেন অপূর্ব ও প্রীতিলতাকে নিয়ে বাড়ীর পেছনের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলে যান। নির্মল সেন নিজে বাড়ীর সামনের দিকে গুলী চালিয়ে সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করে ব্যস্ত রাখবেন।

সূর্য সেনের চিন্তা-ভাবনার নিত্যসহচর, প্রচারবিমুখ নির্মল সেনকে ছেড়ে আসতে তাঁর মন চাইছিল না। তবু ছেড়ে যেতে হবে। বিপ্লবী কর্তব্য কঠোর। সূর্য সেন বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্রীতিলতা ও অপূর্বকে সঙ্গে নিয়ে। একটু পরে আর একটি গুলী এসে নির্মল সেনকে আঘাত করে মারাত্মকভাবে। কেবল 'উঃ! মাষ্টারদা চললাম। রাণী, (১) বিদায়' বলে বিপ্লবী নেতার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল চিরকালের মত। মাষ্টারদা ও অপূর্ব উঠানের শেষপ্রান্তে সুপারিপাতার বেড়া সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সামান্য আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত একটি গুলী এসে পড়ল অপূর্বর বুকে। অপূর্বও বরণ করলেন শহীদের মৃত্যু।

আবার আর একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য। মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা অপূর্বকে শেষবারের মত দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন। এসে পৌঁছলেন বিপ্লবী মণি দত্তের বাসায়। গভীর নিশীথে মণি দত্তের সাহায্যে তাঁরা প্রায় চার মাইল জলভরা মাঠ, ডোবা ও ঝোপঝাড় অতিক্রম করে উপস্থিত হন জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামের গোপন আশ্রয়স্থল কবিরাজ অশ্বিনী দের বাড়ীতে [সাংকেতিক নাম 'কুটির']।

---

[১] বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ডাকনাম।—সম্পাদক।

চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জী

১। চটগ্রামে কারাবরণ :

জরীপকার্যে বাধাসৃষ্টির অপরাধে গুয়াতলীর প্যারীমোহন চৌধুরীর কারাবরণ — ১৮৩৭

একই অপরাধে আনোয়ারার ডাঃ রামকিষ্ণ দত্তের কারাবরণ — ১৮৪৭

২। প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও চট্টগ্রাম :

১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের (বিদেশীর নামকরণ 'সিপাহী-বিদ্রোহ') সময় হাবিলদার রজব আলি খাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীদের দ্বারা সরকারী কোষাগার থেকে তিনলক্ষ টাকা হস্তগত, জেলখানা থেকে কয়েদীদের মুক্তিদান ও অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ — ২৩শে নভেম্বর, ১৮৫৭

৩। ইনকাম ট্যাক্সের প্রতিবাদে :

নবপ্রবর্তিত ইন্‌কাম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে জন-সাধারণের পক্ষে প্রতিবাদ-লিপি লেখার অপরাধে ধলঘাটের স্বাধীনচেতা উকিল দুর্গাদাস দস্তিদারের ১ মাসের জন্য কারাবরণ — ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২

৪। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চট্টগ্রাম গমন এবং বঙ্গভঙ্গ ও দেশবাসীর কর্তব্য বিষয়ে উদ্দীপনা-পূর্ণ ভাষণ — ১৭ই জুন, ১৯০৭

৫। চট্টগ্রামের সদরঘাট ২নং নালাপাড়া গলির প্রবেশপথে গোয়েন্দা সন্দেহে সত্যেন সেনকে হত্যা — জুলাই, ১৯১২

৬। মৌলানা শওকত আলির চট্টগ্রাম গমন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ — সেপ্টেম্বর, ১৯২০

৭।	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চট্টগ্রাম গমন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে ভাষণ	১৪ই মার্চ, ১৯২১
৮।	বিপ্লবী প্রেমানন্দ দত্তকর্তৃক পুলিশ অফিসার প্রফুল্ল রায়কে হত্যা	২৫শে মে, ১৯২৪
৯।	পরৈকোড়া ডাকাতি	আগষ্ট, ১৯২৩
১০।	আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অর্থ লুণ্ঠন	১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৩
১১।	ময়নাগঞ্জে অন্তরীণঅবস্থায় বিপ্লবীনেতা অনুরূপচন্দ্র সেনের জীবনাবসান	৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৮
১২।	বিপ্লবীকর্মী সুখেন্দুবিকাশ দত্ত একদল গুণ্ডার ছুরিকাঘাতে চট্টগ্রাম সহরে গুরুতর আহত,	২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯
	কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে [বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল] ভর্তি	৯ই অক্টোবর, ১৯২৯
	এবং সেখানে তাঁর জীবনাবসান	২৭শে অক্টোবর, ১৯২৯
১৩।	চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহ :	১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০
	(ক) পুলিশ লাইন অস্ত্রাগার অধিকার	রাত্রি ১০-১৫ মিঃ
	(খ) অক্সিলিয়ারী ফোর্সের হেডকোয়ার্টার্স অধিকার	
	(গ) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ভবন অধিকার ও সমস্ত যন্ত্রপাতির ধ্বংসসাধন	
	(ঘ) চট্টগ্রাম সহর থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরবর্তী ধূম ও জোরারগঞ্জ ষ্টেশনগুলির মধ্যবর্তী রেললাইন উৎপাটন	
১৪।	অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন : রাষ্ট্রপতি সূর্য সেনের ঘোষণা [১৭-এর পাতা দেখুন]	১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০
১৫।	জালালাবাদ যুদ্ধ [৪-এর পাতা দেখুন]	২২শে এপ্রিল, ১৯৩০
১৬।	ফেণী সংঘর্ষ : ফেণী ষ্টেশনে পুলিশের সঙ্গে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষালের (মাখন) সংঘর্ষ [৩১১-এর পাতা দেখুন]	২২শে এপ্রিল, ১৯৩০

১৭।	কালারপোল যুদ্ধ : মনোরঞ্জন সেন, রজত সেন, স্বদেশ রায় ও দেবপ্রসাদ গুপ্তের মৃত্যুবরণ। সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী গ্রেপ্তার [৩১২-এর পাতা দেখুন]	৬ই মে, ১৯৩০
১৮।	গোয়েন্দাবিভাগের হেড কোয়ার্টার্স ইলিসিয়াম রো-তে অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণ	২৮শে জুন, ১৯৩০
১৯।	চন্দননগর যুদ্ধ : গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত গ্রেপ্তার। জীবন ঘোষালের [মাখন] মৃত্যুবরণ [৩১৫-এর পাতা দেখুন]	১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০
২০।	অম্বিকা চক্রবর্তী গ্রেপ্তার :	৯ই অক্টোবর, ১৯৩০
২১।	বাংলা পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল ক্রেগ মনে করে ভুলক্রমে রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জীকে চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে হত্যা	১লা ডিসেম্বর, ১৯৩০
২২।	চাঁদপুরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় রিভলভার, কার্তুজ ও বোমাসহ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী গ্রেপ্তার	২রা ডিসেম্বর, ১৯৩০
২৩।	চট্টগ্রাম জেলের অভ্যন্তরে বিপ্লবী বন্দীদের বাসস্থানের কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি	৬ই মে, ১৯৩১
২৪।	চট্টগ্রাম আদালতের নিকটস্থ ভূগর্ভে ডিনামাইট আবিষ্কার	৩রা জুন, ১৯৩১
২৫।	চট্টগ্রামের দেওয়ান বাজারের একটি বাড়ীতে কার্তুজ, দুই বাক্স বিস্ফোরক, এসিড ও কতকগুলি বৈদ্যুতিক তার প্রাপ্তি	১৮ই জুন, ১৯৩১
২৬।	আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসীর মঞ্চে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মৃত্যুবরণ	৩রা আগষ্ট, ১৯৩১
২৭।	গোয়েন্দা ইন্সপেক্টার খান বাহাদুর আসানুল্লাকে চট্টগ্রাম নিজাম পল্টন মাঠে হরিপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক হত্যা	৩০শে আগষ্ট, ১৯৩১
২৮।	সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক কর্তৃক ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্ণোকে হত্যা	২৮শে অক্টোবর, ১৯৩১

২৯। ধলঘাট যুদ্ধ: নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃত্যুবরণ [২৭৮ ও ৩১৮-এর পাতা দেখুন] — ১৩ই জুন, ১৯৩২

৩০। শৈলেশ রায় কর্তৃক কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ প্রধান এলিসনকে হত্যা — ২৯শে জুলাই, ১৯৩২

৩১। চট্টগ্রাম পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ: বহু ইউরোপীয়ান হতাহত। বিপ্লবী নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ — ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

৩২। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন গ্রেপ্তার — ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩

৩৩। গহিরা যুদ্ধ: বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদারের মৃত্যুবরণ। প্রসন্ন তালুকদার আহত। তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত ও সুধীন দাশ গ্রেপ্তার [১০৭-এর পাতা দেখুন] — ১৯শে মে, ১৯৩৩

৩৪। পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে চট্টগ্রামের পুলিশ প্রধান ক্লিয়ারী ও শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের উপর আক্রমণ: বিপ্লবী নিত্যগোপাল সেন ও হিমাংশু ভট্টাচার্যের ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ। বিপ্লবী কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তী গ্রেপ্তার — ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪

৩৫। কিরণ সেন ও খোকা নন্দী কর্তৃক নেত্র সেন হত্যা — ৯ই জানুয়ারী, ১৯৩৪

৩৬। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসীর মঞ্চে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃত্যুবরণ — ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪

৩৭। মেদিনীপুর জেলে ফাঁসীর মঞ্চে কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তীর মৃত্যুবরণ — ৫ই জুন, ১৯৩৪

স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ বীরবৃন্দ

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রামের দোহাজারী—দেওয়ানহাটে পুলিশের গুলীতে মৃত্যু [১৯২১]

মাহ্‌মুদুর রহমান।

ফাঁসীর মঞ্চে :

১। প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী—দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলের মধ্যে স্পেশ্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার অপরাধে ১৯২৬ সালের ২৭শে আগষ্ট আলিপুর জেলে ফাঁসী হয়।

২। সূর্য সেন [মাষ্টারদা]
৩। তারকেশ্বর দস্তিদার [ফুটুদা]
— ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসী হয়।

৪। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস—ডি. আই. জি. ক্রেগ মনে করে রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জীকে চাঁদপুর ষ্টেশনে হত্যার অপরাধে ১৯৩১ সালের ৩রা আগষ্ট আলিপুর জেলে ফাঁসী হয়।

৫। কৃষ্ণ চৌধুরী
৬। হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
— ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রামে ক্রিকেট খেলার মাঠে শ্বেতাঙ্গদের উপর আক্রমণের অপরাধে মেদিনীপুর জেলে ৫ই জুন ফাঁসী হয়।

৭। রোহিণী বড়ুয়া—ফরিদপুরের একটি গ্রামে অন্তরীণ অবস্থায় গোয়ালন্দ থানার ও. সি. এরসাদ আলির দুর্ব্যবহারে অতীষ্ট হয়ে ১৯৩৫ সালের ১৫ই জুন থানার ভিতর রোহিণী ঐ অফিসারকে কুপিয়ে হত্যা করেন। ১৮ই ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলে তাঁর ফাঁসী হয়।

৮। নিরঞ্জন বড়ুয়া—১৯৪২ সালের নৌ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করায় ১৯৪৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ জেলে ফাঁসী হয়।

অস্ত্রাগার দখলের পর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু [২১শে এপ্রিল, ১৯৩০]

হিমাংশু সেন [আশু]

জালালাবাদ যুদ্ধের শহীদ [২২শে এপ্রিল, ১৯৩০]

বিধু ভট্টাচার্য, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ, প্রভাস বল, হরিগোপাল বল [টেগ্‌রা], নির্মল লালা, জিতেন্দ্র দাশগুপ্ত, শশাঙ্ক দত্ত, মতি কানুনগো, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার।

আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মহত্যা [২৪শে এপ্রিল, ১৯৩০]

অমরেন্দ্র নন্দী

কালারপোল খণ্ডযুদ্ধের শহীদ [৬ই মে, ১৯৩০]

স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত

চন্দননগর খণ্ডযুদ্ধের শহীদ [১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০]

জীবন ঘোষাল [মাখন]

গুলীচালনা শিক্ষার সময় একজন সহবিপ্লবীর অনবধানতায় গুলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু [২রা আগষ্ট, ১৯৩১]

সুকুমার কানুনগো

আসানুল্লাহ হত্যার পর নিজ বাড়ীতে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদ করার জন্য পুলিশের গুলীতে নিহত [১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩১]

রজনী সেন

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের ব্যর্থচেষ্টায় আত্মহত্যা [মার্চ, ১৯৩২]

শৈলেশ্বর চক্রবর্তী

ধলঘাট যুদ্ধের শহীদ [১৩ই জুন, ১৯৩২]

নির্মল সেন, অপূর্ব সেন [ভোলা]

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের অব্যবহিত পরে আত্মাহুতি [২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২]

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

গহিরা যুদ্ধের শহীদ [১৯শে মে, ১৯৩৩]

মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, পূর্ণ তালুকদার

ক্রিকেট খেলার মাঠে শ্বেতাঙ্গদের উপর আক্রমণকালে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে নিহত [৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪]

নিত্যগোপাল সেন, হিমাংশু ভট্টাচার্য

বর্মায় আত্মগোপন অবস্থায় মৃত্যু [১৯৪২]

হরিপদ মহাজন

কিশোর বিপ্লবীদের রিভলভার- চালনা শিক্ষা দেবার সময় একজন সহ-বিপ্লবীর অনবধানতায় গুলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু

বীরেন দে

পুলিশের অত্যাচারে মৃত্যু

পয়োজকান্তি চৌধুরী

অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু

অনুরূপ সেন, ফণিভূষণ ভট্টাচার্য,

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত [রাঁচি, ২২শে জুলাই, ১৯৩৩]

কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালীন মৃত্যু

ফণীন্দ্র নন্দী, অশ্বিনী গুহ, ননী ভট্টাচার্য, প্রবোধ মজুমদার, সুরেশ বণিক, নীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্র চৌধুরী, দীনেশ ধুম, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্র বড়ুয়া, সহায়সম্পদ চৌধুরী, মহেন্দ্র বিশ্বাস, হেম ভট্টাচার্য (ভাটিখাইন), রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহেশ বড়ুয়া (১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী রাজসাহী জেলে মৃত্যুবরণ)।

চট্টগ্রামের ফেরারী বিপ্লবীদের যাঁরা আশ্রয় দিয়েছিলেন

[চট্টগ্রামের ফেরারী বিপ্লবীদের যাঁরা আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হল। বলা বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়।—**সম্পাদক**]

চট্টগ্রাম

আনোয়ারা—'পঞ্চপাণ্ডব' ও 'মহিষবাড়ী' আশ্রয় [গৃহস্বামীদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি]

উত্তরভূর্ষী—'কলসীনাচন' আশ্রয় [গৃহস্বামীর নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি], তেজেন্দ্র সেনচৌধুরী, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, মাষ্টার মহাশয় [নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি] ও সাধন [দে ?]

কধুরখিল—তারাচরণ দত্ত, দ্বারিকা দে, নীরদ চৌধুরী, বিমল দাস, মহেন্দ্র বিশ্বাস [এঁর বাড়ীর সাংকেতিক নাম 'বকুলকুটির'], শান্তি সেন, সারদা কবিরাজ, সুবোধ চৌধুরী ও হিমাংশু চৌধুরী।

কড়লডেঙ্গা—আবদুল হক, কামালুদ্দিন ও শিবচরণ দাস।

কাট্টলী—অপর্ণা চক্রবর্তী, জগবন্ধু মজুমদার, দীনবন্ধু মজুমদার, প্রফুল্ল দাস, শান্তি চক্রবর্তী ও যোগেশচন্দ্র মজুমদার [শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা এঁর বাড়ী থেকে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য যাত্রা করেন। বিফল হয়ে ফিরে আসার পর অনুতাপে শৈলেশ্বর এই বাড়িতেই আত্মহত্যা করেন। কয়েক মাস পরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা এই বাড়ী থেকে ঐ ক্লাব আক্রমণের জন্য যাত্রা করেন।]

কাতালগঞ্জ—সুভাষিণীবালা রায় [জমিদার সুরেন্দ্রবিজয় রায়ের স্ত্রী।]

কানুনগোপাড়া—অমরেন্দ্রনাথ কানুনগো, জগদীশ ভট্টাচার্য, জগবন্ধু দে, দীনবন্ধু সর্ববিদ্যা, ধীরেন্দ্রলাল দে, ননীগোপাল সেন, নবচন্দ্র দে, ডাঃ নীরদবরণ দত্ত, বিনোদ বল, মতিলাল চক্রবর্তী, মহেশ মাঝি, রেবতীরমণ গুহ, লালমোহন চক্রবর্তী, শরৎ দে, শশধর চক্রবর্তী, শিশিরবিন্দু দত্ত, হরিপদ কানুনগো, হৃদয়রঞ্জন চৌধুরী, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী [এঁর বাড়ীতে তরুণ বিপ্লবী সুকুমার

কানুনগো অনবধানতাবশতঃ সহকর্মীর গুলীতে নিহত হন] ও শচীন্দ্রনাথ গুহ। এঁর বাড়ীর সাংকেতিক নাম 'শেলীর বাড়ী' ও 'কংগ্রেস অফিস']

কালারপোল—মনসর আলী [কালারপোল যুদ্ধের পূর্বে ফণীন্দ্র নন্দী সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ চাষী মনসর আলী ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে আশ্রয় দেন। এক গ্রামবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় ফণীন্দ্র গ্রেপ্তার হন।

কাশীয়াইস—মধু চক্রবর্তী, মণীন্দ্র জমিদার, সুরেন্দ্র চক্রবর্তী [কাব্যতীর্থ] ও রণেশ দাশ।

কুমিরা—অনিল রায়, মানদাসুন্দরী মিত্র, সুবোধ বিশ্বাস ও হরেন রায়।

কোয়েপাড়া—অমর সেন, কমনীয় দাস, নরেন্দ্র দাস, পরিমল দাশগুপ্ত, বিনয় সেন, ভূপেন্দ্র দাস, যামিনী দে, রামকৃষ্ণ সেন, সুরেশ্বর চক্রবর্তী ও বিনোদিনী দাশগুপ্তা [জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক ও ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নো-হত্যাকারী সরোজ গুহের মাসীমা।]

খরন্দীপ—গোপাল দত্ত, নির্মলকান্তি দত্ত, রবীন্দ্র দত্ত, রাখাল দত্ত, সুকুমার গুপ্ত, সুকুমার দত্ত ও সুখেন্দু দস্তিদার।

গহিরা [আনোয়ারা থানা]—পূর্ণ তালুকদার [এই আশ্রয়স্থানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের পর তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত [যোশী] ও সুধীন দাশ ধৃত হন এবং তরুণ বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার শহীদ হন।]

গহিরা [হাটহাজারী থানা]—অনুশীলন দলের বিশিষ্ট কর্মী প্রবীণ বড়ুয়ার বোন [নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।]

গুয়াতলী—জ্যোৎস্না চৌধুরী, পরিমল চৌধুরী, প্রতাপ চৌধুরী ও সুখেন্দু চৌধুরী [উকিল]

গোপীনাথপুর [দুর্গাপুর]—সুধীর সিংহ।

গৈরলা—অজিত ঘোষ, কামিনী ঘোষ, হরি কবিরাজ ও ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস [সেনাবাহিনী এই আশ্রয়স্থান ঘেরাও করলে সূর্য সেন ও ব্রজেন সেন পালিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত হন। কল্পনা দত্ত, মণি দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত ও শান্তি চক্রবর্তী সূর্য সেনের নির্দেশে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।]

ঘাটচেক [রাঙ্গুনিয়া]—বৌদ্ধমন্দির।

চক্রশালা—অন্নদা চৌধুরী, নীরেন্দ্র বিশ্বাস, প্রভাত চৌধুরী, হরকিশোর চৌধুরী, গগন পোদ্দার [এই আশ্রয়স্থানে তরুণ বিপ্লবী বীরেন দে-র মৃত্যু হয়], কবিরাজ সতীশ চৌধুরী [অম্বিকা চক্রবর্তী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে এই আশ্রয়স্থানে চিকিৎসিত হয়ে সুস্থ হন] ও হরিশ হোড় [অম্বিকা চক্রবর্তী এই বাড়ীতে ধৃত হন।]

চট্টগ্রাম সহর—রায়সাহেব কামিনীকুমার ঘোষের বাড়ী।

ছনদণ্ডী—দেবেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, এঁর বাড়ীর উত্তর-পূর্ব দিকের বাড়ী [গৃহস্বামীর নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি], ফণীন্দ্র দাশগুপ্ত, চারুবালা দাশগুপ্ত ও নিরুপমা দাশগুপ্তা, [গহিরা যুদ্ধের শহীদ মনোরঞ্জন দাশগুপ্তের মা ও কাকীমা।]

ছনহরা—অনিল সেন ও বীরেন্দ্র দত্ত।

জোয়ারগঞ্জ—হরেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র ও নরেন্দ্র ভৌমিক [এঁদের সাংকেতিক নাম Red Brothers.]

জোয়ারা—সঞ্জীব বড়ুয়া।

জ্যৈষ্ঠপুরা—অনন্ত চক্রবর্তী, আশুতোষ শর্মা, ভগবান দেব, সুশীল সেন, হরিপদ দেব, কালিপদ দেব, কবিরাজ অশ্বিনী দে [বাড়ীর সাংকেতিক নাম 'কুটির'] ও সুখেন্দু চক্রবর্তী [তারকেশ্বর দস্তিদার টাইফয়েডে আক্রান্ত হলে এই আশ্রয়স্থানে চিকিৎসিত হয়ে সুস্থ হন।]

তুলাতলী—ব্রজেন দে।

দুর্গাপুর—চন্দ্রবাসী দেবী [বাঞ্ছার মা], তারাশংকর ভট্টাচার্য [প্রধান শিক্ষক, দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়], বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, [প্রায় ১২ বৎসর আত্ম-গোপনের পর জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক বিনোদ দত্ত ১৯৪২ সালে এঁর বাড়ীতে গ্রেপ্তার হন], রতন ভৌমিক ও রাজলক্ষ্মী [পদবী ?]

দেওয়ানপুর—নিকুঞ্জ ধর।

ধলঘাট—বিপ্লবী শচীন দাশের মা [নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি], শশাঙ্ক মোহন দাশ [এই আশ্রয়স্থানে জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক বনবিহারী দত্ত ধৃত হন] ও সাবিত্রী দেবী [এই আশ্রয়স্থানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। নির্মল সেনের গুলীতে ক্যাপ্টেন ক্যামারণ নিহত হয়। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার নির্মল সেনের অনুরোধে পালিয়ে যান। সাবিত্রী ও তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর ৪ বৎসর কারাদণ্ড হয়। মেদিনীপুর জেলে রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।]

ধোরলা—ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, মাধব ভট্টাচার্য [গোলা], সারদা শীল, সুশীল দে ও সৌদামিনী সেন [জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক বিজয়কৃষ্ণ সেনের মা]।

নবাবপুর—বিপিনচন্দ্র দাশগুপ্ত ও চিন্তাসুন্দরী দেবী।

নয়াপাড়া—কমল সেন [সূর্য সেনের সহোদর ভ্রাতা] চন্দ্রকুমার সেন [সূর্য সেনের জ্যেঠতুতো দাদা], পুলিন বড়ুয়া ও রাতুল রায় [উকিল]।

নয়াপাড়া [গরুচি]—তেজেন্দ্র দত্ত।

নয়াপাড়া [চাঁদ রায়চৌধুরী পাড়া]—পরিমলকান্তি সেন, বনলতা সেন ও মতিলাল সেন।

নয়াপাড়া [ঝিকুটী]—অশ্বিনীকুমার দাশ, নবীনচন্দ্র বহর্দার, প্রাণহরি দাশ, সীতাসুন্দরী দাশ, যোগেন্দ্রলাল দাশ ও হরিনারায়ণ দাশ।

নয়াপাড়া [রক্ষিতপাড়া]—সুরেন্দ্রলাল রক্ষিত।

পটিয়াকোড়া—কামিনীকুমার চৌধুরী [বাড়ীর সাংকেতিক নাম 'স্যানিটোরিয়াম'], নিরঞ্জন চক্রবর্তীর শাশুড়ী [বাড়ীর সাংকেতিক নাম 'দিদিমণির আশ্রয়কেন্দ্র'], বিদ্যুল্লতা রায় [জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক দ্বিজেন্দ্র দস্তিদার, কালীপদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ চৌধুরী ও রণধীর দাশগুপ্ত ১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল এই বাড়ীতে প্রথম আশ্রয় নেন], রমণী চক্রবর্তী [বাড়ীর সাংকেতিক নাম 'কুন্তল আশ্রয়কেন্দ্র'], স্বর্ণময়ী দস্তিদার [বাড়ীর সাংকেতিক নাম মাসিমার আশ্রয়কেন্দ্র] ও ডাঃ হেমন্তকুমার ঘোষ [ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড-পরিচালিত পটিয়াকোড়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার। তিনি ঢাকার বাসিন্দা এবং এক সময় অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের চিকিৎসা করেছেন।]

পাঁচখাইন—আমীর হোসেন।

পোপাদিয়া [হাওলা]—অমূল্য আচার্য, কুঞ্জবিহারী লালা, ধূর্জটি চক্রবর্তী (অধিকারী), ননী ভট্টাচার্য [ঢাকা সেণ্টাল জেলে বন্দীঅবস্থায় মিটফোর্ড হাসপাতালে ক্যানসার রোগে মৃত্যু হয়], পুলিন চক্রবর্তী, প্রাণহরি চক্রবর্তী, প্যারীমোহন বৈদ্য, বসন্ত ভট্টাচার্য, মীর আহমদ, মোহিনীমোহন লালা [রায়], প্রদীপ আচার্য, সুকুমার ধর, সুধাংশু লালা, সুরেন্দ্রলাল দে ও খুড়ীমার বাড়ী [আশ্রয়দাত্রীর নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি]

ফতেয়াবাদ—নীলকৃষ্ণ পাল।

ফিরিঙ্গিবাজার [চট্টগ্রাম সহর]—রঞ্জন সেন ও বিনোদিনী সেন [শহীদ রজত সেনের পিতা ও মাতা]।

বাঁশবাড়িয়া—ধীরেন দাস, সুবোধ রায় ও সুরেশ বণিক [ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দীঅবস্থায় বসন্তরোগে মৃত্যু হয়]।

বিদগ্রাম—অনিল দত্ত, কৃষ্ণকুমার মল্লিকের মা [গৈরলা গ্রামে সূর্য সেন ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে সেনাবাহিনী ঘেরাও করলে শান্তি চক্রবর্তী সেই বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সময় রাইফেলের একটি গুলী শান্তির বুকের একটু উপরে এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে যায়। আহত অবস্থায় শান্তি এঁর বাড়ীতে প্রায় পনেরো দিন থাকেন] ও নীলকৃষ্ণ চৌধুরী [এঁর বাড়ীর সকলকেই প্রায় ৪ মাস চট্টগ্রাম জেলে বিচারাধীন থাকতে হয়।

বীণাজুড়ি—নবীন মহাজন, খগেন্দ্র দাস [শিক্ষক], নগেন্দ্র দাস ও হরলাল চৌধুরী [লোকনাথ বল আত্মগোপন করে কলিকাতা আসার সময় হরলালবাবু তাঁকে কুমিল্লা পর্যন্ত পৌঁছে দেন]।

বৈদ্যপাড়া—বিপ্লবী রাজেন্দ্র বড়ুয়ার মা।

ভাটিখাইন—গগনচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্র মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দাশ ও সুধীন দাশ [গহিরা যুদ্ধে ইনি ধৃত হন]।

মহিরা—গোবিন্দ দাস, বংশী কবিরাজের বাড়ী, সুধাংশু সরকার, মধু চক্রবর্তী [মণীন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ী], যতীন দাস ও একজন ধুপী [নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি]।

মহামুনি—বৌদ্ধমন্দির ও সুধীর বড়ুয়া।

মিঠাছড়া [দুর্গাপুর]—ধীরেন্দ্র চৌধুরী, নবীনচন্দ্র চৌধুরী ও রসরাজ নাগের মা।

মোতলা [ধলঘাট]—মজিদ আলী ও সরস্বতী বড়ুয়া [বিপ্লবী মহেন্দ্র বড়ুয়ার জ্যেঠাইমা]।

রাজাপুর [দুর্গাপুর]—বিমল দাস ও হরি চক্রবর্তী।

রাজুনিয়া—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট [—পদবী ছিল বসাক। নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি]।

রাঙ্গামাটি [পার্বত্য চট্টগ্রাম]—কামিনীকুমার দেওয়ান।

শ্রীপুর—অনন্ত দাস, দ্বিজেন্দ্র পাল, নির্মলা চক্রবর্তী ও মণীন্দ্র মজুমদার।

শাকপুরা—ধীরেন্দ্র চৌধুরী [১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী ও পাকদালালেরা তাঁকে হত্যা করে], প্রভাত চৌধুরী,

বিপিনচন্দ্র ধর, বেণী চৌধুরী, মণীন্দ্র চৌধুরী, মণীন্দ্র বিশ্বাস, রেবতীরঞ্জন চক্রবর্তী, সুধাংশুবিমল চৌধুরী, সতীশ শীল, মণীন্দ্র শর্মা ও তাঁর মা [দীপ্তিমেধা চৌধুরী এই বাড়ীতে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ বাড়ীঘর ও সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস করে। মণীন্দ্রবাবু ও তাঁর মায়ের দু'বছর জেল হয়]।

সারোয়াতলী—অমৃত আইচ, আদিনাথ সেন, কানাই চক্রবর্তী, কালীপদ চক্রবর্তী, তেজেন্দ্র সেন, দীনবন্ধু পারিয়াল, দীনরঞ্জন দে, নেপাল দস্তিদার, প্রসন্ন পারিয়ালের মা, বীরেন্দ্র পারিয়ালের মা, ভারতচন্দ্র দত্ত [বিপ্লবী অর্ধেন্দু দস্তের পিতা], যাত্রামোহন দে [শিক্ষক], রমণী নন্দী, শচীন সেন, সতীশ দস্তিদার [শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদারের অগ্রজ]।

হাবিলাসদ্বীপ—অমর দাস, ক্ষীরোদ মহাজন, দ্বিজেন দাস, যোগেন্দ্র চৌধুরী, রাজেন বিশ্বাস, বণিক পদবীধারী একজন আশ্রয়দাতা [নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি] ও রমণী চৌধুরী [সূর্য সেন এই আশ্রয়স্থানের নাম দিয়েছিলেন amiable shelter, আহত শান্তি চক্রবর্তী বিদগ্রাম থেকে এসে এঁর বাড়ীতে আশ্রয় নেন ও সম্পূর্ণ সুস্থ হন। দু'বছর পরে শান্তি ও নেপাল দস্তিদার এই বাড়ীতে গ্রেপ্তার হন। ফলে তাঁর দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়]।

নোয়াখালী

অশ্বিনী দাস, [চৌমোহনী], অমরেন্দ্র সরকার, যোগেশ চৌধুরী, রেবতী পাল, শচীন পাল ও সুরেশ চৌধুরী [খণ্ডল], বিপ্লবী সুরেশ বণিকের আত্মীয় মোক্তার সুরেন্দ্রলাল [দাস ?] [সন্দ্বীপ], ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী [বাণী-সম্পাদক], জগদীশ রায় ও তাঁর ছোট ভাই জ্যোতির্ময় রায় [লামচর গ্রামের চৌধুরী বাড়ী। নোয়াখালী সহরের বাসায়ও জগদীশবাবু বিপ্লবীদের আশ্রয় দেন], নগেন্দ্র গুহরায় [নোয়াখালী সহর], পুলিন দত্ত [মাইজদি], বঙ্কিম সেন [মাধব সিং গ্রাম], বঙ্কিমচন্দ্র সেন [লামচর], ভৈরব ঘোষ [ধর্মপুর গ্রামের তালুকদার। এই বাড়ী থেকে বঙ্কিম সেন এবং জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক ও দুর্গো-হত্যাকারী সরোজ গুহ ধৃত হন। ভৈরব ঘোষের পুত্র গিরীন্দ্র ঘোষের

(ইনি জুরীও নিযুক্ত হতেন) দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা হয়। বৃদ্ধ বলে ভৈরববাবু মুক্তি পান], মনোমোহন দত্ত [সোনাই-মোহরী], সীতেশ রায়, কুমিল্লার পুলিশপ্রধান এলিসনের হত্যাকারী শৈলেশ রায় [করপাড়ার চৌধুরী বাড়ী], চট্টগ্রাম জেলার কানুনগোপাড়া গ্রামের হৃদয়রঞ্জন চৌধুরী [নোয়াখালী সহর] ও জনৈক অধ্যাপক [বাওপুর—লক্ষ্মীপুর থানা]।

ফেণী

দিলীপ, ধীরেন্দ্র, বিপিন, মণীন্দ্র ও যতীন্দ্র দাশগুপ্ত (চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ মহিমচন্দ্র দাশগুপ্তের বাড়ী) [নবাবপুর-আমিরাবাদ]।

কুমিল্লা

যুগান্তর দলের নেতা অখিল নন্দী, অতীন বোস, অনুশীলন দলের নেতা অমূল্য মুখার্জী, অমূল্য দাশগুপ্ত [নবীনগর। ডুর্ণো হত্যার পর সরোজ গুহ ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে এঁর বাড়ীতে আশ্রয় নেন], প্রখ্যাত আইনজীবী কামিনীকুমার দত্ত, কংগ্রেস নেতা বসন্তকুমার মজুমদার, কুমিল্লা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক মৌলভী মক্লেশ্বর রহমান, কংগ্রেসকর্মী মৌলভী এরাদুল্লা, অনুশীলন-দলের নেতা যোগেশ চক্রবর্তী, সরোজকুমার দত্ত, সার্ভে স্কুল ও রামমোহন চক্রবর্তী [সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ঈশ্বর পাঠাশালা]।

ঢাকা

ইন্দুভূষণ বোস ও দেবেন বসাক [তাঁতিবাজার], ব্যাপটিষ্ট মিশন হোষ্টেলের বোর্ডার সুনীল মজুমদার [বাড়ী—মুন্সীগঞ্জ]।

কলিকাতা

যুগান্তর দলের অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত [গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল চট্টগ্রাম থেকে আত্মগোপন করে এসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি এঁদের কলিকাতার খিদিরপুরে (কাঞ্চনলতা চক্রবর্তীর বাড়ী) ও উল্টাডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরে চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় পাঠিয়ে দেন। ভূপেনদার গ্রেপ্তারের পর লোকনাথ বল কলিকাতায় এলে যুগান্তর দলের অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা কিরণ মুখার্জী তাঁকে এই আশ্রয়স্থানে পাঠিয়ে দেন], বাগবাজারস্থ ৩।১ অন্নদা নিয়োগী লেনের গৃহস্বামী [নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি], ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত [বেঙ্গল ইম্যুনিটি], কালীপদ ঘোষ, ডাঃ নারায়ণ রায়, ভূপেন্দ্র

কিশোর রক্ষিত রায়, মনোরঞ্জন রায় [ফরিদপুর], নিরন্ময় মজুমদার, যোগেন দে সরকার, শচীন সেন, শৈলেন নিয়োগী [বিচ্ছু] ও অতুল সেন ['Statesman'-এর সম্পাদক ওয়াটসনকে হত্যার ব্যর্থচেষ্টার পর পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।]

চন্দননগর

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহাসিনী গাঙ্গুলী ও শশধর আচার্য [গোন্দলপাড়ার এক বাড়ীতে এঁরা স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে চট্টগ্রামের আত্মগোপনকারী বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষালকে আশ্রয় দেন।]

আশ্রয়দাতা সম্পর্কে অম্বিকা চক্রবর্তী

জালালাবাদ সংগ্রামে আমাদের জয়লাভের পরদিন ভোরে আমার জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমার সাথীরা কিছু দূরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আমার আহত স্থানের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না—দূর থেকে দেখলাম আরও বেশী সংখ্যায় সৈন্যরা পাহাড়ে উঠে আসছে। তখন প্রাণপণ শক্তি নিয়ে আমি নিজেকে পাহাড়ের ঢালু কাছে থাকায় গড়িয়ে দিই এবং এক ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ি। সৈন্যরা এসে কিছুক্ষণ পরই আবার আহত দু'জনকেও গুলী করল। তারপর শহীদদের মৃতদেহ পেট্রোল দিয়ে যে জ্বালিয়ে দিল তা আমি ঐ ঝোপের আড়ালে পড়ে থেকে টের পেলাম। তারা যে চলে গেল তাও বুঝলাম। বিকালের দিকে এক মুসলিম গ্রামবাসী একটু নীচে দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে বহু কষ্টে আমি ডাকি আর আমাকে একটু জল দিতে বলি। গত বিকাল বেলা আর আজ সকাল বেলার ঘটনা সে জানে। তবু সে আমাকে ধরে কাছেই তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। পনর দিন ধরে সে নানাভাবে আমার সেবা-শুশ্রূষা করে এবং পরে আমাকে কালুরঘাটের কাছে নিয়ে গোপনে সাম্পানে তুলে দেয়। তখনও আমার গুলীবিদ্ধ অবস্থা। সাম্পানের মাঝির সাহায্যে আমি গ্রাম্য কৃষক আমজাদ আলীর বাড়ীতে গিয়ে উঠি। তার সঙ্গে পূর্বেই আমার পরিচয় ছিল। সে নিজেও তার এগার বছরের ছেলে হোসেন আলীর নিকট আমি যে স্নেহ, ভালবাসা, দরদ ও আশ্রয় পেয়েছি, তা আমার আমরণ স্মরণ থাকবে। বিশেষতঃ ঐ দিনের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার তাণ্ডব লীলার মধ্যে, আমার গ্রেপ্তারের জন্য বৃটিশ সরকার যখন ৫০০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে, সেই লোভ আর সব বিপদকে তুচ্ছ করে দীর্ঘ ২৫ দিন সে আমাকে আশ্রয় দেয়। তার পর্দানশীন স্ত্রী আমার সামনে পর্দা ফেলে দিয়ে নিজের ছেলের মত আমাকে দু'বেলা রেঁধে খাওয়াতেন এবং পরম যত্নে আমার সব কাজ করতেন।

আজ আমার পাকিস্তানের মুসলিম ভাইদের কাছে আমজাদ আলীর মত দেশপ্রেমিকের কথা তুলে ধরতে চাই। এমন ভাই যত বেশী সংখ্যায় থাকবে

ততই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বেড়ে উঠবে। সাম্প্রদায়িক নিরাপত্তার আশ্বাস দান বা গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

আরও একটি মুসলিম মায়ের কথা এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। ফতেয়াবাদের বড দীঘির পাড়ে বৃদ্ধা বিধবা ফয়েজুন্নেসার বাড়ীতে আমি দুই দিন দুই রাত্রি ছিলাম। তখন তার ১৭।১৮ বছরের ছেলে ফজল আহমদ জালালাবাদ পাহাড়ে একটি ওয়েবলী রিভলভার কুড়িয়ে পায় এবং আমাকে তা এনে দেয়। তার জন্য কিছু দাম বা পুরস্কার আমি ঐ ফয়েজুন্নেসা বিবিকে দিতে গেলে, তিনি বলেন, এইটি দিয়ে একটা সাহেব (ইংরেজ) মারলে আমি বেশী খুশী হব।

আমি আমজাদ আলীর বাড়ীতে থেকে সূর্যবাবু ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি। তখনও আমি যে জীবিত তা আমার বিপ্লবী সাথীরা জানেন না। পরে গভীর রাত্রে গ্রামের এক পুকুর পাড়ে বহু সতর্কতা নিয়ে তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমাকে জীবিতঅবস্থায় ওখানে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরেন। (১)

---

[১] পূর্ণেন্দু দস্তিদার প্রণীত 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রাম' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

DECLARATION OF WAR OF INDEPENDENCE

by

BANGABANDHU SK. MUJIBUR RAHMAN

[A historic message from Bangabandhu Sk. Mujibur Rahman conveyed to Mr. Zahur Ahmed Chowdhury on 25th March, 1971 at 11-30 Hours—immediate after crack-down of Pak-Army]

"Pak army suddenly attacked E.P.R. Base at Pillkhana, Rajarbag Police Line and killing citizens, street battles are going on in every street of Dacca, Chittagong. I appeal to the Nations of the World for help. Our freedom fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask Police, E.P.R., Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight. No compromise. Victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of motherland. Convey this message to all Awami League leaders, workers and other patriots and lovers of freedom. May Allah bless you."

"JOY BANGLA"

Sk. Mujibur Rahman

(This message was communicated from Teknaf to Dinajpur and to friendly countries through some vessel which were anchored at Bay of Bengal near Chittagong, by Mr. Zahur Ahmed Chowdhury).

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঘোষণাপত্র

[১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত ১১টার দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করার অব্যবহিত পরে রাত সাড়ে ১১টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পূর্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত স্বাধীনতা-যুদ্ধের ঘোষণাপত্রটি পাঠান। জনাব চৌধুরী চট্টগ্রামের কাছে বঙ্গোপসাগরে নোঙ্গরকরা জাহাজের সাহায্যে টেকনাফ থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত সারা বাংলাদেশ ও কয়েকটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশকে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার কথা জানিয়ে দেন। ঘোষণাপত্রটির বাংলা অনুবাদ নিম্নে মুদ্রিত হল।—**সম্পাদক**]

'পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানায় ই.পি.আর. বাহিনীর ঘাঁটি ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে, জনসাধারণকে হত্যা করছে, ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রত্যেক রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। বিশ্ববাসীর কাছে আমার আকুল আবেদন, আমাদের সাহায্য করুন। মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে লড়াই করছে। আমি আপনাদের সকলকে সর্বশক্তিমান্ আল্লার নামে আহ্বান জানাচ্ছি, নির্দেশ দিচ্ছি, দেশকে মুক্ত করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করুন। পুলিশ, ই.পি.আর., বেঙ্গল রেজিমেণ্ট ও আনসারবাহিনীকে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলুন। কোন অবস্থাতে আপোস নয়। জয় আমাদের নিশ্চিত। মাতৃভূমির পবিত্র মাটি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতা ও কর্মী, অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছে দিন। আল্লা আপনাদের আশীর্বাদ করুন।'

"জয় বাংলা"

শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা চট্টগ্রামে

শ্রীঅমলেন্দু সেন [চট্টগ্রাম]

রক্তে লেখা নাম—চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের ইতিহাস কথা বলে। চট্টগ্রামের ইতিহাস অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নি—হবে না। চট্টগ্রাম কালে কালে যুগে যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। সেই ইতিহাস রক্তের আখরে লেখা ইতিহাস।

(১৯৩০ সাল। মহানায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে চট্টগ্রাম বিশ্বের ইতিহাসে এক মহান্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।) সেই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে সৃষ্ট মহান্ উত্তরাধিকারের অন্তরংগ পথে বিচরণ করে দীর্ঘ একচল্লিশ বছর পর ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের অমিততেজা বীরসন্তানের দল রক্তপিপাসু পাকিস্তানী দানববাহিনীকে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ রেখে তিনদিনের জন্যে চট্টগ্রামকে স্বাধীন রেখেছিল। চট্টগ্রামের আকাশেই প্রথম উড়েছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্বের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বীরত্বের আর একটা উল্লেখযোগ্য নজীর স্থাপন করেছিল।

পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে মুক্তিকামী বাঙ্গালীদের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম প্রথম শুরু হয় চট্টগ্রামে। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হবার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ দুপুর একটায় বেতারে প্রচারিত এক ঘোষণার মাধ্যমে অনিদির্ষ্ট কালের জন্যে পিছিয়ে দিলেন।

এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীঅমলেন্দু সেন চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। সাংবাদিকতায় তাঁর দীর্ঘ বারো বছরের অভিজ্ঞতা। তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে দেশ ও জাতির সেবা করে আসছেন। তিনি চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী, দৈনিক জমানা, দৈনিক ইষ্টার্ণ এগ্জামিনার, দৈনিক ইষ্টার্ণ টাইমস্ ও দৈনিক পিপলস ভিউ পত্রিকার সাথে জড়িত থেকে সাংবাদিকতা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন তিনি দৈনিক ইষ্টার্ণ টাইমসের বার্তাসম্পাদক ছিলেন এবং চট্টগ্রামের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর এই তথ্যবহুল প্রবন্ধ পাঠকবর্গের সামনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের ভূমিকা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরবে বলে আমাদের বিশ্বাস।—**সম্পাদক।**

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটাকে কৌশলে এড়িয়ে যাবার জন্যেই সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক ইয়াহিয়া দুরভিসন্ধির আশ্রয় নিলেন। দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে বাঙ্গালীদের মনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, ১লা মার্চের ঘোষণায় তা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। এটা যে পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর একটা হীন চক্রান্ত, মুক্তিকামী বাঙ্গালীদের বুঝতে বাকী রইল না। সাড়ে সাতকোটি নিষ্পেষিত ও শোষিত বাঙ্গালীর প্রাণপ্রতিম নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র ভাষায় ইয়াহিয়ার ন্যক্কারজনক আচরণের প্রতিবাদ ও নিন্দা করলেন। এই ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন।

দলমতনির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণ এই ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিল। শুরু হয়ে গেল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ২রা মার্চ থেকে। খাজানা দেয়া বন্ধ হল, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, জীবনবীমা ও অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদেশে বিশেষ করে পাকিস্তানে টাকা পাঠানো বা এ্যাকাউণ্ট ট্রান্সফারের ব্যবস্থা বন্ধ করা হল। সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত, মিল-কারখানায় দৈনিক আটঘণ্টার পরিবর্তে চারঘণ্টা কাজ চলতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর উপর তখন জাতির অবিচল আস্থা। ১লা মার্চের ঘোষণায় বাঙ্গালীদের মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং তারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মাথা পেতে নেয়। সারা বাংলাদেশে সরকারী বে-সরকারী অফিস-আদালত, মিল-কারখানায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ কার্যকরী করা হয়। স্বাধিকার-আদায়ের দৃপ্ত শপথে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী জাতি ইয়াহিয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবার জন্য বঙ্গবন্ধুর ডাকে ঐক্যবদ্ধ হল।

৭ই মার্চ। স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে [বর্তমানে সোহরওয়ার্দী উদ্যান] ঐতিহাসিক জনসভা। লক্ষ লক্ষ জনতা; উন্মত্ত অধীর। দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ জাতি পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিতে চায়, সামরিক জুণ্টার হীন চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে স্বাধিকার আদায় করে নিতে চায়। শুধু নেতার নির্দেশের অপেক্ষা। স্মরণকালের এই বিশাল জনসভায় বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মহান্ মুক্তিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনির মধ্যে বজ্রকণ্ঠে

ঘোষণা করলেন : এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 'জয় বাংলা' ও 'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সভাস্থল কেঁপে উঠল। নেতার নির্দেশ এল : যতদিন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা না হয় ততদিন পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলবে। নেতার কণ্ঠে লক্ষকোটি সিংহের গর্জন : 'রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরো রক্ত দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা আল্লাহ্।'

মুক্তিকামী জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বললেন : হাতের কাছে যা পাও—কুড়ল, দাও, লাঠি, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত থেকো।

১০ই মার্চ। পাকিস্তান বেতারে প্রচারিত হল, ইয়াহিয়া আসছেন ঢাকায়। উদ্দেশ্য—শেখ মুজিব ও ভুট্টোর সাথে আলোচনা। পনরোই মার্চ থেকে চব্বিশে মার্চ। দশদিন মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনা চলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনা ফলপ্রসূ হল না। ইয়াহিয়ার একগুঁয়েমিতে 'শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতা' ও ক্ষমতা হস্তান্তর-প্রশ্নে কোন সুরাহা হল না। যাবার সময় কুখ্যাত সামরিক জুন্টার নায়ক ইয়াহিয়া তাঁর সুযোগ্য দোসর পাঞ্জাবী স্বার্থের ধারক-বাহক ভুট্টোর পরামর্শে সেনাবাহিনীর প্রতি বাঙ্গালীর স্বাধিকার-আন্দোলনকে বুলেটের মুখে স্তব্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

এদিকে ঢাকায় যখন মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনা চলছে, তখন বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী চট্টগ্রামে এক নিন্দনীয় কাজ করে বসল। সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরে চালাল গুলী।

সতেরোই মার্চ। চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়ল "সোয়াত" জাহাজ প্রচুর গোলা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। জাহাজ বন্দরে ভিড়বার পর পরই মাল খালাসের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল সেনাবাহিনী। বেলা তখন সাড়ে এগারটা। চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মীরা 'সোয়াত' জাহাজের মাল খালাস করতে নারাজ। তাদের ঘোষণা—'সোয়াত' জাহাজ থেকে মাল নামাতে দেয়া হবে না। তারা 'সোয়াত' জাহাজ ঘেরাও করে রাখল। তারা বন্দরের প্রবেশ ও নির্গমন-পথ রুদ্ধ করে দিল। বন্দর থেকে চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনমেণ্ট পর্যন্ত রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করা হল সামরিক যানের গতিরোধ করার জন্যে। বন্দরকর্মীদের সাথে যোগ দিল চট্টগ্রামের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক জনতা। সবার মুখে এক কথা—ঢাকায় যখন আলোচনা চলছে তখন 'সোয়াত' জাহাজ

থেকে অস্ত্র খালাস করতে দেবো না। সবার দাবী—'সোয়াত' জাহাজ ফিরিয়ে নিতে হবে। বন্দরে সমবেত জনতা ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। অবশেষে চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে সেনাবাহিনীর লোকজনকে আনা হল মাল খালাসের জন্যে। কিন্তু সমবেত জনতা তাও করতে দেবে না। জনতার এক কথা—'সোয়াত' জাহাজ ফিরিয়ে নিতে হবে। সেনাবাহিনী তা মানল না। চালাল গুলী, শহীদ হল সতেরো জন ঘটনাস্থলেই। আগুনে ঘৃতাহুতি হল। খবরটা মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলাদেশে। পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল। খবর পেয়ে চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনমেণ্টের বাঙালী অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব এম. এ. হান্নান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ছুটে গেলেন বন্দরে। অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করলেন সবাই। চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনমেণ্টের অধিনায়কের সাথে জনাব হান্নানের কয়েক মিনিট আলোচনা হল। কোনো ফল হল না। জনাব হান্নান সমবেত জনতাকে প্রতিহিংসামূলক কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। এই ঘটনায় বঙ্গবন্ধু গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, এই ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন। পরিস্থিতিকে গুরুতর করার জন্যে সেনাবাহিনীকে দায়ী করে তিনি পরদিন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিলেন।

চট্টগ্রামের বীর জনতা কিছুতেই যেন সতেরোই মার্চের ঘটনাকে মেনে নিতে পারছিল না, তারা চায় এর প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু নেতার নির্দেশ শান্ত থাকার। তাই তারা শান্ত রইল। 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাসের বিরুদ্ধে রক্তের ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সামরিক যানের গতিরোধের জন্যে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করে উনিশ একাত্তরের সেই দিনটিতে চট্টগ্রামের স্বর্ণসন্তানের দল পাকিস্তানী সামরিক জুণ্টার বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের সূচনা করেছিল। আসলে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের শুরু সতেরোই মার্চ থেকে এবং চট্টগ্রাম থেকেই।

পঁচিশে মার্চ। এদিন রাতের অন্ধকারে ভীরু কাপুরুষের মতো বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার পিলখানা ও রাজারবাগে ই. পি. আর. বাহিনী ও পুলিশবাহিনীর সদর দপ্তরের উপর অতর্কিতভাবে হামলা চালাল। ই. পি. আর. বাহিনী এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অনেকেই প্রাণ হারায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই তারা সিংহশাবকের মতো গর্জন করে উঠল,

গড়ে তুলল প্রবল প্রতিরোধ। অল্পক্ষণের মধ্যেই অসমসাহসী ই. পি. আর. বাহিনী 'জয় বাংলা' ও 'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে বর্বর পাকিস্তানী হায়েনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের নগ্ন আক্রমণ সাফল্যের সাথে প্রতিহত করল। হানাদারবাহিনী রাতের অন্ধকারে নিরীহ নাগরিকদের উপরও হামলা চালাতে ছাড়ল না। ঢুকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। নিরীহ শিক্ষক ও ছাত্রজনতার উপর নির্মমভাবে চালাল গুলী, নিহত হল কয়েকশত ছাত্র ও শিক্ষক। ওদিকে হানাদার দস্যুরা বিভিন্ন পাড়ায় ঢুকে নারকীয় হত্যাকাণ্ড শুরু করে দিয়েছে, বিছানা থেকে টেনে এনে বাঙ্গালীদের নির্মমভাবে হত্যা করছে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের কবল থেকে ঘুমন্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে অবলা নারী পর্যন্ত কেউ রেহাই পায় নি। ঢাকার রাস্তায় পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্ক ও মেসিনগানের গুলীতে সেই রাতে ঢাকায় কয়েক হাজার বাঙ্গালী অসহায়ের মতো প্রাণ হারাল। হানাদার দস্যুরা সেই রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের হত্যা করে বর্বরতা ও নৃশংসতার যে পরিচয় দিয়েছে তার নজীর বিশ্বের আর কোথাও মিলে না। পঁচিশে মার্চ থেকে ঢাকায় নরমেধ যজ্ঞের শুরু। নিরীহ নিরপরাধ বাঙ্গালীর রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত।

২৫শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ। তিনদিন চট্টগ্রাম স্বাধীন। চট্টগ্রামের আকাশে স্বাধীন বাংলার পতাকা। ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রির দিকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পরে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে কথাটা জানালেন টেলিফোনে। আর কাউকে জানাবার সময় তিনি পান নি। জনাব চৌধুরীকে খবরটা জানাবার অল্পক্ষণ পরে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে আটক করে।

চট্টগ্রাম ষ্টেশন রোডে রেষ্ট হাউসে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের অফিস। হাজার হাজার জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নেতার নির্দেশের জন্যে। হঠাৎ আওয়ামী লীগ অফিসের টেলিফোন বেজে উঠল। জনাব চৌধুরী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রত্যাশিত খবরটাই এল বুঝি! টেলিফোন উঠাতেই বুঝলেন, হাঁা ঠিক তাই। টেলিফোনের অপর প্রান্তে নেতার বজ্রকণ্ঠ। নেতা জানালেন স্বাধীনতা ঘোষণার কথাটা। প্রায় মিনিট দুয়েক কথা হল নেতার সাথে। তারপর কেটে গেল টেলিফোনের লাইন।

জনাব চৌধুরী উত্তেজিত উৎফুল্ল। আনন্দে উচ্ছ্বাসে তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। ছুটে এলেন বাইরে। হাজার হাজার অপেক্ষমান জনতাকে চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন স্বাধীনতা ঘোষণার খবরটা। মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি উঠল। জনতার উল্লাস। 'জয় বাংলা', 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে রেষ্ট হাউস প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত। মুহূর্তে খবরটা পৌঁছল চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রে। আর চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র রূপান্তরিত হয়ে গেল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে এবং এই স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুকর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথাটা প্রচারিত হয়।

২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রি থেকে ঢাকার বুকে পাকিস্তানী বাহিনীর নগ্ন হামলার খবর চট্টগ্রামে পৌঁছার পর পরই পুলিশ বিভাগসহ সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রের সমস্ত বিভাগের কর্মচারীরা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করলেন। পুলিশ ও জেলা প্রশাসন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সর্বাত্মক ও সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় সর্বতোভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যে এগিয়ে এলেন। সরকারী কোষাগারের অর্থ মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা তহবিলে দেয়া হল। বেসামরিক অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র এনে জনতার মধ্যে বিলি করা হল। শুরু হয়ে গেল সাজ সাজ রব।

ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে সকল দপ্তরে ই. পি. আর. বাহিনীর জওয়ানেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করল। তারা পকিস্তানী হানাদারবাহিনীকে খতম করার দৃঢ়সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ হল। এগিয়ে এলেন ই. পি. আর. বাহিনীর তরুণ মেজর। মেজর জিয়াউর রহমান যোগাযোগ করলেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে। নিজেই উদ্যোগী হয়ে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। মুহূর্তেই তিনি ই. পি. আর. ও ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বিদ্রোহী জওয়ান ও ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক জনতাকে নিয়ে সুশৃংখল ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম চালানোর পরিকল্পনা করে ফেললেন। ই. পি. আর. বাহিনী ও ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের জওয়ান এবং ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক জনতাকে নিয়ে সংগঠিত হল মুক্তিবাহিনী। দামাল জওয়ানদের নিয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে চলল শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে।

এদিকে জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার খবরটা ইংরেজীতে টাইপ করে চট্টগ্রামের জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারের

ব্যবস্থা করলেন। ছাব্বিশে মার্চ সকালে চট্টগ্রামের নাগরিকবৃন্দ জানতে পারলেন যে তাঁদের প্রিয় নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। চট্টগ্রামের রাস্তায় নেমে এল মানুষের ঢল। তারা উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত, উৎফুল্ল। কণ্ঠে তাদের 'জয় বাংলা' ও 'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ' শ্লোগান।

সাতাশে মার্চ রাত সোয়া এগারটায় পাকিস্তান নৌবাহিনীর ডেষ্ট্রয়ার 'বাবর' এসে পৌঁছল বঙ্গোপসাগরে চট্টগ্রামের সীমানায়। এসেই শুরু করল শেলিং। প্রচণ্ড শেলিং। চট্টগ্রামের বাড়ীঘর সব শেলিং-এর দাপটে কেঁপে উঠল। এদিকে চট্টগ্রামে পঁচিশে মার্চ থেকে পাকিস্তানী সেনা-বাহিনী ক্যাণ্টনমেণ্টের ভেতরে অবরুদ্ধ। তাদের বেরোবার পথ রুদ্ধ। ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে চার মাইল দূরে প্রবর্তক আশ্রমের পাহাড়ে মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় ঘাঁটি। পাহাড়-তলীস্থ নৌবাহিনীর ক্যাম্প ও পতেঙ্গাস্থ নৌবাহিনীর সদর দপ্তরও অবরুদ্ধ। কোনোদিক থেকেই হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী শহরে ঢুকতে পারছিল না। কিন্তু সাতাশে মার্চ রাতে 'বাবর' এসে মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করাতে হানাদারবাহিনী যেন সাহস ও মনোবল ফিরে পেল। 'বাবর' থেকে মর্টার নিক্ষেপ করে পাকিস্তানী সমরনায়কেরা ধারণা করেছিল যে, বাঙ্গালী মুক্তিসেনারা মর্টারের ভয়ে পালিয়ে যাবে, তাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু অসমসাহসী বাঙ্গালী মুক্তিসৈনিকের দল হানাদারবাহিনীর সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত করল। 'বাবরের' মর্টার নিক্ষেপের শব্দ নির্ভীক মুক্তিসেনাদের 'জয় বাংলা' ও 'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

'বাবর' থেকে প্রচণ্ডভাবে যখন মর্টার নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে মুক্তিবাহিনী-পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত তরুণ অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মেজর জিয়াউর ইংরেজীতে এক ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেকে সেই বিপ্লবী সরকারের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের আবেদনও জানালেন। ইংরেজীতে এই ঘোষণা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে উপর্যুপরি তিনবার প্রচারিত হয়। যতদূর মনে পড়ে, ঘোষণাটির ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

I, Md. Ziaur Rahman, Major, hereby declare that I have formed the Revolutionary Government in Bangladesh. I

proclaim myself as the Head of the Revolutionary Government. I appeal to the nations of the world to come to our help and rescue.

মেজর জিয়ার পক্ষে হয়তো এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তখন। ঢাকায় হানাদারবাহিনীর হামলা শুরু হবার পর চট্টগ্রামে প্রকৃতপক্ষে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। হানাদারবাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে বাঙ্গালীদের উপর হামলা চালিয়েছে। তারা সুদক্ষ সৈনিক ও সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সবরকমের যুদ্ধপ্রস্তুতি ও রণসম্ভার তাদের আছে। তাদের সাহায্যের জন্যে ডেষ্ট্রয়ার, জঙ্গী বিমান, কিন্তু সদ্যঃগঠিত মুক্তিবাহিনীর এসব কিছুই নেই। এমন কি থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছাড়া বিশেষ কোন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নেই। ডেষ্ট্রয়ার 'বাবর' ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে এবং প্রচণ্ড মর্টারের গোলা বর্ষণ শুরু করেছে। এ অবস্থায় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে না ভেবে মেজর জিয়া বিশ্বের অন্যান্য জাতির কাছে সাহায্যের আবেদন জানানোর প্রয়োজন অনুভব করলেন। কিন্তু স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার না থাকলে বিশ্বের অন্যান্য জাতি বা রাষ্ট্র সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতে পারে না, তাই মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী সরকারের গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

২৮শে মার্চ। দুপুর সোয়া তিনটেয় হানাদারবাহিনীর কম্যাণ্ডোরা লাভ-লেন ও হেম সেন লেনের ভেতর দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে ঢুকে পড়ে এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের বাসভবন লক্ষ্য করে এগোতে থাকে। তারা লাভ লেনের মুখে বৌদ্ধমন্দিরের সামনে মুক্তিবাহিনীর একটা টয়োটা জীপ লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। দীপক বড়ুয়া নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয় ঘটনাস্থলেই। ঐ জীপে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। বাকী পাঁচজন কোন রকমে পালিয়ে যায়। হানাদারবাহিনীর কম্যাণ্ডোরা মুক্তিবাহিনীর সাথে প্রবল সংঘর্ষের পর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জেলা প্রশাসকের বাসভবন দখল করতে সমর্থ হয়। আটাশে মার্চ রাতে জেলা প্রশাসকের বাসভবনে অবস্থানরত হানাদারবাহিনীর কম্যাণ্ডোদের সাথে মুক্তিবাহিনীর আরো চারদফা সংঘর্ষ হয়। সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী কম্যাণ্ডোদের সামনে থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে বেশীক্ষণ টিকে থাকা মুক্তিসেনাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

পরদিন অর্থাৎ উনত্রিশে মার্চ সকাল থেকে হানাদারবাহিনী একে একে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের বাসভবন, ফরেষ্ট হিল, টেলিগ্রাফ অফিস, কোর্ট বিল্ডিং-এর উপর হামলা চালিয়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর দখল করে নেয়। প্রত্যেকটা হামলায় চট্টগ্রামের নির্ভীক মুক্তিসেনার দল প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে এবং পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে দৃঢ় মনোবল ও অপরিসীম শৌর্যের পরিচয় দিয়েছে।

ওদিকে পুলিশসেনাদ্বারা সুরক্ষিত দামপাড়া পুলিশ লাইনের উপর একই দিনে পাকিস্তান নৌবাহিনী বেশ কয়েক দফা হামলা চালায়। কিন্তু পুলিশ-বাহিনীর সাথে দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষের পর হানাদারবাহিনীর নৌ-সেনারা দামপাড়া পুলিশলাইন দখল করতে সক্ষম হয়। এছাড়া প্রবর্তক আশ্রমের ঘাঁটি থেকে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেণ্ট থেকে বেরিয়ে-আসা পাকিস্তানী দস্যুদেব কয়েক ঘণ্টা ধরে যেভাবে কাবু ও পর্যুদস্ত করে রাখা হয়, সেকথা হানাদার দস্যুরা জীবনেও ভুলবে না। প্রবর্তক আশ্রমের ঘাঁটি থেকে যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়, তাতে কয়েকশত বর্বর পাকসেনা নিহত হয়। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল দখল করতে যেয়ে হানাদার দস্যুদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় এবং কয়েকশত পাঞ্জাবী সৈন্যের জীবনাবসানের পর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। চট্টগ্রামের বীর মুক্তিসেনারা রাঙ্গামাটি, কালুরঘাট, রাউজান, ফটিকছড়ি ও মদুনাঘাটে পাকিস্তানী হায়েনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্বের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তার তুলনা বিরল।

পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুকর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার পর চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে রূপান্তরিত হল এবং সেই থেকে উনত্রিশে মার্চ দুপুর সোয়া বারোটা পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান ঠিকমতোই শোনা যাচ্ছিল। আগ্রাবাদস্থ এই বেতারকেন্দ্রটি দখল করার জন্যে পাকিস্তানী নৌবাহিনী ২৮শে মার্চ রাত ১০টা থেকে ২৯শে মার্চ দুপুর ১২টা পর্যন্ত হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু দুর্ধর্ষ ই. পি. আর. বাহিনীদ্বারা সুরক্ষিত স্বাধীন বাংলা বেতারভবনটি পাক নৌসেনারা দখল করতে পারে নি। বেতারভবনের উপর যখন পাক নৌসেনারা হামলা চালাচ্ছে, তখনও বেতারভবনের অভ্যন্তরে প্রকৌশলী ও শিল্পিবৃন্দ নির্ভয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করে চলেছেন, হামলায় তাদেরকে এতটুকু বিচলিত হতে দেখা যায় নি।

পঁচিশে মার্চ দুপুরে পৌনে দুটোয় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের বাঙ্গালী অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে তাঁর কোয়ার্টারে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সাথেও তাঁকে দেখা করতে দেয়া হয় নি। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা কোয়ার্টারে অবরুদ্ধ ছিল। বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে তাঁর স্ত্রীপুত্রকেও রেহাই দেয় নি।

বঙ্গবন্ধুকর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার খবরটা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছ থেকে ছাব্বিশে মার্চ সকালে সাংবাদিকেরা জানতে পারেন। সাংবাদিকেরা যে যেদিকে পারলেন, ছুটলেন খবরটা বহির্বিশ্বে পাঠাবার জন্যে। ঢাকার দৈনিক 'পূর্বদেশ'-এর চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি জনাব নুরুল ইসলাম, 'ENA' Eastern News Agency)-এর চট্টগ্রামস্থ সংবাদদাতা শ্রীপ্রদীপ দাশগুপ্ত ও এই প্রবন্ধের লেখক ছুটলেন ছিলিমপুরস্থ VHf (Very High Frequency & Wireless Station) ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে। VHf ষ্টেশনের অপারেটর অনেক চেষ্টা করেও পৃথিবীর কোনো দেশের সাথে যোগাযোগ করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে বহিঃনোঙরে অবস্থানরত নিউজিল্যাণ্ডের জাহাজের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হওয়াতে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে শেখ মুজিব কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার খবরটা জানানো হল। পরে নিউজিল্যাণ্ডের সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন খবরটা বহির্বিশ্বকে জানিয়ে দেন। পরদিন অর্থাৎ সাতাশে মার্চ অষ্ট্রেলীয় বেতার থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটা প্রথম প্রচারিত হয়। পরে অবশ্যি বি. বি. সি. ও অন্যান্য দেশের বেতারকেন্দ্র থেকে খবরটা প্রচার করা হয়। এভাবে চট্টগ্রামের-ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক থেকে শুরু করে কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক পর্যন্ত সর্বস্তরের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

১৯৩০ সালে সৃষ্ট ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল ১৯৭১ সালে। চট্টগ্রামের জনসাধারণ আর একবার প্রমাণ করল যে, তারা চিরবিপ্লবী চিরবিদ্রোহী। তারা কোনদিনই সংগ্রামে পিছিয়ে থাকে না, বরং তারা সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যে ঘোষণায় হানাদারদের বুক কেঁপে উঠেছিল

মনজুর আহমদ

একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত। বন্দরনগরী চট্টগ্রামের রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে একটি ট্রাক। ট্রাকের উপর কিছু নৌ-সেনা। হাতে তাঁদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র। আর কিছু বাঙালী সৈন্য।

ট্রাকের সামনে একজন পশ্চিমা সামরিক অফিসারের পাশে বসে একজন বাঙালী মেজর। দৃষ্টি তাঁর আনত। মনে তাঁর হাজার চিন্তার ঝড়।

ট্রাকটি ছুটছিল বন্দরের দিকে। ষোলশহর ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বন্দরের দিকে। ছুটছিল—তবে একটানা নয়। মাঝে মাঝে বাধা পেয়ে নামতে হচ্ছিল. ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে সারাপথে অসংখ্য প্রতিরোধ।

আগ্রাবাদের ব্যারিকেডই সবচেয়ে বড। সরাতে অনেক সময় লাগছিল সেনাবাহিনীর লোকদের। পশ্চিমা সামরিক অফিসারটি বসেছিল সামনের আসনে। বাঙালী মেজর নেমে পায়চারী করছিলেন। এক গভীর চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। কি হতে যাচ্ছে! কেন তাকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে বন্দরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? কি এদের উদ্দেশ্য?

এমনি সময় ছুটে এলো একটি ডজ গাড়ী। সশব্দে সেটি ব্রেক করে দাঁড়ালো। তার থেকে লাফিয়ে নামলেন একজন বাঙালী ক্যাপ্টেন। উত্তেজিত কণ্ঠে মেজরকে বললেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা রাস্তায় নেমে পড়েছে। গোলাগুলি ছুঁড়ছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে। কি করবেন এখন? আধ মিনিট। মাত্র আধ মিনিট সময় নিয়ে চিন্তা করলেন বাঙালী মেজর। তারপর বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করলেন—উই রিভোল্ট। রাত তখন সাড়ে এগারোটা।

বিদ্রোহ ঘোষণা করে মেজর জিয়া সেই ট্রাক নিয়েই ফিরে এলেন ষোলশহর ক্যাণ্টনমেণ্টে। সঙ্গী পশ্চিমা সামরিক অফিসার ও নৌ-সেনাদের অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করে গ্রেফতার করলেন তাদের। তারপর একাই গাড়ী নিয়ে ছুটে গেলেন অনেক দুষ্কর্মের হোতা অফিসার কমাণ্ডিং জানজুয়ার বাড়ী। ঘুম থেকে তুলে তাকে নিয়ে এলেন গ্রেফতার করে।

তারপর ৮ম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টের সকল বাঙালী সৈনিককে একত্রিত করে জানালেন পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা। সবাই সমস্বরে সমর্থন জানাল বিদ্রোহের প্রতি। সমর্থন জানাল মেজর জিয়ার প্রতি। শপথ নিল স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগের।

এদের নিয়েই মেজর জিয়া ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। মুক্তির যুদ্ধে। ঘাঁটি গাড়লেন কালুর ঘাটে। তাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল পাকিস্তানী সৈন্যরা।

এই ছিল বীরপ্রসবিনী চট্টলার পঁচিশে মার্চের সেই রাত। এই ছিল প্রথম রাত। তবে এই ইতিহাসের শুরু শুধু এখানে নয়। এ প্রতিরোধের প্রস্তুতি আরো আগের। এ প্রতিরোধের শেষ স্বাধীনতায়।

স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতার ঘোষণাই ধ্বনিত হয়েছিল মেজর [বর্তমানে মেজর জেনারেল] জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা-সংগ্রামে অভাবনীয় সাফল্যের পর ২৭শে মার্চ তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রে। তখন আর চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র নয়—এটি তখন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র। বাংলা ও ইংরাজী ভাষণে মেজর বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন জানালেন বিশ্ববাসীর কাছে। আহ্বান জানালেন দেশবাসীর কাছে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার।

৩০শে মার্চ এই কেন্দ্র থেকেই আবার তিনি ঘোষণা করলেন—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

এ শুধু একটি ঘোষণাই নয়। এ যেনো ছিল হানাদার হিংস্র হামলায় বিপর্যস্ত বাংলার মানুষের কাছে একটি রক্তিম সম্ভাবনার উজ্জল ইঙ্গিতবাহী। একটি প্রচণ্ড মনোবল যেন দুর্দম আবেগে দুঃসাহসী করে তুলছিল বাংলার মানুষকে। আর তাতে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল পশ্চিমা হানাদাররা। কেঁপে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণতির আশংকায়।

আর তাই, তারা এর পর পরই বিমান হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল এই বেতারকেন্দ্র। সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চট্টগ্রামের উপর। সে কাহিনী আজ ইতিহাস। সে ইতিহাস বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস।

পিছিয়ে না গিয়ে এর পরের কথাই বলি। ২৬শে মার্চের সকাল। আগের রাতে ঢাকা শহরে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনের আনন্দে

মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানী সৈন্যরা। সকাল থেকেই পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতরে চলছিল মিষ্টি বিতরণ আর অভিনন্দনের পালা। কিন্তু মুহূর্ত কয়েক পরেই মুখের হাসি তাদের ম্লান হয়ে যায়। মিষ্টি হয়ে ওঠে বিস্বাদ। চট্টগ্রামে বিপর্যয়ের খবর যখন তাঁদের কাছে পৌঁছল, এক দারুণ সন্ত্রাসে সবাই তখন আঁতকে উঠল।

চট্টগ্রাম। বীর নগরী চট্টলা। পাকিস্তানীদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল চট্টগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে গেল পুরো দ্বিতীয় কমাণ্ডো ব্যাটেলিয়ন। যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরীর জন্য মিঠাখানকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হল চট্টগ্রামে। নৌ-বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বাবরকে আনা হয় বন্দরে। এতে ছিল দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য। ডেষ্ট্রয়ার। এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক লাগানো হয় চট্টগ্রামের যুদ্ধে। জাহাজ থেকেও গোলা নিক্ষেপ হতে থাকে শহরের দিকে। এ ছাড়াও ছিল ২০তম বালুচ রেজিমেণ্ট, কুমিল্লা থেকে নেয়া হয়েছিল ৫৩ ব্রিগেড, কোয়েটা থেকে আনা হয়েছিল ১৬শ ডিভিশন ও প্রথম কমাণ্ডো ব্যাটেলিয়ন।

১১ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিরোধে অটল থাকেন মুক্তিপাগল অমিততেজা বাঙালী যোদ্ধারা। বাঙালী সৈন্যদের সাথে স্থানীয় জনসাধারণ, ছাত্র, যুবক সবাই তখন একাকার হয়ে গিয়ে পরিণত হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধায়। তাদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ২০তম বালুচ রেজিমেণ্ট, ৫৩ ব্রিগেড। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অবাঙালীদের ঘরে ঘরে আশ্রয়-নেয়া ছদ্মবেশী কমাণ্ডোরা।

৩০শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাবার পর ৩রা এপ্রিল রাত সাড়ে নয়টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন একটি গোপন এলাকা থেকে চালু করা হয় আর একটি বেতারকেন্দ্র। 'আমার সোনার বাংলা' দিয়ে করা হয় এই কেন্দ্রের উদ্বোধন। এই গানটি গাইবার জন্যে সে রাতে সেখানে এসেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন পুলিশ সুপার জনাব রহমানের তিন মেয়ে।

১১ই এপ্রিল এ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। ছড়িয়ে পড়ে রামগড়, রাঙামাটি, কক্সবাজার আর শোভাপুরের পথে পথে। এই যুদ্ধের সাফল্যজনক সমাপ্তি স্বাধীনতায়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়। [১]

---

(১) সৌজন্য : ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক বাংলা' ২৬শে মার্চ, ১৯৭৪।

চট্টগ্রামে মঠ-মন্দির ধ্বংস

[*পাকিস্তানী বর্বরতা*]

কল্যাণ বসু

মঠ-মন্দির বলতে চট্টগ্রামে এখন আর তেমন কিছু নেই। অথচ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশের জন্য পাক-শাসিত পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রামই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মানুষ্ঠানের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। চট্টগ্রামের যে সব নরপশু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে বিদ্বেষ পোষণ করে আসছিল এবার তারা হানাদারদের সহযোগিতায় পৈশাচিক উল্লাসে ধ্বংসের নেশায় মেতে উঠেছিল। বিধর্মী সেই বর্বরেরা শুধু হিন্দুমন্দির, উপাসনাকেন্দ্র, বৌদ্ধ মঠ, বিহার ধ্বংস করে নি, দেব-দেবীর মূর্তির অবমাননা করে শুধু ধূলায় মিশিয়ে দেয় নি, ওরা মঠে-মন্দিরে নিরস্ত্র পূজারী ও ভক্তদের নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে।

চট্টগ্রাম শহরের এক প্রান্তে ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে কৈবল্য ধামে রাম ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের কথা অনেকেই জানেন। এটিই রাম ঠাকুর সংঘের প্রধান কেন্দ্র। রাম ঠাকুর নিজেই এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যাঁরা চট্টগ্রামের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন কত বিরাট এলাকা নিয়ে এই আশ্রম গড়ে উঠেছে। এই আশ্রমের পেছনেই বিহারীদের ফিরোজ শা কলোনী। এই এলাকা এখন সংরক্ষিত এলাকা। গত কয়েক মাসে আশ্রমের ভেতর কেউ এসেছেন বলে মনে হয় না। ভেতরে ঢুকেই মনে হয়েছে, সদ্যঃআবিষ্কৃত প্রাচীন কোন সভ্যতার নিদর্শনের সামনে হঠাৎ উপস্থিত হয়েছি। সামনে আকাশ-ছোঁয়া কতগুলো থাম অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিকে বড় বড় আগাছা জন্মেছে। আমাদের পেছন পেছন স্থানীয় কিছু বাঙ্গালী এসে জড়ো হয়েছেন। তাঁদের একজন বললেন, 'বাবু আমরা এইখেনেই থাকি। এই মন্দিরে বারো মাসে তেরো পার্বণ। আমরা মুসলমান হলেও উৎসব-পার্বণে কত খেয়েছি, হৈ-চৈ করেছি। মানুষের একেবারে মেলা বসে যেতো।' চোখের জল মুখে। একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা আশ্রমের নাটমন্দির। উৎসবে হাজার কুড়ি

মানুষের এখানে প্রাণ যেত।' একটু এগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। সিঁড়িতে যেসব পাথরের ফলক ছিল, সেগুলোও খুঁড়ে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওপরে উঠে এলাম। মন্দিরের সামনে একটা দেওয়ালে লেখা, 'এই হাড়গুলি ছুঁইবেন না।' প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। স্থানীয় সেই ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার পায়ের সামনে এই যে খুলি-হাড় পড়ে আছে এসব আশ্রমের পূজারীদের। পূজারী কীর্তনীয়া মিলিয়ে ২৭ জনকে সারি করে বসানো হয়েছিল ঠিক এইখানে। তারপর সকলকে গুলি করে মারা হয়। মন্দিরটা তোপ দেগে ভেঙে দিয়েছে।' মন্দিরের ভেতরে গেলাম। এখানে ঠাকুরের সমাধি, কামধেনুর সমাধি ছিল। হানাদাররা সমাধি ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছে, ভেতর থেকে সোনাগয়না পাবার আশায়। মন্দিরে মূর্তির চিহ্ন নেই।

আন্দরদীঘির পশ্চিম পারের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালে। এখানে একটা ছাত্রাবাস ও মন্দির ছিল। এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া এখানে কিছু নেই। একই অবস্থা চট্টেশ্বরী বাড়ী, কৃষ্ণানন্দ আশ্রম, নবগ্রহ বাড়ী, সদরঘাট কালীবাড়ী, কালাচাঁদ ঠাকুরবাড়ী, সীতাকুণ্ড, দশমহাবিদ্যাবাড়ী, ফিরিঙ্গী-বাজার শিবমন্দির, বাড়ৈয়াঢালা রাধামাধব আশ্রম, আবু তরক জগন্নাথ-মন্দির, রামগড় কালীবাড়ী, জগন্নাথবাড়ী ও শীতলা-মন্দিরের। ফিরিঙ্গীবাজার শিবমন্দির ট্রাক্টর দিয়ে পিষে ফেলা হয়েছে। গহিরার কুণ্ডেশ্বরী মন্দিরের দেবীমূর্তি বিকৃত হয়ে গিয়েছে। প্রবর্তক পাহাড়ে পাকবাহিনী একটা ক্যাম্প বসিয়েছিল। যাবার সময় এখানকার আশ্রমের তারা প্রভূত ক্ষতি করে গেছে।

বৌদ্ধ-বিহার রেহাই পায় নি

যদিও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের একটা অংশ পাক-বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, তবুও বেশ কিছু বৌদ্ধমঠ ও বিহার হানাদারদের আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ওদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। অবশ্য বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার যা হবার তা হয়েছে বিভীষিকাময় গত ন'মাসের প্রথম দিকটায়। বৌদ্ধরা 'চীনের বন্ধু' এই শ্লোগান চালু হবার পর অবশ্য তাঁদের ওপর অত্যাচার কমতে থাকে। শেষদিকে বৌদ্ধদের আশ্রয়ে প্রচুর হিন্দু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে রক্ষা পেয়েছেন।

মগ উপজাতির রাজার মানিকছড়ি রাজবাড়ীর প্রধান ভিক্ষু উপন্নিস্তা মহাথেরো বলেছেন, মগ, বুমাং ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা পাক-অত্যাচারের

তবু

শিকার হয়েছেন, অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। চাক্‌মারা ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রেহাই পেয়েছে। অনেক চাকমা রাজাকার হয়ে বৌদ্ধদের ওপরও জুলুম করেছে। তিনি বলেছেন, ওরা ভয় দেখিয়ে ঢাকা থেকে বৌদ্ধপ্রধান বিশুদ্ধানন্দকে চট্টগ্রামে নিয়ে এসেছিলো। অত্যাচারের কিছু না দেখেই তাঁকে সার্টিফিকেট দিতে হয়েছে, চট্টগ্রামে বৌদ্ধরা নিরাপদে আছেন। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েকশ' বৌদ্ধ প্রাণ হারিয়েছেন, রামগড়ের মহামুনি বিহার, পুরা রামগড়-এর মঠ-বিহার লুঠ করে ধ্বংস করা হয়েছে। মানিক-ছড়ির সোনার মূর্তি ওরা নিয়ে গেছে। রাউজান থানার আঁধার মানিক গ্রামের এবং সাত্তার-ঘাট ব্রীজ সংলগ্ন বৌদ্ধমন্দির একেবারে বিধ্বস্ত।

ধর্মান্তরকরণ

মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে খান সেনাদের সাহায্যে কট্টর মুসলীম লীগপন্থীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কত লোকের ধর্মান্তরকরণ করেছে তার হিসেব নেই। হিসেব নেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কত মেয়েকে জোর করে ওরা ভিন ধর্মীয় লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অবশ্য ধর্মান্তরিত লোকেরা আবার স্বধর্ম গ্রহণ করতে পারছেন।

আমার আলাপ হয়েছে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সম্পাদক পটিয়া থানার জোয়াড়া গ্রামের শ্রীরোহিণীকুমার চৌধুরী এবং শ্রীসুরেন্দ্রবিজয় চৌধুরীর সঙ্গে। ধর্মান্তরকরণের পর রোহিণীবাবুর নাম হয়েছিল রহমত আলি এবং সুরেন্দ্রবাবুর নাম হয়েছিল সেকেন্দর আলি। ধর্মান্তরকরণের আগে এঁদের বলা হয়েছিল দাড়ি বড় করার জন্য। নতুন নাম পাবার পর বাড়ীর দরজায় ওরা নতুন নেমপ্লেট লাগিয়ে দিয়ে যায়। দেশ মুক্ত হবার পর গ্রামের ইউনিয়ন কাউন্সিল-এর সাহায্যে আবার এঁরা নিজের ধর্ম ফিরে পেয়েছেন। [১]

১। সৌজন্যঃ—যুগান্তর, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭১

বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা

য